# উপহার

..........................................................................কে
উপহার দিলাম।
উপহারদাতাঃ ..................................................................
তারিখঃ ......................................................................

স্বত্বাধিকারী–

নামঃ ......................................................................
গ্রাম/মহল্লাঃ ..............................................................
থানাঃ ......................................................................
জেলাঃ ......................................................................



**সতর্কীকরণ**

প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
"আহকামে যিন্দেগী"-র ৫ম সংস্করণ
এবং প্রকাশনায় "মাকতাবাতুল আবরার"
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮৮ দেখে ক্রয় করুন।

# আহকামে যিন্দেগী

(জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান)

**গ্রন্থকার**

**মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন**

শাইখুল হাদীছ, জামিআ ইসলামিয়া আরাবিয়া
তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০
মুহাদ্দিছ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
৩১২, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা–১২৩৬

**প্রকাশনায়**

মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪
www.maktabatulabrar.com
www.facebook.com/maktabatulabrarbd



**আহকামে যিন্দেগী**
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

**প্রথম প্রকাশ:**
রমযান, ১৪১৯ হিজরী, ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইংরেজি, পৌষ, ১৪০৫ বাংলা

**দ্বিতীয় সংস্করণ:**
মুহাররম, ১৪২২ হিজরী, এপ্রিল, ২০০১ ইংরেজি, চৈত্র, ১৪০৭ বাংলা

**তৃতীয় সংস্করণ:**
রবিউল আউয়াল, ১৪২৮ হিজরী, এপ্রিল, ২০০৭ ইংরেজি, চৈত্র, ১৪১৩ বাংলা

**চতুর্থ সংস্করণ:**
সফর, ১৪৩২ হিজরী, জানুয়ারি, ২০১১ ইংরেজি, মাঘ, ১৪১৭ বাংলা

**পঞ্চম সংস্করণ:**
জুমাদাউ উলা, ১৪৩৬ হিজরী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ইংরেজি, ফাল্গুন, ১৪২১ বাংলা

**প্রকাশনায়:**
মাকতাবাতুল আবরার



মূল্য: ৩৩০.০০ (তিনশত ত্রিশ টাকা মাত্র)
US$ 30.00



**AHKAME ZINDEGY**
(Guide lines for life)
Written by Maolana Md. Hemayet uddin in bengali
Published by Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

## সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র





## বিস্তারিত সূচিপত্র

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## ইবাদাত

তৃতীয় অধ্যায়

## মুআমালাত

### অর্থনীতি

## বিয়ে-শাদি



## তালাক



চতুর্থ অধ্যায়

## মুআশারাত

## মানবাধিকার







## আদব, শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

**পরিবার-নীতি**



**সন্তান লালন-পালন**

**সমাজনীতি**



**রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি**





পঞ্চম অধ্যায়

**আখলাকিয়্যাত (তায্‌কিয়া/তাসাওউফ)**

**❑ কয়েকটি আত্মিক গুণ ও তা অর্জনের পন্থা**



**❑ কয়েকটা মনের রোগ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়**

**সূচি সমাপ্ত**



## মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ–এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

**الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين، و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد :**

সমস্ত পৃথিবীর মালিক আল্লাহ পাক। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর কোনো শরীক নেই। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে সকলের উপর তাদেরকে শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। আর সেই উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে শ্রেষ্টত্ব বজায় রাখার যথাযথ ব্যবস্থা স্বরূপ পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন। তাঁর একান্ত মেহনত এবং অবিরাম চেষ্টার ফলে চরম বর্বরতার অবসান ঘটে সভ্যতার স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয় এবং এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ সাধন, ইহকাল পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জন–-এর একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। এর কোনো বিকল্প নেই।

এ কথাও আজ সুস্পষ্ট যে, মানুষ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে যে পরিমাণ দূরে সরে রয়েছে সে পরিমাণই ধ্বংসের ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। কেবল মুসলমানরাই নয় বরং অন্য বিধর্মীরাও এ ধ্রুব সত্য অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর কুচক্রী-রা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেয়ার যতই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, ততই বিধর্মীদের মধ্যে ইসলামী জীবন-বিধান গতিশীল এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে, অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে চলেছে।

এই মুহূর্তে ইসলামী জীবন বিধান এবং ইসলামী হুকুম-আহকামের ব্যাপক এবং নিখুঁত প্রচার-প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন, প্রয়োজন সমসাম-য়িক আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার গবেষনামূলক সঠিক উত্তর এবং জ্ঞান চর্চার। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ রচনা এবং বই- পুস্তকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষী-

দের অবদান তুলনাহীন। সর্বযুগে সর্ববিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়াদির উপর ছোট বড় এত অধিক পরিমাণ কিতাব এবং বই-পুস্তক রচিত হয়েছে যার নজির অন্য কোনো ধর্মে বিরল।

তবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ইসলাম মোতাবেক স্বীয় জীবন গড়ে তোলার জন্য এতসব ঘাটাঘাটি করা অতি সহজ ব্যাপার নয়। জ্ঞানের এবং সময়ের স্বল্পতার সাথে সাথে ভাষাগত জটিলতাও অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বাংলাভাষায় বেহেশতী জেওরসহ অনেক কিতাব ও বই-পুস্তক এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেশের প্রেক্ষাপট, তাহযীব-তামাদ্দুন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার চাহিদা আর বিশেষত আধুনিক বিষয়াদির নিরিখে আকায়েদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাকিয়াতের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। আর ছিল বলেই আমি এ বিষয়ের উপর প্রাথমিক কাজও শুরু করেছিলাম, কিন্তু ব্যস্ততা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে কাজে বিলম্ব হতে থাকে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে পবিত্র কুরআন প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে চলেছে। তাঁর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার পর আমি অবগত হই যে, তিনি উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক একখানি কিতাব রচনার কাজ করে যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে আছেন। তাই তাঁকেই দ্রুত কাজটির সমাপ্তির জন্য অনুরোধ করি এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেই।

আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত তিনি অত্যন্ত সঠিক সুন্দরভাবে অনুরূপে উক্ত কিতাব রচনার কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। যার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ।

১. আকায়েদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাকিয়াতের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযুক্ত করেছেন।

২. আধুনিক মাসলা-মাসায়েল এবং সমসাময়িক বিষয়াদির উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

৩. সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর সঠিক ও সাবলীলভাবে মাসলা-মাসায়েল উপস্থাপন করেছেন।

৪. তুলনামূলক অপ্রসিদ্ধ মাসলা-মাসায়েলের বরাত উল্লেখ করেছেন, যাতে প্রয়োজনে কেউ মূল কিতাব দেখে নিতে পারেন।



৫. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের দুআ দুরূদও সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৬. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদাব সবধরনের আহকাম বর্ণনা করেছেন, যেন মানুষ সবগুলো জেনে নিজেদের জীবনকে পূর্ণভাবে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারে।

“মজলিসে দাওয়াতুল হক” আল্লাহ পাকের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সুন্নাতের পুরাপুরি অনুসরণ অনুকরণ এবং আম্‌র বিল মারূফের সাথে সাথে নাহি আনিল মুন্‌কারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের সর্বত্র পবিত্র কুরআনের পরিশুদ্ধ তেলাওয়াত, সুন্নাতের তালীম, আযান একামতের আমলী মশ্‌ক, ফরয ওয়াজিবের সাথে সাথে সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদবের অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এ সমূহ বিষয়ের উপর জরুরি প্রবন্ধ এবং বই-পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে।

ইসলামের সর্ববিষয়ে, বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সমস্যাবলীর সঠিক সমাধানে “আহকামে যিন্দেগী” কিতাবখানি বিশেষ অবদান রাখবে বলে মজলিসে দাওয়াতুল হক কিতাবখানি প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

“আহকামে যিন্দেগী” নামক এ গ্রন্থখানির ন্যায় বড় বড় বিষয়সহ জীবনের বহু খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ ও ব্যাপক ভিত্তিক কোন একক গ্রন্থ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। তাই উপমহাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানির উর্দূ, আরবী ও ইংরেজি অনুবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি। কোনো আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ কাজে এগিয়ে আসলে ইসলামের একটা বড় খেদমত হবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সকলের মেহনতকে কবূল করুন। আমীন!

**মাহমূদুল হাসান**

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ

মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা–১২৩৬

০৬-০৯-১৯৯৮ ইং

## লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين، و على اله واصحابه اجمعين. اما بعد :

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত ও পূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানব-জীবনের সর্ববৃহৎ বিষয় থেকে শুরু করে সর্ব ক্ষুদ্র বিষয়– সব ব্যাপারেই ইসলামের দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে ইসলাম নীরব; এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের নীতি ও দিক-নির্দেশনা অনুপস্থিত। উম্মতের ফুকাহা, উলামা, বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীগণ কুরআন ও হাদীছ থেকে চয়ন করে এসব নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, যেন প্রত্যেকে সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী তার পূর্ণ জীবন ঢেলে সাজাতে পারে এবং যেন এভাবে প্রত্যেকে পূর্ণ মুসলমান হতে পারে। যার মধ্যে পূর্ণ মান্যতা থাকে সে-ই তো পূর্ণ মুসলমান।

মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে উম্মতের এসব লেখা শত শত গ্রন্থে এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ ছড়িয়ে রয়েছে; যার সবটা বুঝা এবং সবটা সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে দুঃসাধ্যও বটে। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল একটি গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় সব ধরনের তথ্য এবং জীবনের সব আহকাম যথাসাধ্য একত্রভাবে পেশ করার। এরই ভিত্তিতে ‘আহকামে যিন্দেগী’ নামক এ গ্রন্থখানি রচনা ও সংকলনের প্রয়াস।

একটি গ্রন্থেই জীবনের সবকিছু নিয়ে আলোচনা করা ও যাবতীয় হুকুম-আহকাম বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে বয়ান করা সম্ভব নয় তা সকলেরই বোধগম্য বিষয়। তাই এ গ্রন্থে বিরল বিষয়াদি বাদ দিয়ে নিত্য প্রয়োজ-নীয় বিষয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে, দার্শনিক ও বিবরণমূলক আলোচনার বাহুল্য বর্জন পূর্বক ব্যবহারিক ও আমলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়কেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মানব-জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:– কিছু ঈমান আকীদার সাথে সম্পর্কিত, কিছু ইবাদতের



সাথে সম্পর্কিত, কিছু মুআমালাত তথা লেন-দেন ও কায়-কারবারের সাথে সম্পর্কিত, কিছু মুআশারাত তথা পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, পারস্পরিক অধিকার ও সমাজ সামাজিকতার সাথে সম্পর্কিত, আর কিছু আখলাকিয়াত তথা তাযকিয়া বা আধ্যাত্মিক সংশোধন ও চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। আলোচ্য গ্রন্থে জীবনের যাবতীয় হুকুম-আহকামের বর্ণনাকে এভাবেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের দুআ-দুরূদ এবং যিকির-আযকারও সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সহজ সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের মানুষ এ থেকে সহজে উপকৃত হতে পারেন।

প্রত্যেকটা মাসআলার সাথে দলীল ও বরাত উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ণনার সাবলীলতা বিনষ্ট হবে– এই আশংকায় সাধারণ, প্রচলিত এবং সুবিদিত মাসায়েলের দলীল বা বরাত উল্লেখ করা হয়নি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক অপ্রসিদ্ধ মাসআলার শুধু বরাত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। দুআ-দুরূদ ইত্যাদির তর্জমা বর্ণনা করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনি। কেউ তার প্রয়োজন বোধ করলে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিতে পারবেন। আর দুআ-দুরূদ ইত্যাদির বাংলা উচ্চারণ লিখে দেইনি এ কারণে যে, এতে যারা আরবী পড়তে জানেন না তাদের আরবী পড়া না শিখে চলতে থাকাকে সমর্থন বা আরও দীর্ঘায়িত করা হবে। তদুপরি বাংলা উচ্চারণ দেখে কখনই শুদ্ধ পড়া সম্ভব নয় এবং অশুদ্ধ পড়লে অনেক ক্ষেত্রে তা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যারা আরবী পড়তে জানেন না, তাদের প্রতি অনুরোধ আরবী পড়া শিখে নিন, এটা খুব কঠিন বিষয় নয়- একজন ওস্তাদের কাছে আন্তরিকতা সহকারে অল্প কিছু দিন মেহনত করলেই ইনশাআল্লাহ সহীহভাবে পড়া শিখতে পারবেন। মনে রাখবেন- সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শেখা ফরয। কুরআন সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে শেখার জন্য এবং নামাযের কেরাত, দুআ ইত্যাদি সহীহ শুদ্ধ করার মাধ্যমে বিশুদ্ধ নামায পড়ার জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার করা কি কর্তব্য নয়? এক্ষেত্রে সহযোগিতা নেয়ার জন্য গ্রন্থের শেষে বর্ণিত তাজবীদের বর্ণনা দেখে নেয়া যাবে।

গ্রন্থখানি রচনা ও সংকলনের কাজে হাত দেয়ার পর মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ–এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)–এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি নিজেই

এরূপ একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছেন বলে জানান। তবে আমার রচনা ও সংকলনের কাজ অনেক দূর অগ্রসর জেনে আমাকে এটি পূর্ণ করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং নিজের পরিকল্পনাকে স্থগিত করেন। তিনি গ্রন্থখানি রচনার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সবশেষে পুরো গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। সর্বোপরি মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ–এর পক্ষ থেকে গ্রন্থখানি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। এসব কিছুর জন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেশের আরও বেশ কয়েকজন সুযোগ্য আলেম ও মুফতীকে দেখিয়ে যাচাই-বাছাই করানো হয়েছে। তন্মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বন্ধুবর মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ ও বিশিষ্ট মুফতী স্নেহভাজন শাগরেদ মাওলানা মুহিউদ্দীন মা'সূম–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এসত্ত্বেও যদি কোনো মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে কোনো মাসআলায় বা কোনো বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। বিশেষভাবে যুগ ও আধুনিক অবস্থার পেক্ষাপটে যেসব নতুন গবেষণাপ্রসূত মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ও অধিকতর তাহ্‌কীক সমৃদ্ধ ভিন্ন মত থাকলে এবং তা আমাদেরকে অবহিত করার কষ্ট স্বীকার করলে বা অন্য কোনোভাবে তা জানতে পারলে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থখানিকে আমার ও মুসলমান ভাই-বোনদের যিন্দেগী গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত

**মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন**

১৭-০৭-১৯৯৮ ইং



## পঞ্চম সংস্করণ প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

**نحمده و نصلى على رسوله الكريم. اما بعد :**

আলহামাদু লিল্লাহ! আহকামে যিন্দেগী-র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের তাওফীক লাভ হল। উলামায়ে কেরামের মাশওয়ারা অনুযায়ী এই পঞ্চম সংস্করণেও বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ মুফতী সাহেবকে দিয়ে অধিকতর তাহকীক সাপেক্ষে আরও কিছু মাসআলায় কিঞ্চিত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন আনা হয়েছে। বহু স্থানে বরাতও সংযোজন করা হয়েছে। বেশ কিছু নতুন মাসআলাও সংযোজিত হয়েছে। বিতর্কিত কিছু বিষয়ে সংশয় নিরশনের জন্য টীকায় বা মূল গর্ভে বেশ কিছু কথা যোগ করা হয়েছে। (গ্রন্থের শেষে "পঞ্চম সংস্করণে যা যা পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করা হয়েছে" শিরোনামে এসব কিছুর বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।) এসব কিছুর প্রেক্ষিতে কিতাবটির কলেবরও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থের মূল্য সামান্য বর্দ্ধিত করতে হয়েছে। ক্রেতাগণের কাছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আবেদন রইল। আশা করি এই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটি পাঠক মহলের নিকট আরও বরণীয় হবে।

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবখানি দ্বারা উম্মতকে আরও অধিক ফায়দা পৌঁছান এবং এটিকে আমার নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত

মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

০৭–০১–২০১৫ ইং

# ইল্‌ম করা (জ্ঞান অর্জন করা) সম্পর্কিত প্রাথমিক কিছু আলোচনা

## ইল্‌ম কাকে বলে

ইল্‌ম-এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান। ইসলামের পরিভাষা অনুসারে কুরআন হাদীছ তথা ইসলামের জ্ঞানকেই ইল্‌ম বলা হয়। ইল্‌মের সঙ্গে সঙ্গে আমলও কাম্য। আমলবিহীন ইল্‌ম ইল্‌ম হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়।

## ইল্‌ম হাছিল করার গুরুত্ব

আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌ম হাছিল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ। আবশ্যক পরিমাণ (যা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন) বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয় এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় লেন-দেন ও কায়-কারবার সম্পর্কিত বিষয়াদির মাসআলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম জানা। আবশ্যক পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত ইল্‌ম যা অন্যেরও উপকারার্থে প্রয়োজন, তা হাছিল করা ফরযে কেফায়া অর্থাৎ, কতক লোক অবশ্যই এরূপ থাকতে হবে যারা দ্বীনের সব বিষয়ে সমাধান বলে দিতে পারবেন, নতুবা সকলেই ফরয তরকের পাপে পাপী হবে। তাই প্রত্যেক এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞ আলেম থাকা আবশ্যক।



## ইল্‌মের ফযীলত

* কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে (কুরআন-হাদীছের) জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেন। (সূরা মুজাদালা: ১১)

* আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী বুঝ (ধর্মীয় জ্ঞান) দান করেন। (বোখারী ও মুসলিম)

* হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আবূ যর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর, তাহলে তোমার জন্য তা একশত রাকআত নফল পড়া থেকেও উত্তম। আর যদি সকাল বেলায় গিয়ে ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, তাহলে তোমার জন্য তা এক হাজার রাকআত নফল পড়া থেকেও উত্তম। (ইবনে মাজা)

## ইল্‌ম হাছিল করার পদ্ধতি

সাধারণত তিন পদ্ধতিতে ইল্‌ম হাছিল করা যায়। যথা:– (এক) নিয়মিত কোন উস্তাদ থেকে। (দুই) দ্বীনী কিতাবাদি পাঠ করে। (তিন) কারও থেকে ওয়াজ-নছীহত বা দ্বীনী আলোচনা শুনে কিংবা জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই তিনটি পদ্ধতির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা রয়েছে। তা হল:

### (এক) উস্তাদ নির্বাচনের নীতিমালা

১. উস্তাদকে হক্কানী ব্যক্তি তথা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে। কোন বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী, ভণ্ড ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে উস্তাদ বানানো যাবে না।

২. উস্তাদের চিন্তাধারা ঠিক থাকতে হবে। নতুবা ছাত্রের চিন্তাধারাও সঠিক হয়ে গড়ে উঠবে না। উল্লেখ্য, আজকাল অনেকে ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি থেকে দ্বীনী অনেক কিছু বিনা বিচারে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। এভাবে অনেকে বিভ্রান্তও হয়ে থাকেন। কার্ বক্তব্য তার সম্বন্ধে ভালভাবে না জেনে অন্তত দ্বীনী কথা আদৌ গ্রহণ করবেন না।

৩. উস্তাদের মধ্যে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল থাকতে হবে। বে-আমল ব্যক্তিকে উস্তাদ বানানো সংগত নয়।

৪. উস্তাদকে আদর্শবান ও উন্নত আখলাক-চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

## (দুই) গ্রন্থ পাঠের নীতিমালা

১. কোন দ্বীনী বিষয় শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্য যখন কোন কিতাব (গ্রন্থ) নির্বাচন করতে হবে, তখন সর্বপ্রথম দেখতে হবে কিতাবখানার লেখক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি-না, তিনি ভাল জাননেওয়ালা ব্যক্তি কি না। যার লেখা কিতাব পাঠ করে ইল্‌ম হাছিল করা হবে তিনিও উস্তাদের পর্যায়ভুক্ত; অতএব পূর্বের পরিচ্ছেদে উস্তাদ নির্বাচনের যে নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে কিতাখানার লেখক সেই নীতিমালায় উত্তীর্ণ কি না তা দেখে নিতে হবে।

২. বিজ্ঞ আলেম নন– এমন ব্যক্তির জন্য কোন বাতিলপন্থী ও বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লিখিত বই-পত্র পাঠ করা ঠিক নয়। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য বিধর্মীদের কিতাব যেমন: তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পাঠ করাও জায়েয নয়। অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন, আমরা পাঠ করে ভালটি গ্রহণ করব মন্দটা গ্রহণ করব না, তাহলে কী অসুবিধা? এ যুক্তি এজন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ভাল/মন্দ সঠিকভাবে বিচার করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকায় তিনি হয়ত মন্দটাকেই ভাল ভেবে গ্রহণ করে বিভ্রান্তি ও গুমরাহী-র শিকার হয়ে পড়বেন।

৩. কোন ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে কোন বিষয় সন্দেহপূর্ণ মনে হলে বা অস্পষ্ট মনে হলে কিংবা ভালভাবে বুঝতে না পারলে দ্বীনী ইল্‌ম সম্বন্ধে বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তি থেকে সেটা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

৪. অনেকে দু'চারটি দ্বীনী পুস্তক পাঠ করেই দ্বীন সম্পর্কে ইজতেহাদ বা গবেষণা শুরু করে দেন, অথচ ইজতেহাদ বা গবেষণা করার জন্য যে শর্তাবলী এবং পর্যাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োজন তা তার মধ্যে অনুপস্থিত। এটা নিতান্তই বালখিল্যতা। নিজের অজানার বহর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই এরূপ মতি-বিভ্রম ঘটে থাকে। এরূপ লোকের গ্রন্থ পাঠ গুমরাহী-র কারণ হতে পারে।

৫. কোন গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোন মাসআলা বা বর্ণনা যদি নিজেদের মাযহাবের খেলাফ মনে হয়, তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না। জানার জন্য সেটা পড়া যাবে, কিন্তু আমল করতে হবে নিজেদের ইমামের মাযহাব ও মাসায়েল অনুযায়ী। প্রয়োজন বোধ হলে নিজেদের মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেয়া যাবে। মাযহাব অনুসরণ প্রসঙ্গে দেখুন ৪৩ নং পৃষ্ঠা।



৬. দ্বীনী কিতাব (গ্রন্থ)–এর আদব রক্ষা করতে হবে। দ্বীনী কিতাবাদি নিচে রেখে উপরে শোয়া বা উপরে বসা থেকে বিরত থাকাই আদব।

## (তিন) ওয়াজ-নছীহত বা দ্বীনী আলোচনা শোনার নীতিমালা

১. সর্বপ্রথম দেখতে হবে তার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সহীহ কি না এবং তিনি হকপন্থী কি না। নিজের জানা না থাকলে কোন বিজ্ঞ আলেম থেকে তার সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

২. জেনে নেয়ার পরও তার কোন বক্তব্য সন্দেহপূর্ণ মনে হলে কোন বিজ্ঞ আলেম থেকে সে সম্পর্কে তাহ্‌কীক করে নিতে হবে। তাহ্‌কীক করার পূর্বে সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না বা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না।

## ইল্‌ম হাছিল করার জন্য যা যা শর্ত ও করণীয়

১. নিয়ত সহীহ করে নিতে হবে অর্থাৎ, আমল করা ও আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়তে ইল্‌ম হাছিল করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করে মানুষের সঙ্গে তর্কে বিজয়ী হওয়া বা অহংকার প্রদর্শন কিংবা সম্মান অর্জন প্রভৃতি নিয়ত রাখা যাবে না।

২. কিছু জানি না– এরূপ মনোভাব নিয়ে ইল্‌ম সন্ধানে থাকতে হবে। জানার জন্য আগ্রহ এবং মনে ব্যাকুলতা থাকতে হবে। আমি অনেক জানি– এরূপ মনোভাব রাখলে সেই মনে নতুন ইল্‌ম প্রবেশ করবে না। তবে হাঁ এর অর্থ এ নয় যে, বিনা বিচারেই সকলের সব কথা গ্রহণ করতে হবে। বরং কোন বিষয় সন্দেহপূর্ণ মনে হলে অবশ্যই তা তাহ্‌কীক করে নিতে হবে।

৩. দ্বীনী ইল্‌মের আজমত-সম্মানবোধ অন্তরে রাখতে হবে। এই ইল্‌ম শিক্ষা করে কী হবে– এরূপ হীনম্মন্যতা পরিহার করতে হবে।

৪. গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা গোনাহগারদের অন্তরে সঠিক ইল্‌ম প্রবেশ করে না।

৫. উস্তাদ ও কিতাবের আদব রক্ষা করতে হবে। উস্তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে এবং উস্তাদের হক আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৩৯ নং পৃষ্ঠা।

৬. উস্তাদের জন্য দুআ করতে হবে। কিতাব পাঠ করে জ্ঞান অর্জন করা হলে সেই কিতাবের লেখকের জন্যও দুআ করা কর্তব্য।

৭. ইল্‌মের জন্য মেহ্‌নত করতে হবে।

৮. যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বারবার উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে কিংবা বারবার পড়ে সেটা পরিষ্ক-ার করে নিতে হবে।

৯. ইল্‌ম বৃদ্ধির জন্য এবং ভালভাবে বুঝে আসার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করতে হবে।

১০. ইল্‌ম অর্জন করে এই ইল্‌ম অন্যকে শিক্ষা দেয়া এবং এই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দেয়ার নিয়তও রাখতে হবে।

## শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি

এ সম্পর্কে ছাত্রের করণীয় এবং উস্তাদের করণীয় শীর্ষক দুইটি পরিচ্ছেদে পরোক্ষভাবে আলোচনা এসে গিয়েছে। দেখুন ৪৩৯ ও ৪৪২ নং পৃষ্ঠা।

## ইল্‌মের জন্য সফরের মাসআলা

সফরের কারণে যদি মাতা-পিতা বা স্ত্রী সন্তানাদির ভরণ-পোষণ বা জীবনের ব্যাপারে আশংকা হয় অর্থাৎ, তার সম্পদ না থাকে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের মত কেউ না থাকে, তাহলে ইল্‌ম অর্জন করার জন্য কোনো অবস্থাতেই সফর করতে পারবে না, চাই ফরযে আইন পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য হোক বা ফরযে কেফায়া পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য হোক। আর তাদের ব্যাপারে এরূপ আশংকা না থাকলে মাতা-পিতা বা স্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা মানবে না। তবে সন্তান যদি দাড়িবিহীন বালক হয় আর পিতা- মাতা তার চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকায় সফর করতে নিষেধ করেন, তাহলে সে নিষেধাজ্ঞা মান্য করা জরুরি। কিংবা যদি সফরের কারণে সন্তানের জীবনের আশংকা থাকে তাহলেও সন্তানকে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে। আর মোস্তাহাব পর্যায়ের ইল্‌ম অর্থাৎ, গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য সর্বাবস্থায় পিতা-মাত-ার আনুগত্য করা উত্তম। আর স্ত্রীর আনুগত্য করা না করা স্বামীর ইচ্ছা–করতেও পারে না-ও করতে পারে, উভয়টার অবকাশ রয়েছে।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও চার মাসে অন্তত একবার তার সঙ্গে মিলন স্ত্রীর অধিকার এবং এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ অধিকার আদায়ে ত্রুটি না হলে ইল্‌মের জন্য সফর করা জায়েয। কিংবা যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রী তার এ



অধিকার ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে সফরে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তাহলেও স্বামীর পক্ষে সফর করা জায়েয হবে। অবশ্য এতসব সত্ত্বেও যদি স্ত্রীর ব্যাপারে চারিত্রিক ফেতনার আশংকা হয়, তাহলে সফরে যাওয়া বা সফরে থাকা জায়েয নয়। (ماخذ از احسن الفتاوی ج/۱)

## আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা অর্জন সম্পর্কে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান যুগের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন: স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, বিদ্যুৎবিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা করা যদি ইসলামের উৎকর্ষ সাধন ও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা বৈধ, কেননা ভাল উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করা হচ্ছে। এর বিপরীত কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এগুলো শিক্ষা করা বৈধ নয়। ফেকাহ্‌র পরিভাষায় এগুলোকে 'হারাম লিগাইরিহী' বলে। 'হারাম লি আইনিহী' নয় অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো নিজে হালাল, জায়েয ও মোবাহ, কিন্তু অন্য হারাম কাজের ওছীলা ও মাধ্যম হওয়ার কারণে তা হারাম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য ভাল হলে এগুলোই অনেক নেকীর কাজে পরিণত হয়। (ইংরেজি পড়িব না কেন? মূল- হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, অনুবাদ: হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী) এরই ভিত্তিতে হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন (উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্র.) "যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে সততা সহকারে মানব সমাজের সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে রাস্তা, পুল, ঘর/বাড়ী তৈরি করে মানুষের উপকার করতে পারে, চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা করে মানুষের সেবা করতে পারে, তাহলে তা উচ্চ দরের নেকীর কাজ ও ছওয়াবের কাজ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যদি ইঞ্জিয়ারিং পড়ে চোরামী ধোঁকাবাজী করে, ব্লাক মার্কেটিং করে, আমানতে খেয়ানত করে, মানুষের বাড়ি-ঘর, পুল, রাস্তা ইত্যাদি নষ্ট করে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ে গরীব রোগীদের সেবার পরিবর্তে শুধু অর্থগৃধ্নুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গরীবদের রক্ত শোষণ এবং গরীবদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, নতুন আবিষ্কারের মেশিন দ্বারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, অর্থ শোষণ করে তাদেরকে কঙ্কালসার করে দেয়, তবে সেটা কুরআন- হাদীছের সাধারণ সূত্র অনুসারে হারাম হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

## তাকলীদ ও মাযহাব অনুসরণ প্রসঙ্গ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম−এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। কুরআন এবং হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই এ ফরয আদায় হবে। কিন্তু সরাসরি যারা কুরআন-হাদীছের ভাষা- আরবী বোঝেন না, কিংবা আরবী ভাষা বুঝলেও কুরআন-হাদীছ যথাযথভাবে অনুধাবন ও তা থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন ও ইজতেহাদ করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার, আরবী সাহিত্য, উসূলে ফেকাহ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর ইত্যাদি যেসব আনুষঙ্গিক শাস্ত্র বুঝার প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেগুলো পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও গভীরভাবে সেসব বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেননি, তাদের পক্ষে সরাসরি সব মাসআলা- মাসায়েল কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ (গবেষণা) করে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা নিরাপদও নয়। বরং গভীর বুৎপত্তি ও দক্ষতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। তাই এসব শ্রেণীর লোকদের জন্য বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের জন্য এমন কোন বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যিনি উপরোক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ও দক্ষ হওয়ার ফলে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ করে বের করতে সক্ষম। এরূপ বিজ্ঞ ও ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতিহাদ করে সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান যেভাবে বলেন তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা উক্ত ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা। তাকলীদ করা তাই উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের লোকদের জন্য ওয়াজিব। আরও উল্লেখ্য, যে ইমামেরই হোক এরূপ যে কোন এক জনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। উম্মতের ইজ্‌মা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এক সাথে একাধিক ইমামের অনুসরণ করা যাবে না, অর্থাৎ, এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করা যাবে না। বরং যে কোন এক জন ইমামেরই পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করার অবকাশ নেই এবং সেরূপ করা জায়েযও নয়, কারণ তাতে সুবিধাবাদ ও খাহেশাতের অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে গোমরাহী-র পথ উন্মুক্ত হয়।



ইতিহাসে অনুরূপ মুজতাহিদ ইমাম অনেকেই অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তন্মধ্যে বিশেষভাবে চারজন ইমাম ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাঁদের চয়ন ও ইজতিহাদকৃত মাসআলা-মাসায়েল তথা তাঁদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। তাই আমরা চার ইমাম ও চার মাযহাব-এর কথা শুনে থাকি। উক্ত চার জন ইমাম হলেন হযরত ইমাম আবূ হানিফা (রহ.), হযরত ইমাম শাফিঈ (রহ.), হযরত ইমাম মালেক (রহ.) ও হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। তাঁদের মাযহাবকেই যথাক্রমে হানাফী মাযহাব, শাফিঈ মাযহাব, মালেকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব বলা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত সব মাযহাবই হক, তবে অনুসরণ যে কোন একটিরই করতে হবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানসহ পৃথিবীর অধিক সংখ্যক মুসলমান হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)−এর তথা হানাফী মাযহাব−এর অনুসারী।

অনেকের মনে সন্দেহ জাগে যে, এক আল্লাহ, এক নবী, এক কুরআন, তাহলে এত মাযহাব কেন! আসলে ‘মায্‌হাব’ অর্থ কি তা তারা ভালভাবে খেয়াল করেন না। এখানে মাযহাব অর্থ ধর্ম নয় যে, একাধিক মাযহাব থাকলে ধর্ম একাধিক হয়ে গেল। বরং পূর্বেই বলা হয়েছে, বিজ্ঞ ও ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যাকেই এখানে মাযহাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব বিজ্ঞ ও ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলেম একাধিক থাকার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যাও একাধিক হতে পারে। এভাবে মাযহাব একাধিক হয়ে গিয়েছে। আরও মনে রাখতে হবে অনুসরণীয় সব ইমামই কুরআন-হাদীছের আলোকে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের কারও ব্যাখ্যাই কুরআন-হাদীছের বাইরে নয়। কোন বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে সকলের মতের স্বপক্ষেই কুরআন/হাদীছ রয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন-হাদীছে সে বিষয়ে একাধিক সূরতের আবকাশ রয়েছে। তাই সব মাযহাবই হক, তবে অনুসরণ যে কোন একটিরই করতে হবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

# প্রথম অধ্যায়: ঈমান ও আকাইদ

ঈমান হচ্ছে সমস্ত আমলের বুনিয়াদ। যার ঈমান নেই
তার কোনো আমল কবূল হয় না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ. الاية

যারা কাফের (অর্থাৎ, যাদের ঈমান ঠিক নেই) তাদের আমলসমূহ
মরুভূমির মরিচিকার ন্যায়। ... (সুরা নূর: ৩৯)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

## ঈমান ও আকাইদ

### কয়েকটা পরিভাষার অর্থ

* ঈমান: "ঈমান" শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরীআতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয় যা স্পষ্টভাবে এবং অবধারিতরূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়) আর কুরআন-হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের অবধারিত (বদীহী) বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

* **মু'মিন:** যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মু'মিন বলা হয়।

* **ইসলাম:** "ইসলাম" শব্দের শাব্দিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য



করা। শরীআতের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় (ঈমানসহ) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।

বি. দ্র. 'ঈমান' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটো সমার্থবোধকভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

* **মুসলমান/মুসলিম:** 'ইসলাম' ধর্ম অনুসারীকে মুসলমান বা মুসলিম বলা হয়।

* **কুফ্‌র:** যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোনো কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস না রাখা হল কুফ্‌র।

* **কাফের:** যার মধ্যে কুফ্‌র থাকে সে হল 'কাফের'।

* **শির্‌ক:** আল্লাহ্‌র জাত (সত্তা), তাঁর ছিফাত (গুণাবলী) এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল শির্‌ক।

* **মুশ্‌রিক:** যে শির্‌ক করে তাকে বলা হয় মুশ্‌রিক।

* **নেফাক/মুনাফেকী:** মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফ্‌র প্রচ্ছন্ন রাখা– এরূপ কপটতাকে বলা হয় নেফাক বা মুনাফেকী।

* **মুনাফেক:** যে মুনাফেকী করে তাকে বলা হয় মুনাফেক।

* **মুল্‌হিদ/যিন্‌দীক:** যে মৌলিকভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান–এর অনুসারী, কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বদীহী তথা অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন- হাদীছের স্পষ্ট বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুল্‌হিদ আর হাদীছের পরিভাষায় তাকে বলা হয় যিন্‌দীক। কারও কারও ব্যাখ্যামতে সব ধরনের ধর্ম-বিরোধী বা মুশ্‌রিকদেরকেও যিন্‌দীক বলা হয়। যারা দাহ্‌রিয়্যা তথা নাস্তিক, তাদেরকেও যিন্‌দীক বলা হয়ে থাকে।

* **মুরতাদ:** ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিংবা ঈমান-পরিপন্থী কোনো কথা বললে বা ঈমান-পরিপন্থী কোনো কাজ করলে তাকে মুরতাদ বলে। সংক্ষেপে মুরতাদ অর্থ ধর্মত্যাগী।

* **ফাসেক:** প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি গোনাহে কবীরা করে বেড়ায়, তাকে বলা হয় ফাসেক। আবার ব্যাপক অর্থে সব ধরনের অবাধ্যকে ফাসেক বলা হয়। এ

হিসাবে একজন কাফেরকেও ফাসেক বলা হতে পারে, যেহেতু সে-ও অবাধ্য।

* **আকীদা:** "আকীদা"-এর শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় আকীদা অর্থ দৃঢ় ও মজবূত ঈমান, অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। "আকীদা" শব্দের বহুবচন হল **আকাইদ**। **এ'তেকাদ** শব্দটিও আকীদা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ'তেকাদ শব্দের বহুবচন এ'তেকাদাত।

* আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত: এর জন্য দেখুন ৯০ নং পৃষ্ঠা।

## যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়

### ১. "আল্লাহ"-এর উপর ঈমান

আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান বলতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াকে বোঝায়। যথা:–

ক. আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

খ. আল্লাহ্র ছিফাত অর্থাৎ, তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্র গুণাবলী

গ. তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করা। এই তাওহীদ বা একত্ব আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে যেমন, তাঁর গুণাবলী ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা যেমন এক– তাঁর সত্তায় যেমন কেউ শরীক নেই, তেমনিভাবে তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, ইবাদতে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করা যাবে না।

তাওহীদের বিপরীত হল শির্ক। অতএব একাধিক মা'বূদে বিশ্বাস করা শির্ক। যেমন: অগ্নিপূজক সম্প্রদায় কল্যাণের মা'বূদ হিসাবে 'ইয়াযদান' এবং অকল্যাণের মা'বূদ হিসাবে 'আহরামান'কে বিশ্বাস করে। এটা শির্ক। এমনিভাবে খৃষ্টানরা তিন খোদা মানে। হিন্দু সম্প্রদায় ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং মহাদেবকে সংহারকর্তা বলে মানে; এভাবে তারা একাধিক ভগবানে বিশ্বাসী। এ ছাড়াও তারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, এটা শির্ক।

এমনিভাবে আল্লাহ্র গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা, যেমন: মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিংবা বিপদ মোচন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা, এটা শির্ক।

এমনিভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে ইবাদতে কাউকে শরীক করাও শির্ক, যেমন: জলের (অর্থাৎ, গঙ্গার) সূর্যের, রামের, যীশুর, দেবতার ইত্যাদির



পূঁজা করা শির্ক।

### ২. ফেরেশ্তা সম্বন্ধে ঈমান

ফেরেশতা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ এক প্রকার নূরের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, যারা পুরুষও নন নারীও নন। যারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে মুক্ত। যারা নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করেন না। তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তারা সংখ্যায় অনেক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিপুল শক্তির অধিকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। কতিপয় আযাবের কাজে, কতিপয় রহমতের কাজে নিযুক্ত আছেন। কতিপয় আমলনামা লেখার কাজে নিযুক্ত, তাদেরকে "কিরামান কাতিবীন" বলা হয়। এমনিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির বিভিন্ন কাজে ফেরেশ্তাদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছেন।

ফেরেশ্তাদের মধ্যে চারজন সর্ব প্রধান। যথা:

(এক) **জিব্রাইল ফেরেশ্তা:** তিনি ওহী ও আল্লাহ্র আদেশ বহন করে নবীদের নিকট আসতেন। এছাড়া আল্লাহ যখন যে নির্দেশ প্রদান করেন তা কর্তব্যরত ফেরেশ্তার নিকট পৌঁছান।

(দুই) **মীকাঈল ফেরেশ্তা:** তিনি মেঘ প্রস্তুত করা ও বৃষ্টি বর্ষাণো এবং আল্লাহ্র নির্দেশে মাখ্লূকের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত।

(তিন) **ইসরাফীল ফেরেশ্তা:** তিনি রূহ সংরক্ষণ ও সিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে দুনিয়াকে ভাঙ্গা ও গড়ার কাজে নিযুক্ত।

(চার) **আযরাঈল ফেরেশ্তা:** জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিযুক্ত তিনি। তাকে 'মালাকূল মউত'ও বলা হয়। রূহ কব্য করার সময় তাঁকে কারও কাছে আসতে হয় না বরং সারা পৃথিবী একটা গামলার মত তাঁর সামনে অবস্থিত, যার আয়ু শেষ হয়ে যায় নিজ স্থানে থেকেই তিনি তার রূহ কব্য করে নেন। তবে মৃত ব্যক্তি নেককার হলে রহমতের ফেরেশ্তা আর বদকার হলে আযাবের ফেরেশ্তা মৃতের নিকট এসে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে যান।

### ৩. নবী ও রসূল সম্বন্ধে ঈমান

জিন ও ইনছানের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে যে

কিতাব প্রেরণ করেন, সেই কিতাবের ধারক-বাহক বানিয়ে, সেই কিতাব বোঝানো ও ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য তথা আল্লাহ্র বাণী হুবহু পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং আমল করে আদর্শ দেখানোর জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জিন ও মানব জাতির নিকট তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয় নবী বা পয়গম্বর। এই নবীদের মধ্যে বিশেষভাবে যারা নতুন কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে বলা হয় রসূল, আর যারা নতুন কিতাব প্রাপ্ত হননি বরং পূর্ববর্তী নবীর কিতাব প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদেরকে শুধু নবী বলা হয়। তবে সাধারণভাবে নবী, রসূল, পয়গম্বর শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নবী ও রসূলদের প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হল প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখা।

১. নবীগণ নিষ্পাপ– তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হয় না।

২. নবীগণ মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর বা অবতার নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব। আল্লাহ্র বাণী অনুসারে জিন ও মানুষ জাতিকে হেদায়েতের জন্য তাঁরা দুনিয়াতে প্রেরিত হন।

৩. নবীগণ আল্লাহ্র বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন।

৪. নবীদের ছিলছিলা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উপর শেষ হয়েছে।

৫. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তিনি খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, শেষ নবী, তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। অন্য কেউ নবী হওয়ার দাবি করলে সে ভণ্ড ও কাফের।

৬. নবীগণ কবরে জীবিত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কবরে জীবিত আছেন। তাঁর রওযায় সালাম দেয়া হলে তিনি শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করে থাকেন। অন্য কোনো স্থানে থেকে নবীর প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করা হলে নির্ধারিত ফেরেশ্‌তাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নিকট তা পৌঁছে দেন।

৭. হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন, সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আগমনের পর অন্য নবীর শরীআত রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর শরীআত ও তাঁর আনুগত্যই চলবে।



৮. নবীদের দ্বারা তাঁদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে 'মু'জিযা' বলে। মু'জিযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত।

## ৪, আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে ঈমান

আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন জাতির হেদায়েত এবং দিক নির্দেশন-ার জন্য নবীদের মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এই বাণী ও আদেশ-নিষেধের সমষ্টিকে বলা হয় কিতাব। আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল সহীফা (পুস্তিকা) অর্থাৎ, কয়েক পাতার কিতাব।

এক বর্ণনামতে সর্বমোট ১০৪টি কিতাব প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে চারখানি হল বড় কিতাব। যথা:–

(এক) **তাওরাত বা তৌরীত:** যা হযরত মূসা (আ.)–এর উপর নাযেল হয়।
(দুই) **যবূর:** যা হযরত দাউদ (আ.)–এর উপর নাযেল হয়।
(তিন) **ইঞ্জীল:** যা হযরত ঈসা (আ.)–এর উপর নাযেল হয়।

উল্লেখ্য যে, আলাহ্র প্রেরিত আসল ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই। বর্তমানে ইঞ্জীল বা বাইবেল নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা মূলত ঈসা (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে নেয়ার বহু বৎসর পর কিছু লোক রচনা ও সংকলন করেছিল। তার পর যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রী ও খৃষ্টান পণ্ডিত তাতে বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছে। ফলে এটিকে কোনোক্রমেই আর আসমানী ইঞ্জীল বলে মেনে নেয়া যায় না বরং এ হল মানুষের মনগড়া, বিকৃত ও মানব রচিত ইঞ্জীল– আসমানী ইঞ্জীল নয়।

(চার) **কুরআন:** যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উপর নাযিল হয়। কুরআনকে আল-কুরআন, আল-কিতাব, ফুরকান এবং আল-ফুরকানও বলা হয়।

* আল্লাহ্র কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা।

১. এ সমস্ত কিতাব আল্লাহ্র বাণী, মানব-রচিত নয়।

২. আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর ও চিরন্তন, তাঁর বাণীও তেমনি অবিনশ্বর ও

চিরন্তন। কুরআন নশ্বর বা সৃষ্ট নয়।

৩. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪. কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব, এর পর আর কোনো কিতাব নাযেল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের বিধানই চলবে। কুরআন শরীফের মাধ্যমে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

৫. করআন শরীফের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন, কাজেই কেউ এতে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না। কুরআন শরীফকে সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

## ৫. আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান

আখেরাত বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করার অর্থ হল মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, হাশর-নাশর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং জান্নাত জাহান্নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় –যেগুলো সম্পর্কে ঈমান আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার সব কিছুতেই– বিশ্বাস করা। অতএব এ পর্যায়ে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

### (এক) কবরের সওয়াল জওয়াব সত্য

কবরে প্রত্যেক মানুষের সংক্ষেপে কিছু পরীক্ষা নেয়া হবে। মুনকার ও নাকীর নামক দুজন ফেরেশতা কবরবাসীকে প্রশ্ন করবে তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? সে নেককার হলে এ প্রশ্নাবলীর উত্তর সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হবে। তখন তার কবরের সাথে এবং জান্নাতের সাথে দুয়ার খুলে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে সুখে বসবাস করতে থাকবে। আর নেককার না হলে (অর্থাৎ, কাফের বা মুনাফেক হলে) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই সে বলবে, هَا هَا لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ, হায় হায় আমি জানি না! তখন জাহান্নামের ও তার কবরের মাঝে দুয়ার খুলে দেয়া হবে এবং বিভিন্ন রকম শাস্তি তাকে দেয়া হবে।

### (দুই) কবরের আযাব সত্য

কবর মূলত শুধু নির্দিষ্ট গর্তকে বলা হয় না, কবর বলতে মূলত বোঝায় মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন জগতকে। এ জগতকে কবর জগৎ, আলমে বরযখ বা বরযখের জগৎ বলা হয়। মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ যেখানেই যেভাবে



থাকুক না কেন সে কবর জগতের অধিবাসী হয়ে যায় এবং বদকার হলে তার উপর আযাব চলতে থাকে। কবরের এ আযাব মূলত হয় রূহের উপর এবং রূহের সাথে সাথে দেহও সে আযাব উপলব্ধি করে থাকে। তাই দেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে। আর মৌলিকভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকাও অপরিহার্য নয়।

### (তিন) পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য

কিয়ামতের সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর সবকিছু নেস্ত-নাবূদ হয়ে যাবে। আবার আল্লাহ্‌র হুকুমে এক সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে আদি অন্তের সব জিন ইনছান ও যাবতীয় প্রাণী পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্র হবে।

### (চার) আল্লাহ্‌র বিচার ও হিসাব-নিকাশ সত্য

পুনর্জীবিত হওয়ার পর সকলকে আল্লাহ্ তাআলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তাঁর নিকট সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে।

### (পাঁচ) নেকী ও বদীর ওজন সত্য

কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য মিযান বা দাড়িপাল্লা (মাপযন্ত্র) স্থাপন করা হবে এবং তার দ্বারা নেকী-বদী ওজন করা হবে এবং ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ–এর পরিমাপ করা হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন আমি ইন্‌সাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করব। (সূরা: ২১-আম্বিয়া: ৪৭)

### (ছয়) আমলনামার প্রাপ্তি সত্য

কিয়ামতের ময়দানে আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকে তার জীবনের ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে সব তাতে লিখিত অবস্থায় পাবে। যখন আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে, তখন নেককারের আমলনামা তার ডান হাতে গিয়ে পৌঁছবে, আর বদকারের বাম হাতে আমলনামা গিয়ে পড়বে।

### (সাত) হাউজে কাউছার সত্য

এই উম্মতের মধ্যে যারা পূর্ণভাবে সুন্নাতের পায়রবী করবে, কিয়ামে-

তর ময়দানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি হাউজ থেকে পানি পান করাবেন, যার ফলে আর তাদেরকে পিপাসায় কষ্ট দিবে না। এই হাউজকে বলা হয় "হাউজে কাউছার"।

### (আট) পুলসিরাত সত্য

জাহান্নামকে হাশরের ময়দানের কাছে আনা হবে। এই জাহান্নামের উপর একটা পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এটাকে বলা হয় পুলসিরাত। সকলকেই এই পুল পার হতে হবে।

এই পুরসিরাত হল দুনিয়ার সিরাতে মুস্তাকীমের স্বরূপ। দুনিয়াতে যে যেভাবে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলেছে, সে সেভাবে পুরসিলাত পর হয়ে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে, আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে। মোটকথা, যার যে পরিমাণ নেকী সে সেরকম গতিতে উক্ত পুল পার হবে। আর পাপীদেরকে জাহান্নামের আংটা জাহান্নামের মধ্যে টেনে ফেলে দিবে।

### (নয়) শাফাআত সত্য

পরকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাফেজ, মুজাহিদ প্রমুখদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক প্রকারের শাফাআত বা সুপারিশ করবেন। তন্মধ্যে:

১. হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। হাশরের ময়দানে কষ্টে সমস্ত মাখলূক যখন পেরেশান হয়ে বড় বড় নবীদের কাছে আল্লাহর নিকট এই মর্মে সুপারিশ করার আবেদন করবে যেন আল্লাহ পাক বিচার কার্য সমাধান করে হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে সকলকে মুক্তি দেন, তখন সকল নবী অপারগতা প্রকাশ করবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা সেদিন অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সুপারিশ করবেন। এটাকে শাফাআতে কুব্‌রা বা বড় সুপারিশ বলা হয়।
২. কোন কোন কাফেরের আযাব সহজ করার জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালেবের জন্য এরূপ সুপারিশ হবে।
৩. কোন কোন মু'মিনকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করবেন।
৪. যেসব মু'মিন বদ আমল বেশি হওয়ার কারণে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে– এরূপ মু'মিনদের কতকের মাগফেরাতের জন্য সুপারিশ করবেন।
৫. কোন কোন মু'মিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ করবেন।
৬. জান্নাতে মু'মিনদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবেন।
৭. আ'রাফ তথা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে যারা অবস্থান করবে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন।



### (দশ) জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সত্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ণ ধারণাও আসতে পারে না। এইসব মহা নেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশ্‌ত। জান্নাত বা বেহেশ্‌ত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং সৃষ্টরূপে তা বিদ্যমান আছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। মু'মিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন।

জান্নাতের আটটি স্তর থাকবে। যথা: (১) জান্নাতুল ফেরদাউস (২) জান্নাতে আদ্‌ন (৩) দারুস সালাম (৪) জান্নাতুল মা'ওয়া (৫) জান্নাতুন নাঈম (৬) দারুল মুক্বামা (৭) দারুল ক্বারার (৮) জান্নাতুল খুল্‌দ।

### (এগার) জাহান্নাম বা দোযখ সত্য

পাপীদেরকে আল্লাহ আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, শৃঙ্খল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তির উপরকণ দ্বারা আযাব দেয়ার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোযখ। জাহান্নাম আল্লাহ্‌র সৃষ্ট রূপে বিদ্যমান রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে।

জাহান্নামের সাতটা স্তর বা দরজা থাকবে। একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এ স্তরগুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যথা: (১) জাহান্নাম (২) লাযা (৩) হুতামা (৪) সায়ীর (৫) সাকার (৬) জাহীম (৭) হাবিয়া।

## ৬. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান

ষষ্ঠ যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, তা হল তাকদীরের বিষয়ে ঈমান। "তাকদীর" অর্থ পরিকল্পনা বা নকশা। আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টিজগতের একটা নকশাও করে রেখেছেন, সবকিছুর পরিকল্পনাও লিখে রেখেছেন। এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাকদীর। এই পরিকল্পনা এবং নকশা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয় এবং হবে। অতএব ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে এবং তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়- এই বিশ্বাস রাখতে হবে। ভাল ও মন্দ উভয়টার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ– এই বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। এর বিপরীত কেউ যদি ভাল বা 'সু'-র জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা আর মন্দ বা "কু"-র জন্য অন্য একজন সৃষ্টিকর্তা মানে, তাহলে সেটা ঈমানের পরিপন্থী কুফ্‌র ও শির্‌ক হয়ে যাবে। যেমন: অগ্নিপূজারীরা কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে 'ইয়াযদান' এবং অকল্যাণের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে 'আহরামান'কে মানে। এটা শিরক। হিন্দুরা 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীদেবী এবং 'কু'-র সৃষ্টিকর্তা শনি দেবতাকে মানে। এটা কুফ্‌র ও শির্‌ক।

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কী, যা হওয়ার তা তো হবেই? এ প্রশ্ন করা যাবে না এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা কর্মজগতের নক্‌শায় লিখে রেখেছেন, যদি মানুষ ইচ্ছা করে তাহলে এরূপ আর যদি ইচ্ছা না করে তাহলে এরূপ। এমনিভাবে আল্লাহ মন্দ–এর সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি দায়ী নন বরং মানুষ মন্দ করার জন্য দায়ী এ কারণে যে, তাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি মন্দের জন্য ব্যয় করল কেন? এরপরও তাকদীর সম্পর্কে এরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে এবং মনে তাকদীর ও ভাগ্য সম্পর্কে নানান প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, কেননা তাকদীরের বিষয়টা এমন এক জটিল রহস্যময় যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। আমাদের কর্তব্য তাকদীরে বিশ্বাস করা, আর আল্লাহ পাক আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই আমল করে যাওয়া।

তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখা।



১. সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সবকিছু লিখে রেখেছেন।

২. সবকিছু ঘটার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা অনাদি জ্ঞানে সেসব কিছু সম্বন্ধে অবহিত এবং তাঁর জানা ও ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়।

৩. তিনি ভাল ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে মন্দ সৃষ্টির জন্য তিনি দোষী নন বরং যে মাখলূক মন্দ উপার্জন করবে সে দোষী। কেননা মন্দ সৃষ্টি মন্দ নয় বরং মন্দ উপার্জন হল মন্দ। মন্দ সৃষ্টি এজন্য মন্দ নয় যে, তার মধ্যেও বহু রহস্য এবং বহু পরোক্ষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই ভাল কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট।

৪. আল্লাহ তাআলা কলম দ্বারা লওহে মাহ্‌ফূজে (সংরক্ষিত ফলকে) তাকদীরের সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাই লওহ, কলম ও লওহে যা কিছু লিখে রাখা হয়েছে সবকিছুতে বিশ্বাস রাখা তাকদীরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

৫. মানুষ একদিকে নিজেকে অক্ষম ভেবে নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করবে না এই বলে যে, আমার কিছুই করার নেই; তাকদীরে যা আছে তা-ই তো হবে। আবার তাকদীরকে এড়িয়ে মানুষ খোদার পরিকল্পনার বাইরেও কিছু করে ফেলতে সক্ষম– এমনও মনে করবে না।

৬. মানুষের প্রতি আল্লাহর যত হুকুম ও আদেশ নিষেধ রয়েছে, তার কোনোটা মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। কোনো অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ কোনো হুকুম ও বিধান দেননি।

৭. আল্লাহ তাআলার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়, তিনি কাউকে কিছু দিতে বাধ্য নন, তাঁর উপর কারও কোনো হুকুম চলে না, যা কিছু তিনি দান করেন সব তাঁর রহমত ও মেহেরবানী মাত্র।

### আল্লাহ্‌র গুণবাচক ৯৯ টি নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদাসমূহ[১]

১. اَلْحَيُّ (আল-হায়্যু)- চিরঞ্জীব;

২. اَلْقَيُّوْمُ (আল-কায়্যুমু)-স্ব-প্রতিষ্ঠ, সংরক্ষণকারী;

১. অধিকতর তাহকীকের ভিত্তিতে আহ্‌কামে যিন্দেগী ৩য় সংস্করণে আসমায়ে হুছনার অর্থে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বোঝার স্বার্থে আসমায়ে হুছনার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ আকীদাসমূহও সংযোজিত করা হয়েছে।

* এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তাআলা চিরঞ্জীব। নিজের জীবন না থাকলে তিনি সৃষ্টিকর্তা হবেন কীভাবে? আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই,

তিনি অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান।

* আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল থেকে আছেন, তাঁকে কেউ প্রতিষ্ঠিত করেননি। বরং তিনি নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত সৃষ্টির সত্তা ও গুণাবলীর অস্তিত্ব দানকারী ও তার সংরক্ষণকারী। অর্থাৎ, সবকিছুর অস্তিত্ব তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অস্তিত্ব কারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

৩. اَلْحَقُّ (আল-হাক্কু)- সত্য

* তিনি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং হক মা'বূদ। তাঁর খোদায়ী এবং শাহান-শাহী সত্য ও যথার্থ। তিনি ব্যতীত আর সব মিথ্যা ও বাতিল।

৪. اَلْاَوَّلُ (আল-আওয়ালু)-প্রথম অর্থাৎ, অনাদি;

৫. اَلْاٰخِرُ (আল-আখিরু)-শেষ অর্থাৎ, অনন্ত,

৬. اَلْبَاقِيْ (আল-বাকী)-চিরস্থায়ী

* তিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্বে কখনও অনস্তিত্ব ছিল না। তাঁর সত্তা অনাদি।

* আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু অনাদি নয়। যারা মৌলিক উপাদান, সূরত, বুদ্ধি ও আকাশসমূহকে অনাদি বলে থাকে, ইমাম গায্যা-লীর মতে তারা কাফের।

* তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেই তাঁর অস্তিত্ব সদা সর্বদা টিকে থাকবে। অর্থাৎ, তিনি চির বাকী, অনন্ত। তিনি যেমন অনাদি, তেমনি অনন্ত। তাঁর অস্তিত্বে যেমন কখনও অনস্তিত্ব ছিল না, তেমনি কখনও অনস্তিত্ব আসবেও না।

৭. اَلظَّاهِرُ (আয্ যাহিরু)-প্রকাশ্য;

৮. اَلْبَاطِنُ (আল-বাতিনু)-গুপ্ত;

* আল্লাহ্র অস্তিত্ব দেখা যায় না, তাঁর অস্তিত্ব গোপন। অর্থাৎ, তিনি গুপ্ত। তিনি বাতিন।

* তাঁর অস্তিত্ব সুক্ষ্ম ও গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বের ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন বহন করে চলেছে। এ হিসাবে তিনি প্রকাশ্য।

৯. اَلْعَلِيْمُ (আল-আলীমু)-মহা জ্ঞানী;

১০. اَلْخَبِيْرُ (আল-খবীরু)-সর্বজ্ঞ;



১১. اَللَّطِيْفُ (আল-লাতীফু)-সুক্ষ্মদর্শী;

* এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত ও জ্ঞানী। কোনো কিছু তাঁর থেকে গোপন নয়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো কিছু তাঁর জানার আওতা থেকে বাইরে নয়।

* সমগ্র মাখ্লূকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, জাহের-বাতেন সর্ববিষয়ে তিনি অবগত। অর্থাৎ, তিনি মহা জ্ঞানী। কেউ কেউ বলেছেন, যিনি বাতিনী বিষয় জানেন তাকে 'খাবীর' বলে এবং সাধারণভাবে জাননেওয়ালাকে 'আলীম' বলে।

* আল্লাহ তাআলা যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তখন সবকিছুর যাবতীয় জ্ঞান অবশ্যই তাঁর থাকবে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে অনবগত থাকবেন তা হতে পারে না।

* আল্লাহ্র জ্ঞান অনাদি। তিনি অনাদিকাল থেকে সর্ববিষয়ে অবগত। ভবিষ্যতে তাঁর মাখ্লূকের মধ্যে যা সৃষ্টি হবে বা যেসব অনিত্ব বিষয় ঘটবে, সেসব বিষয়ে তাঁর অনাদি জ্ঞান রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞানে অনিত্ব কোন বিষয়ের জ্ঞান সংযোজিত হয় না। বরং যেকোনো ঘটিত অনিত্ব বিষয় সম্বন্ধে অনাদিকাল থেকেই তিনি অবগত।

* গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহর খাস সিফাত বা গুণ। অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

* তিনি সবকিছুর জাহের-বাতেন সম্বন্ধে যেমন অবগত, তেমনিভাবে সবকিছুর হাকীকত ও স্বরূপ সম্বন্ধেও অবগত অর্থাৎ, তিনি সর্বজ্ঞ।

* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে 'হাজির-নাযির' জানা স্পষ্ট গোমরাহী ও বাতিল পন্থা।

* তিনি সুক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ, এমন গোপন ও সুক্ষ্ম বিষয়ও তিনি অনুভব করেন যেখানে অন্য কারও দৃষ্টি পৌছতে সক্ষম নয়।

১২. اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকীমু) প্রজ্ঞাময়;

* আল্লাহ তাআলার জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। যেহেতু তিনি সবকিছুর জাহের-বাতেন এবং সবকিছুর প্রকৃত স্বরূপ ও মূল রহস্য সম্বন্ধে অবগত, এ হিসাবে তাঁর জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। তাঁর এই পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁর সব কাজ-কর্ম ও কথা হয়ে থাকে প্রজ্ঞাময়। অতএব তিনি হেকমতওয়ালা বা প্রজ্ঞাময়। হেকমত বলা হয় পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে

কাজ-কর্ম এবং কথা যথাযথ ও পাকাপোক্ত হওয়া।

১৩. اَلْوَاسِعُ (আল-ওয়াছিউ)-সর্বব্যাপী;

* তাঁর জ্ঞান ও দান সবটাই ব্যাপক। তাঁর জ্ঞান ও দানের আওতা থেকে কোনো কিছু বাইরে নয়। তিনি তাঁর জ্ঞান ও নেয়ামত দিয়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন– এ অর্থে তিনি সর্বব্যাপী।

১৪. اَلْمَلِكُ (আল-মালিকু)-অধিপতি, সম্রাট,

১৫. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুল্ক)-সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;

* তিনি সকলের সম্রাট বা অধিপতি এবং সবকিছুর প্রকৃত মালিক। অতএব তিনি যা যেভাবে ইচ্ছা তৈরি করেন। সবকিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সবকিছু পরিচালনার ব্যাপারে তিনি একচ্ছত্র ইচ্ছার অধিকারী।

* তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি হুকুম করবেন, যেমন ইচ্ছা তেমনি হস্তক্ষেপ করবেন, কেউ তাঁর হুকুম ও হস্তক্ষেপে বাধ সাধতে পারবে না। তিনি রাজাধিরাজ, তাই যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করবেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নিবেন।

* তিনি সকলের মালিক আর সকলে তাঁর গোলাম। তাই মালিক হিসাবে গোলামকে তিনি যে হুকুম করবেন এবং তাদের ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করবেন তাতে জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিনা অপরাধেও যদি তিনি কাউকে শাস্তি দেন তাতেও কোনো জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারবে না। কারণ জুলুম বলা হয় অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করাকে। আর সবকিছুই আল্লাহ্‌র মালিকানা। তবে হ্যাঁ, নেক কাজের উপর তিনি পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আর সে ওয়াদা অবশ্যই তিনি পূরণ করবেন। আল্লাহ্ কোনো ওয়াদা খেলাপ করেন না।

* আল্লাহ্ তাআলা মহা সম্রাট, রাজাধিরাজ। যা ইচ্ছা, যাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম করেন, যেমন ইচ্ছা রাজ্য পরিচালনা করেন। এই হুকুম প্রদান ও রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাকশক্তি ('কালাম' ছিফাত তথা কালাম গুণ) তাঁর রয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র কালাম ছিফাত প্রমাণিত। বাকশক্তি না থাকা একটি দোষ। আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব দোষ থেকে মুক্ত, তাই তাঁর বাকশক্তি থাকা অপরিহার্য। তবে তাঁর কথা অন্য কারও কথার মত নয়, যেমন তাঁর অস্তিত্ব অন্য কারও অস্তিত্বের মত নয়।

১৬. اَلْمُعِزُّ (আল-মুইয্‌যু) সম্মানদাতা;

১৭. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল্লু)-অপমানদাতা বা সম্মান হরণকারী ;



* তাঁর একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দিবেন, কারণ সম্মান প্রদান তাঁর এখতিয়ারে। তিনি সম্মানদাতা।

* আবার যাকে ইচ্ছা তার থেকে সম্মান ছিনিয়ে নিবেন, কারণ অপমান প্রদান বা সম্মান হরণও তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি অপমানদাতা। তবে আল্লাহ্ তাআলা কারও অকল্যাণ করেন না, তাঁর কাছে কল্যাণই কাম্য।

১৮. اَلْخَافِضُ (আল-খাফিযু)-অবনতকারী;

১৯. اَلرَّافِعُ (আর্-রাফিউ)-উন্নয়নকারী;

* যার যতটুকু সম্মান ও স্তর রয়েছে তার সেই সম্মান ও স্তরকে তিনি নতও করেন। তিনি আল-খাফিযু।

* আবার যার যতটুকু সম্মান ও স্তর রয়েছে তার সেই সম্মান ও স্তরকে তিনি উন্নতও করেন। তিনি আর্-রাফিউ। এই নত ও উন্নত করার মধ্যে রিযক হ্রাস বৃদ্ধি করাও অন্তর্ভুক্ত।

২০. اَلْقَادِرُ (আল-ক্বাদিরু)-শক্তিশালী;

* তিনি তাঁর কোনো কাজে উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। কোনো আসবাব ছাড়াই তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

২১. اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুকতাদিরু)-পূর্ণ ও স্বয়ংক্রিয় শক্তির অধিকারী;

* তাঁর এই ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা এবং ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা।

২২. اَلْقَوِيُّ (আল-ক্বাবিয়্যু)-অসীম ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী;

* তিনি সীমাহীন ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ক্ষমতা কখনও শেষ হবে না এবং কখনও তাতে কোনো দুর্বলতা দেখা দেয় না।

২৩. اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু)-সুস্থিত এবং অসম ক্ষমতার অধিকারী;

* তাঁর ক্ষমতা সুস্থিত ও দৃঢ়, যাতে চিড় ধরার বা দূর্বলতা আসার কোন অবকাশ নেই। এবং কেউ তাঁর ক্ষমতার সমকক্ষ নেই।

২৪. اَلْعَزِيْزُ (আল-আযীযু)-পরাক্রমশালী;

* তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিবলে তিনি পরাক্রমশালী, সকলকে তিনি পরাভূত করতে সক্ষম, কেউ তাকে পরাভূত করতে বা কেউ তাঁর মোকাবি-লা করতে সক্ষম নয়।

২৫. اَلْمَانِعُ (আল-মানিউ)-প্রতিরোধকারী;

* আল্লাহ যা কিছুই করতে চান তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

তিনি কারও কল্যাণ করতে চাইলে তা কেউ ঠেকাতে পারে না, এমনিভাবে কারও ক্ষতি করলে তাও কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি প্রতিরোধকারী।

২৬. اَلْقَهَّارُ (আল-কাহ্হারু)-মহাপরাক্রান্ত;

* তাঁর ক্ষমতা ও বিক্রমের সামনে সকলে অক্ষম ও পরাভূত। তিনি মহাপরাক্রান্ত।

২৭. اَلْجَبَّارُ (আল-জাব্বারু)-প্রবল বিক্রমশালী;

* আল্লাহ্ তাআলা প্রবল বিক্রমশালী, কেউ তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়।

২৮. اَلسَّمِيْعُ (আস্ সামীউ)-সর্বশ্রোতা;

২৯. اَلْبَصِيْرُ (আল-বাছীরু)-সম্যক দ্রষ্টা;

* আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা। সবকিছু তিনি শুনতে পান। একই সাথে আল্লাহ পাক সমস্ত আওয়াজ শুনতে পান; তাঁর জন্য এক আওয়াজ অন্য আওয়াজ শোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না।

* তিনি সর্বদ্রষ্টা। সবকিছু তিনি দেখতে পান। এমনকি মনের চিন্তা বা কল্পনার গোপনীয় বিষয়ও তার অগোচর বা অদেখা নয়। একই সঙ্গে তিনি সবকিছু দেখতে পান, এক দৃশ্য অন্য দৃশ্য দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না।

৩০. اَلْخَالِقُ (আল-খালিকু)- স্রষ্টা;

৩১. اَلْمُبْدِئُ (আল-মুবদিউ)- আদি স্রষ্টা;

৩২. اَلْبَارِئُ (আল-বারিউ)- উদ্ভাবনকর্তা;

৩৩. اَلْمُصَوِّرُ (আল-মুসাওবিরু)- আকৃতিদাতা;

৩৪. اَلْبَدِيْعُ (আল-বাদীউ)-নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী;

* এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা।

* তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং আদি সৃষ্টিকর্তা (আল-মুবদিউ)।

* সবকিছুর নমুনাও আল্লাহ্ তাআলা উদ্ভাবন করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আল-বারিউ।

* সবকিছুর আকৃতিও আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আল-মুসাওবিরু। বিভিন্ন রকম আকৃতি আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি করা এসব আকৃতি একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, যা তাঁর মহা কুদরতের একটি নমুনা।



* জগত সৃষ্টি করার সময় তার সামনে কোনো আসল বা নমুনা ছিল না। কোনো আসল ও নমুনা ছাড়াই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আল-বাদীউ।

* আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর সত্তা, সবকিছুর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমুদয়ের সৃষ্টিকর্তা। এমন নয় যে, তিনি শুধু একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে।

* আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাদের কর্ম-এরও সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা নয়।

* আল্লাহ্ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু করেছেন সবকিছুর সঙ্গে তাঁর ইরাদা সংশ্লিষ্ট। তাঁর ইরাদা ব্যতীত কোনো কিছু অস্তিত্বে আসতে পারে না। তিনি ইরাদা করেন অতঃপর সেটাকে সৃষ্টি করেন। এমন নয় যে, তিনি ইরাদা করেন আর সেটা হয় না।

৩৫. اَلنُّوْرُ(আন্ নূরু)- জ্যোতির্ময়;

৩৬. اَلْهَادِئُ (আল-হাদীউ)-পথ প্রদর্শক;

* আল্লাহ তাআলা নূর বা জ্যোতির্ময়, হাদী বা হেদায়েত দানকারী ও পথ প্রদর্শক। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান অর্থাৎ, হেদায়েত দান করেন যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। মু'তাযিলাদের মত বক্তব্য ঠিক নয় যে, বান্দার জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ্র উপর তা করা ওয়াজিব। অতএব হেদায়েত মানুষের জন্য কল্যাণকর বিধায় সকলকে হেদায়েত করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। তাদের বক্তব্য ঠিক নয় এ কারণে যে, কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েতকে তাঁর ইচ্ছাধীন বলেছেন।

* আল্লাহ্র ইরাদা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। যা কিছু তিনি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করবেন বা যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যথাসময়ে ঘটবে তার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদা অনাদিকাল থেকেই বিজড়িত রয়েছে।

৩৭. اَلرَّشِيْدُ (আর-রাশীদু)- সত্যদর্শী;

* তিনি শুধু পরকালের বিষয়ে পথ প্রদর্শনকারী নন বরং তিনি দ্বীনী ও দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শনকারী। এবং তাঁর যাবতীয় পদক্ষেপ সত্য ও সঠিক। তিনি সত্যদর্শী (আর-রাশীদু), জগতের পথ প্রদর্শনকারী।

৩৮. اَلْمُحْيِيْ (আল-মুহ্য়ী)-জীবনদাতা;

* সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে জীবন সঞ্চারকারীও তিনি। তিনিই জীবনদাতা (আল-মুহ্য়ী)। অন্য কেউ জীবনদাতা (আল-মুহ্য়ী) নয়। তিনি ব্যতীত কোনো প্রাণীর মধ্যে আপনা আপনি কোন বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে জীবন সঞ্চারিত হয়নি। যারা ডারউইন উদ্ভাবিত বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানব জীবন সৃষ্টি হওয়ার প্রবক্তা, তারা আল্লাহ্র এই ছিফাতকে অস্বীকারকারী কাফের।

৩৯. اَلْوَاحِدُ (আল-ওয়াহিদু)-একক;

৪০. اَلْاَحَدُ (আল-আহাদু)-এক অদ্বিতীয়;

* তিনি একক। তাঁর কোনো দ্বিতীয় অর্থাৎ, শরীক বা সমকক্ষ নেই।[১]

* তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করতে হবে। এই তাওহীদ বা একত্ব আল্লাহ্র সত্তার ক্ষেত্রে যেমন, তাঁর গুণাবলী ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও তেমনি। অর্থাৎ,

১. আল্লাহ্র সত্তা যেমন এক, তাঁর সত্তায় যেমন কেউ শরীক নেই,

২. তেমনিভাবে তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই এবং

৩. একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, ইবাদতেও তাঁর সঙ্গে কেউ শরীক নেই, কাউকে শরীক করা যাবে না।

* আর যখন তাঁর শরীক না থাকা প্রমাণিত, তখন তাঁর সন্তানাদি না থাকাও প্রমাণিত। কেননা পুত্র পিতার শ্রেণীভুক্তই হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহর পুত্র থাকলে সে-ও খোদায়ীতে শরীক থাকবে। অথচ আল্লাহ্ শরীক থেকে পবিত্র।

১. অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে وَاحِدُ ও اَحَدُ সমার্থবোধক। কেউ কেউ এ দু'টোর মধ্যে বিভিন্নভাবে পার্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যথা:

(১) وَاحِدُ বা একক হল সত্তার ক্ষেত্রে আর اَحَدُ হল গুণাবলীর ক্ষেত্রে।

(২) وَاحِدُ অনাদিত্ব ও অনন্ততা বোঝায় আর اَحَدُ গুণাবলীর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়তার ইংগিত বহন করে।

(৩) وَاحِدُ সৃষ্টির ও কর্মের ক্ষেত্রে শরীক না থাকা বোঝায়।

এখানে সৃষ্টিকর্মে শরীক না থাকার কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে وَاحِدُ গুণটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর اَحَدُ অনাদিত্ব ও অনন্ততা জ্ঞাপন করে।



* তাওহীদের বিপরীত হল শির্ক। অতএব একাধিক মা'বূদে বিশ্বাস করা শির্ক। যেমন: অগ্নিপূজক সম্প্রদায় কল্যাণের মা'বূদ হিসাবে 'ইয়াযদান' এবং অকল্যাণের মা'বূদ হিসাবে 'আহরামান'কে বিশ্বাস করে। এটা শির্ক। এমনিভাবে খৃষ্টানরা তিন খোদা-এর প্রবক্তা। উক্ত তিন খোদা হল: পিতা অর্থাৎ, আল্লাহ্, পুত্র অর্থাৎ, ঈসা (যীশু) [আ.] এবং পবিত্রাত্মা অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) বা মতান্তরে মরিয়াম (মেরি) [আ.]।

হিন্দুসম্প্রদায় ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং মহাদেবকে সংহারকর্তা বলে মানে; এভাবে তারা একাধিক ভগবানে বিশ্বাসী। এছাড়াও তারা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করে, তারা প্রায় ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। এটা শির্ক।

এমনিভাবে আল্লাহ্র গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা, যেমন: মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিংবা বিপদ মোচন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা, এটা শির্ক।

এমনিভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে ইবাদতে কাউকে শরীক করাও শির্ক, যেমন: জল (অর্থাৎ, গঙ্গা), সূর্য, রাম, যীশু, দেবতা ইত্যাদির পূজা করা শির্ক।

৪১. اَلْمُقِيْتُ ( আল-মুকীতু)-আহার্যদাতা;

৪২. اَلرَّزَّاقُ (আল-আর্রায্যাকু)- রিযিকদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলা মাখলূকের আহার্য দানকারী। শারীরিক ও আত্মিক উভয় ধরনের আহার্য এর অন্তর্ভুক্ত।

* আল্লাহ্ তাআলা রায্যাক অর্থাৎ, রিযিক সৃষ্টিকারী ও রিযিক দানকারী। ইন্দ্রীয়গাহ্য ও অতিরিন্দ্রীয় সব ধরনের রিযিক এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা যত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন ও করবেন সকলের রিযিকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন।

* প্রত্যেকে তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক পুরোপুরি অর্জন করবে। কেউ তার রিযিক গ্রহণ করবে না বা অন্য কেউ তার রিযিক গ্রহণ করবে তা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ যার জন্য যে রিযিক বরাদ্দ করেছেন অবশ্যই সে সেটা গ্রহণ করবে, অন্য কারও পক্ষে সেটা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রিযিক বলতে হালাল হারাম উভয়টাকে বোঝায়। কেননা রিযিক বলা হয় যা আল্লাহ কোন প্রাণীর জন্য প্রেরণ করেন ও তার কাছে পৌঁছান। তবে সেটা হারাম হলে জিন ইনসান তা গ্রহণ করুক আল্লাহ তা পছন্দ করেন না।

৪৩. اَلْبَاسِطُ (আল-বাসিতু)-সম্প্রসারণকারী;

৪৪. اَلْقَابِضُ (আল-ক্বাবিযু)- সংকোচনকারী;

* রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করে দেন। তিনি সম্প্রসারণকারী (আল-বাসিতু)।

* যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। তিনি সংকোচনকারী। তবে এই সম্প্রসারণ বা সংকোচন তাঁর হেকমতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, হেকমতবিহীন নিছক স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে নয়।

৪৫. اَلْفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহু)- উন্মুক্তকারী;

* যাদের রিযিক বন্ধ আছে তাদের রিযিকের দুয়ার আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দেন। এমনিভাবে যেকোনো বিপদ-আপদ থাকলে বিপদ-আপদের গিরা আল্লাহ্ তাআলা খুলে দেন। তিনি উন্মুক্তকারী।

৪৬. اَلْحَفِيْظُ (আল-হাফীযু)-সংরক্ষণকারী;

* বিপদ আসার পর তা থেকে তিনি উদ্ধার করেন, আবার বিপদ-মুসীবত আসার পূর্বেও তা থেকে তিনি বান্দাকে হেফাজত ও রক্ষা করেন। তিনি সংরক্ষণকারী।

৪৭. اَلْمُؤْمِنُ ( আল-মু'মিনু)-নিরাপত্তা বিধায়ক;

* তিনি শুধু বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করা নয় বরং যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার এবং মাখলূকের জন্য নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপত্তার সরঞ্জাম যোগান দানকারী। এ অর্থে তিনি নিরাপত্তা বিধায়ক।

৪৮. اَلسَّلَامُ (আস্-সালামু) নিরাপদ, শান্তিময়;

* তাঁকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হয় না। বরং তিনি নিজে বিপদ-আপদ ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং শান্তি দানকারী। তিনি নিরাপদ ও শান্তিময়।

৪৯. اَلْمُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিনু)-রক্ষক, নেগাহবান;

* আল্লাহ্ তাআলা সব জিনিসের নেগাহবান ও পাহারাদার। তিনি সকলের সব অবস্থার প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রাখেন।

৫০. اَلْوَالِيُ (আল-ওয়ালী)-অধিপতি; অভিভাবক;

* শুধু রিযিক প্রদান, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ও রক্ষা নয়, তিনি সবকিছুর অধিপতি ও অভিভাবক, সবকিছুর ব্যবস্থাপক, সবকিছু সম্পাদনকারী।



৫১. اَلْوَكِيْلُ (আল-ওয়াকীলু)-কর্মবিধায়ক;

* আল্লাহ্ তাআলা কর্মবিধায়ক অর্থাৎ, তাঁর নিকট যা কিছু সোপর্দ করা হয় তিনি তা সম্পাদনকারী। সে মতে আল্লাহ্‌র উপর কেউ ভরসা করলে তিনি তার কর্ম সম্পাদন করে দেন।

৫২. اَلْوَهَّابُ (আল-ওয়াহ্হাবু)-মহানুভবদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাখলূককে যা কিছু দেন এক্ষেত্রে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নেই, দুনিয়াতে একজন আরেকজনকে দেয়ার পশ্চাতে যেমন কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ বা বিনিময় ছাড়াই দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন মহানুভবদাতা।

৫৩. اَلْكَرِيْمُ (আল-কারীমু)-উদারদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলার দানের জন্য সওয়াল করারও প্রয়োজন হয় না। তিনি সওয়াল ছাড়াই নিজ উদারতায় দান ও অনুগ্রহ করে থাকেন। তিনি উদারদাতা।

৫৪. اَلْغَنِيُّ (আল-গানিয়্যু)- অভাবমুক্ত; মুখাপেক্ষীহীন;

* মাখলূকের রিযিক পৌঁছাতে গিয়ে এবং অন্য কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁর কখনও অভাব দেখা দেয় না, তিনি অভাবমুক্ত। এমনিভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি কারও মুখাপেক্ষীও হন না। তিনি মুখাপেক্ষীহীন।

আসমান-জমিনের সবকিছুর যিনি মালিক তাঁর অভাব হতে পারার ধারণা অমূলক। তিনি অভাবী হতে পারেন না।

اَلْمُغْنِيُ (আল-মুগ্নীয়্যু)-অভাব মোচনকারী;

* আল্লাহ্‌র অভাব হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না বরং তিনি সকলের অভাব মোচনকারী অর্থাৎ, তিনি আল-মুগ্নী।

৫৬. اَلْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদু)-প্রাপক;

* আল্লাহ্ তাআলা যা চান তা-ই পান অর্থাৎ, তা-ই হয়। এ অর্থে তিনি প্রাপক। কোনো কিছু তাঁর থেকে অব্যাহতি পায় না, কোনো কিছু তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। অথবা এর ব্যাখ্যা হল তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

৫৭. اَلنَّافِعُ (আন্নাফিউ')-কল্যাণকারী;

৫৮. اَلضَّارُّ (আয্যাররু)-অকল্যাণের মালিক;

* তিনি কল্যাণ অ-কল্যাণ সবটার মালিক। তিনি যেমন কল্যাণকারী তেমনি অকল্যাণকারীও। কল্যাণ অকল্যাণ উভয়টা তাঁর হাতে।

৫৯. اَلْبَرُّ (আল-বার্‌রু)-নেকময়;

* কল্যাণ-অ-কল্যাণ সবই আল্লাহ্‌র হাতে, তবে তিনি কারও অকল্যাণ করেন না বরং তিনি সকলের সাথে কল্যাণের আচরণ এবং নেকীর মুআমালা করেন। তিনি নেকময়। অতএব যার ব্যাপারে আল্লাহ যা করেন তার মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ নিহিত।

৬০. اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীতু)-মৃত্যুদাতা;

* আল্লাহ্ তাআলা যেমন জীবনদাতা, তেমনি মৃত্যুদাতাও। নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটবে। কিয়ামতের সময় শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে সকলের মৃত্যু ঘটবে।

৬১. اَلْوَارِثُ (আল-ওয়ারিসু)-স্বত্বাধিকারী;

* সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন একমাত্র তিনিই থাকবেন সবকিছুর স্বত্বাধিকারী এবং মালিক। বাহ্যিক-ভাবে যারা দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক বলে মনে হত, তাদের কারও তখন কোনো অস্তিত্বও থাকবে না।

৬২. اَلْمُعِيْدُ (আল-মুঈদু)-পুনঃসৃষ্টিকারী;

৬৩. اَلْبَاعِثُ (আল-বা'ইছু)- পুনরুত্থানকারী;

৬৪. اَلْجَامِعُ (আল-জামিউ)-একত্রকরণকারী;

* তার পর তিনি সকলকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি পুনঃসৃষ্টিক-ারী। শিংগায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেয়ার পর সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে।

* তার পর তিনি সকলের পুনরুত্থান ঘটাবেন। তিনি পুনরুত্থানকারী।

* পুনরুত্থান পূর্বক তিনি সকলকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করবেন। তিনি একত্রকরণকারী।

৬৫. اَلْحَسِيْبُ (আল-হাসীবু)-হিসাব গ্রহণকারী;

৬৬. اَلْمُحْصِىْ (আল-মুহ্‌সী)-পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণকারী;

* কিয়ামতের ময়দানে সকলকে একত্র করে তিনি সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনি হিসাব গ্রহণকারী।



* এই হিসাব হবে পুংখানুপুংখ রূপে। সে হিসাবে থাকবে না বিন্দুমাত্র ত্রুটি। কেননা তিনি পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণকারী। আল-মুহ্‌সী–এর আর এক অর্থ হল জগতের সৃষ্টিসমূহের যাবতীয় গণনা ও পরিমিতির ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞানী। তাঁর জ্ঞানের আওতা থেকে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো কিছুই বহির্ভূত নয়।

৬৭. اَلشَّهِيْدُ (আশ-শাহীদু)- প্রত্যক্ষকারী;

* সবকিছুর পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়ার জন্য সবকিছুর যাহের বাতেন প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক এবং এজন্য তার সর্বত্র হাজির-নাযির থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্র হাজির-নাযির এবং তিনি সবকিছুর প্রত্যক্ষকারী। (কেউ কেউ বলেছেন, জাহিরী বিষয় জাননেওয়ালাকে 'আশ-শাহীদু' বলে এবং বাতিনী বিষয় জাননেওয়ালাকে 'খাবীরু' বলে।) উল্লেখ্য, তিনি সর্বত্র হাজির এর অর্থ হল জ্ঞানগতভাবে হাজির, অবগতি লাভ করার দিক থেকে হাজির। অর্থাৎ, علما و اطلاعا হাজির।

৬৮. اَلرَّقِيْبُ (আর্ রাকীবু)-পর্যবেক্ষণকারী;

* তিনি শুধু প্রত্যক্ষ করেন না বরং ভালভাবে পুংখানুপুংখ রূপে প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণকারী।

৬৯. اَلْحَكَمُ (আল-হাকামু)-মীমাংসাকারী;

৭০. اَلْعَدْلُ (আল-আদ্‌লু)-ন্যায়নিষ্ঠ;

৭১. اَلْمُقْسِطُ (আল-মুকসিতু)- ন্যায়পরায়ণ;

* হিসাব গ্রহণ পূর্বক তিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুর মীমাংসা করবেন। তিনি হলেন মীমাংসাকারী।

* আল্লাহ্‌র মীমাংসা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে হবে। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ।

৭২. اَلشَّكُوْرُ ( আশ্ শাকূরু)- গুণগ্রাহী;

* তাঁর ন্যায্য বিচারে যে নেককার ও ভাল সাব্যস্ত হবে, তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। তিনি গুণগ্রাহী। তিনি গুণের মূল্যায়ন করবেন। দুনিয়াতেও তিনি নেক কাজের কিছু পুরস্কার ও বদকাজের কিছু শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে পূর্ণ পুরস্কার ও পুর্ণাঙ্গ শাস্তি দিবেন পরকালে।

৭৩. اَلْوَالِىُّ (আল-ওয়ালিয়্যু)-সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক;

* আখেরাতে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে শান্তি দান করবেন এবং সাহায্য করবেন। তিনি সাহায্যকারী অভিভাবক অর্থাৎ, মুমিনদের সাহায্যকারী ও মুমিনদের অভিভাবক। দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের অভিভাবক।

৭৪. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইক্‌রাম) আযমত ও জালালের অধিকারী, একরাম করনেওয়ালা ;

* তিনি আযমত ও জালালের অধিকারী অর্থাৎ, তিনি মহিমাময়। তাঁর আযমত ও জালালের সামনে যারা আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁর এতায়াত করে, তিনি তাদের সম্মানিত ও পুরস্কৃত করবেন কারণ তিনি মহানুভব, একরাম করনেওয়ালা।

৭৫. اَلْوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদু)-প্রেমময়;

* নেককার লোক এবং নেক কাজকে তিনি ভালবাসেন। এ অর্থে তিনি প্রেমময়।

৭৬. اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুকাদ্দিমু)-অগ্রবর্তীকারী;

৭৭. اَلْمُؤَخِّرُ (আল-মুআখ্‌খিরু)-পশ্চাদবর্তীকারী;

* যারা আল্লাহ্‌র দোস্ত তাদেরকে তিনি অগ্রবর্তী করে দেন, তিনি অগ্রবর্তীকারী। আর যারা তাঁর দুশমন, তাদেরকে তিনি পশ্চাদবর্তী করে দেন। তিনি পশ্চাদবর্তীকারী।

৭৮. اَلْمُنْتَقِمُ (আল-মুন্‌তাকিমু)-শাস্তিদাতা;

* নেককার, দোস্ত ও আপন লোকদেরকে তিনি পুরস্কার দান করবেন। পক্ষান্তরে যে বদকার সাব্যস্ত হবে, তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি হলেন শাস্তিদাতা।

৭৯. اَلصَّبُوْرُ (আস্ সাবূরু)- ধৈর্যশীল;

৮০. اَلْحَلِيْمُ (আল-হালীমু)-সহিষ্ণু;

* আল্লাহ্ তাআলা পাপের কারণে শাস্তিদাতা। তবে দুনিয়াতে তিনি সব পাপের কারণে শাস্তি দেন না। কারণ তিনি ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মধ্যে পার্থক্য হল– ধৈর্যগুণ যখন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেটাকে সহিষ্ণুতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৮১. اَلْعَفُوُّ (আল-'আফুউ)- ক্ষমাকারী;

৮২. اَلْغَفَّارُ (আল-গাফ্‌ফারু) পরম ক্ষমাশীল;



৮৩. اَلْغَفُوْرُ (আল-গাফূরু)- পরম ক্ষমাকারী;

* আখেরাতে যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাদের অনেককে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল। ক্ষমার গুণ আল্লাহ্ তাআলার অত্যন্ত বেশি। তিনি পরম ক্ষমাশীল। শির্‌ক ব্যতীত আর সব ধরনের পাপ যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন বলে কুরআনে কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন।

৮৪. اَلتَّوَّابُ (আত্-তাওয়াবু)-তওবা কবূলকারী;

৮৫. اَلْمُجِيْبُ (আল-মুজীবু)- কবূলকারী;

* ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তওবার নিয়ম করে রেখেছেন। কেউ তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। তিনি তওবা কবূলকারী।

* শুধু তওবা কবূলকারী নন, বরং যেকোনো বিষয়ে দুআ করলে (যদি তা দুআর শর্ত অনুযায়ী হয়) আল্লাহ্ তাআলা তার দুআ কবূলও করেন। তিনি কবূলকারী (আল-মুজীবু)।

৮৬. اَلرَّحِيْمُ (আর রহীমু)- অতি দয়ালু;

৮৭. اَلرَّحْمٰنُ ( আর রহ্‌মানু)-অত্যন্ত দয়াময়;

* সবকিছু আল্লাহ্‌র দয়ায় সংঘটিত হয়, কোনো কিছু আল্লাহ্‌র উপর জরুরি নয়। আল্লাহ্‌র উপর কোনো কিছু ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় বলা হলে আল্লাহ্‌র এখতিয়ার রহিত হওয়া অবধারিত হয়ে যায়।

৮৮. اَلرَّؤُوْفُ (আর্-রাউফু) সীমাহীন দয়ালু ;

* রহ্‌মত ও দয়াগুণ তাঁর মধ্যে সীমাহীন। তিনি সীমাহীন দয়ালু।

৮৯. اَلْقُدُّوْسُ (আল-কুদ্দূসু) পবিত্র;

* আল্লাহ্ তাআলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্ম দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তিনি সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র (اَلْقُدُّوْسُ)।

৯০. اَلْجَلِيْلُ (আল-জালীলু)- পূর্ণাঙ্গ মহিমাময় ;

* দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্রতা, অনপেক্ষ হওয়ার পরম স্তরে তিনি উন্নীত। তিনি পূর্ণাঙ্গ মহিমাময়।

৯১. اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদু)- গৌরবময়;

* আল্লাহ্ তাআলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও কর্ম দোষ-ত্রুটিযুক্ত তো নয়ই বরং আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্মে তিনি বুযুর্গীর অধিকারী অর্থাৎ, গৌরবময়।

৯২. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বিরু)- সুউচ্চ, সমুচ্চ গৌরবময়তার অধিকারী;

* আল্লাহ তাআলা তাঁর বুযুর্গী ও গৌরবময়তায় অত্যন্ত উঁচু স্তরে উন্নীত। তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সুউচ্চ, সুমহান।

৯৩. اَلْمُتَعَالِىْ (আল-মুতা‘আলী)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

* আল্লাহ্ তাআলা আলীশান, অর্থাৎ, তিনি তাঁর বুযুর্গী ও গৌরবময়ত-ায় এমন উঁচু মর্যাদার স্তরে উন্নীত, যে পর্যন্ত কারও পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।

৯৪. اَلْمَاجِدُ (আল-মাজীদু)- এককতম মহান;

* আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মের বুযুর্গী এবং গৌরবময়তায় একক। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি আল-মাজিদু।

৯৫. اَلصَّمَدُ (আস্ সমাদু)-অনপেক্ষ;

* আল্লাহ্ তাঁর সত্তা, কর্ম ও গুণাবলী কোনো ক্ষেত্রেই কারও মুখাপেক্ষী নন বরং তিনি অনপেক্ষ। কোনো ব্যাপারেই তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং অন্য সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী।

৯৬. اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদু)-প্রশংসিত;

* আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মের প্রেক্ষিতে প্রশংসার্হ্য। অর্থাৎ, তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে এমন বুযুর্গী বা গৌরবময়তার অধিকারী, যার প্রেক্ষিতে তিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

৯৭. اَلْكَبِيْرُ (আল-কাবীরু)-সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী;

* আল্লাহ্ তাআলা সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী; যার চেয়ে বড় কারও কল্পনা করা যায় না।

৯৮. اَلْعَلِىُّ (আল-আলিয়্যু)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

* আল্লাহ্ তাআলা সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। যার উপর আর কারও মর্যাদা হতে পারে না।

৯৯. اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীমু)-সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী;

* আল্লাহ্ তাআলা সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী; যার মাহাত্মের স্তরে কারও পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার আরও কিছু



গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

১. اَلرَّبُّ (আর রব্বু)-প্রতিপালক; ২. اَلْمُنْعِمُ (আল মুন্ইমু)-নেয়ামত দানকারী; ৩. اَلْمُعْطِىْ (আল্ মু‘তী) দাতা; ৪. اَلصَّادِقُ (আস্ সাদিকু)-সত্যবাদী; ৫. اَلسَّتَّارُ (আস্ সাত্তারু)-গোপনকারী।

* ‘আল-আছমাউল হুছনা’-র যথাযথ বাংলা অনুবাদ হয় না। এখানে যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ইংগিত মাত্র। আল-আছমাউল হুছনার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক গুণ আল্লাহ্র জন্য সত্তাগত, অনাদি-অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অস্থায়ী ও সীমিত।

* কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ يَدٌ হাত, وَجْهٌ মুখমণ্ডল, عَيْنٌ চক্ষু। এগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত এই যে, আল্লাহ তাআল-ার জাত (সত্তা) ও ছিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তার উপর ঈমান রাখতে হবে। আল্লাহ্র এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত নয়, আল্লাহ যেমন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তেমনি তাঁর শান উপযোগী। এর চেয়ে বিস্তারিত আমাদের জানা নেই।

## মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা

### মে’রাজ সম্বন্ধে আকীদা

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা একদা রাতে জাগরিত অবস্থায় সশরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহ্র ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহ্র সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাবার্তা বলেন। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মে’রাজ বলে।

### আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা

‘আরশ’ অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন, তাঁর আরশ এবং কুরছীও তেমনিই শানের হয়ে থাকবে। সপ্তম আসমানের উপর আরশ ও কুরছী অবস্থিত। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ কুরছী এত বিশাল যে,

তা সমগ্র আকাশ ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাক কোন মাখ্লূকের ন্যায় উঠা-বসা করেন না এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। মাখলূকের কোনো কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোনো কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা হয় না। তারপরও তাঁর আরশ কুরছী থাকার কী অর্থ, তা অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের উর্ধ্বে। এ সম্বন্ধে বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণে যাওয়া সংগত নয়। আমাদেরকে শুধু আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে।

## আল্লাহ্র দীদার সম্বন্ধে আকীদা

আল্লাহর দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল দুনিয়ায় থেকে জাগ্রত অবস্থায় এই চর্ম চক্ষুর দ্বারা কেউ আল্লাহকে দেখতে পারেনি এবং পারবে না। তবে বেহেশ্তবাসীগণ বেহেশতে গিয়ে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভ করবেন। বেহেশতের অন্যান্য নেয়ামতের তুলনায় এই নেয়ামত (আল্লাহ্র দীদার) সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় মনে হবে। উল্লেখ্য যে, স্বপ্নে আল্লাহ্কে দেখা যায়, তবে সেটাকে দুনিয়ার চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা বলা হয় না।

## কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা

হাদীছে কিয়ামতের বহু ছোট ছোট আলামত বর্ণিত হয়েছে যা দেখে বোঝা যাবে যে, কিয়ামত তথা দুনিয়ার ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এই সব আলামতের মধ্যে রয়েছে যেমন: লোকেরা ওয়াক্ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করে ভোগ করতে থাকবে, যাকাত দেয়াকে দণ্ড স্বরূপ মনে করবে, আমানতের মালকে গনীমতের মালের মত নিজের মাল মনে করে তাতে হস্তক্ষেপ করবে, পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করবে, মায়ের নাফরমানী করবে, পিতাকে পর মনে করবে, বন্ধু-বান্ধবকে আপন মনে করবে, খারাপ ও বদ লোকেরা রাজত্ব ও সরদারী করবে, অযোগ্য লোকেরা বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, লোকেরা জুলুমের ভয়ে জালেমের তাযীম-সম্মান করবে, নাচ গান ও বাদ্য-বাজনার প্রচলন খুব বেশি হবে ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় কিয়ামতের “আলামতে ছুগরা” বা কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত।

কুরআন ও হাদীছে কিয়ামতের কিছু বড় বড় আলামত বর্ণিত হয়েছে,



যেগুলোকে “আলামতে কুবরা” বা বড় বড় আলামত বলা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হযরত মাহ্দীর আবির্ভাব, দাজ্জালের আবির্ভাব, আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আ.)–এর দুনিয়াতে অবতরণ, ইয়া’জূজ-মা’জূজের আবির্ভাব, দাব্বাতুল আর্দ–এর বহিঃপ্রকাশ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ইত্যাদি। হযরত মাহ্দীর আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামতের বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হবে।

## হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে আকীদা

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর একটা সময় এমন আসবে, যখন কাফেরদের প্রভাব খুব বেশি হবে, চতুর্দিকে নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, খায়বারের নিকট পর্যন্ত নাসারাদের আমলদারী হবে। এমন সময় মুসলমানগণ তাদের বাদশা বানানোর জন্য হযরত মাহ্দীকে তালাশ করবেন এবং এক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নেক লোক মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফরত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তাঁকে চিনতে পারবেন এবং তাঁর হাতে বায়আত করে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর বয়স হবে ৪০ বৎসর। ঐ সময় একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে যে, “ইনিই আল্লাহর খলীফা-মাহদী।”

হযরত মাহ্দীর নাম হবে মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ফাতেমা (রা.)–এর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ, সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। মদীনা তাঁর জন্মস্থান হবে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক-চরিত্র রসূল (সা.)–এর অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন না, তাঁর উপর ওহীও নাযিল হবে না। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন এবং আধিপত্য বিস্তারকারী নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তাঁর আমলেই হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন। হযরত ঈসা (আ.)–এর আগমন ও দাজ্জালের ধ্বংশ হওয়ার কিছুকাল পর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

## দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জাল শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ তাআলা শেষ যমানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে।

চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ, কাফের। সকল মু'মিনই সে লেখা পড়তে পারবে। ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার অভ্যুত্থান হবে। সে ইয়াহুদী বংশোদ্ভুত হবে। প্রথমে সে নবুওয়াতের দাবী করবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইয়াহুদী তার অনুগামী হবে, তখন খোদায়ী দাবী করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে। মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে দেখাবে। কৃত্রিম বেহেশ্‌ত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশ্‌ত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশ্‌ত। সে আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারবে, যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেৎনা এবং এক ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল একটা গাধার উপর সওয়ার হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূখণ্ডে বিচরণ করবে এবং মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত (এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশ্‌তাগণ এসব এলাকার পাহারায় থাকবে।) সবস্থানে ফেৎনা বিস্তার করবে।

হযরত মাহ্‌দীর সময় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। (হযরত ঈসা [আ.] বর্তমানে দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন।)

অভ্যুত্থানের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে। দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য হাদীছে আমাদেরকে নিম্নোক্ত দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাই। (বোখারী ও মুসলিম)

## হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসের চতুর্দিক ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। এ সময়ে একদিন ফজরের নামাযের ইকামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে ফেরেশ্‌তাদের উপর ভর করে অবতরণ করবেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন[1] এবং হযরত মাহ্‌দী উক্ত নামাযের



ইমামত করবেন। নামাযের পর হযরত ঈসা (আ.) হাতে ছোট একটা বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পলায়ন করতে আরম্ভ করবে। হযরত ঈসা (আ.) তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং "লুদ" নামক স্থানের প্রবেশদ্বারে গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে তাকে বধ করবেন।

মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তাআলা সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণও করেননি কিংবা ইয়াহুদীরা তাঁকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যাও করতে পারেনি। তিনি আকাশে জীবিত আছেন। তিনি উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী দাজ্জালের আবির্ভাবের পর দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং ৪০ বৎসর রাজত্ব পরিচালনা করার পর ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর রওযা শরীফের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পাশেই দাফন করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) নবী হিসাবে আগমন করবেন না বরং তিনি আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উম্মত হিসাবে আগমন করবেন এবং এই শরীআত অনুযায়ীই তিনি জীবন যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন।

## ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের ফেতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফেৎনা। ইয়া'জূজ মা'জূজ[2] অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা (আ.) ও মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন।

১. এক বর্ণনা অনুযায়ী দামেস্কের এক মসজিদের পূর্ব দিকের শুভ্র মিনারায় তিনি অবতরণ করবেন। অধিকাংশ আলেমের মতে তাঁর অবতরণ হবে বায়তুল মুকাদ্দাসে। এরূপ বর্ণনাও হাদীছে রয়েছে। হতে পারে তাঁর অবতরণের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসেও শুভ্র মিনারা তৈরী হয়ে যাবে। আবার বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকে ভৌগোলিকভাবে দামেস্কের অন্তর্ভূক্ত বলা যায়। তাহলে দুই বর্ণনায় কোনো বৈপরিত্য থাকে না।

২. ইয়া'জূজ মা'জূজ বর্তমানে কোন্ দেশের কোথায় কীভাবে রয়েছে, কী তাদের বর্তমান পরিচয়– তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীগণ হযরত মাওলানা হেফজুর রহমান রচিত "কাছাছুল কোরআন" কিতাব পাঠ করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা মহামারীর আকারে রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত

আছে, সেই রোগের ফলে তাদের গর্দানে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি হবে, ফলে অল্প দিনের মধ্যে ইয়া'জূজ মা'জূজের গোষ্ঠীর সবাই মরে যাবে। তাদের অসংখ্য মৃত দেহের দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের দুআয় আল্লাহ তাআলা এক ধরনের বিরাটকায় পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। তারা মৃতদেহগুলো উড়িয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহ্র ইচ্ছা ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

## আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা

হযরত ঈসা (আ.)–এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায় পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তার পর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে এবং চতুর্দিকে বে-দ্বীনী শুরু হবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে, যার ফলে মু'মিন মুসলমানের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

## পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা

তার কিছুদিন পর একদিন হঠাৎ একটা রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যাক্ত হয়ে যাবে, গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। তারপর সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তখন থেকে আর কারও ঈমান বা তওবা কবূল হবে না। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আবার আল্লাহ্র হুকুমে পশ্চিম দিকে গিয়েই অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি পূর্বের নিয়মে পূর্বদিক থেকে উদিত হতে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে থাকবে।

## দাব্বাতুল আর্দ সম্বন্ধে আকীদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কিছু দিন পর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভূত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় "দাব্বাতুল আর্দ" (ভূমির জন্তু)। এ প্রাণীটা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে।



এ জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এ জন্তুটির আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে বিভিন্ন রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

## কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্বন্ধে আকীদা

দাব্বাতুল আর্দ গায়েব হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে একটি আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে ঈমানদারদের বগলে কিছু অসুখ হবে এবং তারা মারা যাবে। দুনিয়ায় কোনো ঈমানদার ব্যক্তি ও আল্লাহ আল্লাহ করার বা আল্লাহর নাম নেয়ার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সারা দুনিয়ায় হাব্শী কাফেরদের রাজত্ব চলবে। তারা বায়তুল্লাহ শরীফকে শহীদ করে ফেলবে। কুরআন শরীফ দেল থেকে এবং কাগজ থেকে উঠে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। সিঙ্গার ফুঁকে প্রথম প্রথম হালকা আওয়াজ হবে। পরে এত কঠোর ও ভীষণ হবে যে, সমস্ত লোক মারা যাবে। জমিন ও আসমান ফেটে যাবে। পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের রূহও বেহুশ হয়ে যাবে। সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

## ঈছালে ছওয়াব সম্বন্ধে আকীদা

"ঈছালে ছওয়াব" অর্থ ছওয়াব রেছানী বা ছওয়াব পৌঁছানো। মৃত মুসলমানদের জন্য কৃত নামায, রোযা, দান-সদকা, তাসবীহ-তাহলীল, তিলাওয়াত ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব পৌঁছে থাকে। এক মতে ফরয ইবাদতের দ্বারাও ঈছালে ছওয়াব করা যায়। এতে নিজের যিম্মাদারীও আদায় হবে, মৃতও ছওয়াব পেয়ে যাবে।

(امداد الفتاوی ج/٥ واحسن الفتاوی ج/٤ থেকে গৃহীত)

## দুআর মধ্যে ওছীলা প্রসঙ্গে আকীদা

দুআ কবূল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকের ওছীলা[১] দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওছীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয বরং তা মোস্তাহাব।

(احسن الفتاوی ج/١ في رسالة نيل الفضيلة بسؤال الوسيلة وامداد الفتاوی ج/٥)

১. কিছু লোক বলে থাকে মৃত নেককার লোকদের ওছীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয নয়। তাদের বক্তব্য ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## জিন সম্বন্ধে আকীদা

আল্লাহ তাআলা আগুনের তৈরী এক প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন, যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, তাদেরকে জিন বলে। তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সবরকম হয়। তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ এবং বড় দুষ্ট হল ইবলীস অর্থাৎ, শয়তান। জিন মানুষের উপর আছর করতে পারে।

## কারামত, কাশ্‌ফ, এল্‌হাম ও পীর বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা

* বুযুর্গ ও আল্লাহর অলীদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে অসাধারণ কাজ দেখিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় কারামত। আর জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তাঁরা যেসব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগোচর জিনিসকে দেলের চোখে দেখতে পারেন, তাকে বলা হয় কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম। বুযুর্গদের কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম সত্য। মৃত্যুর পরও বুযুর্গদের কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

* কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম হয়ে থাকে বুযুর্গ ও অলীদের। আর বুযুর্গ ও অলী বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাকে। আর শরীআতের বরখেলাফ করে কেউ আল্লাহ্‌র প্রিয় তথা ওলী বা বুযুর্গ হতে পারে না। অতএব যারা শরীআতের বরখেলাফ করে যেমনঃ নামায রোযা করে না, গাঁজা, শরাব বা নেশা খায়, বেগানা মেয়েলোককে স্পর্শ করে বা দেখে, গান-বাদ্য করে ইত্যাদি, তারা কখনও বুযুর্গ নয়। যদি তারা অলৌকিক কিছু দেখায়ও তবুও তা কারামত নয় বরং বুঝতে হবে হয় সেটা যাদু বা কোনরূপ তুকতাক ও ভেল্কিবাজী, কিংবা যেকোনো রূপ প্রতারণা। অনেক সময় শয়তান এ জাতীয় লোকদেরকে গায়েব জগতের অনেক খবর জানিয়ে দেয়। যাতে করে তা শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না।

* কাশ্‌ফ এবং এল্‌হাম যদি শরীআতের অনুকূল হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

* কোনো বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শির্‌ক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন।

* কোনো পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন- এটা শির্‌ক। কোনো পীর-বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশ্‌ফ এল্‌হাম হতে পারে, তাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

* কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা –চাই সে যতবড় হোক– কোন নবী বা



সাহাবী থেকে বেশি বা তাঁদের সমানও হতে পারে না।

## ওলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন, মানব জগতে বার প্রকার আউলিয়া বিদ্যমান রয়েছেন। যথা:–

১. কুতুবঃ তাঁকে কুত্‌বুল আলম, কুত্‌বুল আকবার, কুত্‌বুল এরশাদ ও কুত্‌বুল আক্‌তাবও বলা হয়। আলমে গায়েবের মধ্যে তাঁকে আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর দুইজন উযীর থাকেন, যাদেরকে ইমাম-াইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আবদুল মালেক এবং বামের উযীরের নাম আবদুর রব। এ ব্যতীত আরও বারজন কুতুব থাকেন, সাতজন সাত এক্‌লীমে (অঞ্চলে) থাকেন, তাদেরকে কুত্‌বে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্ট কুতুব প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক একজন করে।

২. ইমামাইনঃ ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৩. গাউছঃ গাউছ থাকেন মাত্র একজন। কেউ কেউ বলেছেন, কুতুবকেই গাউছ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, গাউছ ভিন্ন একজন, তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।

৪. আওতাদঃ আওতাদ চারজন, পৃথিবীর চার কোণে চারজন থাকেন।

৫. আবদালঃ আবদাল থাকেন ৪০ জন।

৬. আখ্‌ইয়ারঃ তারা থাকেন পাঁচশত জন কিংবা সাতশত জন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ভ্রমণ করতে থাকেন। তাঁদের নাম হুসাইন।

৭. আব্‌রারঃ অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন আব্‌দালকেই আবরার বলেছেন।

৮. নুকাবাঃ নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।

৯. নুজাবাঃ নুজাবা হাসান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।

১০ আমূদঃ আমূদ মুহাম্মাদ নামে চারজন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।

১১. মুফাররিদঃ গাউছ উন্নতি করে ফর্‌দ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফর্‌দ উন্নতি করে কুতুবুল আওতাদ হয়ে যান।

১২. মাক্‌তুমঃ মাক্‌তুম শব্দের অর্থ পুশিদা বা লুকায়িত। বাস্তবেও তারাও পুশিদা বা গোপনই থাকেন।

(تعليم الدين প্রভৃতির আলোকে গৃহীত।)

বি. দ্র. ওলীদের এই প্রকার এবং এই বিবরণ সম্মন্ধে কুরআন-হাদীছে

খুলে কিছু বলা হয়নি, শুধু বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্‌ফের দ্বারা এটা জানা গিয়েছে। আর কাশ্‌ফ যার হয় তার জন্য সেটা দলীল, অন্যদের জন্য সেটা দলীল হয় না। অতএব এগুলো নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই শ্রেয়। এখানে এসব বর্ণনা পেশ করার উদ্দেশ্য হল একথা ব্যক্ত করা যে, এগুলো কুরআন-হাদীছে বর্ণিত বিষয় নয়। সুতরাং ওলীদের সম্পর্কে অনেকে বাড়াবাড়িমূলক যেসব আকীদা রাখেন, যেমন: গাউছ কুতুব ইত্যাদি ওলীদের হাতে দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব থাকে, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত অনেক কিছু করতে পারেন– এসব আকীদা বর্জন করা চাই। এগুলো কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## মাজার সম্বন্ধে আকীদা

"মাজার" শব্দের অর্থ যিয়ারতের স্থান। সাধারণভাবে বুযুর্গদের কবর যেখানে যিয়ারত করা হয়, তাকে মাজার বলা হয়। সাধারণত কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয়। যেমন: কল্‌ব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বিশেষভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়যও লাভ হয়। মাজারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য, কিন্তু এর অতিরিক্ত সাধারণ মানুষ মাজার ও মাজার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন:

## মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ

১. মাজারে গেলে বিপদ-আপদ দূর হয়।

২. মাজারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়।

৩. মাজারে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি হয়।

৪. মাজারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।

৫. মাজারে গেলে মকসূদ হাসেল হয়।

৬. মাজারে মানত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

৭. মাজারে টাকা-পয়সা নযর-নিয়ায দিলে ফায়দা হয়।

৮. মাজারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ইত্যাদি। এগুলো সবই ভ্রান্ত ধারণা।

## সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা



* সকল সাহাবী আদিল অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তাকী, পরহেযগার, ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দানকারী। প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং আলো রয়েছে; কারও মধ্যে অন্ধকার নেই।

* সকল সাহাবী সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা করা, দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা সম্পূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ। সাহাবীদের সমালোচনাকারীরা ফাসেক, ফাজের ও গুমরাহ।

* সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম শিয়ার বা প্রতীকী বৈশিষ্ট্য।

* প্রত্যেক সাহাবী সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের কষ্টিপাথর, যার নিরিখে অবশিষ্ট সকলের ঈমান পরীক্ষা করা হবে। আমল এবং দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা মাপকাঠি। এক কথায় সাহাবায়ে কেরাম হকের মাপকাঠি, তাঁদের নিরিখে নির্ণীত হবে পরবর্তীদের হক বা বাতিল হওয়া।

* যেসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে দ্বিমত বা বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সাহাবী হক ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে তাঁদের কোন পক্ষের এজতেহাদী ভুল-চুক থাকতে পারে, তবে প্রত্যেকের নিয়ত সহীহ ছিল, ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁরা সেটা করেননি বরং দ্বীনের খাতিরে এবং এখলাছের সঙ্গেই করেছেন– এই আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রেও যেকোনো একজন বা এক পক্ষের অনুসরণ করলে হেদায়াত, মুক্তি ও নাজাত পাওয়া যাবে। কিন্তু একজনের অনুসরণ করে অন্যজনের দোষ চর্চা করা যাবে না। দোষ চর্চা করা হারাম হবে।

* সাহাবীদের মর্যাদা সমস্ত অলী-আউলিয়ার উর্ধ্বে। যিনি উম্মতের সবচেয়ে বড় অলী (যিনি সাহাবী নন) তার মর্যাদাও একজন নিম্ন স্তরের সাহাবীর সমান হতে পারে না। বরং সাহাবী আর সাহাবী নন– এমন দুই স্তরের মধ্যে মর্যাদার তুলনাই অবান্তর।

* সমস্ত সাহাবীর মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং তিনি প্রথম খলীফা। তারপর (২) হযরত ওমর (রা.), তিনি দ্বিতীয় খলীফা। তারপর (৩) হযরত ওসমান গনী (রা.), তিনি তৃতীয় খলীফা। তারপর (৪) হযরত আলী (রা.), তিনি চতুর্থ খলীফা।

খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে এই তারতীব অর্থাৎ, এই পর্যায়ক্রম হক ও যথার্থ।

* সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহ তাআলা চির সন্তুষ্টির খোশ-খবরী দান করেছেন। বিশেষভাবে একসাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। উক্ত দশজনকে "আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্" (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), (২) হযরত ওমর (রা.), (৩) হযরত ওসমান (রা.), (৪) হযরত আলী (রা.), (৫) হযরত তাল্‌হা (রা.), (৬) হযরত যোবায়ের (রা.), (৭) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ (রা.), (৮) হযরত সাআদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাছ (রা.), (৯) হযরত সাঈদ ইব্‌নে যায়েদ (রা.) এবং (১০) হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (রা.)।

এছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

## রসূল (সা.)-এর বিবি, আওলাদ ও পরিবার সম্বন্ধে আকীদা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আওলাদের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রা.) এবং বিবিদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)–এর মর্তবা সবচেয়ে বেশি।

## আস্‌বাব/বস্তুর ক্ষমতা সম্বন্ধে আকীদা

কোনো আস্‌বাব বা বস্তুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো আস্‌বাব বা বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে– এরূপ বিশ্বাস করা শিরক। তবে বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায় তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত, তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে বা তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না– আল্লাহ পাকের এরূপ ফয়সালা হলেই বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। বস্তু সম্বন্ধে এ হচ্ছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। আস্‌বাব গ্রহণ বা বর্জনের বিধান সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫২৭ নং পৃষ্ঠা।

## রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা

সাধারণত ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে সে ব্যাপারে ইসলামের আকীদা হল– কোনো রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায় তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে



আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, আবার অনেকে না যেয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ আকীদা হল– রোগের মধ্যে সংক্রমণ বা অন্যের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই সে আল্লাহ্‌র হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় আক্রান্ত হবে না। কিংবা এরূপ আকীদা রাখতে হবে যে, এসব রোগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তা'আলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে সংক্রমণ না-ও ঘটতে পারে। অর্থাৎ, সংক্রমণের এ ক্ষমতা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছার দখল থাকলেই তা সংক্রমিত হয়ে থাকে নতুবা নয়।

তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে, বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকট গেলে আর তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফয়সালা হওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হলে তার ধারণা হতে পারে যে, উক্ত রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন না হতে পারে এ জন্যই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মজবুত আকীদার অধিকারী হলে সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে অন্য কারও আকীদা নষ্টের কারণ না ঘটে।

## রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

"রাশি" বলা হয় সৌরজগতের কতগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটা রাশি কল্পনা করা হয়। যথাঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology–এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা

ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে– এই আকীদা রাখা শির্ক। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ও রাশি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" নামক গ্রন্থ।

(فتح الملهم ج/۱ ও آپ کے مسائل اوران کا حل ج/۱ থেকে গৃহীত)

## হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা

পামিস্ট্রি (Palmistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে গণকগণ কর্তৃক যে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয় ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফ্‌রী। (آپ کے مسائل اوران کا حل ج/۱)

## রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

* মণি, মুক্তা, হীরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে– এরূপ আকীদা-বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের নয়।

(آپ کے مسائل اوران کا حل ج/۱)

## তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়– হতেও পারে না-ও হতে পারে। যেমনঃ দুআ করা হলে রোগ-ব্যাধি আরোগ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আরোগ্য হয় নতুবা হয় না। তদ্রূপ তাবীজ এবং ঝাড় ফুঁকও একটি দুআ বরং তাবীজের চেয়ে দুআ বেশি শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয় বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়ে থাকে।

* সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই এজতেহাদ ও অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীছে যার ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা অমুক কাজ হবে। অতএব কোন তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাংখিত ফল লাভ না হলে



এরূপ বলার বা এরূপ ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন-হাদীছ কি তাহলে সত্য নয়?

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন-হাদীছের বাক্যাবলী দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন কুফ্‌র শির্কের কথা থাকলে বা এরূপ কোন যাদু হলে তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক হারাম। এমনিভাবে কোন অবৈধ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হলে তা জায়েয নয়, যদিও কুরআন-হাদীছের বাক্য দ্বারা তা করা হয়।

* যেসব বাক্য বা শব্দ কিংবা যেসব নকশার অর্থ জানা যায় না, তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

* কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে– এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারও এজাযতপ্রাপ্ত হওয়া জরুরি– এরূপ ধারণাও ভুল।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভাল আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমেলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়।

(ما خوذ از معارف القرآن، الشامي ج/٦، مرقاة و اغلاط العوام)

## নজর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা

* হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে, এমনকি সন্তানের প্রতি মাতা-পিতারও বদনজর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন ভূতের বাতাস অর্থাৎ, তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তাহলে এটাও সত্য; কেননা জিন ভূত মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

* কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি مَاشَآءَ اللّٰهُ (মাশা আল্লাহ) বলে, তাহলে তার প্রতি তার বদনজর লাগে না।

* কারও উপর কারও বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ, হাত (কনুইসহ) এবং শরীরের নিচের অংশ ধুয়ে সেই পানি যার উপর নজর লেগেছে তার উপর ঢেলে দিলে খোদা চাহে তো ভাল হয়ে যাবে। (كذا في المرقاة بضوء حديث مسلم)

* বদনজর থেকে হেফাজতের জন্য কাল সুতা বাঁধা বা কালি কিংবা

কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার।

## কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা

ইসলামী আকীদামতে কোনো বস্তু বা অবস্থা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা কোনো সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত নয়– এরূপ কোনো লক্ষণ মানা বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে– এরূপ মুহূর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে খুশী বা সাফল্যসূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হলে কিংবা এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সুলক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলত কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়, বরং এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র রহমতের আশাকে শক্তিশালী করা।

## শরীআতের আকীদা বিরুদ্ধ কয়েকটা লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থ-কড়ি আসবে মনে করা।
২. চোখ লাফালে বিপদ-আপদ আসবে মনে করা।
৩. কুকুর কাঁদলে রোগ মহামারী আসবে মনে করা।
৪. এক চিরুনিতে দু'জন চুল আঁচড়ালে উক্ত দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লাগবে মনে করা।
৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা।
৬. যাত্রা পথে পিছন থেকে কেউ ডাকলে খারাপ মনে করা।
৭. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেথর দেখলে বা কাল কলসি দেখলে, কিংবা বিড়াল দেখলে কুলক্ষণ মনে করা।
৮. অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন বিবাহ নাস্তি, অমুক দিন ভ্রমণ নাস্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মোটকথা, কোনো দিন সময় বা কোনো মুহূর্তকে অশুভ মনে করা।
৯. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না– এরূপ বিশ্বাস করা।
১০. পেঁচা ডাকলে ঘর-বাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা।
১১. জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে বা কেউ তাকে স্মরণ করছে মনে করা।
১২. চড়ূই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা।
১৩. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা। বরং প্রথমেই সহযোগিতার নিয়তে কাউকে বাকি দিলে মানুষকে সহযোগিতার ছওয়াব ও বরকতে তার ব্যবসা ভাল হতে পারে। তাই প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন ফাঁকি যাবে মনে করা ঠিক নয়।



১৪. কোন লোকের আলোচনা চলছে, ইত্যবসরে বা কিছুক্ষণ পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবি হওয়ার লক্ষণ মনে করা।
১৫. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে উক্ত ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে মনে করা।
১৬. আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।
১৭. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিষ্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।
১৮. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে মনে করা।
১৯. ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।
২০. কোনো প্রাণী বা কোনো প্রাণীর ডাককে শুভ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা।

বি. দ্র. এরূপ আরও বহু গলত আকীদা রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা উল্লেখ করা হল। (اغلاط العوام ইত্যাদি থেকে গৃহীত)

## আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বন্ধে আকীদা

এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর ফির্কায় (দলে) বিভক্ত হয়ে পড়বে, তন্মধ্যে মাত্র একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, জান্নাতী) আর বাকি সবগুলো ফিরকা হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তাঁরা হল আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর আছি তার অনুসারীগণ। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড)

এ হাদীছের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁদেরকেই বলা হয় "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।" নামটির মধ্যে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মত ও পথ এবং 'জামাআত' শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের জামাআত উদ্দেশ্য। মোটকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসারীদেরকেই বলা হয় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যে সব সম্প্রদায় ও ফির্কার উদ্ভব

হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বযুগে এ দলটিই হল সত্যাশ্রয়ী দল। সর্বযুগে ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে হকপন্থী গরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন, হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসরণ করে আসছে, এ দলটি তারই অনুসরণ করে আসছে। এর বাইরে যারা গিয়েছে, তারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এরূপ বহু বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যারা রয়েছে তারাও বিলীন হবে, হকপন্থী দল চিরকাল টিকে থাকবে।

## ঈমান সম্পর্কিত কোন বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগলে তখন কী করণীয়

যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সে সব বিষয়ে যদি কখনও মনে সন্দেহ এবং ওয়াছওয়াছা দেখা দেয়, যেমনঃ মনে সন্দেহ দেখা দিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) আসলেই খোদা বলে কেউ আছেন কি? বা থাকলে তাকে কে সৃষ্টি করল, কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তিনি হলেন কীকরে? কিংবা সন্দেহ দেখা দিল যে, জান্নাত জাহান্নাম আসলেই আছে কি? এরূপ আল্লাহ, রসূল, কুরআন, পরকাল, তাকদীর ইত্যাদি যেকোনো ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে সন্দেহ আসলে তখন তিনটি আমল করণীয়। যথা:-

১. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম পড়ে নেয়া।
২. আমান্‌তু বিল্লাহ (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম) পড়ে নেয়া।
৩. উক্ত চিন্তা থেকে বিরত হয়ে অন্য কোন চিন্তা বা কাজে লিপ্ত হওয়া।

(مسلم ج/١)

## ঈমান বাড়ে কমে কীভাবে

ঈমান বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে নূর পয়দা হয় এবং ঈমান মজবূত হয় নিম্নোক্ত তরীকায়।

১. ঈমানের আলোচনা দ্বারা।
২. ঈমানদারদের সোহবত বা সাহচর্য গ্রহণ দ্বারা।
৩. আমল দ্বারা। (ঈমানের শাখাগুলোর উপর আমল করা দ্বারা)

পক্ষান্তরে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং ঈমানের নূর কমে যায়, এমনকি কখনও কখনও ঈমান নষ্ট হয়ে যায় নিম্নোক্ত কারণে।

১. কুফ্‌র দ্বারা।
২. শির্‌ক দ্বারা।



৩. বিদআত দ্বারা।
৪. রছম ও কুসংস্কার পালন করা দ্বারা।
৫. গোনাহ দ্বারা।

## ঈমানের শাখা

ঈমানের পরিচয়ের মধ্যে বলা হয়েছে কতকগুলো বিষয়কে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিণত করার সমষ্টি হল ঈমান। এ থেকে বুঝা গেল- ঈমানের কিছু বিষয় দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিছু জবানের দ্বারা এবং কিছু হাত, পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা। এ সবগুলোকে ঈমানের শাখা বলা হয়। বড় বড় ইমামগণ হাদীছের ইঙ্গিত পেয়ে গবেষণা করে কুরআন-হাদীছ থেকে ঈমানের ৭৭টি শাখা নির্ণয় করেছেন। এর মধ্যে দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি। জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭টি। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০টি। আমলের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে সবগুলোর বর্ণনা পেশ করা হল।

### দেলের দ্বারা যেগুলো সম্পন্ন হয়

১. আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা।
২. আল্লাহ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁর মাখ্‌লূক-একথা বিশ্বাস করা।
৩. ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা।
৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।
৫. আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বরগণের প্রতি ঈমান আনা।
৬. তাকদীরের উপর ঈমান আনা।
৭. কিয়ামতের উপর ঈমান আনা।
৮. বেহেশ্‌তের উপর ঈমান আনা।
৯. দোযখের উপর ঈমান আনা।
১০ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত রাখা।
১১. কারও সঙ্গে আল্লাহ্‌র জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কারও সঙ্গে দুশমনী রাখা।
১২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে মহব্বত রাখা।
১৩. এখলাস। (অর্থাৎ, সবকিছু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করা।)
১৪. তওবা অর্থাৎ, কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তা পরিত্যাগ করা এবং

ভবিষ্যতে তা না করার জন্য সংকল্প করা। তওবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৫৭ নং পৃষ্ঠা।

১৫. আল্লাহ্কে ভয় করা।

১৬. আল্লাহ্র রহ্মতের আশা রাখা।

১৭. আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ না হওয়া।

১৮. হায়া বা লজ্জা।

১৯. শোকর।

২০. অঙ্গীকার রক্ষা করা।

২১. ছবর।

২২. বিনয় নম্রতা ও বড়দের প্রতি সম্মানবোধ।

২৩. স্নেহ-মমতা ও জীবের প্রতি দয়া।

২৪. তাকদীরের উপর তথা আল্লাহ্র ফয়সালার উপর রাজী থাকা।

২৫. তাওয়াক্কুল করা।

২৬. নিজেকে বড় এবং ভাল মনে না করা।

২৭. হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা।

২৮. রাগ না করা।

২৯. কারও অহিত চিন্তা না করা, কারও প্রতি কু-ধারণা না করা।

৩০. দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা।

বি. দ্র. ১১ নং থেকে ৩০ নং পর্যন্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**জবানের দ্বারা যেগুলো সম্পন্ন হয়**

১. কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়া।

২. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা।

৩. ইল্মে দ্বীন শিক্ষা করা।

৪. ইল্মে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।

৫. দুআ বা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা।

৬. আল্লাহ্র যিকির।

৭. বেহুদা কথা থেকে জবানকে হেফাজত করা।

**বহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যেগুলো সম্পন্ন হয়**



১. পবিত্রতা হাছিল করা।

২. নামাযের পাবন্দী করা।

৩. ছদকা, যাকাত, ফিত্রা, দান-খয়রাত, মেহমানদারী ইত্যাদি।

৪. রোযা।

৫. হজ্জ।

৬. এ'তেকাফ (শবে কদর তালাশ করা এর অন্তর্ভুক্ত)।

৭. হিজরত করা অর্থাৎ, দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে দেশ-বাড়ি ত্যাগ করা।

৮. মানত পুরো করা।

৯. কছম করলে তা পূরণ করা আর কছম ভঙ্গ করলে তার কাফ্ফারা দেয়া।

১০. কোন কাফ্ফারা থাকলে তা আদায় করা।

১১. ছতর ঢেকে রাখা।

১২. কুরবানী করা।

১৩. জানাযা ও তার যাবতীয় আনুষঙ্গিক কাজের ব্যবস্থা করা।

১৪. ঋণ পরিশোধ করা।

১৫. লেন-দেন ও ক্রয়-কারবার সততার সঙ্গে এবং জায়েয তরীকা মোতাবেক করা।

১৬. সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা। সত্য জানলে তা গোপন না করা।

১৭. বিবাহের দ্বারা হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।

১৮. পরিবার-পরিজনের হক আদায় ও চাকর-নওকরদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

১৯. মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

২০. ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২১. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

২২. উপরওয়ালার অনুগত হওয়া, যেমন: চাকরের প্রভভক্ত হওয়া।

২৩. ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা।

২৪. মুসলমানদের জামাআতের সঙ্গে থাকা ও হক্কানী জামাআতের সহযোগিতা করা, তাদের মত পথ ছেড়ে অন্যভাবে না চলা।

২৫. শরীআত-বিরোধী না হলে শাসনকর্তাদের অনুসরণ করা।

২৬. লোকদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তা মিটিয়ে দেয়া।

২৭. সৎ কাজে সাহায্য করা।

২৮. আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করা তথা সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে বাধা দেয়া।

২৯. জিহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

৩০. হদ তথা শরীআত নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা।

৩১. আমানত আদায় করা। গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করা এর অন্তর্ভুক্ত।

৩২. অভাবগ্রস্তকে কর্জ দেয়া।

৩৩. প্রতিবেশীর হক আদায় করা ও তাদেরকে সম্মান করা।

৩৪. লোকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

৩৫. অর্থের সদ্ব্যবহার করা।

৩৬. সালামের জওয়াব দেয়া ও সালাম প্রদান করা।

৩৭. যে হাঁচি দিয়ে 'আল হামদুলিল্লাহ' পড়ে তাকে 'ইয়ারহামুকালাল্লাহ' বলা।

৩৮. পরের ক্ষতি না করা। কাউকে কোনোরূপ কষ্ট না দেয়া।

৩৯. খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও নাচ গান থেকে দূরে থাকা।

৪০. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।

নিম্নে কুফ্র, শির্ক, বিদআত রছম ও গোনাহের বিষয়াদি সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হল, যেন এগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ঈমানকে রক্ষা করা যায়।

## কতিপয় কুফ্রী ও তার বিবরণ

* যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয় (৪৯ পৃষ্ঠা থেকে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন) তার কোনটি অস্বীকার করা কুফ্রী।

* কুরআন-হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয় অস্বীকার করা। যেমনঃ নামায রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা, নামাযের সংখ্যা, রাকআতের সংখ্যা, রুকু সাজদার অবস্থা, আযান, যাকাত, হজ্জ, ইত্যাদি বিষয়–এর কোনটি অস্বীকার করা কুফ্রী।

* কোন মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করা কুফ্রী। (احسن الفتاوی ج/١)

* কুরআন-হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা দেয়া, যা কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বিবরণের খেলাফ- এটাও কুফ্রী।

* কুফ্র ও ভিন্ন ধর্মের কোন শি'আর বা ধর্মীয় বিশেষ নিদর্শন গ্রহণ করা কুফ্রী। যেমনঃ হিন্দুদের ন্যায় পৈতা গলায় দেয়া, খৃষ্টানদের ক্রুশ গলায় ঝুলানো ইত্যাদি।

* কুরআনের কোনো আয়াতকে অস্বীকার করা বা তার কোনো নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্রী।

* কুরআন শরীফকে নাপাক স্থানে ও ময়লা আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ



করা কুফ্রী।

* ইবাদত ও তাজীমের নিয়তে কবরকে চুমু দেয়া কুফ্রী। ইবাদতের নিয়ত ছাড়া চুমু দেয়া গোনাহে কবীরা।

* দ্বীন ও ধর্মের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্রী। এ জন্যই নামায রোযা নিয়ে উপহাস করা কুফ্রী, ইসলামের পর্দা ব্যবস্থাকে তিরস্কার করা বা উপহাস করা কুফরী, দাড়ি টুপি পাগড়ী নিয়ে উপহাস করা কুফ্রী ইত্যাদি।

* আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কোনো হুকুমকে খারাপ মনে করা এবং তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা কুফ্রী।

* ফেরেশ্তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব পোষণ করা বা তাদের সম্পর্কে কটুক্তি করা কুফ্রী।

* হারামকে হালাল মনে করা এবং হালালকে হারাম মনে করা কুফ্রী।

* কারও মৃত্যুতে আল্লাহ্র উপর অভিযোগ আনা, আল্লাহ্কে জালেম সাব্যস্ত করা কুফ্রী।

* কাউকে কুফ্রী শিক্ষা দেয়া কুফ্রী।

* হারাম বস্তু পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ বলা, যেনায় লিপ্ত হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা কুফ্রী।

* দ্বীনী ইল্মের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও অবমাননাকর বক্তব্য প্রদান করা কুফ্রী।

* হক্কানী উলামায়ে কেরামকে দ্বীনী ইল্মের ধারক বাহক হওয়ার দরুন গালি দেয়া বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। এটাও কুফ্রী।

* কেউ প্রকাশ্যে কোন গোনাহ করে যদি বলে যে, আমি এর জন্য গর্বিত তাহলে সেটা কুফ্রী।

* আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর অবমাননা করা, আল্লাহ ও নবীকে গালি দেয়া এবং তাঁদের শানে বেয়াদবী করা কুফ্রী।

* যে যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী কুফ্র ও শিরকের কথাবার্তা বা কাজকর্ম থাকে তা কুফ্রী।

(ماخوذ از معارف القرآن جواہر الفقہ، احسن الفتاوی ج/١، امداد الفتاوی ج/٥ ও ফাতাওয়া মাসায়েল آپ کے مسائل اوران کا حل ج/١ وغیرہ)

## ঈমান পরিপন্থী কিছু আধুনিক ধ্যান-ধারণা

* জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান-পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়, তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা ঈমান-আকীদার পরিপন্থী।

* সমাজতন্ত্রে নিখিল বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা বা খোদা আছে বলে স্বীকার করা হয় না, তাই নাস্তিকতা-নির্ভর এই সমাজতন্ত্রের মতবাদে বিশ্বাস করা ঈমান-আকীদা পরিপন্থী।

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফ্রী।

* "ধর্ম নিরপেক্ষতা"-এর অর্থ যদি হয় কোনো ধর্মে না থাকা, কোনো ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা, কোনো ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা, তাহলে এটা কুফ্রী মতবাদ। কেননা ইসলাম ধর্মে থাকতেই হবে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, ইসলামী কার্যক্রমকে সমর্থন দিতেই হবে। আর যদি ধর্মনরিপেক্ষতার অর্থ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত না করা, তাহলে সে ধারণাও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আর কোন ফরযকে আস্বীকার করা কুফ্রী। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে, জোর জবরদস্তী কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না, তাহলে এতটুকু ধারণা ইসলাম-পরিপন্থী হবে না।

* ডারউইন-এর বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা কুফ্রী অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে এক পর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে।



* ইসলাম মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এটাকে টেনে আনা যাবে না- এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্রী। কেননা, এভাবে ইসলামের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা হয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন-হাদীছে তথা ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্টীয় যাবতীয় ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে শাশ্বত সুন্দর দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

* নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরযসমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরুরি মনে না করা এবং গান, বাদ্য, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারামসমূহকে হারাম মনে না করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্রী। কেননা কোনো ফরযকে ফরয বলে অস্বীকার করা বা কোনো হারামকে জায়েয মনে করা কুফ্রী।

* টুপি, দাড়ি, পাগড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেম মৌলভী ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলোকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মারাত্মক গোমরাহী। ইসলামের কোন বিষয় -তা যত সামান্যই হোক- তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

* আধুনিক কালের নব্য শিক্ষিতদের কেউ কেউ মনে করেন যে, কেবল মাত্র ইসলমই নয়- হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ নির্বিশেষে যেকোনো ধর্মে থেকে মানবতা, মানব সেবা, পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে- এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্রী। একমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত- একথায় বিশ্বাস রাখা ঈমানের জন্য জরুরি।

**বি. দ্র.** এ কিতাবে যেসব বিষয়কে কুফ্রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কারও মধ্যে তা পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা কুফ্রের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফ্রী গোমরাহী এবং যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত, তবে কুফ্রের কোন্ স্তর পাওয়া গেলে কাউকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যায় তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্তী-গণই নির্ণয় করতে পারেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্তীগণের স্মরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজেদের থেকে কোন ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার জরুরি কয়েকটি মূলনীতি এ অধ্যায় (প্রথম অধ্যায়)-এর শেষে বর্ণনা করা হয়েছে।

## কতিপয় শির্‌ক

* কোনো বুযুর্গ বা পীর মুরশিদ সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি সর্বত্র হাজির নাযির।

* কোনো পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন।

* কোনো পীর বুযুর্গের কবরের নিকট সন্তান বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য চাওয়া। সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ, পীর বুযুর্গ নন।

* পীর বা কবরকে সাজদা করা।

* কোনো বুযুর্গের নাম অজীফার মত জপ করা।

* কোনো পীর বুযুর্গের নামে শিরনী, ছদকা বা মানত মানা।

* কোনো পীর বুযুর্গের নামে জানোয়ার জবেহ করা।

* কারও দোহাই দেয়া।

* কারও নামের কছম খাওয়া বা কিরা করা।

* আলী বখ্‌শ, হোছাইন বখ্‌শ ইত্যাদি নাম রাখা।

* নক্ষত্রের তাছীর (প্রভাব) মানা বা তিথি পালন করা,

* জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর বা যার ঘাড়ে জিন এসেছে তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবরে বিশ্বাস স্থাপন করা।

* কোনো জিনিস দেখে কু-লক্ষণ ধরা বা কু-যাত্রা মনে করা, যেমনঃ অনেকে যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে বা যাত্রা মুখে কোন মেয়ে মানুষ বা কাল কলসি দেখলে বা যাত্রা মুখে হোঁচট খেলে কু-যাত্রা মনে করে থাকে।

* কোনো দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।

* মহররমের তা'জিয়া বানানো।

* এরকম বলা যে, খোদা রসূলের মর্জি থাকলে এই কাজ হবে বা খোদা রসূল যদি চায় তাহলে এই কাজ হবে। (বরং এভাবে বলা সহীহ যে, খোদা চাইলে হবে বা খোদার মর্জি থাকলে হবে।)

* এরকম বলা যে, উপরে খোদা নিচে আপনি (বা অমুক)।

* কাউকে "পরম পূজনীয়" লেখা।

* "কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়া যায় না" বলা বা "জয়কালী নেগাহবান " ইত্যাদি বলা।



* কোনো পীর বুযুর্গ, দেও পরী, বা ভূত ব্রাহ্মণকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করা।

* কোনো পীর বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা।

* কোনো পীর বুযুর্গের দরগাহ বা বাড়ীকে কাবা শরীফের ন্যায় আদব- তা'জীম করা। (ماخوذ از تعليم واحسن الفتاوی)

## কতিপয় বিদআত

বিদআত অর্থ নতুন সৃষ্টি। শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে কোনো নতুন সৃষ্টিকে, অর্থাৎ, দ্বীনের মধ্যে ইবাদত মনে করে এবং অতিরিক্ত ছওয়াবের আশায় এমন কিছু আকীদা বা আমল সংযোজন ও বৃদ্ধি করা, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা ও তাবেঈদের যুগে অর্থাৎ, আদর্শ যুগে ছিল না। তবে যেসব নেক কাজের প্রেক্ষাপট সে যুগে হয়নি, পরবর্তীতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়ায় নতুন আঙ্গিকে দ্বীনের কোন কাজ করা হয় সেটা বিদআত নয় যেমন প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

নিম্নে কতিপয় বিদআতের বিষয় চিহ্নিত করে দেখানো হল।

* কোনো বুযুর্গের মাজারে ধুমধামের সাথে মেলা মিলানো।

* ওরস করা।

* কাওয়ালী।

* জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

* মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা)।

* মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা।

* কবরের উপর চাদর দেয়া।

* কবরের উপর ফুল দেয়া।

* কবর পাকা করা।

* কবরের উপর গম্বুজ বানানো।

* কবরের দুই প্রান্তে কাঁচা ডাল লাগানোকে স্থায়ী নিয়মে পরিণত করা। তবে যদি মাঝে মধ্যে এটা করা হয় এবং স্থায়ী নিয়মে পরিণত করা না হয়, তাহলে তার অবকাশ রয়েছে।

* মাজারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া।

* প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান।

* মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা।

* জানাযার নামাযের পর আবার হাত উঠিয়ে দুআ করা।

* জানাযা নামাযের পর জোর আওয়াজে কালেমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া।

* দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া।

* ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা ও মুআনাকা তথা কোলাকুলি করা।

* আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা। (১/□□ احسن الفتاوی)

* আযান ইকামতের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম এলে বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো। (احسن الفتاوی ج/১وراہ سنت)

* রমযানের শেষ জুমুআর খুতবায় বিদায় জ্ঞাপনমূলক শব্দ (যেমন: আল-বিদা) যোগ করা। “জুমুআতুল বিদা” বলে কোন ধারণা ইসলামে নেই।

* ‘আমীন’ বলে মুনাজাত শেষ করা নিয়ম। অনেকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা বলতে বলতে মুখে হাত বুলান এবং মুনাজাত শেষ করেন–এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা বিদআত। (১/□□ احسن الفتاوی)

* জানাযার উপর কালিমা ইত্যাদি লেখা চাদর বা ফুলের চাদর বিছানো।

(ماخوذ از تعلیم الدین. آپکے مسائل اور ان کا حل. راہ سنت. احسن الفتاوی ج/١ والفرقان وغیر ہا)

## কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা

* বিধবা বিয়েকে দোষণীয় মনে করা।

* বিয়ের সময় সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেশাচার পালন করা এবং অযথা অপব্যয় করা।

* নছব বা বংশের গৌরব করা।

* কোনো হালাল পেশাকে অপমানের মনে করা। যেমন: দপ্তরীর কাজ করা, মাঝিগিরী বা দর্জিগিরী করা, তেল-লবণের দোকান করা ইত্যাদি।

* বিয়ে-শাদিতে হিন্দুদের রছম পালন করা। যেমন: ফুল-কুল দ্বারা বৌ বরণ করা, ভরা মজলিসে বউ–এর মুখ দেখানো, গীত গেয়ে স্ত্রী পুরুষ একত্র হয়ে বর কনেকে গোসল দেয়া ইত্যাদি। এগুলো গোনাহের কাজ। বিয়ে- শাদির অনুষ্ঠানে এসব গোনাহের কাজ করলে বিয়ে-শাদির বরকত নষ্ট হয়ে যায়। সেই বিয়ে-শাদিতে মঙ্গল হয় না।



* মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়কে দোষণীয় মনে করা।

* বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা। (তবে শিকার ও পাহারার প্রয়োজনে কুকুর পালন করা বৈধ।)

* বিয়ে-শাদি, খতনা ইত্যাদিতে হাদিয়া-উপঢৌকন দেয়া। এসব হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদানের পশ্চাতে ভাল নিয়ত থাকে না বা খারাপ নিয়ত থাকে, যেমন: না দিলে অসম্মান হয়, দুর্নাম হয় বিধায় দেয়া হয় কিংবা অমুক অনুষ্ঠানে তারা দিয়েছিল তাই দিতে হয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ দিয়ে থাকে।

* বিয়ে-শাদিতে পদে পদে শত শত রছম ও কুসংস্কার পালিত হয়, এগুলো বর্জনীয়। প্রত্যেকটা পদে পদে শরীআতের তরীকা কি তা জেনে বাকি সব পরিত্যাগ করা উচিত।

* শবে বরাতে হালুয়া রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজী করা।

* আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত তৈরি এবং বণ্টন করা।

* শবে বরাত ও শবে কদরে রাত্র জাগরণের জন্য ফরয ওয়াজিব থেকে বেশি গুরুত্ব সহকারে লোকদের সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া।

* শাব্দিক অর্থে “ঈদ মুবারক” বলা খারাপ ছিল না, কিন্তু এটা রছমে পরিণত হয়েছে বিধায় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

* ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার আগেই তাসবীহ বা জায়নামায দিয়ে স্থান দখল করে রাখা।

* মুয়াজ্জিনের জন্য জায়নামায দিয়ে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা।

* মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বা ধর্মীয় অন্য কোনো কাজের জন্য মজলিসের মধ্যে এমনভাবে চাঁদা আদায় ও দান কালেকশন করা যে, মানুষ শরমে পড়ে বা চাপের মুখে পীড়াপীড়ির কারণে দান করে।

* বিপদ-আপদে যেকোনো দান-সদকা করলে বিপদ দূরীভূত হয়, কিন্তু গরু ছাগল মোরগ প্রভৃতি কোন প্রাণীই জবাই করতে হবে –যেমন: বলাও হয় জানের বদলে জান– এটা একটা রছম। জানের বদলে জান হওয়া জরুরি নয় বরং যেকোনো ছদকা হলেই তা বিপদ দূরীভূত হওয়ার সহায়ক।

* তারাবীহ্‌তে কুরআন খতম হওয়ার দিন মিষ্টান্ন বিতরণ করাও রছম।

* মাইয়েতের জন্য ঈছালে ছওয়াব করা দুআ করা শরীআতসম্মত বিষয়, কিন্তু সেটা সম্মিলিত হয়েই করতে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতার পিছনে পড়াও রছমে পরিণত হয়েছে। অতএব তা পরিত্যাজ্য।

(ماخوذ از بہشتی زیور، تعلیم الدین، اصلاح الرسوم، احسن الفتاوی وغیرہا)

## কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা

১. শির্ক।
২. পিতা-মাতার নাফরমানী করা অর্থাৎ, তাদের হক আদায় না করা। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৩৬ নং পৃষ্ঠা।)
৩. "কাত্য়ে রেহ্মী" করা অর্থাৎ, যেসব আত্মীয়ের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের হক নষ্ট করা।
৪. যেনা করা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৫ নং পৃষ্ঠা)
৫. বালকদের সাথে কুকর্ম করা।
৬. হস্তমৈথুন করা।
৭. প্রাণীর সাথে কুকর্ম করা।
৮. আমানতের খেয়ানত করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৪৪ নং পৃষ্ঠা)
৯. মানুষ খুন করা।
১০. মিথ্যা তোহ্মত বা অপবাদ লাগানো, বিশেষভাবে যেনার অপবাদ লাগানো।
১১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
১২. সাক্ষ্য গোপন করা, যখন অন্য কেউ সাক্ষ্য দেয়ার না থাকে।
১৩. যাদু দ্বারা কারও ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা। (দেখুন ৮৮ নং পৃষ্ঠা।)
১৪. যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া।
১৫. ওয়াদা খেলাফ করা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কথা দিয়ে তা ঠিক না রাখা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৪৮ নং পৃষ্ঠা।)
১৬. গীবত করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৭ নং পৃষ্ঠা।)
১৭. স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মনিবের বিরুদ্ধে চাকরকে, উস্তাদের বিরুদ্ধে শাগরেদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে ক্ষেপিয়ে তোলা।
১৮. নেশা করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৩-৬৩৪ নং পৃষ্ঠা।)
১৯. জুয়া খেলা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৪৩ নং পৃষ্ঠা।)
২০. সুদ অনেক প্রকারের আছে- সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সুদই মহাপাপ। সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেন-দেনে



সাক্ষ্যদাতা ও সুদ বিষয়ক লেন-দেনের দলীল লেখক সকলের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। সকলেরই কবীরা গোনাহ হয়।
২১. রেশওয়াত বা ঘুষ প্রদান ও গ্রহণের কারণে আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীর্ণ হয়, এটা মহাপাপ। তবে জালেমের জুলুমের কারণে নিজের হক আদায় করার জন্য ঠেকায় পড়ে ঘুষ দিলে তা পাপ নয়। কিন্তু ঘুষ দিয়ে কার্য উদ্ধার করার মনোবৃত্তি ভাল নয়। যাদের বেতন ধার্য আছে তারা কর্তব্য কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত যা কিছু নিবে সবই ঘুষ, চাই একটা সিগারেট হোক বা এক কাপ চা বা একটা পানই হোক।
২২. অন্যায়ভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হরণ বা ভোগ দখল করা।
২৩. অনাথ, এতীম, নিরাশ্রয় বা বিধবার মাল গ্রাস করা।
২৪. খোদার ঘর যিয়ারতকারী তথা হজ্জযাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা।
২৫. মিথ্যা কছম করা।
২৬. গালি দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৯ নং পৃষ্ঠা।)
২৭. অশ্লীল কথা বলা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৯ নং পৃষ্ঠা।)
২৮. জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
২৯. ধোঁকা দেয়া।
৩০. অহংকার করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬২৬ নং পৃষ্ঠা।)
৩১. চুরি করা।
৩২. ডাকাতি ও লুটতরাজ করা, এমনিভাবে পকেট মারা, ছিনতাই করা।
৩৩. নাচ, গান-বাদ্য সিনেমা ইত্যাদি। (দেখুন ৬৩৩ নং পৃষ্ঠা।)
৩৪. স্বামীর নাফরমানী করা, অর্থাৎ, স্বামীর হক আদায় না করা। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৪৩-৪৪৬ নং পৃষ্ঠা।)
৩৫. জায়গা জমির আইল (সীমানা) নষ্ট করা।
৩৬. শ্রমিক থেকে কাজ পূর্ণ নিয়ে তার পূর্ণ মজুরি না দেয়া বা পূর্ণ মজুরি দিতে টাল-বাহানা করা।
৩৭. মাপে কম দেয়া।
৩৮. মালে মিশাল দেয়া।
৩৯. খরীদ্দারকে ধোঁকা দেয়া। যেমনঃ দেশী মালকে বিদেশী বলে, কিংবা

খারাপটাকে ভিতরে রেখে উপরে ভালটি রেখে ধোঁকা দেয়া ইত্যাদি।

৪০. দাইয়্যূছিয়াত অর্থাৎ, নিজের বিবিকে বা অধীনস্থ কোন নারীকে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়া, পর পুরুষের বিছানায় যেতে দেয়া, এসবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

৪১. চোগলখোরী করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৮ নং পৃষ্ঠা।)

৪২. গণকের কাছে যাওয়া। (আরও জানার জন্য দেখুন ৮৭ নং পৃষ্ঠা।)

৪৩. মানুষ বা অন্য কোন জীবের ফটো আদর করে ঘরে রাখা।

৪৪. পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান করা।

৪৫. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা। (দেখুন ৪৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৪৬. শরীরের রূপ ঝলকে– মেয়েলোকদের জন্য এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা।

৪৭. মহিলাদের জন্য পুরুষের এবং পুরুষের জন্য মহিলার পোশাক পরিধান করা।

৪৮. গর্বভরে লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও প্যান্ট পায়ের টাখনু গিরার নিচে ঝুলিয়ে চলা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৯৫ নং পৃষ্ঠা।)

৪৯. বংশ বদলানো অর্থাৎ, পিতৃ পরিচয় বদলে দেয়া।

৫০. মিথ্যা মোকাদ্দমা করা, মিথ্যা মোকাদ্দমার পরামর্শ প্রদান, তদবীর ও পায়রবী করাও কবীরা গোনাহ।

৫১. মৃত ব্যক্তির শরীআতসম্মত ওছিয়াত পালন না করা।

৫২. কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া।

৫৩. গুপ্তচরবৃত্তি করা, অর্থাৎ, মুসলমান সমাজের এবং মুসলমান রাষ্ট্রের গুপ্ত ভেদ ও দুর্বল পয়েন্টের কথা অন্য সমাজের লোকের কাছে, অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করা।

৫৪. কাউকে মেপে দিতে কম দেয়া এবং মেপে নিতে বেশি নেয়া।

৫৫. টাকা বা নোট জাল করা।

৫৬. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় ত্রুটি করা।

৫৭. দেশের জরুরি রসদ, খাদ্য বা হাতিয়ার চোরাচালান বা পাচার করা।

৫৮. রাস্তা-ঘাটে, ছায়াদার কিংবা ফলদার বৃক্ষের নিচে মল-মূত্র ত্যাগ করা।

৫৯. বাড়ি-ঘর, আনাচ-কানাচ, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় নোংরা ও গন্ধ করে রাখা।

৬০. হায়েয বা নেফাছ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।



৬১. মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা।

৬২. যাকাত না দেয়া।

৬৩. ইচ্ছাপূর্বক ওয়াক্তিয়া নামায কাযা করা।

৬৪. জুমুআর নামায না পড়া।

৬৫. বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গা।

৬৬. রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

৬৭.জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য জীবিকা নির্বাহোপযে-াগী খাদ্যদ্রব্য, জিনিসপত্র গোলাজাত করে রাখা।

৬৮.মানুষের কষ্ট হয় এমন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশী হওয়া।

৬৯.ষাঁড় বা পাঠার দ্বারা গাভী বা ছাগী পাল দিতে না দেয়া। পাল দেয়ার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়।

৭০.প্রতিবেশীকে (ভিন্ন জাতির হলেও) কষ্ট দেয়া।

৭১.পাড়া প্রতিবেশীর বউ, কন্যাকে কু-নজরে দেখা।

৭২.মাল থাকা বা মাল উপার্জনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হয়ে সওয়াল করা।

৭৩. জনগণ চায় না তা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব দেয়া।

৭৪. কারণ ছাড়াই স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া।

৭৫. পরের দোষ দেখে বেড়ানো।

৭৬. কারও জান, মাল বা ইজ্জতের হানি করা।

৭৭. নিজের প্রশংসা করা।

৭৮. বিনা দলীলে কারও প্রতি বদগোমানী করা। (দেখুন ৬৩০ নং পৃষ্ঠা।)

৭৯. ইল্মে দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করে ইল্মে দ্বীন হাছিল না করা বা হাছিল করে আমল না করা।

৮০. এমন কথা যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি বা এমন কোনো কাজ যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি- সে সম্পর্কে এরূপ বলা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন।

৮১. হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা। তবে মৃত্যুর সময় হজ্জের ওছিয়াত বা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গেলে পাপমুক্ত হতে পারবে।

৮২. কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সাহাবীদের সমালোচনা করা।

৮৩. হযরত আলী (রা.)কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে শ্রেষ্ঠ বলা।
৮৪. কোনো নারীকে তার স্বামীর কাছে গমন ও স্বামীর হক আদায়ে বাধা দেয়া।
৮৫. কোনো অন্ধকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়া।
৮৬. পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা ও অশান্তি ছড়ানো, ফ্যাসাদ করা।
৮৭. কাউকে কোন পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা।
৮৮. কোন গোনাহে সগীরার উপর হটকারিতা করা।
৮৯. পেশাবের ছিটা থেকে সাবধান সতর্ক না থাকা।
৯০. কোন দান-সদকা করে বা হাদিয়া-উপঢৌকন দিয়ে খোঁটা দেয়া।
৯১. অনুগ্রহকারীর না-শুকরী করা।
৯২. কোনো মুসলমান ভাইকে ছুরি, চাকু, তলোয়ার ইত্যাদি লৌহ অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ভয় দেখানো।
৯৩. দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা খেলা। আরও কতিপয় খেলা রয়েছে যা হারাম ও কবীরা গোনাহ। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৪২–৬৪৩ নং পৃষ্ঠা।)
৯৪. বিনা জরুরতে লোকের সামনে সতর খোলা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৪৩ নং পৃষ্ঠা।)
৯৫. মেহমানের খাতির ও আদর-যত্ন না করা।
৯৬. হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা।
৯৭. স্বজন প্রীতি করা।
৯৮. অন্যায় বিচার করা।
৯৯. নিজে ইচ্ছা করে, দাবি করে পদপ্রার্থী হওয়া বা পদ গ্রহণ করা। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, তিনিই একমাত্র উক্ত পদের যোগ্য, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ না করলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থ নষ্ট হবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে পদ চাওয়া হলে তা ভিন্ন কথা।
১০০. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা।
১০১. নিজের বিবি-বাচ্চার খবর-বার্তা না নিয়ে তাদেরকে নষ্ট হয়ে যেতে দেয়া।
১০২. খতনা না করা মহাপাপ। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৪৫ নং পৃষ্ঠা।)
১০৩. অসৎ ও অন্যায় কাজ দেখে পারতপক্ষে তাতে বাধা না দেয়া। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৪৯ নং পৃষ্ঠা।)
১০৪. জালেমের প্রশংসা বা তোষামোদ করা।



১০৫. অন্যায়ের সমর্থন করা।
১০৬. আত্মহত্যা করা।
১০৭. স্বেচ্ছায় নিজের কোনো অঙ্গ নষ্ট করা।
১০৮. স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করা।
১০৯. প্রিয়জন বিয়োগে সিনা পিটিয়ে বা চিৎকার করে কাঁদা।
১১০. স্ত্রী পুরুষের নাভির নিচের পশম, বগলের পশম বর্ধিত করে রাখা।
১১১. উস্তাদ, পীর, হাফেজ, আলেম প্রমুখদের অমর্যাদা করা, তাদের সাথে বেয়াদবী করা।
১১২. প্রাণীর ছবি তৈরি করা বা ব্যবহার করা।
১১৩. শুকরের গোস্ত খাওয়া।
১১৪. কোনো হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা।
১১৫. ষাঢ়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াই দেয়া।
১১৬. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। (কোন রোগের কারণে হলে তা ভিন্ন কথা) কেউ কেউ বলেছেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ এমন হয়ে যাওয়া যে, দেখেও আর পড়তে পারে না।
১১৭. কোনো জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। তবে সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল ইত্যাদি কষ্টদায়ক জীব থেকে বাঁচার আর কোন উপায় না থাকলে ভিন্ন কথা।
১১৮. আল্লাহ্‌র রহ্‌মত থেকে নিরাশ হওয়া।
১১৯. আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নির্ভীক হওয়া।
১২০. মৃত প্রাণী খাওয়া।
১২১. হালাল জীবকে আল্লাহ্‌র নামে জবাই না করে অন্য কারও নামে জবাই করে বা অন্য কোনো উপায়ে মেরে খাওয়া।
১২২. অপব্যয় করা। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৪ নং পৃষ্ঠা)
১২৩. বখীলী বা কৃপণতা করা। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬২৫ নং পৃষ্ঠা।)
১২৪. রাজকীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন সমর্থন না করে অনৈসলামিক আইন সমর্থন করা।
১২৫. ইসলামী আইন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা।
১২৬. ছোট জাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, কুমার, কামার,

বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা খোঁটা দেয়া।

১২৭. বিনা এজাযতে কারও বাড়ির ভেতরে বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা কিংবা তাকানো। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫১০-৫১১ নং পৃষ্ঠা।)

১২৮. লুকিয়ে কারও কথা শোনা।

১২৯. ছুরত শেকেলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোনো মুসলমানকে টিট্‌কারি দেয়া বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

১৩০. উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে কাফের বলা।

১৩১. কোনো মুসলমানের সঙ্গে উপহাস করা।

১৩২. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা।

১৩৩. কোন খাদ্যকে মন্দ বলা। (তবে রান্নার ত্রুটি বর্ণনা করা হলে তা খাদ্যকে মন্দ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।)

১৩৪. দুনিয়ার মহব্বত। অর্থাৎ, দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া।

১৩৫. দাড়িবিহীন বালকের প্রতি খাহেশাতের নজরে তাকানো।

১৩৬. গায়রে মাহ্‌রাম স্ত্রী লোকের নিকট একা একা বসা।

১৩৭. কাফেরদের রীতিনীতি পছন্দ করা।

(ماخوذ از فروع الایمان، تعلیم الدین، گناہ بے لذت نقلا عن انذار العشائر من الصغائر والکبائر وغیرہا)

## সগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার তালিকা

নিম্নে সগীরা বা ছোট গোনাহের একটা মোটামুটি তালিকা পেশ করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, এই তালিকার মধ্যকার অনেক গোনাহকে অনেকে কবীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আবার পূর্বে উল্লেখিত কবীরা গোনাহের তালিকায় উল্লেখিত কোন কোন গোনাহকে সগীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। আসলে একটা গোনাহকে তার চেয়ে বড় গোনাহের তুলনায় ছোট বলা যায়, আবার তার চেয়ে ছোট গোনাহের তুলনায় তাকে বড় গোনাহও বলা যায়। আবার এক হিসাবে কোন গোনাহই ছোট নয়, কেননা সেটাও তো আল্লাহরই নাফরমানী। যেমন: ছোট সাপও ধ্বংসকারী, বড় সাপও জীবন ধ্বংসকারী– এরূপ বিচারে কোনো সাপই ছোট অর্থাৎ, অবহেলার নয়। অতএব এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পাপকেই তুচ্ছ বা ছোট মনে করতে নেই। আর সগীরা বা ছোট গোনাহের উপর হটকারিতা করলে তা কবীরা গোনাহ হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক স্বাভাবিক-ভাবে যেগুলোকে সগীরা গোনাহ বলা হয় তার একটা মোটামুটি তালিকা নিম্নরূপ।



১. কোনো মানুষ বা প্রাণীকে লা'নত (অভিশাপ) দেয়া।

২. না জেনে কোন পক্ষে ঝগড়া করা কিংবা জানার পর অন্যায় পক্ষে ঝগড়া করা।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হাসা বা কোন বিপদের কারণে নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা।

৪. ফাসেক লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করা।

৫. মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া।

৬. মসজিদে নাপাক প্রবেশ করানো।

৭. মসজিদে পাগল বা এমন ছোট শিশুকে নিয়ে যাওয়া, যার দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

৮. পেশাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা।

৯. উলঙ্গ হয়ে গোসল করা, যদিও আটকা স্থানে এবং লোকদের অগোচরে গোসল করা হোক।

১০. কোনো স্ত্রীর সঙ্গে যিহার করলে কাফফারা আদায় করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা।

উল্লেখ্য, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত (অর্থাৎ, মাতার পিঠের মত হারাম) এরূপ বলাকে "যিহার" বলা হয়। ইসলাম পূর্বকালে স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করার এটা একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। এরূপ বললে কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রী হালাল হবে না।

১১. সওমে বেসাল করা অর্থাৎ, এমনভাবে কয়েক দিন রোযা রাখা যে, মধ্যে ইফতারীও করবে না।

১২. মাহ্‌রাম পুরুষ ব্যতীত নারীর জন্য সফর করা।

১৩. কেউ ক্রয়ের জন্য কথা-বার্তা বলছে বা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এখনও উত্তর মেলেনি এরই মধ্যে অন্য কারও দর বলা বা প্রস্তাব দেয়া।

১৪. বার থেকে শহরে যে মাল আসছে সেটা শহরের বাইরে গিয়ে ক্রয় করা। (এভাবে মধ্যস্বত্ব ভোগীর কারণে শহরে এসে মালের দাম বৃদ্ধি পায়)

১৫. জুমুআর (প্রথম) আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ করা। অবশ্য জুমুআর দিকে চলন্ত অবস্থায় বেচা-কেনা করলে তাতে পাপ হবে না, কারণ অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় জুমুআর

নামাযের জন্য ব্যাঘাত ঘটায় না।

১৬. শখ করে কুকুর লালন-পালন করা। মালামাল ও ফসল সংরক্ষণের জন্য কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা জায়েয।

১৭. অতি নগন্য বস্তু চুরি করা।

১৮. দাঁড়িয়ে পেশাব করা।

১৯. গোসলখানায় কিংবা পানির ঘাটে পেশাব করা।

২০. নামাযে সাদল (سدل) করা অর্থাৎ, অস্বাভাবিকভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা।

২১. গোসল ফরয– এরূপ অবস্থায় আযান দেয়া।

২২. গোসল ফরয– এরূপ অবস্থায় বিনা ওজরে মসজিদে প্রবেশ করা।

২৩. গোসল ফরয– এরূপ অবস্থায় মসজিদে বসা।

২৪. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

২৫. নামাযে লম্বা চাদর এমনভাবে শরীরে জড়ানো যাতে হাত বের করা মুশকিল হয়।

২৬. নামাযে অযথা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা কাপড় ওলট-পালট করা।

২৭. নামাযীর সামনে তার দিকে তাকিয়ে বসা বা দাঁড়ানো।

২৮. নামাযে ডানে বামে অথবা উপরের দিকে তাকানো।

২৯. মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা।

৩০. ইবাদত নয়– এরূপ কোনো কাজ মসজিদে করা।

৩১. রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে নিরাভরণ হয়ে জড়াজড়ি করা।

৩২. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া। (যদি আরও আগে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে)।

৩৩. নিকৃষ্ট মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা।

৩৪. গলার পশ্চাদ্দিক থেকে প্রাণী জবেহ করা।

৩৫. পঁচা মাছ অথবা মরে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া।

৩৬. বিনা প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া।

৩৭. বালেগা বোধসম্পন্ন নারীর পক্ষে ওলীর এজাযত ব্যতীত বিয়ে বসা (যদি ওলী অহেতুক বিয়েতে বাধা দেয়ার না হয়)।

৩৮. "নেকাহে শেগার" করা। অর্থাৎ এমন বিয়ে যাতে মহরের টাকা-পয়সার পরিবর্তে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়।



৩৯. স্ত্রীকে একের অধিক তালাক দেয়া।

৪০. স্ত্রীকে বিনা প্রয়োজনে বায়েন তালাক দেয়া এবং (বরং রেজ্য়ী তালাক দেয়া উচিত।)

৪১. হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া। (খোলা তালাক দেয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিলে তাকে খোলা তালাক বলে।)

৪২. যে তুহরে (হায়েমুক্ত অবস্থায়) সহবাস হয়েছে তাতে তালাক দেয়া।

৪৩. তালাকে রেজ্য়ী প্রদত্ত স্ত্রীকে সহবাস ইত্যাদি দ্বারা রুজু করা। (বরং প্রথমে মৌখিকভাবে রুজু হওয়া চাই।)

৪৪. স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ঈলা করা। 'ঈলা' বলা হয় কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা ছাড়া অথবা চার মাস কিংবা তারও বেশি সময়ের জন্য স্ত্রী গমন না করার শপথ করাকে। এরূপ শপথ করার পর চার মাসের মধ্যে শপথ ভঙ্গ করলে অর্থাৎ, স্ত্রী গমন করলে শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা দিতে হবে এবং স্ত্রী বহাল থাকবে– তালাক হবে না। আর চার মাসের মধ্যে উক্ত স্ত্রীকে ব্যবহার না করলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

৪৫. সন্তানদেরকে কোনো মাল ইত্যাদি দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করা। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৭৩ নং পৃষ্ঠা।)

৪৬. বিচারক কর্তৃক বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানী ও তাদের প্রতি মনোযোগ প্রদানে সমতা রক্ষা না করা।

৪৭. কোনো যিম্মি কাফেরকে কাফের বলে সম্বোধন করা। (যদি সে এরূপ সম্বোধনে কষ্টবোধ করে।)

৪৮. বাদশার এনআম (পুরস্কার) কবূল না করা। (যদি তাতে অন্যায়ভাবে বাদশার ইজ্জতহানি হয়। হাঁ যদি বাদশা তার কোন অন্যায় উদ্দেশ্যের পক্ষে নেয়ার জন্য কাউকে কিছু পুরস্কার প্রদান করে, তাহলে সেরূপ পুরস্কার গ্রহণ না করা উচিত, তা গ্রহণ করা গোনাহ।)

৪৯. যার হালাল সম্পদের পরিমাণ কম, হারামের পরিমাণ বেশি, বিনা ওজরে তাহকীক-তদন্ত ছাড়া তার দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ করা।

৫০. কোনো প্রাণীর নাক কান প্রভৃতি কেটে দেয়া।

৫১. জবর দখলকৃত জমিতে প্রবেশ করা, এমনকি নামাযের জন্য হলেও।

৫২. কোনো মুরতাদ বা অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফেরকে তিন দিন পর্যন্ত তওবা

করত মুসলমান হওয়ার দাওয়াত প্রদান করার পূর্বে হত্যা করে দেয়া।

৫৩. নামাযে পাঠ করার জন্য কোনো বিশেষ সূরা নির্ধারিত করা। (তবে হাঁ, আছানীর জন্য যদি সেরূপ করা হয়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিংবা যদি সেই সূরা/কেরাত সুন্নাত কিংবা মোস্তাহাব হয় এবং সেটিই পড়তে হবে, অন্যটা পড়া ঠিক হবে না– এমন বিশ্বাস না থাকে, তাহলেও সব সময় সেটি পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।)

৫৪. নামাযে যে সাজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয় সেটাকে বিলম্বিত করা বা ছেড়ে দেয়া।

৫৫. বিনা প্রয়োজনে একাধিক মাইয়েতকে এক কবরে দাফন করা।

৫৬. জানাযার নামায মসজিদের ভিতরে পড়া।

৫৭. ডানে কিংবা বায়ে ফটো রেখে নামায পড়া বা ফটোর উপর সাজদা করা।

৫৮. স্বর্ণের তার দিয়ে দাঁত বাঁধাই করা।

৫৯. মৃত ব্যক্তির চেহারায় চুমু দেয়া।

৬০. ইসলাম বিরোধী কোন সম্প্রদায়ের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা।

৬১. বালেগদের জন্য নিষিদ্ধ– এমন কোনো পোশাক শিশুদেরকে পরিধান করানো।

৬২. স্ত্রীর সঙ্গে এমন কারও সামনে সংগম করা যে বোঝে এবং হুশ রাখে, যদিও সে ঘুমিয়ে থাকে। (খুব ছোট শিশুর বেলায় ভিন্ন কথা।)

৬৩. কোন আমীর বা শাসকের অভ্যর্থনায় বের হওয়া।

৬৪. রাস্তায় এমন স্থানে দাঁড়ানো বা বসা, যাতে অন্যদের চলতে অসুবিধা হয়।

৬৫. আযান শোনার পর ওজর বা জরুরি কাজ ব্যতীত ঘরে বসে বসে একামতের অপেক্ষা করতে থাকা।

৬৬. পেট ভরার পরও অতিরিক্ত খাওয়া। (রোযা বা মেহমানের কারণে কিছু বেশি খাওয়া হলে তা ব্যতিক্রম।)

৬৭. ক্ষুধা লাগা ছাড়াও খাওয়া। (রোগের অবস্থা ব্যতিক্রম।)

৬৮. খুতবার সময় কথা বলা (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২২২ নং পৃষ্ঠা।)

৬৯. মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে যাওয়া।

৭০. মানুষের চলার পথে নাপাকী ফেলা।

৭১. মসজিদের ছাদে নাপাকী ফেলা।

৭২. নিজের সাত বৎসরের চেয়ে অধিক বয়স্ক ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এক



বিছানায় শয়ন করা।

৭৩. অহেতুক কাজে ও কথায় সময় নষ্ট করা।

৭৪. কারও প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা। কারও সম্বন্ধে যতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রশংসা করা নিষেধ। করলে তা হবে প্রশংসায় অতিরঞ্জন।

৭৫. কথা বলতে গিয়ে ছন্দ মিলানোর কসরৎ করা।

৭৬. হাসি-ফুর্তিতে সীমালংঘন করা।

৭৭. কারও গুপ্ত কথা ফাঁস করা।

৭৮. সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবদের হক আদায়ে ত্রুটি করা।

৭৯. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবকে জুলুম থেকে বিরত না রাখা।

৮০. বিনা ওজরে হজ্জ বা যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা। কেউ কেউ এটাকে কবীরা গোনাহের তালিকাভুক্ত করেছেন।

(گناہ بے لذت থেকে গৃহীত।)

## মুসলমান হওয়ার বা মুসলমান বানানোর তরীকা

* কোন অমুসলমানকে মুসলমান হতে হলে বা তাকে মুসলমান বানাতে হলে তার গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব, যদি হদছে আকবার থেকে পাক হয়, অর্থাৎ গোছল ওয়াজিব অবস্থায় না থাকে।

* যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায়, সে কালিমায়ে তাইয়্যেবা কিংবা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। বোবা হলে ইশারায় তাওহীদ ও রেছালাতের স্বীকৃতি দিবে।

* কালিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর যে রেছালাত (রসূল হওয়া) সম্বন্ধে স্বীকৃতি রয়েছে তা জেনে বুঝে মেনে নিতে হবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে। কালিমার এই অর্থ ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি ব্যতিরেকে কেবল মুখে মুখে কালিমা উচ্চারণ করে নিলেই সে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন ও মুসলমান বলে গণ্য হবে না। (دین کیا ہے)

**কালিমায়ে তাইয়্যেবা এই–**

**لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.**

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই (অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদত ও বন্দেগী লাভের উপযুক্ত নয়।) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র (সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ) রসূল।

**কালিমায়ে শাহাদাত এই–**

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ (ইবাদাতের উপযুক্ত) নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল।

**কালিমায়ে তাওহীদ এই-**

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই তুমি এক- তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল, মুত্তাকীদের ইমাম (সরদার), সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত মহামানব বা রসূল।

**কালিমায়ে তামজীদ এই-**

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِيَ اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

অর্থ: (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ (ইবাদাতের উপযুক্ত) নেই, তুমি (হেদায়েতের) নূর। আল্লাহ নিজ নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, সব রসূলের সর্দার এবং সর্বশেষ নবী।

* কালেমায়ে তাইয়্যেবা, কালিমায়ে শাহাদাত, কালিমায়ে তাওহীদ, কালিমায়ে তামজীদ প্রভৃতি কালিমাসমূহ মুখস্থ করা জরুরি নয়, শুধু তার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। (خیر الفتاوی ১/□□)

* অতঃপর তাকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের জরুরি আকীদা ও আমলের বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

* যেকোনো মুসলমান অন্য যেকোনো অমুসলমানকে মুসলমান



বানাতে পারে। এর জন্য আলেম বা বুযুর্গ হওয়া শর্ত নয়।

**কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা (تکفیر করা)-এর নীতি**

১. যখন কেউ প্রকৃতই কাফের হয়ে যায়, তখন তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া মুফতীদের কর্তব্য, যাতে অন্য মুসলমান তার আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মুফতীদের কিছু লোকের এ কথার ভয় করা উচিত হবে না যে, মৌলভীরা শুধু ফতওয়াবাজী করে বেড়ায় বা নিজেদের মধ্যে কাদা ছুড়াছুড়ি করে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হক কথা বলা কাদা ছুড়াছুড়ি নয় বরং উম্মতকে হেফাজত করার জন্য এটা বলে দেয়াই জরুরি।

২. যদি কেউ প্রকৃতই কাফের না হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা মহাপাপ। এতে এরূপ ফতওয়া প্রদানকারী স্বয়ং নিজেই কাফের হয়ে যাবে। কাজেই কাফের ফতওয়া প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া সংগত নয়।

৩. কোনো মুসলমানের কোনো কথা বা কাজ কুফ্‌র কি না– এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যাবে না, এমন কি কুফ্‌রের দিকটার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও এমনকি সেটা কুফ্‌র হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফ্‌র না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও। তবে হ্যাঁ একটা কথা বা একটা কাজও যদি এমন পাওয়া যায় যা নিশ্চিতই কুফ্‌রী, তাহলে তার কারণে তাকে কাফের, আখ্যায়িত করা হবে। (جواہر الفقہ)

( جواہر الفقہ ও اسلام اور کفر থেকে গৃহীত)

বি. দ্র. কয়েকটা কুফ্‌রীর বিবরণ পূর্বে ৯৫–৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, কি কি কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায় সে সম্বন্ধে আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে "যেসব কারণে কেউ কাফের হয়ে যায়" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

**প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল**

# দ্বিতীয় অধ্যায়: ইবাদত

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।
(সূরা যারিয়াত: ৫৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# ইবাদাত



**কয়েকটা পরিভাষার ব্যাখ্যা**

* **ফরয:** যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতরূপে করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে, তাকে ফরয বলে। যেমন: কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জেহাদ, ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি।

ফরয দুই প্রকার। যথা:- (এক) **'ফরযে আইন'**- যে কাজ প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান নর-নারীর উপর সমানভাবে ফরয। যেমন: পাঁচ ওয়াক্তের নামায, আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি। (দুই) **'ফরযে কেফায়া'**- যে কাজ কতক লোকে পালন করলে সকলেই গোনাহ থেকে বেঁচে যায়; কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলেই ফরয তরকের জন্য পাপী হয়ে যায়। যেমন: জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা, আবশ্যক পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি।

* **ওয়াজিব:** ওয়াজিব কাজ ফরযের ন্যায় অবশ্য করণীয়। তবে



পার্থক্য এতটুকু যে, কেউ ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না, তবে ফাসেক হয়ে যায়। যেমন: বেতরের নামায পড়া, কুরবানী করা, ফেতরা দেয়া ইত্যাদি।

* **সুন্নাত:** যে কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ করেছেন তাকে সুন্নাত বলে।

সুন্নাত দুই প্রকার। যথা: (এক) **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**- যে কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ সব সময় করেছেন, বিনা ওজরে কখনও ছাড়েননি। যেমন: আযান, ইকামত, খতনা, বিয়ে ইত্যাদি। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবেরই মত গুরুত্বপূর্ণ, বিনা ওজরে তা ছাড়লে বা ছাড়ার অভ্যাস করলে পাপী হতে হয়। তবে ওজরবশত কখনও ছুটে গেলে কাযা করতে হয় না। (দুই) **'সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা'**- যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ করেছেন তবে ওজর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করেছেন। সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা'কে **'সুন্নাতে যায়েদা'**'-ও বলে। এটা করলে ছওয়াব আছে, না করলে আযাব হবে না।

* **মুস্তাহ্ছান:** যাকে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে পূর্ববর্তী পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ভাল মনে করেছেন।

* **মোস্তাহাব:** যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ করেছেন, তবে সব সময় করেননি- কোন কোন সময় করেছেন। এটা করলে ছওয়াব আছে না করলে পাপ নেই। মোস্তাহাবকে **'নফল'** এবং **'মানদূব'**ও বলা হয়।

* **হালাল:** শরীআতের দৃষ্টিতে যেসব বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়। জায়েয ও হালাল সমার্থবোধক।

* **হারাম:** হারাম হল ফরযের বিপরীত অর্থাৎ, যা নিষিদ্ধ হওয়াটা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। হারামকে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যায় আর বিনা ওজরে হারাম কাজ করলে কাফের হয় না তবে ফাসেক হয়ে যায়। হারাম কাজ বর্জন করা ফরয। **'না জায়েয'** ও **'হারাম'** সমার্থবোধক।

* **মাকরূহ তাহ্‌রীমী:** ওয়াজিবের বিপরীত, যা কেউ অস্বীকার করলে কাফের হয় না তবে ফাসেক হয়ে যায়। বিনা ওজরে মাকরূহ তাহ্‌রীমী করাও ফাসেকী।

* **মাকরূহ তানযীহী:** যা না করলে ছওয়াব আছে করলে আযাব নেই।

* **মোবাহ:** যা মানুষের ইচ্ছাধীন, যে ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে করা বা

না করার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন। যেমন: মাছ মাংস খাওয়া, পানাহার করা, কৃষিকর্ম করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, দেশভ্রমণ করা ইত্যাদি। তবে মোবাহ কাজের সংগে যদি ভাল নিয়ত সংযুক্ত হয়, তাহলে তা ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। যেমনঃ পানাহার করল এই নিয়তে যে, এতে শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তাহলে ইবাদত, ইসলামের খেদমত, জেহাদ ইত্যাদি ভালভাবে করা যাবে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মোবাহ কাজের সঙ্গে খারাপ নিয়ত যুক্ত হলে তা পাপের হয়ে যায়; যেমন কোথাও ভ্রমণে গেল বেগানা নারী দর্শনের উদ্দেশ্যে বা নাজায়েয কিছু দেখা ও করার জন্য তাহলে গোনাহ হবে।

## নাপাকীর বর্ণনা

* যে সমস্ত নাপাকী চক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং যা থেকে শরীর, কাপড় ও খাদ্যবস্তু পাক রাখা উচিত তা দুই ধরনের। যথা: (১) নাজাছাতে গলীজা (যে নাপাকীর হুকুম শক্ত।) (২) নাজাছাতে খফীফা (যার হুকুম কিছুটা হালকা।)

* মানুষের মল-মূত্র, মানুষ ও প্রাণীর রক্ত, বীর্য, মদ, সব ধরনের পশুর পায়খানা, সব ধরনের হারাম পশুর পেশাব এবং পাখির মধ্যে শুধু হাঁস ও মুরগির বিষ্টা নাজাছাতে গলীজা বা শক্ত নাপাকী।

* গরু, মহিষ, বকরী ইত্যাদি সকল হালাল পশুর পেশাব, কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি সকল হারাম পাখির বিষ্ঠা এবং ঘোড়ার পেশাব নাজাছাতে খফীফা।

* হাঁস, মুরগি ও পানকৌড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পাখির বিষ্ঠা (যেমনঃ কবুতর, চড়ুই, শালিক ইত্যাদির বিষ্ঠা।) এবং বাদুর ও চামচিকার পেশাব পায়খানা পাক। এমনিভাবে মশা, মাছি, ছারপোকা এবং মাছের রক্তও পাক।

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো তরল, যেমনঃ রক্ত পেশাব ইত্যাদি, তা এক দেরহাম (গোলকৃতভাবে একটা কাঁচা টাকা অর্থাৎ, হাতের তালুর নিচ স্থান পরিমাণের সমান।) পর্যন্ত শরীর বা কাপড়ে লাগলে মাফ আছে অর্থাৎ, তা না ধুয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, তবে বিনা ওজরে স্বেচ্ছায় এরূপ করা মাকরূহ। আর এক দেরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে তা মাফ নয় অর্থাৎ, তা পাক না করে নামায পড়া জায়েয নয়।

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো গাঢ় যেমনঃ গোবর, পায়খানা



ইত্যাদি তা এক সিকি পরিমাণ পর্যন্ত (অর্থাৎ, ৪.৮৬ গ্রাম পর্যন্ত) কাপড় বা শরীরে লাগলে মাফ, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ লাগলে মাফ নয়। মাফ–এর অর্থ পূর্বে বয়ান করা হয়েছে।

* নাজাছাতে খফীফা শরীর বা কাপড়ে লাগলে যে অঙ্গে লেগেছে তার চার ভাগের এক ভাগের কম হলে মাফ, আর পূর্ণ চার ভাগের এক ভাগ বা আরও বেশি হলে মাফ নয়। জামার হাতা, কলি, কাপড়ের আঁচল, পায়জামার দুই পায়ের প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ (অংশ) বলে গণ্য হবে।

* নাজাছাত কম হোক বা বেশি হোক পানিতে পড়লে সেই পানি নাজাছাত বা নাপাক হয়ে যাবে– নাজাছাতে গলীজা পড়লে পানিও নাজাছাতে গলীজা হয়ে যাবে এবং নাজাছাতে খফীফা পড়লে নাজাছাতে খফীফা হবে। তবে প্রবাহিত পানিতে বা ১০০ বর্গহাত কিংবা তার চেয়ে বড় কোন কূয়া হাউজ ইত্যাদিতে নাপাকী পড়লে তা নাপাক হবে না। তবে নাপাকী পড়ার কারণে তার রং স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে গেলে নাপাক হয়ে যাবে। যে পানি দ্বারা কোনো নাপাক জিনিস ধৌত করা হয়, সে পানি নাপাক হয়ে যায়।

* মৃতকে যে পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয় সে পানিও নাপাক।

* রাস্তা-ঘাটে বা বাজারে যে পানি বা কাদার ছিটা কাপড়ে কিংবা শরীরে লাগে তাতে স্পষ্টত কোন নাপাক জিনিস দেখা গেলে তা নাপাক আর স্পষ্টত কোনো নাপাক জিনিস দেখা না গেলে নাপাক নয়। এটাই ফতওয়া; তবে মুত্তাকী লোকদের জন্য –যাদের হাঁটে-বাজারে যাওয়ার অভ্যাস নয়, যারা সাধারণত খুব পাক ছাফ থাকেন– তাদের শরীরে বা কাপড়ে এই পানি কাদা লাগলে তাতে কোনো নাপাক জিনিস দেখা না গেলেও ধুয়ে নেয়া উচিৎ।

* পেশাবের অতি ক্ষুদ্র ফোটা যা চোখে দেখা যায় না, তার কারণে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হয় না। অনর্থক সন্দেহের কারণে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

* গাভী, বকরী দহন করার সময় যদি দুই একটি লেদা বা সামান্য গোবর দুধের মধ্যে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বের করে ফেলা হয় তাহলে তা মাফ। কিন্তু যদি লেদা বা গোবর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ দুধ নাপাক হয়ে যাবে, তা খাওয়া জায়েয হবে না।

* উৎপন্ন ফসল মাড়াই করার সময় গরু অথবা অন্য কোন পশু তার

উপর পেশাব করলে তা নাপাক হবে না। তবে মাড়াবার সময় ব্যতীত অন্য সময় পেশাব করলে নাপাক হয়ে যাবে।

* কুকুর, শুকর, বানর এবং বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর ঝুটা নাপাক। (খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে মুখ লাগিয়ে ত্যাগ করলে তাকে ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট বলা হয়।)।

* বিড়ালের ঝুটা পাক, তবে মাকরূহ। বিড়াল কোন পানিতে মুখ দিয়ে থাকলে তা দ্বারা উযূ করবে না। অবশ্য যদি অন্য পানি না পাওয়া যায় তবে ঐ পানি দ্বারাই উযূ করবে। আর দুধ বা তরকারী ইত্যাদি খাদ্য-খাবারের মধ্যে মুখ দিয়ে থাকলে যদি মালিক অবস্থাপন্ন হয় তাহলে তা খাবে না– খাওয়া মাকরূহ হবে। যদি গরীব হয় তবে তার জন্য তা খাওয়া মাকরূহ নয়। তবে বিড়াল যদি সদ্য ইঁদুর ধরে এসে তৎক্ষণাৎ কোন পানি বা খাদ্য-খাবারে মুখ দেয় তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি কিছুক্ষণ দেরি করে নিজের মুখ চেটে চুষে পরিষ্কার করে তারপর মুখ দেয় তখন নাপাক হবে না– এখন পূর্বের মাসআলার ন্যায় মাকরূহ হবে।

* যেসব প্রাণী ঘরে থাকে যেমনঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, তেলাপোকা, টিকটিকি এবং মুরগি –যে গুলো সর্বত্র ছাড়া থাকে– এদের ঝুটা মাকরূহ তানযীহী। ইঁদুর যদি রুটির কিছু অংশ খেয়ে থাকে সেদিক দিয়ে কিছুটা ছিড়ে ফেলে অবশিষ্ট অংশ খাবে।

* হালাল পশু ও হালাল পাখীর ঝুটা পাক। ঘোড়ার ঝুটাও পাক। যে কোনো রকম পোশা পাখি যদি মরা না খায় এবং তার ঠোটে কোনো রকম নাপাকী থাকার সন্দেহ না থাকে তবে তাদের ঝুটাও পাক।

* হালাল পশু ও হালাল জানোয়ারের ঝুটা পাক। তাদের ঘামও পাক। যাদের ঝুটা মাকরূহ তাদের ঘামও মাকরূহ।

* মুসলমান অমুসলমান সব লোকের ঝুটা পাক, তবে কোন নাপাক বস্তু তার মুখে থাকা অবস্থায় পানি উচ্ছিষ্ট করলে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে।

* জানা অবস্থায় বে-গানা পুরুষের ঝুটা খাদ্য ও পানি নারীর জন্য খাওয়া মাকরূহ। অনুরূপ বে-গানা নারীর ঝুটাও পুরুষের জন্য মাকরূহ। অবশ্য না জানা অবস্থায় খেয়ে ফেললে মাকরূহ হবে না।

## শরীর ও কাপড় পাক করার নিয়ম

* গাঢ় নাজাছাত (যা দেখা যায় যেমনঃ পায়খানা, রক্ত) শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হল নাজাছাতকে এমনভাবে ধৌত করবে যেন দাগ না থাকে। একবার বা দুইবার ধোয়ায় দাগ চলে গেলেও



পাক হয়ে যাবে তবে তিনবার ধোয়া মোস্তাহাব। তিনবার ধোয়া সত্ত্বেও এবং নাজাছাত চলে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি কিছু দাগ বা দুর্গন্ধ থেকে যায় তাতে কোন দোষ নেই, সাবান প্রভৃতি লাগিয়ে দাগ বা দুর্গন্ধ দূর করা ওয়াজিব নয়।

* পানির মত তরল নাজাছাত শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হল তিনবার ধৌত করা এবং প্রত্যেক বার কাপড় ভাল করে নিংড়ানো। তৃতীয়বার খুব জোরে নিংড়াতে হবে। ভালমত না নিংড়ালে কাপড় পাক হবে না।

* কাপড় বা শরীরে গাঢ় কিংবা তরল নাজাছাত লাগলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে পাক করা যায় না। পানির দ্বারা ধুয়ে যেরূপ পাক করা যায় তদ্রূপ পানির ন্যায় তরল এবং পাক (যেমনঃ গোলাপ জল, রস, সিরকা প্রভৃতি) জিনিস দ্বারাও ধুয়ে পাক করা যায়। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তা দ্বারা ধুলে পাক হবে না; যেমনঃ দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

* ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া হলে মেশিন যেহেতু নিয়ম মত কাপড় নিংড়াতে পারে না এবং নাপাক কাপড়ের সঙ্গে থাকা পাক কাপড় একত্রে ভিজানোর কারণে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যায়, তাই ধোয়ার পূর্বে বা পরে নাপাক কাপড়গুলোকে পৃথকভাবে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। তা না করলে যদি মেশিনেই তিনবার নিয়মমত পানি ঢেলে নিংড়িয়ে নেয়, তবুও চলবে।

* ধোপারা সাধারণত অনেক কাপড় একসঙ্গে ভিজিয়ে রাখে। এর মধ্যে কোনো কাপড় নাপাক থাকলে পাক কাপড়গুলোও নাপাক হয়ে যাবে, তখন সবগুলোকে নিয়মমত ধুয়ে পাক করা প্রয়োজন। ধোপারা সেরূপ করে কি না তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তাই লন্ড্রির মাধ্যমে কাপড় ধোলাই করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে একান্তই কেউ পাক কাপড় দিলে তা নাপাক হয়েছে ধরা হবে না। পক্ষান্তরে নাপাক কাপড় দিলে তা পাকও ধরা হবে না। ড্রাই ওয়াশ–এর হুকুমও অনুরূপ। (২/□□ احسن الفتاوی)

* দুই পাল্লা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা বা তুলা ভরা কাপড়ের এক দিক যদি নাপাক এবং অন্য পাল্লা বা অন্য দিক পাক হয় এমতাবস্থায় উভয় পাল্লা যদি একত্রে সেলাই করা হয় তাহলে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে না। সেলাই করা না হলে নাপাক পাল্লা নিচে রেখে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে; তবে শর্ত এই যে, পাক পাল্লা এত মোটা

হওয়া চাই যাতে পাক পাল্লার উপর থেকে নাপাকীর রং দেখা না যায় এবং গন্ধও টের না পাওয়া যায়।

* বিছানার এক কোণ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হলে পাক অংশে নামায পড়া দুরস্ত আছে।

* না ধুয়ে কাফেরদের কাপড়ে বা বিছানায় নামায পড়া মাকরূহ।

* তুলার গদি, তোষক অথবা লেপে যদি মল মূত্র বা অন্য কোন প্রকার নাজাছাত লাগে তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। যদি নিংড়ানো কঠিন হয় তাহলে ভাল করে তিনবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। প্রতিবার পানি প্রবাহিত করার পর এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়, তারপর আবার পানি প্রবাহিত করবে, এভাবে তিনবার করলেই পাক হয়ে যাবে– তুলা ইত্যাদি বের করে ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

## আসবাব/দ্রব্য পাক করার নিয়ম

* যদি এমন জিনিসে নাজাছাত (নাপাকী) লাগে যা নিংড়ানো যায় না (যেমন: থালা-বাসন, কলস, খাট, মাদুর, জুতো ইত্যাদি) তাহলে তা পাক করার নিয়ম হল– একবার তা ধুয়ে এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায় এবং পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর অনুরূপ আর একবার করবে, এভাবে তিনবার ধৌত করলে ঐ জিনিস পাক হয়ে যাবে।

* জুতো বা চামড়ার মোজায় গাঢ় বীর্য, রক্ত, পায়খানা, গোবর ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগলে তা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষে বা শুকনো হলে নখ বা ছুরি/চাকু দিয়ে খুঁটে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত না থাকে তাহলেও তা পাক হয়ে যাবে– না ধৌত করলেও চলবে। কিন্তু পেশাবের ন্যায় তরল নাজাছাত লাগলে পূর্বোক্ত নিয়মে ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

* আয়না, ছুরি, চাকু সোনা রূপার অলংকার, থালা-বাসন, বদনা, কলস ইত্যাদি নাপাক হলে ভালমত ঘষে বা মাটি দ্বারা মেজে ফেললেও পাক হয়ে যায়। কিন্তু এই জাতীয় জিনিস নকশাদার হলে উপরোক্ত নিয়মে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হবে না।

* নাপাক ছুরি, চাকু বা হাড়ি-পাতিল জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে পোড়ালেও পাক হয়ে যায়।

* কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। তিনবার ধৌত



করলেও তা পাক হয়ে যায়, কিন্তু সাত বার ধৌত করা উত্তম। আর একবার মাটি দ্বারা মেজে ফেললে আরও বেশি উত্তম।

## জমিন পাক করার নিয়ম

* জমিন/মাটিতে কোনো নাজাছাত লাগলে তিন বার পানি প্রবাহিত করে দিলে তা পাক হয়ে যাবে।

* জমিন/মাটির উপর কোন নাজাছাত লেগে যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, নাজাছাতের কোনো চিহ্ন না থাকে তবুও তা পাক হয়ে যায়– তার উপর নামায পড়া দুরস্ত আছে; তবে ঐ মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করা দুরস্ত নয়।

* ইট, সিমেন্ট বা পাথর প্রভৃতি দ্বারা পাকা স্থানও জমিনের হুকুমে, তবে শুধু খালি ইট বিছানো থাকলে তা পূর্বের নিয়মে ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

* জমিনের সঙ্গে যে ঘাস লাগা আছে তাও জমিনেরই মত অর্থাৎ, শুধু শুকালে এবং নাজাছাতের চিহ্ন চলে গেলে পাক হয়ে যাবে এবং তার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে। কিন্তু কাটা ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

* গোবর দ্বারা লেপা জমিনের উপর পাক বিছানা না বিছিয়ে নামায পড়া দুরস্ত নয়।

## খাদ্য-দ্রব্য পাক করার নিয়ম

মধু, চিনি, মিছরি, শিরা, তেল, ঘি, ডালডা ইত্যাদি নাপাক হলে তা পাক করার দুইটি নিয়ম। যথা:

১. যে পরিমাণ তেল, শিরা ইত্যাদি, সেই পরিমাণ পানি তাতে মিশ্রিত করে আগুনে জ্বাল দিবে। যখন সমস্ত পানি উড়ে যাবে তখন আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রিত করে জ্বাল দিবে, এভাবে তিনবার করলে পাক হয়ে যাবে।

২. তেল ঘি ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে তাতে নাড়াচাড়া দিলে তেলটুকু উপরে উঠে আসবে; তারপর আস্তে আস্তে কোন উপায়ে উপর থেকে তেলটুকু তুলে নিয়ে আবার সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে আবার অনুরূপভাবে তেলটুকু তুলে নিবে। এভাবে তিনবার করলে পাক হয়ে যাবে। যদি ঘি, ডালডা, তেল জমাট হয় তাহলে তাতে পানি মিশ্রিত করে রৌদ্র বা আগুনের আঁচের উপর রাখবে। এভাবে গলে তেল ঘি ইত্যাদি উপরে ভেসে উঠলে তারপর উপরোক্ত নিয়মে তিনবার পানি

দিয়ে তা তুলে নিলে পাক হয়ে যাবে।

* দুধ বা তরকারী ইত্যাদি তরল জিনিসে বিড়াল মুখ দিলে তার মাসআলা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

* যেসব প্রাণীর ঝুটা হারাম বা মাকরূহ, তারা যদি রুটি পাউরুটি ভাত ইত্যাদি শক্ত খাবারে মুখ দেয় বা খায়, তাহলে মুখ দেয়ার স্থান থেকে কিছুটা ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া যায়।

## হাউজ বা ট্যাংক পাক করার নিয়ম

* হাউজ বা ট্যাংক যদি ১০০ বর্গ হাত বা তার চেয়ে বড় হয় তাহলে তাতে কোন নাপাকী পড়লে বা কোন প্রাণী তাতে মারা গেলে তার পানি নাপাক হয় না। আর ১০০ বর্গ হাতের চেয়ে ছোট হলে নাপাক হয়ে যায়। অবশ্য মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি জলজ প্রাণী মরলে তাতে পানি নাপাক হয় না। তবে এসব প্রাণীও যদি মরে পঁচে গলে যায়, তাহলে তার পানি পান করা বা এ দ্বারা খাদ্য পাকানো দুরস্ত নয়, যদিও উযূ গোসল করা দুরস্ত আছে।

* সাধারণত হাউজ বা ট্যাংক দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা:

(১) আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক, যাতে সরকারী পানির লাইনের মাধ্যমে পানি এসে ভরে। (২) ছাদে বা উপরে স্থাপিত ও নির্মিত ট্যাংক, যার থেকে সব কামরায় উযূ গোসল ইত্যাদির জন্য পানি পৌঁছানো হয়। এই উভয় ধরনের হাউজ বা ট্যাংকে এক দিকের পাইপ থেকে পানি আসছে অন্য দিকের পাইপ থেকে সরছে– এমতাবস্থায় তাতে যদি কোনো নাপাক পড়ে তাহলে অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে সে ট্যাংকে পানি নাপাক হবে না, কারণ সেটা প্রবাহমান পানির পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য যদি উক্ত পানিতে নাপাকির রং, গন্ধ বা স্বাদ পাওয়া যায় তাহলে যতটুকু পানিতে রং, গন্ধ বা স্বাদ পাওয়া যাবে ততটুকু পানি নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি নাপাক বস্তুটা পানি উভয় দিক থেকে প্রবাহকালে পতিত হয়ে কোন এক দিকের পাইপের পানি বন্ধ হওয়ার পরও তাতে পড়ে থাকে তাহলেও তখন পানি নাপাক হয়ে যাবে।

আর যদি কোন এক দিকের লাইনের পানি বন্ধ থাকা অবস্থায় নাপাকী পতিত হয় তাহলে অধিকাংশ ফকীহের মতে হাউজ/ট্যাংক নাপাক হয়ে যাবে। অতঃপর তা পাক করার দুইটি নিয়ম। যথা:

১. যদি হাউজ থেকে ফেলে দেয়ার মত কোন নাপাক বস্তু হয় তাহলে



তা ফেলে দেয়ার পর হাউজের এক দিকের পাইপ থেকে পানি প্রবেশ করানো শুরু হবে এবং অন্যদিকের পাইপ থেকে পানি বের করা শুরু হবে। এরূপ করা শুরু করলেই সাথে সাথে হাউজ/ট্যাংক ও পানি সব পাক হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ পানি বা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করা শর্ত নয়।

২. নিচের ট্যাংক (আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক) হলে সরকারী পাইপ থেকে পানি আসতে আসতে সেটি ভরে গিয়ে যখন মুখ থেকে পানি উপচে পড়া শুরু হবে তখন তা পাক হয়ে যাবে। আর উপরের ট্যাংক হলে তা থেকে গোসলখানা ইত্যাদিতে যাওয়ার সব লাইন বন্ধ করে দিবে এবং তারপর মেশিনের সাহায্যে তাতে পানি ভরা (তোলা) শুরু করবে। যখন উপরের পাইপ বা মুখ থেকে পানি উপচে পড়া শুরু হবে তখন উপরের ট্যাংক এবং তার সাথে সংযুক্ত সব পাইপ পাক হয়ে যাবে। তবে কোন কোন ফকীহের মতে তিনবার আবার কারও মতে একবার নাপাক ট্যাংক পানিতে ভরে রেখে পানি ফেলে দেয়া আবশ্যক। এই মতভেদের প্রেক্ষিতে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় হাউজে যে পরিমাণ পানি ছিল সেই পানি হাউজ থেকে বের করার পর হাউজটি পাক হয়েছে বলে মনে করা উত্তম।

(آلات جدیدہ کے شرعی احکام اور احسن الفتاوی ج/۲ থেকে গৃহীত।)

## নলকূপ পাক করার নিয়ম

* যদি নলকূপে নাপাক কাপড় ইত্যাদি এমন বস্তু পতিত হয় যা বের করা সম্ভব, তাহলে তা বের করার পর নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় নলকূপে যে পরিমাণ পনি ছিল তা বের করে ফেললে নলকূপ পাক হয়ে যাবে। পেশাব ইত্যাদি তরল নাপাকী পড়লেও এই পরিমাণ পানি বের করলে নলকূপ পাক হয়ে যাবে।

* যদি নলকূপে পায়খানা গোবর ইত্যাদি স্থূল নাপাক বস্তু পতিত হয়, তাহলে নাপাক বস্তুটা মাটিতে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে হবে। অতঃপর পূর্বের নিয়মে পানি বের করে নলকূপটা পাক করতে হবে।

(آلات جدیدہ کے شرعی احکام থেকে গৃহীত।)

## ইস্তেনজার (পেশাব/পায়খানার) সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ

* ইস্তেনজাখানায় প্রবেশের পূর্বে মাথা ঢেকে নেয়া মোস্তাহাব।

* টুপি বা কোন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকার সময় বিসমিল্লাহ বলে নিবে।

* জুতো/স্যান্ডেল পরিধান পূর্বক ইস্তেনজা করা।

* জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করার সময় বিসমিল্লাহ বলে নিবে।

* প্রথমে ডান পায়ের জুতো/স্যান্ডেল পরবে।

* নামাযের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়ে ইস্তেনজা করা উত্তম। অন্যথায় নাপাকী থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। (حاشية الطحطاوي)

* বিসমিল্লাহসহ ইস্তেনজাখানায় প্রবেশের দুআ পড়া। খোলা স্থান হলে কাপড় উঁচু করার সময় দুআ পড়তে হয়। আর মনে না থাকলে প্রবেশের পর বা কাপড় উঠানোর পর মনে মনে দুআ পড়া যায়, মুখে উচ্চারণ করে নয়। আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূলের নাম, ফেরেশ্‌তার নাম বা কুরআনের কিছু লিখিত বস্তু নিয়ে এস্তেনজায় যাওয়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে এগুলো উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।

* বিসমিল্লাহসহ ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশের দুআটি এই–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! দুষ্ট পুরুষ জিন এবং দুষ্ট মহিলা জিনদের অত্যাচার থেকে তোমার পানাহ চাই।

* প্রথমে বাম পা দিয়ে এস্তেনজাখানায় প্রবেশ করা।

* বসার সময় পা দানিতে প্রথমে ডান পা রাখবে এবং নামার সময় প্রথম বাম পা নামাবে। (তোহ্‌ফায়ে আবরার)

* প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর না খোলা। (এর সহজ উপায় হল বসতে বসতে কাপড় উঠানো। দাঁড়ানো অবস্থাতেই সতর খোলা নিষিদ্ধ।)

* বসে ইস্তেনজা করা।

* বাম পায়ে ভর করে বসাই আদব। (نور الإيضاح)

* উভয় পায়ের মাঝে বেশ ফাঁক রেখে বসা আদব। (حاشية الطحطاوي)

* কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে না বসা। এমনিভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে, বায়ূর বিপরীতে, চলার পথে, কবরস্থানে, ছায়াদার বা ফলদার গাছের নিচে, প্রবাহিত নদী-নালায়, বদ্ধ পানিতে বা মানুষ বসতে পারে এমন ঘাসের উপর ইস্তেনজা না করা।

* নজরকে সংযত রাখা অর্থাৎ, যৌনাঙ্গের দিকে, মল-মূত্রের দিকে, এমনিভাবে আকাশের দিকে নজর না দেয়া এবং এদিক সেদিক বেশি না তাকানো।



* মল-মূত্রের উপর থুথু, কফ, শিকনি না ফেলা। (شرعة الإسلام)

* ডান হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ না করা।

* ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।

* বাম হাত দিয়ে ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করবে।

* পায়খানার পর তিন বার ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

* পেশাবের পর ঢিলা/কুলুখ নিয়ে হাঁটা-চলা করে, কিংবা কাশি দিয়ে বা নড়াচড়া করে, কিংবা অভ্যাস অনুযায়ী যেকোনোভাবে পেশাবের কতরা বন্ধ হয়েছে– এরূপ নিশ্চিত হতে হবে। মহিলাদের জন্য এটার প্রয়োজন নেই।

* প্রথম ঢিলা/কুলুখ পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, দ্বিতীয়টা সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে, তৃতীয়টা পিছন দিক থেকে সামনের দিকে– এ নিয়মে ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা অধিক পবিত্রতার অনুকূল। আর যদি অণ্ডকোষ ঝুলানো থাকে তাহলে প্রথমটা সামনের দিক থেকে আরম্ভ করা। মহিলাগণ সর্বদা প্রথমটা সামনের দিক থেকে শুরু করবে।

* পানি ব্যবহারের পূর্বে হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করা। এক হাদীছের বর্ণনার ভিত্তিতে এ স্থলে উভয় হাত ধৌত করার একটি মতও পাওয়া যায়। (مراقي الفلاح)

* তারপর পানি দ্বারা ধৌত করা সুন্নাত, নাপাকী এক দেরহামের (হাতের তালুর নিচ স্থান সমপরিমাণ বিস্তৃত) বেশি পরিমাণ স্থান ছড়িয়ে পড়লে পানি দ্বারা এস্তেনজা করা ওয়াজিব।

* পানি ব্যবহার করার সময় প্রথমে বাম হাতের মধ্যমা আঙ্গুল–এর পেট দ্বারা মর্দন করা, তারপর অনামিকাসহ প্রয়োজনে আরও দুই এক আঙ্গুল ব্যবহার করা। মহিলাগণ প্রথমেই দুই আঙ্গুল (মধ্যমা ও অনামিকা) ব্যবহার করবে। (محيط ونور الإيضاح)

* রোযা অবস্থায় না হলে পিছনের রাস্তা খুব ঢিলা করে বসে পানি ব্যবহার করা। (مراقي الفلاح)

* দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করতে থাকবে।

* প্রথমে পিছনের রাস্তা তারপর সামনের রাস্তা ধৌত করা। (مراقي الفلاح) দুই রাস্তার মধ্যখানের স্থানটুকুও মধ্যমা বা কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা মর্দন করে ধৌত করা। (مفاتيح الجنان)

* সৌচকার্যের পর মাটি বা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পুনরায় হাত পরিষ্কার করে নেয়া উত্তম।

* রোযা অবস্থায় হলে সতর্কতার জন্য ওঠার পূর্বে কাপড় (বা এ জাতীয় কিছু) ব্যবহার করে কিংবা বাম হাত দ্বারা বার বার ঘষে পিছনের রাস্তার পানি মুছে ফেলা উচিৎ। আর যাদের রোগের কারণে মলদ্বার বের হয়ে যায় তাদের জন্য জরুরি। রোযাদার না হলেও এরূপ করা মোস্তাহাব। (طحطاوي و شامى)

* যথাসম্ভব দ্রূত এস্তেনজা সেরে বের হয়ে আসা। (مراقي الفلاح)

* বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করা সুন্নাত।

* বের হয়ে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَ عَافَانِيْ.

অথবা শুধু غُفْرَانَكَ

অর্থ: তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লহর জন্য, যিনি কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন।

* প্রথমে বাম পায়ের জুতো/স্যান্ডেল খোলা সুন্নাত।

## উযূর ফরয, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদবসমূহ

(উযূর মধ্যে যা যা করতে হয় তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল।)

* ওয়াক্ত আসার পূর্বেই উযুর সামান প্রস্তুত রাখা উত্তম। (مراقي الفلاح)

* মা'যূর না হলে তার জন্য ওয়াক্ত আসার পূর্বে উযূ করে নেয়া উত্তম।

* উযূর পূর্বে পেশাব পায়খানার হাজত থেকে ফারেগ হয়ে নেয়া উত্তম।

* উঁচু স্থানে বসে উযূ করা আদব।

* পবিত্র স্থানে উযূ করা।

* কেবলামুখী হয়ে উযূ করা আদব।

* পানি ঢেলে নিতে হয়– পানির পাত্রটা এমন হলে সে পাত্রটা বাম দিকে রাখা আর পানি হাত দিয়ে তুলে নিতে হয়– এমন পাত্র হলে সেটা ডান দিকে রাখা আদব। (حاشية الطحطاوي)

* প্রথমে উযুর নিয়ত করবে। নাপাকী দূর করার কিংবা পবিত্রতা অর্জন করার বা নামায জায়েয হওয়ার অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করার নিয়ত করবে। নিয়ত করা সুন্নাত। মনের ইরাদা ও ইচ্ছাকে বলা হয় নিয়ত।

* নিয়ত মুখে উচ্চারণ না করলে যাদের খটকা থেকে যায়, তারা নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতে পারেন।



* নিয়ত মুখে উচ্চারণ করলে আরবীতে করা যায়। আরবীতে করা ফরয ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাবও নয়। আরবীতে নিয়ত করতে চাইলে এভাবে করা যায়।

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ: আমি নাপাকী দূর করার, নামায বৈধ করার এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার নিয়তে উযূ করছি।

* নিয়ত করার পর এই দুআ পড়া মোস্তাহাব। এই দুআ পড়ে উযূ শুরু করবে, তাহলে ফেরেশতাগণ এই উযূ ভাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত নেকী লিখতে থাকবে–

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. (رد المحتار ج/١ و معارف السنن ج/١)

অর্থ: মহান আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তিনি আমাকে দ্বীন ইসলামের উপর রেখেছেন এজন্য।

* কোন ওজর না থাকলে উযূর মধ্যে অঙ্গ মর্দন করে দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ না করাই আদব। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পানি তুলে দিলে বা পানি ঢেলে দিলেও কোনো দোষ নেই।

* তারপর হাতের কবজি ধোয়ার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব) উল্লেখ্য যে, উযূর অঙ্গগুলো ধোয়া বা মাসেহ করার যেসব দুআ বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এগুলো পড়াকে সুন্নাত মনে করা যাবে না। তবে বুযুর্গানে দ্বীন এগুলো পাঠ করেছেন এবং করেন। তদুপরি এ দুআগুলোর অর্থ ভাল, এ হিসাবে এগুলো পাঠ করাকে মোস্তাহাব বা উত্তম বলা হয়।

* বিসমিল্লাহসহ হাতের কবজি ধোয়ার দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট মঙ্গল ও বরকত কামনা করি এবং অমঙ্গল ও ধ্বংস থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

* তারপর উভয় হাতের কবজি ধৌত করবে। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত।

* মেসওয়াক করা সুন্নাত। মেসওয়াক উযূ শুরু করার পূর্বেও করা যায়। মেসওয়াক না থাকলে কিংবা মুখে ওজর থাকলে বা দাঁত না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও ঘষে নেয়া।

* তারপর কুলি করার জন্য বিসমিল্লাহসহ কুলি করার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

**بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.**

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য কর যেন কুরআন তিলাওয়াত করতে, যিকির করতে ও শোকর আদায় করতে পারি।

* দুআ পড়ার পর কুলি করবে। কুলি করা সুন্নাত এবং তিনবার কুলি করা সুন্নাত। তিন বারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তিন বার পানি নেয়া উত্তম।

* ডান হাতে কুলির পানি নিবে। (মোস্তাহাব)

* রোযাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত।

* তারপর নাকে পানি দেয়ার জন্য বিসমিল্লাহসহ নাকে পানি দেয়ার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

**بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ أَرِحْنِيْ رَآئِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَاتُرِحْنِيْ رَآئِحَةَ النَّارِ.**

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের সুগন্ধি দান কর এবং জাহান্নামের গন্ধ আমার ভাগ্যে দিও না।

* নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।

* ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলা আদব। (حاشية الطحطاوي)

* রোযাদার না হলে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি টেনে নেয়া উত্তম।

* বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নাকের মধ্যে পরিষ্কার করা আদব।

* এরূপ তিন বার নাকে পানি দেয়া এবং ঝেড়ে ফেলা সুন্নাত। তিন বারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তিন বার পানি নেয়া উত্তম।

* তারপর বিসমিল্লাহসহ মুখমণ্ডল ধৌত করার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

**بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ.**



অর্থ: হে আল্লাহ, যেদিন (কতক) মানুষের চেহারা উজ্জ্বল এবং (কতক) চেহারা দুঃখ মলিন হবে, সেদিন আমার চেহারাকে উজ্জ্বল করো।

* মুখমণ্ডল ধৌত করা ফরয। কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া থেকে চিবুক (থুতনি) পর্যন্ত এবং চেহারার দুই পাশে দুই কানের লতি পর্যন্ত হল মুখমণ্ডলের সীমানা।

* ডান হাতে পানি নিয়ে তার সঙ্গে বাম হাত মিলিয়ে কপালের উপরিভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা আদব। (مراقي الفلاح)

* মুখে পানি আস্তে লাগাবে। জোরে পানি মারা মাকরূহ।

* পাতলা দাড়ি হলে চামড়াতে পানি পৌঁছাতে হবে। আর ঘন দাড়ি হলে মুখের বেষ্টনীর ভিতরের দাড়ি ধৌত করতে হবে– চামড়াতে পানি পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই। দাড়ির উপর থেকে নজর করলে যদি নিচের চামড়ার রং বুঝা যায় তাহলে তা পাতলা দাড়ি বলে গণ্য হবে, অন্যথায় ঘন দাড়ি বলে গণ্য হবে।

* চেহারার বেষ্টনীর বাইরের ঝুলন্ত দাড়িতে মাসেহ করা সুন্নাত। (احسن الفتاوی)

* এরূপ তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করা সুন্নাত।

* প্রতিবার পুরো মুখমণ্ডলে ভাল করে হাত বুলাবে।

* ঘন দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত। তিনবার মুখ ধৌত করার পর দাড়ি খেলাল করতে হবে। (طحطاوي)

* দাড়ি খেলাল করার তরীকা হল এক কোষ পানি নিয়ে দাড়ির নিচের ভাগের থুতনিতে লাগাবে, তারপর খেলাল করবে। ডান হাতের তালু সামনের দিকে রেখে গলার দিক থেকে দাড়ির নিচ দিয়ে উপর দিকে খেলাল করা নিয়ম। খেলাল তিন বারের বেশি করবে না।

* তারপর বিসমিল্লাহসহ ডান হাত ধোয়ার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

**بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.**

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব-নিকাশ সহজ করো।

* ডান হাত কনুইসহ ধৌত করা ফরয।

* আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা সুন্নাত। (طحطاوي) এবং হাতের অগ্রভাগ নিচু করবে যাতে করে ধোয়া পানি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।[১]

* এভাবে তিনবার ধৌত করা সুন্নাত।

* প্রতিবার ধৌত করার সময় পুরো অঙ্গ ভালভাবে মর্দন করবে।

* হাতে আংটি থাকলে ভালভাবে নাড়াচাড়া করে ভিতরে পানি প্রবেশ করানো মোস্তাহাব। আর আংটি চাপা থাকলে অবশ্যই এরূপ করতে হবে। মহিলাদের নাকের অলংকার, চুড়ি ইত্যাদির বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

* বাম হাত ধৌত করার মাসআলাও ডান হাতের ন্যায়। তবে বাম হাত ধৌত করার দুআটি (বিসমিল্লাহসহ) এই–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার আমলনামা দিও না আমার বাম হাতে, আর না পিছন দিক থেকে।

* বাম হাত তিনবার ধৌত করার পর উভয় হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে। এটা সুন্নাত। (ظهيرية)

* আঙ্গুল খেলাল করার তরীকা হল– এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করানো কিংবা বাম হাতের আঙ্গুলগুলো এক সাথে ডান হাতের পিঠের দিক থেকে ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ করানো। এমনিভাবে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল খেলাল করা।

* তারপর বিসমিল্লাহসহ মাথা মাসেহ করার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ أَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন তোমার আরশের ছায়াতলে আমাকে স্থান দিও।

১. এখানে কনুইর দিক থেকে ধোয়া আরম্ভ করার একটি মতও রয়েছে যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানি গড়াতে পারে। তবে উপরোক্ত তরীকায় হাত ধোয়া হলে উভয় মতের উপর আমল হয়ে যায়।



* মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত। (حاشيه شرح وقايه)

* মাথা মাসেহ করা। পুরো মাথায় মাসেহ করা সুন্নাত। অন্তত মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরয।

* মাথায় মাসেহ করার তরীকা হল– দুই হাতের পুরো তালু আঙ্গুলের পেটসহ মাথার অগ্রভাগে রেখে পুরো মাথা জুড়ে পেছনের দিকে টেনে আনবে।[১] মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসেহ শুরু করা সুন্নাত। (طحطاوي)

* উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। এক হাত দ্বারা মাসেহ করা সুন্নাতের খেলাফ। (১/□□ فتاوی دار العلوم)

* তারপর বিসমিল্লাহসহ কান মাসেহের দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهٗ.

অর্থ: হে আল্লাহ, যারা (তোমার) কথা শুনে মেনে চলে আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

* কান মাসেহ করা (উভয় কান এক সঙ্গে) সুন্নাত। (طحطاوي)

* কান মাসেহ করার তরীকা হল– উভয় হাতের তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল) প্রথমে কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাবে। তারপর সেই আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা কানের ভিতরের দিক মাসেহ করবে। অতঃপর বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পিছনের ভাগ মাসেহ করবে।

* কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়ার দরকার নেই।

* তারপর বিসমিল্লাহসহ গর্দান মাসেহের দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার ঘাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

* অতঃপর গর্দান মাসেহ করবে। (মোস্তাহাব)

* উভয় হাতের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসেহ করবে।

১. মাসেহ করার এই তরীকাটি সহজ। অন্য একটি তরীকাও বর্ণিত আছে, তা হল– উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পেট (শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল ব্যতীত) মাথার অগ্রভাগের উপরে রেখে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর দুই হাতের তালু মাথার দুই পাশে রেখে পেছন দিক থেকে সামনে টেনে নিয়ে আসবে।

* তারপর বিসমিল্লাহসহ ডান পা ধোয়ার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, যেদিন অনেক পা পুলসিরাত থেকে পিছলে যাবে সেদিন আমার পদযুগল স্থির রেখ।

* প্রথমে ডান পা ধৌত করবে। পা ধৌত করা ফরয।

* পায়ের অগ্রভাগে পানি ঢালা সুন্নাত।

* বাম হাত দিয়ে পা বিশেষভাবে পায়ের তলা মর্দন করা আদব।

* তিনবার ধৌত করা সুন্নাত।

* প্রতিবার পুরো অঙ্গ ভাল করে মর্দন করবে।

* ডান পা ধৌত করার পর ডান পায়ের আঙ্গুল খেলাল করবে। (সুন্নাত)

* খেলাল করার তরীকা হল– বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করবে। (আদব)

* ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খেলাল আরম্ভ করা নিয়ম।

* খেলাল করার সময় পায়ের আঙ্গুলের নিচের দিক থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে খেলাল করবে। (مراقي الفلاح)

* তারপর বিসমিল্লাহসহ বাম পা ধোয়ার দুআ পড়বে। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার গোনাহ মার্জনা কর, আমার চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত কর এবং আমার (আখেরাতের) ব্যবসাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা কর।

* তারপর ডান পায়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী বাম পা ধৌত করবে। শুধু বাম পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার সময় বৃদ্ধ আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দিক খেলাল করা নিয়ম।

### উযূর সব অঙ্গের জন্য প্রযোজ্য মাসায়েল

* উযুর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় জোড়া ও ভাজগুলোতে বিশেষ যত্ন সহকারে পানি পৌঁছাতে হবে।

* উযূর মাঝে মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পড়া উত্তম।



اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَ وَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার পাপ ক্ষমা কর, আমার ঘরে প্রাচুর্য্য দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও। (عمل اليوم الليلة بإسناد صحيح)

* উযুর প্রয়োজন মোতাবেক পানি ব্যবহার করবে– কম বা বেশি করবে না। আজকাল টেপে উযূ করতে গেলে প্রচুর পানির অপচয় হয়। তাই সম্ভব হলে কোন পাত্রে পানি নিয়ে উযূ করবে। অন্যথায় টেপের পানি হালকাভাবে ছেড়ে উযূ করবে এবং প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে বন্ধ করে নিবে।

* উযুর মধ্যে কোন জাগতিক কথা-বার্তা না বলা আদব।

* প্রত্যেক অঙ্গকে ফরয পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি ধৌত করা উত্তম। যেমন কনুইর উপরেও কিছুটা ধৌত করা। এটাকে إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ (অর্থাৎ, উজ্জ্বলতা ও চমক বৃদ্ধি করা) বলে। কেননা, সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামতের দিন উযুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে।

* উযুর প্রত্যেকটা অঙ্গের শুরুতে কালেমায়ে শাহাদাত এবং শেষে দুরূদ শরীফ পড়াকে ফোকাহায়ে কেরাম মোস্তাহাব বলেছেন। কারও কারও মতে অন্তত যেকোনো একটা অঙ্গের ক্ষেত্রে আমলটি করে নিলেও চলবে।

### উযূ শেষ হওয়ার পর করণীয় কয়েকটি আমল

* রোযাদার না হলে উযূর অবশিষ্ট পানি বা তার কিয়দাংশ পান করা মোস্তাহাব। এ পানি পান করা অনেক রোগের শেফা। এ পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা উত্তম। দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয়ভাবে পান করা যায়। (حاشية الطحطاوي واحسن الفتاوى ج/١)

* এ পানি পান করার দুআ–

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِشِفَآئِكَ وَدَاوِنِيْ بِدَوَآئِكَ وَاعْصِمْنِيْ مِنَ الْوَهْنِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ. (حاشية الطحطاوى)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে শেফা দান কর তোমার শেফা দ্বারা, আমার চিকিৎসা করাও তোমার দাওয়াই দ্বারা এবং আমাকে রক্ষা কর দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধি ও ব্যথা-বেদনা থেকে।

* উত্তমভাবে উযুর শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়লে (দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে, আকাশের দিকে নজর করে– (حاشية الطحطاوي واحسن الفتاوى ج/١) তার

জন্য জান্নাতের আট দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (سنن الترمذي)

**اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.**

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের থাকবে না কোনো ভয় এবং যারা হবে না দুঃখিত। (তিরমিযী)

* নিম্নোক্ত দুআটি পড়াও উত্তম (দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে এবং আকাশের দিকে নজর দিয়ে)।

**سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ.** (كتاب الأذكار)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ (ইবাদতের যোগ্য) নেই। তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার সামনে তওবা করছি। (কিতাবুল আযকার)

* (উযূর পর রুমাল, তোয়ালিয়া, গামছা ইত্যাদি দ্বারা উযুর পানি অঙ্গ থেকে মুছে নেয়ায় ক্ষতি নেই। তবে খুব মর্দন করে নয় বরং উত্তম হল হালকাভাবে মুছে নেয়া। (১/□□ احسن الفتاوى)

* উযূর পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূ নামায পড়ে নেয়া উত্তম। এসম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২২৮ নং পৃষ্ঠা।

## যেসব কারণে উযূ মাকরূহ হয়

নিম্নলিখিত কার্যগুলো উযুতে করলে উযূ মাকরূহ হয় অর্থাৎ, করলে উযূ ভঙ্গ হয় না তবে ছওয়াব কমে যায়।

১. তারতীব অনুযায়ী উযূ না করলে।
২. অপবিত্র স্থানে বসে উযূ করলে।
৩. অতিরিক্ত পানি ব্যয় করলে।
৪. উযুতে রত থাকা অবস্থায় জাগতিক কথা-বার্তা বললে। তবে কোন বিশেষ প্রয়োজনে দু' একটি কথা বললে কোনো আপত্তি নেই।



৫. মুখ অথবা অন্য কোনো অঙ্গে জোরে পানি মারলে।
৬. মুখে পানি দেয়ার সময় সুরসুর শব্দ বেরিয়ে আসলে।
৭. তিন বারের অধিক কোন অঙ্গ ধৌত করলে কিংবা অঙ্গগুলো একবার ধুয়ে মুছে ফেললে। তবে কোন কারণবশত এরূপ করলে কোনো দোষ নেই। বিনা কারণে করা ঠিক নয়।
৮. ডান হাতে নাক পরিষ্কার করলে।
৯. প্রথমে বাম হাত অথবা বাম পা ধৌত করলে।

## যেসব কারণে উযূ ভাঙ্গে না

কিছু জিনিস এমন আছে যাতে উযূ ভঙ্গ হয় না, তবে সাধারণত উযূ ভঙ্গ হয় বলে খ্যাত। যেমন:–

১. বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
২. নামাযের সাজদায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে উযূ ভঙ্গ হয় না। তবে তন্দ্রায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাথে মিশে গেলে –যেমন: কনুই উরুর সাথে মিশে গেলে অথবা উরু পেটের সাথে মিললে– উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েলোক এর ব্যতিক্রম।
৩. নামাযের মধ্যে মুচকি হাসি দিলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৪. উযূ করার পর স্ত্রীলোক তার সন্তানকে দুধ পান করালে অথবা স্তন থেকে দুধ নিংড়িয়ে ফেললেও উযূ ভঙ্গ হয় না।
৫. নিজের অথবা স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গে দৃষ্টিপাত করলে উযূ ভঙ্গ হয় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা ভাল নয়।
৬. পুরুষ বা স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করলে অথবা চুম্বন করলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৭. উযূ করার পর লজ্জাস্থানে হাত লাগালে উযূ নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা মাকরূহ।
৮. উযূ করার পর নখ কাটলে অথবা পায়ের চামড়া কাটলে অথবা উপড়ালে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৯. বিড়ি সিগারেট সেবন করলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
১০.সতর খুললে উযূ ভঙ্গ হয় না।
১১.কারও সতর দেখলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
১২. মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে (রোগের কারণে এমন হয়ে থাকে, এতে) উযূ ভঙ্গ হয় না। (بہشتی زیور)

## যেসব কারণে উযূ ভেঙ্গে যায়

১. পেশাব বা পায়খানা করা।

২. পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসা।

৩. পেশাব পায়খানা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু যেমনঃ কেঁচো, ক্রিমি, পাথরকণা ইত্যাদি অথবা এগুলো ছাড়াও যদি অন্য কোনো বস্তু পেশাব অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত হয়, তখন উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪. শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি বেরিয়ে গড়িয়ে গেলে।

৫. বমি ছাড়াও রক্ত, পিত্ত, খাদ্য অথবা পানি মুখ ভরে নির্গত হলে উযূ ভঙ্গ হবে। এসমস্ত বস্তু অল্প অল্প করে কয়েকবার নির্গত হলেও উযূ ভঙ্গ হবে যদি সববারেরটা একত্রে হলে মুখ ভরা পরিমাণ হত বলে মনে হয়।

৬. থুথুতে রক্তের পরিমাণ বেশি হলে কিংবা উযূ করার সময় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়ে আসলে উযূ ভঙ্গ হবে। রক্তের পরিমাণ অল্প হলে কোনো ক্ষতি নেই, তবে রক্ত অধিক পরিমাণে হলে অর্থাৎ, থুথু থেকে রক্তের পরিমাণ বেশি হলে রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উযূ করতে পারবে না।

৭. বীর্য, মযী অথবা হায়েযের রক্ত দেখা দিলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর বর্ণনা গোসল অধ্যায়ে করা হবে। উল্লেখ্য যে, বীর্য ও মযীতে পার্থক্য রয়েছে– যৌন সম্ভোগের সময় তৃপ্তি হওয়ার মুহূর্তে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে যা নির্গত হয় তা হল বীর্য, আর পুংলিঙ্গের চটপটে ভাব দ্বারা অথবা স্ত্রীলোককে চুম্বন করায় অথবা স্ত্রীলোকের নিকটবর্তী হওয়ায় অথবা কোন খারাপ ধারণার বশবর্তী হলে লিঙ্গের অগ্রভাগ দিয়ে পানির মত যে বস্তু বেরিয়ে আসে, তা হল মযী। বীর্য বের হলে গোসল করা ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়। কিন্তু মযী বের হলে গোসল করা আবশ্যক হয় না, তবে উযূ ভেঙ্গে যায়।

৮. স্ত্রীলোকের স্তন থেকে বুকের দুধ ব্যতীত অন্য বস্তু বেরিয়ে আসলে এবং ব্যথা হলে উযূ ভঙ্গ হবে।

৯. যোনির মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করালে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১০. বেহুঁশ বা পাগল হলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১১. নামাযের মধ্যে এরকম শব্দ সহকারে হাসা যে, পাশের লোক সে শব্দ শুনতে পায়– এর দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।



## মা'যূর ব্যক্তির উযূর বয়ান

### মা'যূর কে?

যার নাক বা অন্য কোনো যখম থেকে অনবরত রক্ত বইতে থাকে বা অনর্গল পেশাবের ফোঁটা আসতে থাকে, এমনকি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও বিরতি হয় না, যার মধ্যে সে শুধু উযূর ফরয অঙ্গগুলো ধুয়ে সংক্ষেপে ফরয নামায আদায় করতে পারে, এরূপ ব্যক্তিকে মা'যূর বলে।

### মা'যূর ব্যক্তির হুকুম

* মা'যূর ব্যক্তিকে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নতুন উযূ করতে হবে। যে পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ত থাকবে সে পর্যন্ত তার উযূ থাকবে অর্থাৎ, ঐ ওজরের কারণে উযূ যাবে না। তবে ঐ কারণ ছাড়া উযূ ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ ঘটলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

* মা'যূর ব্যক্তি যে কারণে মা'যূর হয়েছে সে কারণ বন্ধ থাকার সময় উযূ ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ ঘটায় যদি উযূ করে, তারপর মা'যূর যে কারণে হয়েছে সে কারণ ঘটে, তাহলেও উযূ চলে যাবে, অবশ্য মা'যূর যে কারণে হয়েছে সে কারণে যে উযূ করবে সেই উযূ ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত থাকবে যদি উযূ ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ না পাওয়া যায়।

* যদি এই রক্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ, যে কারণে মা'যূর হয়েছে) কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ হওয়ার পূর্বে আবার লেগে যাবে, তাহলে ঐ রক্ত ধোয়া ওয়াজিব নয়। অন্যথায় ধুয়ে নিয়ে পাক কাপড়েই নামায পড়তে হবে। তবে রক্ত এক দেরহাম পরিমাণের কম হলে তা না ধুয়েও নামায হয়ে যাবে। হাতের তালু সম্পূর্ণ খুলে তাতে পানি রাখলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে তাকে এক দেরহাম–এর পরিমাণ বলা হয়। (বেহশতি জেওর)

* মা'যূর বলে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল পূর্ণ এক ওয়াক্ত (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) এমন অতিবাহিত হওয়া, যার মধ্যে সে ওজর থেকে এতটুকু বিরতি পায় না যাতে উযূর ফরযগুলো আদায় করে ফরয নামায পড়ে নিতে পারে। এরপর প্রতি ওয়াক্তে সারাক্ষণ সেই ওজর থাকা জরুরি নয় বরং ওয়াক্তের মধ্যে এক বারও যদি পাওয়া যায় তবুও সে মা'যূর বলে গণ্য থাকবে। অবশ্য যদি এমন একটা ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়, যার মধ্যে একবারও সে ওজর দেখা যায়নি, তাহলে সে আর মা'যূর থাকল না।

## মেসওয়াকের মাসায়েল

### মেসওয়াক–এর ডাল বিষয়ক

১, মেসওয়াক পীলু বা যয়তুনের ডালের হওয়া উত্তম।
২. মেসওয়াক কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা হওয়া উত্তম।
৩. মেসওয়াক প্রথমে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হওয়া উত্তম।
৪. মেসওয়াক নরম হওয়া মোনাসেব।
৫. মেসওয়াক কম গিরা সম্পন্ন হওয়া উত্তম।
৬. মেসওয়াকের ডাল কাঁচা হওয়া উত্তম।

### মেসওয়াক ধরার তরীকা বিষয়ক

১. মেসওয়াক ডান হাতে ধরা মোস্তাহাব।
২. মেসওয়াক ধরার তরীকা হল– কনিষ্ঠ আঙ্গুল মেসওয়াকের নিচে, বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাব মেসওয়াকের উপরের দিকে নিচে এবং অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো (মধ্যের তিন আঙ্গুল) মেসওয়াকের উপরে রাখবে।

### মেসওয়াকের দুআ ও যিকির বিষয়ক

১. বিসমিল্লাহ বলে মেসওয়াক শুরু করবে।
২. মেসওয়াক শুরু করার সময় দুআ পড়া মোস্তাহাব। দুআটি এই–

**بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِيْ هٰذَا مَحِيْصًا لِّذُنُوْبِيْ وَمَرْضَاةً لَّكَ وَبَيِّضْ بِهٖ وَجْهِيْ كَمَا بَيَّضْتَ أَسْنَانِيْ.**

অর্থ: হে আল্লাহ, এই মেসওয়াক করাকে আমার পাপ মোচনকারী ও তোমার রেজামন্দীর ওছীলা বানাও, আর আমার দাঁতগুলোকে যেমন তুমি সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চেহারাকেও উজ্জ্বল (সুন্দর) কর।

### মেসওয়াক করার তরীকা বিষয়ক

১. মেসওয়াক শুরু করার পূর্বে ভিজিয়ে নেয়া উত্তম।
২. প্রথমে উপরের দাঁতের ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে, তারপর নিচের দাঁতের ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে, তারপর দাঁতের ভিতরের দিকে অনুরূপভাবে ঘষতে হবে। (رد المحتار ج/١)
৩. এভাবে কমপক্ষে তিনবার করে ঘষবে। প্রতিবারেই নতুন পানি দিয়ে মেসওয়াক ভিজিয়ে নিবে। (رد المحتار ج/١)



৪. মেসওয়াক দাঁতের অগ্রভাগে, উপর ও নিচের তালুর অগ্রভাগে এবং জিহবার উপরিভাগেও করা উত্তম।
৫. মেসওয়াক দাঁতের উপর চওড়াভাবে ঘষা নিয়ম। ইমাম গায্যালী (রহ.) উপর-নিচভাবে ঘষার কথাও বলেছেন। কমপক্ষে চওড়াভাবে ঘষতে হবে। (مفاتيح الجنان نقلا عن احياء علوم الدين)
৬. শোয়া অবস্থায় মেসওয়াক করা মাকরূহ।
৭. মেসওয়াক করার পর মেসওয়াক ধুয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে। (الدر المختار)

বি. দ্র. মেসওয়াক না থাকলে মেসওয়াকের বিকল্প হিসাবে ব্রাশ ব্যবহার করা যায়। এতে মেসওয়াকের ডাল বিষয়ক সুন্নাত আদায় না হলেও মাজা ও পরিষ্কার করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (درس ترمذی) অন্যথায় হাত দিয়ে বা মোটা কাপড় দিয়ে দাঁত মেজে নিতে হবে। হাত দিয়ে মাজার তরীকা হল– ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে ডান পাশের দাঁতের উপরে অতঃপর নিচে, তারপর শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল দিয়ে বাম পাশের দাঁতের উপরে অতঃপর নিচে ঘষতে হবে। (১/□□ احسن الفتاوى)

### গোসলের ফরয, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদবসমূহ

(গোসলের যাবতীয় করণীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল)

* গোসলখানা নোংরা থাকলে কিংবা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে বাম পা দিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করবে। আর তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে যেকোনো পা দিয়ে প্রবেশ করা যায়।

* গোসলের জন্য কাপড় খোলার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

**بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.** (عمل اليوم والليلة)

* তবে গোসলখানা নোংরা থাকলে বা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে এ দুআটি বাইরে থেকেই কাপড় খোলার সময় পড়বে। (احسن الفتاوى ج/٢)

* গোসলের নিয়ত করা সুন্নাত। (رد المحتار)

* নিয়ত এভাবে করা যায়–

**نَوَيْتُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.**

অর্থ:, আমি জানাবাত থেকে পবিত্রতা হাছেল করার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

* বসে গোসল করা উত্তম। (احسن الفتاوى/۲)

* আড়াল স্থানে এবং ছতর ঢেকে গোসল করা মোস্তাহাব। আড়াল স্থান হলে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয তবে মোস্তাহাবের খেলাফ।

* কেবলামুখী হয়ে গোসল না করা উত্তম।

* গোসলের শুরুতে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। এটা সুন্নাত।

* তারপর পেশাব পায়খানার রাস্তা (তাতে নাপাকী না থাকলেও) ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর শরীরের কোনো স্থানে নাপাকী থাকলে তা ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযূ করবে। এই উযুর মধ্যে উযুর অঙ্গসমূহের দুআ পাঠ করাটা বিতর্কিত, তবে গোসলখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে এবং তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে দুআগুলো পাঠ করা যায়। (احسن الفتاوى /۲ والفقه على المذاهب الأربعة)

## গোসলের ফরযসমূহ

১. কুলি করা ফরয। রোযাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত এবং তিনবার এরূপ গড়গড়াসহ কুলি করা সুন্নাত। দাঁতের মধ্যে খাদ্যকণা আঁটকে থাকলে তা অপসারণ করবে।

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয। নাকের মধ্যে শুকনো ময়লা থাকলে তা-ও দূরীভূত করবে। তিনবার এরূপ পানি পৌঁছানো সুন্নাত।

৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো ফরয। মহিলাদের নাকের ও কানের ছিদ্রে অলংকার না থাকলে তার মধ্যেও পানি পৌঁছাতে হবে। অলংকার থাকলে নাড়াচাড়া দিয়ে ছিদ্রের ভিতরে পানি প্রবেশ করাবে। চুলের বেণী ও খোপা না খুলে যদি সব চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো সম্ভব হয় তাহলে বেণী ও খোপা খোলা জরুরি নয়। তা সম্ভব না হলে বেণী ও খোপা খুলে নিতে হবে। (مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي وغيرها)

* গোসলের স্থানে পানি জমা হয়–এমন স্থানে গোসল করলে গোসলের পরে অন্যত্র সরে গিয়ে পা ধোয়া সুন্নাত।

* সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানোর সুন্নাত তরীকা হল - প্রথমে ভিজা হাত দ্বারা সমস্ত শরীর ভিজিয়ে নিবে। (منية المصلي) তারপর তিনবার



মাথায় পানি ঢালবে। তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালবে। তারপর তিনবার বাম কাঁধে পানি ঢালবে। প্রতিবার পানি ঢেলে ভাল করে শরীর মর্দন করে পরিষ্কার করা সুন্নাত।

* গোসলের পর পানি মুছে ফেলার কিছু থাকলে তা দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে।

* তারপর যথাসম্ভব দ্রুত কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করবে।

* গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময় যদি বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে ডান পা দিয়ে বের হবে।

* বের হওয়ার পর উযূর শেষে যে সব দুআ পড়া মোস্তাহাব এখানেও সেগুলো পড়বে।

* গোসলের পর কোন অঙ্গ ধোয়া হয়নি বা কোথাও শুকনো রয়ে গেছে মনে হলে শুধু সেটা ধুয়ে নিলেই চলবে, পুরো গোসল দোহরানোর (পুনরায় করার) প্রয়োজন নেই।

## যেসব কারণে গোসল ফরয হয়

১. যৌন সম্ভোগ দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে জোশের সঙ্গে মনী (বীর্য) বের হলে।
২. স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক রাতে অথবা দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলে। তবে শয়নের কাপড়ে বা শরীরে মনীর চিহ্ন না দেখা গেলে গোসল ফরয হয় না।
৩. স্বামীর লিঙ্গের শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ, খৎনার স্থানটুকু স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করলে (যদিও কিছু বের না হয়)। যেমন সামনের রাস্তার এই হুকুম, তেমনি মহাপাপ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ পিছনের রাস্তায় প্রবেশ করায় তবুও এই হুকুম।
৪. স্ত্রীলোকের হায়েয হওয়ার পর যখন রক্ত বন্ধ হয় তখন গোসল ফরয হয়।
৫. স্ত্রীলোকের নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে পাক হওয়ার জন্য গোসল ফরয হয়।

## যেসব কারণে গোসল ফরয হয় না

১. যদি কোন রোগের কারণে ধাতু পাতলা হয়ে বা কোন আঘাত খেয়ে বিনা উত্তেজনায় ধাতু নির্গত হয় তাতে গোসল ফরয হয় না।

২. স্বামী স্ত্রী শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করে যদি ছেড়ে দেয়- কিছু মাত্র ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং মনীও বের না হয়, তাতে গোসল ফরয হয় না।
৩. শুধু মযী বের হলে তাতে কেবল উযূ ভঙ্গ হয় গোসল ফরয হয় না।
৪. ঘুম থেকে উঠার পর যদি স্বপ্ন স্মরণ থাকে কিন্তু কাপড়ে বা শরীরে কোনো কিছু দেখা না যায় তবে তাতে গোসল ফরয হয় না।
৫. এস্তেহাযার রক্তের কারণে গোসল ফরয হয় না।

বি. দ্র. মনী ও মযী কাকে বলে তা পূর্বে ১৪১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

## তাইয়াম্মুমের মাসায়েল

(ধারাবাহিকভাবে তাইয়াম্মুমের করণীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হল।)

* পানি না পাওয়ার কারণে যাকে তাইয়াম্মুম করতে হবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা থাকলে মোস্তাহাব ওয়াক্ত পার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য মোস্তাহাব। আর কেউ পানি দেয়ার ওয়াদা করলে অবশ্যই তাকে অপেক্ষা করতে হবে, যদিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা হয়।

* তাইয়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত।

* মেসওয়াক করা উযুর ন্যায় তাইয়াম্মুমেরও সুন্নাত।

(الفقه على المذاهب الأربعة)

* নিয়ত করা ফরয। (পবিত্রতা অর্জন করা বা নাপাকী দূর করার নিয়ত করবে। কিংবা নামায, সাজদায়ে তিলাওয়াত প্রভৃতি এমন মৌলিক ইবাদতের নিয়ত করবে যা পবিত্রতা ব্যতীত সহীহ হয় না।

* নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম এই অর্থে যে, তাতে মনের খটকা দূর হয়ে যায়। মূলত নিয়ত মনের ইরাদা বা ইচ্ছাকে বলা হয়, তাই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়।

এরূপ বাক্যে নিয়ত করা যায়–

نَوَيْتُ أَنْ أَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

অর্থ: আমি নাপাকী দূর করার, নামায বৈধ করার এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে তাইয়াম্মুমের নিয়ত করছি।

* নিয়ত করার পর পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু (যার উপর তাইয়াম্মুম করা যায়)–এর উপর উভয় হাতের তালু মারবে।

* হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো খোলা রাখা সুন্নাত।



* হাত মারার পর উভয় হাত ঐ স্থানে রাখা অবস্থায় একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে নিবে। এটা সুন্নাত।

* হাত এমনভাবে ঝাড়বে, যেন আলগা ধুলা ঝরে যায়।

* পুরো মুখ ঐ হাত দ্বারা মাসেহ করবে। এটা ফরয।

* দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত।[১]

* আবার মাটিতে অনুরূপভাবে হাত মারবে। (আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রেখে)

* হাত সামনে এবং পেছনের দিকে নিবে। এটা সুন্নাত।

* এখানেও (হাত মাসেহের পূর্বেই) উযুর মত উভয় হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে। এটা সুন্নাত। (حاشية الطحطاوي)

* পূর্বের ন্যায় হাত ঝাড়বে।

* প্রথমে ডান হাত কনুইসহ মাসেহ করবে।

* তারপর বাম হাত কনুইসহ মাসেহ করবে। হাত মাসেহ করা ফরয।

* মসেহ করার সুন্নাত তরীকা হল– বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট (বৃদ্ধ আঙ্গুল ছাড়া) ডান হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রাখবে। তারপর ডান হাতের পিঠের উপর দিয়ে কনুইর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অতঃপর বাম হাতকে উল্টে বাম হাতের তালু এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক থেকে আঙ্গুলের দিকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে যেন বাম হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে চলে যায়। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে।[২]

* আংটি চুড়ি ইত্যাদিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে এমনভাবে হাত মাসেহ করবে যেন সব স্থানে মাসেহ করা হয়।

* তায়াম্মুমের এই তারতীব রক্ষা করা সুন্নাত।

* তাইয়াম্মুমের মধ্যেও উযুর ন্যায় একের পর এক অঙ্গগুলো লাগাতার (অর্থাৎ, বেশি বিরতি না দিয়ে) করে যাওয়া সুন্নাত।

১. হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)–এর মতে তাইয়াম্মুমের মধ্যে দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত নয়। (مراقى الفلاح)

২. عناية গ্রন্থকার মাসেহ করার এই তরীকা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলে দাবী করেছেন, অন্য অনেকে তা অস্বীকার করলেও এরূপ করা সুন্নাত তরীকার খেলাফ হবে বলে মন্তব্য করেননি। তবে যেকোনো রূপে পুরো হাত মাসেহ করা সম্পন্ন হলেই তাইয়াম্মুমের ফরয আদায় হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

* তাইয়াম্মুম উযুর ন্যায়, তাই উযুর মধ্যে মুখ ও হাত ধোয়ার যে দুআ পড়া হয়, এমনিভাবে উযুর শেষে যে সব দুআ পড়া হয়, তাইয়াম্মুমের বেলায়ও সেগুলো পড়ার হুকুম একই হবে। (كتاب الأذكار)

## কি কি বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েয

পাক মাটি, কংকর, বালি, চুনা, মাটির তৈরী কাঁচা অথবা পাকা ইট, ধুলা-বালি, মাটি, পাথর ইটের তৈরী দেয়াল, পাকা বাসন, (তেল লেগে না থাকলে)। লাকড়ি বা কাপড়ে অথবা অন্য কোনো পাক বস্তুতে ধুলাবালি লেগে থাকলে এসব বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা যাবে। (العالمغيرية والدر المختار)

## কোন্ অপবিত্রতায় তাইয়াম্মুম করা যায়

উপরে অপ্রকৃত নাপাকীর (নাজাছাতে হুক্মী তথা বে-উযূ বে-গোসল হওয়ার অবস্থা) বর্ণনা করা হয়েছে। ছোট বড় যেকোনো অপ্রকৃত নাপাকী অবস্থায় তাইয়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে প্রকৃত নাপাকীর বেলায় তাইয়াম্মুম করলে যথেষ্ঠ হবে না বরং ধৌত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, উযূ ও গোসলের জন্য এক রকম তাইয়াম্মুমই করতে হবে। এক তাইয়াম্মুমই উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

## কখন তাইয়াম্মুম করতে হবে

নিম্নলিখিত কারণগুলো ব্যতীত তাইয়াম্মুম জায়েয নয়।

১. পানি এক মাইল অথবা তদুর্ধ অথবা এর চেয়েও দূরে থাকতে হবে।
২. পানির কূপ আছে, কিন্তু পানি উঠানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকলে।
৩. পানির নিকট কোনো ক্ষতিকর প্রাণী অথবা কোন শত্রু থাকলে এবং কাছে গেলে কোনো বিপদের আশংকা থাকলে।
৪. রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ অথবা মোটরগাড়ীতে আরোহণ অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে অথবা উযূ করার সুযোগ না থাকলে বা উযূ করতে গেলে গাড়ী ছেড়ে দেয়ার ভয় থাকলে। তবে রেলগাড়ী বা মোটরে তাইয়াম্মুমের জন্য শর্ত হল (এক) রেলগাড়ীর অন্য কোনো ডাব্বায় (বগিতে) পানি নেই (দুই) পথিমধ্যে এক মাইলের (১.৬০৯ কি.)–এর মধ্যে পানি অর্জন করা যাবে– এরূপ জানা নেই।
৫. পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি অথবা রোগ সৃষ্টি অথবা স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ভয় হলে। অবশ্য এসব ব্যাপারে অনর্থক সন্দেহ করে তাইয়াম্মুম না করা চাই। তবে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার অথবা রোগ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে, যেমনঃ সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত লোক শীতকালে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হয়, এমতাবস্থায় গরম পানি দিয়ে গোসল অথবা উযূ করা দরকার। গরম পানি সংগ্রহ করতে না পারলে অথবা গরম পানি ব্যবহার করলেও ক্ষতির আশংকা হলে তাইয়াম্মুম করবে।



৬. অল্প পানি থাকায় উযূ করলে পিপাসায় কষ্ট করতে হবে অথবা খাবার পাক করতে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে।
৭. পানি আছে, কিন্তু নিজে উঠে গিয়ে আনতে সক্ষম নয়, আর পানি এনে দেয়ার জন্য অন্য লোকও না পাওয়া যায়।
৮. যে নামাযের কাযা হয় না, উযূ অথবা গোসল করতে গেলে এমন নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে। যেমনঃ দুই ঈদের নামায, জানাযার নামায। এগুলোতে উযূ ব্যতীত তাইয়াম্মুম করা যায়।

(اسلامی فقہ، احسن الفتاوی وعالمگیری থেকে গৃহীত।)

* উল্লেখ্য, কোন লোকের গোসলের প্রয়োজন, কিন্তু গোসল করলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, উযূ করলে কোনো ক্ষতি হবে না, তখন সে গোসলের জন্য তাইয়াম্মুম করে নিবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উযূ করে নামায পড়বে। পানির পরিমাণ যদি অল্প হয় ও মাত্র একবার করে মুখ হাত ও পা ধৌত করা যায়, এমতাবস্থায় তাইয়াম্মুম করবে না– উযূর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলেই হবে, উযূর সুন্নাত অর্থাৎ, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ছেড়ে দিতে হবে।

* তাইয়াম্মুম করে নামায আদায় করার পর কোন লোক জানতে পারলে যে পানি নিকটেই আছে, তখন তাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না। পানি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকলে তখন এ হুকুম প্রযোজ্য হবে; নতুবা উযূ করে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। নামাযের শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে শেষ ওয়াক্তেই নামায পড়া মোস্তাহাব। যেমনঃ রেলগাড়ী অথবা মোটরে আরোহণ করার পর জানতে পারল যে, নামাযের শেষ ওয়াক্তে রেলগাড়ী অথবা মোটরগাড়ী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে যেখানে পানি আছে, তখন বিলম্ব করেই নামায পড়বে। তবে গাড়ী পৌঁছার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাইয়াম্মুম করেই নামায পড়বে।

* কোন লোক পানি অনুসন্ধান করে তাইয়াম্মুম করে নামায আদায় করল, অথচ নামাযের সময় থাকতেই পানি পাওয়া গেল, তখন তাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না।

* রেলগাড়ীতে বা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করলে মাটি ও পানি না পাওয়া গেলে উযূ ও তাইয়াম্মুম ব্যতীত নামাযের নকল (تشبه بالمصلي) করবে অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত ছাড়া শুধু নামাযের মত উঠা-বসা ইত্যাদি করবে। এমনিভাবে কোন লোক জেলখানায় থাকাকালীন পানি ও মাটি না পেলে উযূ ও তাইয়াম্মুম বিহীন অনুরূপভাবে নামাযের ন্যায় করবে। তবে উভয় অবস্থায় পানি পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। মানুষের সৃষ্ট কোন অপারগতায় কেউ উপনীত হলে তার হুকুমও পূর্বের ন্যায়। যেমনঃ কোন লোকের জেলখানায় থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার উযূর পানি বন্ধ করে দিল, তখন তাইয়াম্মুমের ব্যবস্থাও করতে না পারলে সে অনুরূপভাবে নামাযের ন্যায় করবে।

### কোন্ কোন্ কারণে তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়

১. যেসব কারণে উযূ ভঙ্গ হয় তাইয়াম্মুমও সেসব কারণে ভঙ্গ হয়।
২. যেসব কারণে গোসল ফরয হয় সেসব কারণে তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়।
৩. যেসব কারণে তাইয়াম্মুম করা হয়েছিল, সেসব কারণ রহিত হয়ে গেলে তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৪. পানি পাওয়ার পর তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

## হায়েয নেফাস ও ইস্তেহাযা ইত্যাদি

### হায়েযের পরিচয়

প্রতি মাসে বালেগা মেয়েদের যৌনাঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে হায়েয বলে। কুরআন ও হাদীছে এই রক্তকে নাপাক বলা হয়েছে।

* সাধারণত ৯ বৎসরের পূর্বে এ রক্ত দেখা দেয় না। ৯ বৎসর বয়সের পূর্বে এ ধরনের রক্ত দেখা দিলে তা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে। (تحفہ خواتین)

* ৫৫ বৎসর বয়সের পর সাধারণত হায়েযের রক্ত আসে না। অতএব ৫৫ বৎসর পার হওয়ার পরও কোন মেয়েলোকের রক্তস্রাব দেখা দিলে তার রং যদি লাল অথবা কালো হয় তাহলে তাকে হায়েযই মনে করতে হবে। রং যদি হলুদ বা সবুজ বা মেটে হয়, তাহলে তাকে হায়েয গণ্য করা হবে না



বরং সেটা ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। অবশ্য ঐ মেয়েলোকের যদি পূর্বেও হলূদ, সবুজ বা মেটে বর্ণের রক্তস্রাব হওয়ার অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে ৫৫ বৎসরের পরও অনুরূপ বর্ণের রক্তকে হায়েয ধরা হবে। (خواتین کے شرعی احکام)

* হায়েযের সময়সীমার মধ্যে লাল, হল্‌দে, মেটে, সবুজ, কাল যে কোনো প্রকার রং-এর রক্তকে হায়েযের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখা দিবে তখন মনে করতে হবে যে, হায়েয বন্ধ হয়েছে। সাদা রংয়ের পূর্বে সব ধরনের রংই হায়েযের রং। (خواتین کے شرعی احکام)

* রক্ত যোনির ছিদ্রের বাইরে আসার পর (যোনি মুখের চামড়ার বাইরে না এলেও) থেকেই হায়েযের শুরু ধরা হবে। রক্ত ভিতরে থাকার কোনো ধর্তব্য নেই। যদি ছিদ্রের মুখে তুলা দিয়ে রাখে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের তুলায় রক্তের দাগ দেখা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে পবিত্র মনে করবে। যখন রক্তের চিহ্ন বাইরে ছড়িয়ে পড়বে অথবা ছিদ্রের তুলা সরিয়ে দেয়ার পর রক্ত বের হতে শুরু করবে, তখন থেকে হায়েযের শুরু ধরতে হবে। (১/[illegible] شرح وقایہ)

* পবিত্র অবস্থায় যোনির ভেতরে তুলা ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। সকালে উঠে তার মধ্যে রক্তের দাগ নজরে পড়ল, তাহলে যখন থেকে দাগ নজরে পড়েছে তখন থেকে হায়েযের হিসাব শুরু হবে। (شرح وقایہ)

### হায়েযের সময়সীমা

হায়েযের সময়সীমা কমপক্ষে ৩ দিন ৩ রাত এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন ১০ রাত।

* হায়েযের সময়ে অর্থাৎ হায়েযের দিনগুলোতে সর্বক্ষণ রক্ত আসা জরুরি নয় বরং নিয়মমত রক্ত আসার পর অভ্যাসের দিনগুলোতে বা ১০ দিন ১০ রাতের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুই চার ঘণ্টা বা এক দিন আধ দিন রক্ত বন্ধ থেকে আবার এলেও সেই মাঝখানের সময়কেও হায়েযের সময় ধরা হবে। (تحفہ خواتین)

### হায়েযের মাসায়েল

যেহেতু হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা কমপক্ষে ৩ দিন ৩ রাত আর সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন ১০ রাত, অতএব কোনো স্ত্রীলোকের ৩ দিন ৩ রাতের কম রক্তস্রাব হলে হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না, তাকে ইস্তেহাযার রক্ত ধরা হবে। এমনিভাবে ১০ দিন ১০ রাতের অধিক রক্তস্রাব

হলে সর্বশেষ যে হায়েয এসেছিল তার চেয়ে যে কয়দিন বেশি হবে সে কয়দিনের রক্ত হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না, তাকে ইস্তেহাযার রক্ত ধরা হবে। ইস্তেহাযার মাসায়েল পরে আলোচনা করা হয়েছে।

* যদি কোনো মেয়েলোকের জীবনের প্রথম রক্তস্রাব শুরু হয়েই ১০ দিনের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে মাসআলা হল সে ১০ দিন ১০ রাত হায়েয গণ্য করবে, অবশিষ্ট দিনগুলো এস্তেহাযা গণ্য করবে। আর যদি এরূপ মেয়েলোকের রক্ত বরাবর জারি থাকে মোটেই বন্ধ না হয়, তাহলে প্রতিমাসে ১০ দিন ১০ রাত হায়েয এবং মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এস্তেহাযা গণ্য করবে। (تحفۂ خواتین)

## দুই হায়েযের মধ্যবর্তী স্রাব বা পবিত্রতার কিছু মাসায়েল

* দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ দিন পবিত্র থাকার সময়। অতিরিক্ত কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। অতএব যদি কোন মেয়েলোকের ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়ার পর ১৫ দিন পাক থাকে এবং আবার ১ অথবা ২ দিন রক্ত দেখে তাহলে মাঝখানের ১৫ দিন পবিত্রতার সময় আর এদিক ওদিক যে ১ বা ২ দিন রক্ত দেখেছে তা হায়েয নয় বরং তা ইস্তেহাযা। কারণ ৩ দিনের কম হায়েয হয় না। (خواتین کے شرعی احکام)

* যদি কোনো মেয়েলোকের ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখা দেয়, তারপর ১৫ দিন পাক থাকে; আবার ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখা দেয়, তাহলে পূর্বের ৩ দিন ৩ রাত এবং পরের ৩ দিন ৩ রাত হায়েয ধরা হবে আর মধ্যকার দিনগুলো পাক থাকার সময়। (خواتین کے شرعی احکام)

* কোনো স্ত্রীলোকের ৩ দিনের কম ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব হয়ে পুনরায় ১ অথবা ২ দিন পাক থাকার পর আবারও যদি রক্তস্রাব দেখা দেয়, সবগুলোকে হায়েয ধরে নিতে হবে।

* কারও ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়ার পর ১৫ দিনের কম অর্থাৎ, ১০/১২ দিন রক্তস্রাব বন্ধ রইল, তারপর আবার রক্তস্রাব দেখা দিল, এমতাবস্থায় যত দিন অভ্যাসের দিন ছিল, ততদিন হায়েয গণনা করা হবে, অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসাবে ধরে নিতে হবে।

* যদি কোনো মেয়েলোকের এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার রক্ত দেখা দেয় এবং সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায ছেড়ে দিতে থাকে আর ৩ দিন ৩ রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই



সে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর আবার ১৫/২০ দিন কোন রক্ত দেখা না যায়, তাহলে (বুঝতে হবে এই রক্ত হায়েযের রক্ত নয়; কেননা ৩ দিন ৩ রাতের কম হায়েয হয় না। অতএব) হায়েয মনে করে যে নামাযগুলো ছেড়ে দিয়েছিল তার কাযা করতে হবে। (تحفۂ خواتین)

* দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কয়েক মাস বা বৎসর পর্যন্ত যদি রক্ত দেখা না দেয়, তবুও পুরো সময়কে পাক ধরতে হবে। (تحفۂ خواتین)

## লিকুরিয়া বা সাদা স্রাবের মাসায়েল

স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রবাহনের ফলে যে রস বা সাদা স্রাব (লিকুরিয়া) নির্গত হয়, এতে উযূ নষ্ট হয়, গোসল করা আবশ্যক হয় না। আজকাল অনেক মহিলারই এ রোগ দেখা যায়। তাই এর মাসায়েল ভালভাবে বুঝে নেয়া চাই।

* যদি সর্বক্ষণ এই স্রাব বের হতে থাকে এবং পুরো ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও না পায় যাতে পবিত্র হয়ে নামায পড়ে নিতে পারে, তাহলে সে মাযূর বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন উযূ করে নামায আদায় করে নিবে এবং উযুর পূর্বে স্রাব ধৌত করে নিবে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে স্রাব দেখা দিলেও সে অবস্থায় সে কাপড়েই নামায হয়ে যাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে এই স্রাব দেখা দেয় এবং মাঝে মধ্যে বন্ধ থাকে, তাহলে সে বন্ধ থাকার সময়ে নামায পড়ে নিবে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে স্রাব দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিয়ে পুনরায় উযূ করে নামায পড়বে এবং কাপড়ে লেগে থাকলে কাপড়ও পরিবর্তন করে নিবে। (آپکے مسائل اور ان کا حل. ج/۲)

## হায়েযের অভ্যাস পরিবর্তন হওয়া সংক্রান্ত মাসায়েল

* কোনো স্ত্রীলোকের সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে ৩ দিন রক্তস্রাব হয়, তার হায়েযের সময়সীমা ৩ দিন ধরে নিতে হবে, এটাই তার অভ্যাস। কোন মাসে তার ৭ দিন রক্তস্রাব হলে সেটাকেও হায়েয মনে করতে হবে, কেননা হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা ১০ দিন। তবে পরবর্তী কোন মাসে তার রক্তস্রাব ১০ দিনের বেশি হলে যেমন: ১২ দিন অথবা ১৫ দিন হলে, তখন পূর্ববর্তী মাসে যে কয়দিন রক্ত এসেছিল সেই কয়দিন হায়েয হিসাবে পরিগণিত হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরে নিতে হবে।

* কোনো স্ত্রীলোকের হায়েযের অভ্যাস ৩ দিন, কিন্তু একমাসে তার ৪ দিন স্রাব হলো। তার পরবর্তী মাসে ১৫ দিন স্রাব হল, এমতাবস্থায় যেহেতু

এক মাসে তার ৪ দিন রক্ত এসেছিল, সে জন্য তার অভ্যাস ৪ দিনই মনে করে নিতে হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোর নামায কাযা করতে হবে। তবে এ কাযা আদায় করার জন্য ১০ দিন বিলম্ব করতে হবে। কেননা ১০ দিন পর্যন্ত অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ১০ দিন চলে যাওয়ার পরও রক্ত বন্ধ না হওয়ায় পরিষ্কার ধরে নিতে হবে যে, ৪ দিনের চেয়ে যতগুলো দিন বেশি রক্তস্রাব হয়েছে সেগুলো ইস্তেহাযার রক্ত। আর যে মাসে তার ৮ দিন অথবা ৯ দিন অথবা ১০ দিন রক্তস্রাব হয়, তখন পূর্ববর্তী অভ্যাস ধর্তব্য হবে না। বরং এই ৮ অথবা ৯ অথবা ১০ দিনই তার হায়েয। কেননা ১০ দিন পর্যন্ত হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ। মনে করতে হবে তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য ১০ দিনের বেশি রক্তস্রাব হলে পূর্বের মাসের ঐ ৪ দিনকেই তার অভ্যাসের দিন বলে মনে রাখতে হবে।

* কারও অভ্যাস ৩ দিনের। হঠাৎ এক মাসে দেখা গেল ৩ দিনের পরও স্রাব বন্ধ হয়নি, তাহলে গোসল করার দরকার নেই। নামাযও পড়তে হবে না। যদি ১০ দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটা হায়েয এবং সব নামায মাফ। মনে করতে হবে অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। আর যদি ১০ দিনের পরে একাদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে বা আরও পরে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে মনে করতে হবে ৩ দিন হায়েয ছিল, বাকিটা ইস্তেহাযা। তাই গোসল করে ৩ দিন বাদ দিয়ে বাকি দিনের নামায কাযা করতে হবে। (فتح القدير)

সারকথা এই যে, ১০ দিন পার হয়ে গেলে অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাবকে নিঃসন্দেহে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে, হায়েয মনে করা যাবে না। কিন্তু ১০ দিনের মধ্যে রক্তস্রাবের অভ্যাস সর্বদা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন সর্বদা ৪ দিন রক্তস্রাব হতো, মুহার্‌রম মাসে ৫ দিন আসল, আবার সফর মাসে ১২ দিন আসল, তখন ঐ ৫ দিনকেই তার অভ্যাস মনে করতে হবে। কিন্তু সফর মাসে ৯ দিন এসে থাকলে মনে করতে হবে যে, তার পূর্বের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কেননা ১০ দিনের মধ্যে অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

## হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে নামায রোযার মাসায়েল

* হায়েযের সময়ে নামায পড়া ও রোযা রাখা নিষেধ। তবে নামায ও রোযার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। নামায পরিপূর্ণভাবে মাফ হয়ে যায়, আর কখনও কাযা করতে হয় না, কিন্তু রোযা সাময়িক মাফ হয়, হায়েয শেষে আবার রোযার কাযা করতে হয়। (البحر الرائق ج/١)



* ফরয নামায পড়াকালে যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সেই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, সেই চলতি নামাযও মাফ হয়ে যাবে। হায়েয শেষে সেটার কাযা পড়তে হবে না। (تحفۂ خواتین، الجوهرة النيرة)

* নফল বা সুন্নাত নামায পড়াকালে রক্ত দেখা দিলে সে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং সেটা পরে কাযা করতে হবে। (تحفۂ خواتین)

* ওয়াক্তের নামায এখনো পড়েনি, কিন্তু নামায পড়ার মত সময় এখনও আছে, অর্থাৎ ওয়াক্তের শেষ অবস্থা, এমতাবস্থায় যদি হায়েয শুরু হয়, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামাযও মাফ হয়ে যাবে, কাযা পড়তে হবে না। (خواتین کے شرعی احکام، تحفۂ خواتین)

* রোযা শুরু করার পর যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সেটারও পরে কাযা করতে হবে, চাই সেটা ফরয রোযা হোক বা নফল রোযা। (تحفۂ خواتین)

* যদি কারও ১০ দিনের কম সময় স্রাব হয় এবং এমন সময় গিয়ে রক্ত বন্ধ হয়, যদি খুব তাড়াহুড়া করে গোসল করে নেয়, তাহলে পবিত্রতার পর এতটুকু সময় থাকবে, যার মধ্যে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাঁধা যায়, তাহলেও সেই ওয়াক্তের নামায ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় নামায শুরু করার পর যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবুও নামায পুরো করে নিবে। তবে ফজরের ওয়াক্ত হলে যদি নামায শুরু করার পর সূর্য উদিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায কাযা করতে হবে। আর যদি সময় তার চেয়ে কম হয়, অর্থাৎ, এমন সময় গিয়ে রক্ত বন্ধ হয়, যে খুব তাড়াহুড়া করে গোসল করে নিয়ে পবিত্রতা অর্জনের পর এতটুকু সময় থাকবে না, যার মধ্যে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাঁধা যায়, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামায মাফ, তার কাযা করতে হবে না। (تحفۂ خواتین)

* যদি পরিপূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয়, যার মধ্যে শুধু একবার 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় আছে, তারপরেই নামাযের সময় শেষ, গোসলেরও সময় নেই। তবুও ঐ ওয়াক্তের নামায ওয়াজিব হবে। পরে কাযা পড়তে হবে। (تحفۂ خواتین)

* যদি রমযান মাসে দিনের বেলায় হায়েয বন্ধ হয়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারের মতই থাকতে হবে, পানাহার করতে পারবে না। অবশ্য পরে এ দিনটির রোযার কাযাও করতে হবে। (شرح الوقاية ج/١)

* যদি কেউ পূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত পর রাতের শেষভাগে গিয়ে পবিত্র হয়, যখন পাক হয়েছে তখন রাতের এতটুকু সময়ও হাতে নেই, যার মধ্যে একবার আল্লাহু আকবার বলতে পারে। তবুও পরের দিনের রোযা ওয়াজিব। আর যদি ১০ দিনের কমেই হায়েয বন্ধ হয় এবং এতটুকু রাত অবশিষ্ট থাকে, যার মধ্যে তড়িঘড়ি করে গোসল করে নিতে পারে তবে একবার 'আল্লাহু আকবার'ও বলা যায় না, তবুও পরের দিনের রোযা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় গোসল না করে থাকলে গোসল ছাড়াই রোযার নিয়ত করে নিবে। সকাল বেলায় গোসল করে নিবে। আর যদি সময় তার চেয়েও কম থাকে, অর্থাৎ, গোসল করা পরিমাণ সময়ও না থাকে, তাহলে রোযা জায়েয হবে না। তাই সে রোযা রাখবে না, তবে সারাদিন তাকে রোযাদারের মতই থাকতে হবে। পরে কাযা করতে হবে। (شرح الوقاية ج/١)

* ১/২ দিন হায়েয হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হয় না। উযূ করে নামায পড়তে থাকবে। তবে এখনই সহবাস করা দোরস্ত নয়। যদি ১৫ দিনের মধ্যে আবার স্রাব শুরু হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সেটা হায়েযের সময় ছিল। এমতাবস্থায় হিসাব করে যত দিন হায়েযের সেটাকে হায়েয মনে করবে। এবং এখন গোসল করে নামায পড়তে শুরু করবে। আর যদি পূর্ণ ১৫ দিন রক্ত দেখা না যায়, তাহলে মনে করতে হবে সেটা ইস্তেহাযার রক্ত ছিল। সুতরাং সেই সময়ে বাদ পড়া নামাযগুলোর কাযা পড়তে হবে।

* যদি কোন মেয়েলোকের এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার রক্ত দেখা দেয় এবং সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায ছেড়ে দিতে থাকে আর ৩ দিন ৩ রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর আবার ১৫/২০ দিন কোনো রক্ত দেখা না যায়, তাহলে হায়েয মনে করে যে নামাযগুলো ছেড়ে দিয়েছিল তার কাযা করতে হবে। (تحفۂ خواتین)

* হায়েযের অবস্থায় যে কাপড় পরিহিত ছিল, সে কাপড়ে যদি হায়েযের নাপাকী বা অন্য কোনো নাপাকী না লেগে থাকে, তাহলে সে কাপড় ব্যবহার করে নামায আদায় করাতে কোনো ক্ষতি নেই। যদি কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকে, তাহলে সে স্থানটুকু ধৌত করে তাতে নামায পড়া যাবে, পুরো কাপড় ধৌত করা জরুরি নয়। (تحفۂ خواتین)



## হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে সহবাসের মাসায়েল

* হায়েয চলাকালীন সহবাস জায়েয নেই। সহবাস ছাড়া আর সবকিছুই জায়েয; অর্থাৎ, একসঙ্গে খানা-পিনা করা, বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণ করা সবই জায়েয। (البحر الرائق ج/١)

* স্বামী স্ত্রীর হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থানে তার কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে লজ্জত হাসেল করতে পারবে না। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী যৌন তৃপ্তি মেটাতে পারে না, শরীআতমতে তা হারাম, হেকিমীমতেও এ অবস্থায় যৌন ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বামী এরূপ করতে চাইলে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে নরমে বুঝিয়ে বিরত রাখবে। হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সম্মতিতে সহবাস হলে স্ত্রীও গোনাহগার হবে।

* স্বামী তার হায়েযা স্ত্রীর নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে হাত বা কোনো অঙ্গ লাগাবে না। নাভির উপর থেকে মাথা পর্যন্ত অন্যান্য স্থানে হাত লাগাতে পারবে, চুমু দিতে পারবে। (تحفۂ خواتین)

* হায়েয অবস্থায় মহিলার শরীর ও মুখের লালা পবিত্র। হ্যাঁ যদি শরীরে রক্ত বা অন্য কোনো নাপাকী লাগে তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে শরীর নাপাক হবে। অন্যথায় শুধু হায়েযের কারণে তার শরীর নাপাক বলে গণ্য হবে না। অতএব হায়েয অবস্থায় তার শরীরের সাথে ছোয়া লাগলে বা স্বামী স্ত্রীর মুখের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করালে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

* যদি কারও ১০ দিনের মধ্যেই অভ্যাস মোতাবেক ৫ দিন, ৬ দিন, ৭ দিন, ৮ দিন অথবা ৯ দিনে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত তার সঙ্গে সহবাস জায়েয হবে না। হ্যাঁ, যদি এক ওয়াক্ত নামাযের সময় চলে যায় (অর্থাৎ, এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যার মধ্যে গোসল সেরে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারা যায়) এবং তার উপর এক ওয়াক্ত নামাযের কাযা ওয়াজিব হয়, তারপর গোসলের পূর্বেও সহবাস জায়েয হবে। (تحفۂ خواتین البحر الرائق ج/١)

* যদি কারও অভ্যাস অনুযায়ী হায়েযের যে কয়দিন ছিল তার পূর্বেই স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, যেমন: অভ্যাস ছিল ৫ দিনের, ৪ দিনেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু সহবাস জায়েয হবে না। কারণ, হতে পারে আবার স্রাব শুরু হয়ে যাবে। ৫ দিন পার হওয়ার পর সহবাস জায়েয হবে। (البحر الرائق ج/١)

* যদি পরিপূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হয় এবং হায়েয বন্ধ হওয়ার পরও অলসতাবশত স্ত্রী গোসল না করে, তাহলে গোসলের পূর্বেও সহবাস জায়েয হবে। তবে গোসলের পূর্বে সহবাস থেকে বিরত থাকা উত্তম। (تحفۂ خواتین، البحر الرائق ج/١) এটাই পবিত্র মানসিকতার পরিচায়ক।

* ১ বা ২ দিন হায়েয হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হয় না। উযূ করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা হায়েযের সর্বনিম্ন সময় ৩ দিন ৩ রাত। ৩ দিন ৩ রাতের কম স্রাব হলে তা হায়েয বলে গণ্য হয় না। তবে এখনই সহবাস করা দোরস্ত হবে না। কেননা যদি ১৫ দিনের মধ্যে আবার স্রাব শুরু হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সেটা হায়েযের সময় ছিল। (بہشتی زیور)

## নেফাস কাকে বলে

সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্ত্রীলোকের যোনি থেকে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নেফাস বলে।

* এক গর্ভে কয়েকটা সন্তান হলে (৬ মাসের মধ্যে) প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর থেকেই নেফাসের মেয়াদ গণনা করা শুরু করা হবে। দ্বিতীয় সন্তান থেকে নয়। (خواتین کے شرعی احکام)

## নেফাসের সময়সীমা

* নেফাসের সময়সীমা সর্বোচ্চ ৪০ দিন। ৪০ দিনের পরেও রক্ত আসতে থাকলে সেটা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং সেটাকে ইস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য করা হবে। ইস্তেহাযা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

* নেফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোনো সীমা নেই। দুই চার ঘণ্টা বা দুই চার দিন বা পাঁচ দশ দিন ইত্যাদি যেকোনো পরিমাণ সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি সন্তান প্রসবের পর রক্ত একেবারেই নাও আসতে পারে।

* প্রসবের পর যদি কারও একেবারেই রক্ত না যায়, তবুও তাকে গোসল করতে হবে। এই গোসল ফরয। (১/□□ تحفۂ خواتین و شرح وقایہ)

* নেফাসের সময়সীমার মধ্যে সর্বক্ষণ রক্ত আসা জরুরি নয় বরং মেয়াদের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুই চার ঘণ্টা বা দুই এক দিন রক্ত বন্ধ থেকে আবার এলেও সেই মাঝখানের সময়কেও নেফাসের সময় ধরা হবে। (تحفۂ خواتین)



## নেফাসের মাসায়েল

* ৪০ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নিতে হবে। নিজেকে পাক মনে করে নামায পড়া আরম্ভ করতে হবে। কোন কোন এলাকায় মহিলাদের মধ্যে প্রচলন আছে যে, ৪০ দিনের আগে রক্ত বন্ধ হলেও ৪০ দিন পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকে, এটা ঠিক নয়।

* ৪০ দিনেও রক্ত বন্ধ না হলে এবং এটা মহিলার জীবনের প্রথম নেফাস হয়ে থাকলে ৪০ দিনে নেফাস শেষ ধরা হবে এবং গোসল করে নিয়ে নামায পড়া শুরু করতে হবে। ৪০ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাব ইস্তেহাযা হিসাবে ধরে নিতে হবে। সেমতে এস্তেহাযার মাসায়েল অনুযায়ী প্রতি ওয়াক্তে নতুন উযূ করে নামায পড়তে থাকবে। আর এটা মহিলার জীবনে প্রথম নেফাস না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী নেফাসে যে কয়দিন রক্তস্রাব এসেছিল সে কয়দিন পরই তাকে পবিত্র ধরা হবে। তার থেকে অতিরিক্ত দিনগুলোকে এস্তেহাযা ধরে নিতে হবে। অভ্যাসের অতিরিক্ত যে কয়দিনকে সে নেফাস মনে করে নামায ছেড়ে দিয়েছে তার কাযা করতে হবে। (تحفۂ خواتین)

* কোন মেয়েলোকের হয়তো ৩০ দিন রক্ত যাওয়ার অভ্যাস ছিল, কিন্তু একবার ৩০ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হল না; এমতাবস্থায় এই মেয়েলোক এখন গোসল না করে অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি পূর্ণ ৪০ দিন শেষে বা ৪০ দিনের ভিতর রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে এই সব কয় দিনই নেফাসের মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ৪০ দিনের বেশি রক্ত জারি থাকে, তাহলে পূর্বের অভ্যাস মোতাবেক ৩০ দিন নেফাসের মধ্যে গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। ৪০ দিন পর গোসল করে নামায পড়তে থাকবে এবং ৩০ দিনের পরের ১০ দিনের নামাযের কাযা করবে। (خواتین کے شرعی احکام)

* নেফাসের অবস্থায় সহবাস ও হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থান ভোগ করা জায়েয নেই। তবে একসঙ্গে খানা-পিনা, বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণ সবই জায়েয। (تحفۂ خواتین)

## হায়েয ও নেফাস উভয়টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মাসায়েল

(নিম্নের মাসআলাগুলো হায়েয ও নেফাস উভয় অবস্থার জন্য প্রযোজ্য।)

* হায়েয, নেফাস অথবা অন্য যেকোনো কারণে যে নারীর ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে পড়েছে তার জন্য মসজিদে যাওয়া হারাম। সে কা'বা

শরীফ তওয়াফ করতে পারবে না; কুরআন শরীফ পড়তে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি কুরআন শরীফের উপর জুযদান লাগানো থাকে অথবা রুমাল দিয়ে জড়ানো থাকে তাহলে জুযদান অথবা রুমালের উপর দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যদি কাগজ বা চামড়ার আস্তর থাকে এবং যদি সেটা কুরআন শরীফের সঙ্গে সেলাই করা না হয় কিংবা আঠা দিয়ে আঁটকানো না থাকে, তাহলে তার উপর দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয আছে। (بہشتی زیور نقلا عن مجمع الأنهر ج/١)

* যার উযূ নেই সেও কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে না। তবে মুখস্থ পড়তে পারবে। (بہشتی زیور)

* যে টাকা-পয়সা বা বরতনে বা তাবীজে কুরআনের কোনো আয়াত লেখা আছে উল্লেখিত জনেরা সেই টাকা-পয়সা, তাবীজ এবং বরতনও স্পর্শ করতে পারবে না। হ্যাঁ, কোন থলি বা পাত্রে রাখলে সে থলি বা পাত্র স্পর্শ করতে পারবে এবং থলি বা পাত্রের গায়ে ধরে উঠাতেও পারবে। (البحر الرائق ج/١)

* গায়ের জামা এবং ওড়না দিয়েও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং উঠানো জায়েয নয়। হ্যাঁ, গা থেকে আলাদা কাপড় দিয়ে ধরতে ও উঠাতে পারবে। যেমনঃ রুমাল দিয়ে ধরে উঠাতে পারবে। (أيضا)

* যদি পরিপূর্ণ আয়াত তেলাওয়াত না করে বরং কোনো একটি শব্দ অথবা আয়াতের অর্ধেকটা তেলাওয়াত করে তাহলে জায়েয আছে। অবশ্য সেই অর্ধেক আয়াতটুকু ছোট কোন আয়াতের সমান হতে পারবে না। (أيضا)

* কোনো মেয়ে হেফ্জ করা অবস্থায় হায়েয এসে গেলে এবং মুখস্থ করার জন্য তেলাওয়াতের প্রয়োজন দেখা দিলে বা কোনো হাফেজা মেয়ে হায়েয অবস্থায় কুরআন হেফজ্ রাখার জন্য তেলাওয়াত জারি রাখতে চাইলে মনে মনে তেলাওয়াত করবে, মুখে উচ্চারণ করে নয়। (آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/٢)

* সূরা ফাতেহা অথবা কুরআনে কারীমের অন্য কোনো দুআর আয়াত (যেমনঃ আয়াতুল কুরছী) যদি তেলাওয়াতের নিয়তে না পড়ে বরং দুআর নিয়তে পড়ে, তাহলে কোনো গোনাহ নেই। (البحر الرائق ج/١)

* দুআ কুনূত পড়াও জায়েয আছে। (أيضا)



* যদি কোনো মহিলা বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন তাহলে তিনি বানান করে পড়াতে পারবেন এবং রিডিং পড়ানোর সময় এক দুই শব্দ করে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা শ্বাসে পড়তে পারবেন। (أيضا)

* হায়েয নেফাস অবস্থায় কালিমা, দুরূদ শরীফ, এস্তেগফার, আল্লাহ্‌র নাম নেয়া জায়েয। لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ ইত্যাদির ওযীফাও পাঠ করা যায়। (البحر الرائق ج/١)

* হায়েয নেফাসের অবস্থায় নামাযের সময়ে উযূ করে নামাযের স্থানে নামায আদায় করার পরিমাণ সময় বসে থেকে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকবে, যেন ইবাদতের অভ্যাস বজায় থাকে। এটা মোস্তাহাব। (أيضا)

* হায়েয অবস্থায় মহিলারা প্রতি নামাযের ওয়াক্তে সত্তর বার এস্তেগফার পাঠ করলে এক হাজার রাকআত নফল নামাযের ছওয়াব পাবে, সত্তরটা গোনাহ মাফ হবে এবং দরজা বুলন্দ হবে। (تاتار خانیہ)

* গোসল ফরয ছিল, গোসলের পানি ছিল না, যখন পানি পাওয়া গেছে তখন হায়েয নেফাস শুরু হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আর গোসলের প্রয়োজন নেই। স্রাব থেকে পাক হওয়ার পর একবারেই গোসল করে নিতে পারবে। (بہشتی زیور)

* কোন মহিলার বাচ্চা প্রসব হচ্ছে। কিছু (অর্ধেকের কম) বের হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি হুঁশ থাকে, বিবেক সুস্থ থাকে, তাহলে নামায পড়া ওয়াজিব। কাযা করতে পারবে না। আর যদি বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নামায পড়বে না। পরে কাযা পড়বে। অনুরূপভাবে ধাত্রী যদি মনে করে সে নামায পড়তে গেলে সদ্যপ্রসূত শিশুটির ক্ষতি হবে, তাহলে সেও নামায কাযা করতে পারবে। (البحر الرائق ج/١ وغيره) সিজারকারী ডাক্তারও এই মাসআলা অনুযায়ী আমল করবেন।

* হায়েয ও নেফাসের পর সত্বর গোসল করে নামায আরম্ভ করতে হবে। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যত ওয়াক্তের নামায ছুটবে তার জন্য পাপ হবে।

* হায়েয ও নেফাস অবস্থায় নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অবশ্য নামায ও রোযার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হায়েয ও নেফাস অবস্থায় যে নামায ছুটে গিয়েছিল সেগুলোর কাযা করতে হবে না, মাফ হয়ে গেল। তবে পবিত্র হওয়ার পর রোযার কাযা আবশ্যক। হায়েয

ও নেফাস অবস্থায় যিক্‌র, দুরূদ, দুআ, এস্তেগফার ও কুরআন শরীফে যে দুআ আছে এগুলো পড়া যায়। স্বামী-স্ত্রী একত্রে উঠা-বসা ও খানা-পিনা করতে পারে, তবে যৌন তৃপ্তি মেটাতে পারে না, শরীআতমতে তা হারাম, হেকিমীমতেও এমন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

## ইস্তেহাযা কাকে বলে

* স্ত্রী-লোকের যৌনাঙ্গ থেকে হায়েযের সর্বনিম্ন সময় ৩ দিন থেকে কম অথবা অভ্যাসের অতিরিক্ত ১০ দিনের চেয়ে বেশি যে রক্তস্রাব হয়, তাকে ইস্তেহাযা বলে।

* ৯ বৎসর বয়সের পূর্বে যদি রক্ত আসে, সেটাও ইস্তেহাযা বলে গণ্য।

* গর্ভাবস্থায় যদি রক্ত বের হয় সেটাও ইস্তেহাযা বলে গণ্য।

* বাচ্চা প্রসবের সময়ে প্রসবের পূর্বে যে রক্ত বা পানি বের হয়, সেটাও ইস্তেহাযা। বাচ্চার অর্ধেকটা বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে রক্ত বের হবে সেটাও ইস্তেহাযা।

* নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন পার হওয়ার পরও রক্ত আসতে থাকলে সেই রক্তকেও ইস্তেহাযা বলে গণ্য করা হবে।

## ইস্তেহাযার হুকুম ও মাসায়েল

* ইস্তেহাযার রক্ত এরূপ, যেমন নাক অথবা দাঁত দিয়ে পড়া রক্ত। রোগের কারণেই সাধারণত এরূপ হয়ে থাকে। নাক অথবা দাঁত দিয়ে রক্ত পড়লে যেমন নামায রোযা মাফ হয় না, তেমনি ইস্তেহাযার রক্তের কারণেও নামায রোযা মাফ হয় না।

* ইস্তেহাযার কারণে নামায রোযা মাফ হয় না। অতএব ইস্তেহাযার কারণে নামায রোযা কাযা করতে পারবে না। (شرح الوقاية)

* ইস্তেহাযা অবস্থায় নামায ত্যাগ করা যাবে না। তবে প্রত্যেক নামাযে নতুন করে উযূ করতে হবে। উযূ করে নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যে রক্ত এসে শরীর বা কাপড়ে লাগলে বা জায়নামাযে লাগলে সে অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে।

* এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারবে না। অবশ্য কয়েক ওয়াক্তের কাযা নামায এক উযূ দ্বারা আদায় করা যাবে।

* যদি ইস্তেহাযা অবস্থায় সর্বক্ষণ রক্ত না আসে বরং এরকম হয় যে, মাঝে মধ্যে আসে, মাঝে মধ্যে বন্ধও থাকে, তাহলে ওয়াক্ত আসার পর



অপেক্ষা করবে, যখন রক্ত বন্ধ থাকবে সে সময় উযূ করে নামায পড়ে নিবে।

* ইস্তেহাযা অবস্থায় উযূ করে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে পারবে, কুরআন শরীফও স্পর্শ করতে পারবে।

* ইস্তেহাযা অবস্থায় স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে। (شرح الوقاية)

## গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল

* দৈব কোন কারণে গর্ভ পড়ে গেলে সে কারণে গোনাহ হয় না।

* 'এম আর' অর্থ মাসিক নিয়মিত করণ অর্থাৎ, যে কোনো কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে যান্ত্রিক উপায়ে গর্ভস্থ রক্ত ইত্যাদি বের করে দেয়ার মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ। গর্ভে সন্তান আসার পর গর্ভপাত হলে বা এম আর করলে তার মাসআলা হল–

* গর্ভপাত হলে বা এম আর করা হলে যদি সন্তানের মধ্যে হাত, পা, নখ প্রভৃতি মানবের কোনো অঙ্গ তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে বাচ্চা ধরা হবে এবং যে রক্ত বের হবে সেটাকে নেফাসের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। এ অবস্থায় নেফাসের আহকাম চালু হবে এবং সন্তানকে গোসল ও কাফন-দাফন দিতে হবে। আর যদি কোনো অঙ্গ প্রকাশ না হয়ে থাকে তাহলে সেটার গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই বা নিয়মমত দাফনও করা হবে না। তবে যেহেতু সেটা মানুষের অঙ্গ তাই যেখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে সম্মানের সাথে কোথাও মাটিতে গেড়ে দেয়া উচিত। আর এ অবস্থায় যে রক্ত বের হবে সেটা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং দেখতে হবে এর পূর্বে যে হায়েয হয়েছে তা যদি পনের দিন বা বেশি পূর্বে হয়ে থাকে এবং এখনকার রক্ত কমপক্ষে তিন দিন দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এটা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এর পূর্বের হায়েয পনের দিনের কম সময় আগে হয়ে থাকে বা এখনকার রক্ত তিন দিনের কম দীর্ঘায়িত হয় তাহলে এটা এস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় এস্তেহাযার হুকুম জারি হবে। (امداد الفتاوي ج/١)

* উল্লেখ্য যে, বাচ্চার অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর (যার মেয়াদ ১২০ দিন) গর্ভপাত করানো জায়েয নয়। (فتاوی رحیمیہ ج/٦)

## প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা

* প্রসবের সময় প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ধাত্রী বা নার্সের সামনে শরীরের এতটুকু খোলা জায়েয, যতটুকু না খুললে নয়। এমনিভাবে প্রসবের সময় বা অন্য কোনো সময় ওষুধ লাগানোর স্বার্থেও ততটুকু পরিমাণই খোলা জায়েয– সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়া জায়েয নয়। এর জন্য উত্তম সূরত হল চাদর দ্বারা প্রসূতির শরীর ঢেকে দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় স্থানটুকু খুলে ধাত্রী প্রয়োজন সেরে নিবে।

* প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়–এমন কারও সামনে শরীর খোলা জায়েয নয়। অন্য মহিলাদের জন্যও সামনে এসে তার সতর দেখা হারাম।

* ধাত্রীর দ্বারা পেট মর্দন করাতে হলে চাদর বা কাপড়ের নিচ দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে মর্দন করাবে। নাভির নিচে কাপড় উন্মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়।

* ধাত্রী বা নার্স যদি অমুসলিম হয়, তাহলে অমুসলিম মহিলাদের সামনে যেহেতু মুখ, হাতের কবজি পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ব্যতীত শরীরের অন্য স্থান খোলা জায়েয নয়, তাই প্রসবের প্রয়োজনে যতটুকু না খুললে নয় তা ব্যতীত মাথা, হাত, চুল প্রভৃতি কোনো অঙ্গ পর্দামুক্ত করা জায়েয হবে না। (تربیت اولاد اور اسکے متعلقات)

* নিম্নোক্ত আয়াত লিখে প্রসূতির বাম রানে বেঁধে দিলে আল্লাহ চাহে তো আছানীর সাথে প্রসব হবে। প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুলে দিবে। (اعمال قرآنی)

আয়াতটি এই–

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ○ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ○ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ○
وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ○ (সূরা ইন্‌শিকাক: ১–৪)

## প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা

* প্রসূতিকে অচ্ছ্যুৎ মনে করা ভিত্তিহীন। প্রসূতি কোনো পাত্রে পানাহার করলে বা কোনো পাত্র স্পর্শ করলে সেটা না ধুয়ে তাতে পানাহার করা যাবে না– এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন।

* নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ৪০ দিন পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না- এটাও ভুল ধারণা। ৪০ দিন হল নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ, এর পূর্বেও রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়া শুরু করবে। গোসলে ক্ষতির



আশংকা থাকলে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে। অনেকে মনে করে ৪০ দিন যাওয়ার পূর্বে নামায পড়তে হয় না, এ ধারণা ভুল।

* প্রসূতি গোসল না করা পর্যন্ত তার হাতের কোনো কিছু খাওয়া যাবে না– এই ধারণা ভুল।

* ৪০ দিন পর্যন্ত স্বামী প্রসূতি-ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না– এটা আমাদের সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা।

* যে স্থান দেখা জায়েয নয় প্রসূতিকে গোসল দেয়ার সময় ধাত্রী বা অন্য কোনো নারীও সে স্থানে সরাসরি হাত লাগিয়ে মর্দন করে দিতে পারবে না বা সে স্থান দেখতে পারবে না। প্রয়োজনে হাতে গেলাফ লাগিয়ে বা কোনো কাপড় পেঁচিয়ে কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মর্দন করে দিতে পারবে।

* প্রসূতিকে গোসল দেয়ার সময় ধুমধাম করা, নাচ-গান করা বা হৈ হুল্লোড় করা সবই কুসংস্কার ও গোনাহের কাজ।

* অনেক স্থানে প্রচলন আছে ৬ দিনের দিন প্রসূতিকে গোসল দিতেই হবে– এই প্রচলন ভিত্তিহীন।

* অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রসূতি-ঘরে প্রসূতি নারী মারা গেলে তার আত্মা প্রেতাত্মা হয়ে যায়– এ ধারণা ভুল। বরং হাদীছে এসেছে, এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়া ফযীলতের। এ অবস্থায় মারা গেলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। অতএব যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হয়, সেটা কখনও খারাপ অবস্থা হতে পারে না।

বি. দ্র. স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রবাহনের ফলে সে রস নির্গত হয়, এতে গোসল করা আবশ্যক হয় না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন উযূ করে নামায আদায় করে নিতে হবে এবং উযূর পূর্বে ধৌত করে নিতে হবে।

## মোজায় মাসেহ করার বয়ান

উযূ করার সময় মোজা পরিহিত থাকলে মোজা খুলে পা না ধুয়ে মোজার উপর মাসেহ করে নিলেও চলে, তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

## মোজায় মাসেহের শর্তসমূহ

১. পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করবে। চাই পূর্ণ উযূ করার পর শেষে পা ধুয়ে মোজা পরিধান করা হোক কিংবা আগেই পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে তারপর উযূ ভঙ্গকারী কিছু ঘটার পূর্বেই উযূ পূর্ণ করে নেয়া হোক।

২. মোজা পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হতে হবে।

৩. মোজা এমন হতে হবে যা পরিধান করে উপর্যুপরি অন্তত তিন মাইল পথ চলা যায়।

৪. একটি মোজায় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি ফাঁটা-ছেঁড়া থাকতে পারবে না, চলার সময় এ পরিমাণ খুললেও চলবে না।

৫. মোজা এমন হতে হবে যা বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর আঁটকে থাকে।

৬. মোজা এমন হতে হবে যার ভিতর দিয়ে পানি ভেদ করে শরীরে লাগে না।

৭. কমপক্ষে হাতের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ পায়ের অগ্রভাগ থাকতে হবে। অতএব কোন এক পা টাখনু গিরার উপর থেকে কাটা গেলে আর অপর পা ঠিক থাকলে সে অবস্থায় পরিহিত মোজায় মাসেহ করা জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য, গোসল ফরয হলে মোজায় মাসেহ করা জায়েয নয় বরং তখন মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে।

(مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي والدر المختار مع رد المحتار)

## কোন্ ধরনের মোজায় মাসেহ করা জায়েয

* চামড়ার মোজা হলে তার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে (উপরোক্ত ৭টি শর্ত সাপেক্ষে)।

* পশম, কাতান প্রভৃতির মোজায়ও মাসেহ করা জায়েয আছে এই শর্তে যে, তা এমন মোটা হবে যা দিয়ে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না, যা ভেদ করে পানি ভিতরে ঢুকবে না, যা অন্তত পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হবে, যা বাঁধা ছাড়াই পায়ের গোছার উপর খাড়া থাকতে পারে এমন হবে, যা পায়ে দিয়ে অন্তত তিন মাইল হাঁটা যাবে তাতে ফাটবে না।

(مراقي الفلاح والدر المختار مع رد المحتار)

* চামড়ার জুতোর উপর মাসেহ করা জায়েয আছে এই শর্তে যে, সে জুতো পায়ের টাখনুকে ঢেকে রাখবে, সেই জুতো এতটুকু মজবুত হবে যে, তা পায়ে দিয়ে অন্তত ৩ মাইল পথ হাঁটা যাবে এবং মাসেহ করার সময় জুতোর যে অংশের উপর মাসেহ করা হবে পায়ের পাতা সে অংশের ভিতরে থাকবে। (امداد الفتاوى من الدر المختار مع رد المحتار) তবে উল্লেখ্য যে, জুতো পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে হলে জুতো পাক থাকতে হবে এবং



জুতোর মাথার সাথে পায়ের আঙ্গুলের মাথা লাগা থাকতে হবে, ফাঁকা থাকলে চলবে না।

* হাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

## মোজায় কত দিন মাসেহ করা জায়েয

* শর্‌য়ী সফরের অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত এবং এরূপ সফর না হলে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করা যায়। যে উযূ করে মোজা পরিধান করা হবে সে উযূ ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে এই তিন দিন তিন রাত ও এক দিন এক রাতের হিসাব ধরা হবে।

* বাড়িতে থাকা অবস্থায় মাসেহ শুরু হয়েছিল এবং এক দিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সফর আরম্ভ হয়েছে, তাহলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে।

* পক্ষান্তরে সফরে থাকা অবস্থায় মাসেহ শুরু করা হয়েছিল তারপর এক দিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাড়িতে চলে এসেছে, তাহলে এক দিন এক রাত হওয়ার পর আর মাসেহ করতে পারবে না।

## মোজায় মাসেহের তরীকা

উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে উভয় পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখবে, যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর ছাপ পড়ে। অতঃপর হাতের পাতা শূন্যে রেখে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে ক্রমশ আঙ্গুলগুলো টেনে পায়ের টাখনুর দিকে আনবে। পুরো হাতের পাতাসহ মোজার উপর রেখে টেনে আনলেও দুরস্ত আছে।

## যেসব কারণে মোজায় মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়

১. যে যে কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় তাতে মাসেহও ভেঙ্গে যায়।

২. উভয় মোজা বা একটা মোজা খুললেও মাসেহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ অবস্থায় উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে আবার মোজা পরিধান করে নিলেই চলে, পুরো উযূ দোহরানোর প্রয়োজন হয় না।

৩. মাসেহের মেয়াদ– তিন দিন তিন রাত বা এক দিন এক রাত পূর্ণ হয়ে গেলেও মাসেহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।

৪. মোজার ভিতরে পানি ঢুকে সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশি ভিজে গেলে। এ ক্ষেত্রেও উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।

৫. মাযূর ব্যক্তি যদি মাসেহ করে, তাহলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর যেমন তার উযূ ভেঙ্গে যায় তদ্রূপ তার মাসেহও ভেঙ্গে যাবে। তবে উযূ করার সময় এবং মোজা পরিধান করার সময় ওজর না থাকলে অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় সেও মাসেহ করতে পারবে।

(ما خوذ از نور الایضاح، بہشتی زیور، والفقہ علی المذاہب الاربعۃ)

## আযান ইকামতের মাসায়েল

* সমস্ত ফরযে আইন নামাযের জন্য পুরুষদের এক বার আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। শুধুমাত্র জুমুআর জন্য দুই বার আযান দেয়া আবশ্যক।

* জেহাদ ইত্যাদি ধর্মীয় কাজে লিপ্ত থাকার দরুন বা গায়র এখতিয়ারী (অনিচ্ছাকৃত) কোনো কারণবশত সর্বসাধারণের নামায কাযা হয়ে থাকলে সে নামাযের জন্যও উচ্চস্বরে আযান ইকামত বলা সুন্নাত।

* অলসতা বা বে-খেয়ালীবশত নামায কাযা হয়ে থাকলে সে নামায যেহেতু অন্যদের অগোচরে পড়া উচিৎ, তাই তার জন্য আযান ইকামত উচ্চস্বরে নয় বরং চুপে চুপে বলতে হবে, যাতে অন্য লোকেরা নামায কাযা করার মত একটা গোনাহের বিষয় জানতে না পারে।

* কয়েক ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে কাযা করলে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান দেয়া সুন্নাত, আর বাকি ওয়াক্তগুলোর জন্য পৃথক পৃথক আযান দেয়া সুন্নাত নয় বরং মোস্তাহাব। তবে ইকামত সব ওয়াক্তের জন্যই পৃথক পৃথক সুন্নাত।

* সফর অবস্থায় কাফেলার সমস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদের জন্য আযান দেয়া মোস্তাহাব, সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নয়। তবে ইকামত সকলে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় সুন্নাত।

* বাড়িতে, দোকানে, মাঠে বা বিলে একাকী বা জামাআতে নামায পড়লে আযান দেয়া মোস্তাহাব এবং ইকামত দেয়া সুন্নাত।

* স্ত্রীলোকের আযান ইকামত বলা মাকরূহ।

(বেহেশ্‌তি জেওর থেকে গৃহীত।)

## আযানের শর্তসমূহ

১. ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিতে হবে-ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে সে আযান সহীহ হবে না, ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে।



২. আযান আরবী ভাষায় এবং যে সব শব্দে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রুত ও বর্ণিত হয়েছে সেভাবে হতে হবে।

৩. আযানের শব্দসমূহ দীর্ঘ বিরতি ব্যতীত একটি শেষ হওয়ার পরপরই অন্যটি বলতে হবে। একটির পর আর একটি বলার মাঝে এতটুকু বিরতি থাকবে যাতে শ্রোতা জওয়াব দিতে পারে।

৪. আযানের শব্দাবলী সহীহ তারতীবে আদায় করতে হবে। তারতীবের খেলাফ হলে আযান মাকরূহ হবে, সে আযান দোহরাতে হবে।

## আযান ইকামতের সুন্নাত ও মোস্তাহাবসমূহ

১. মুআয্‌যিনের ছোট-বড় সব নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া।

২. মুআয্‌যিনের সজ্ঞান বালেগ হওয়া। বুঝমান বালক হলেও চলে, তবে মাকরূহ তানযীহী। আর পাগল বা অবুঝ বালক আযান দিলে সে আযান দোহরাতে হবে।

৩. মুআয্‌যিনের আওয়াজ আকর্ষণীয় ও উচ্চ হওয়া।

৪. মুআয্‌যিনের দ্বীনদার পরহেযগার হওয়া।

৫. মসজিদের বাইরে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া এবং ইকামত মসজিদের ভিতরে দেয়া। মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া মাকরূহ তানযীহী।[১] জুমুআর দ্বিতীয় আযানের হুকুম ভিন্ন। সেটা মসজিদের ভিতরেই হবে।

৬. কোন ওজর না থাকলে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া।

৭. কেবলামুখী হয়ে আযান ইকামত দেয়া। তবে গাড়ি বা যানবাহনে আযান দেয়ার সময় কেবলামুখী না হলেও সুন্নাতের পরিপন্থী হবে না।

১. মসজিদের বাইরে এবং উঁচু স্থানে আযান দেয়ার উদ্দেশ্য হল আওয়াজ ছড়িয়ে দেয়া। বর্তমানে মাইকে আযান দেয়ার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এবং মসজিদের মধ্যে থেকেই সাধারণত মাইকে আযান দেয়া হয়। যেহেতু মাইকে আযান দিলে আওয়াজ এমনিতেই দূরে পৌঁছে যায় এবং বাইরে উঁচু স্থানে আযান দেয়ার যে উদ্দেশ্য তা হাছিল হয়ে যায়- এ প্রেক্ষিতে মসজিদের বাইরে থেকে আযান দেয়ার যে উদ্দেশ্য তা হাছিল হয়ে যায়। অতএব মসজিদের ভিতরে থেকে আযান দিলে মাকরূহ হবে না বলে মনে হয়। তবে মসজিদের ভিতরে এত জোরে আওয়াজ করা খেলাফে আদব মনে হয়, তাই সম্ভব হলে মসজিদের বাইরে থেকেই মাইকে আযানের ব্যবস্থা করা উত্তম। (১/□□ احسن الفتاوی)

৮. আযান দেয়ার সময় দুই শাহাদাত আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো মোস্তাহাব। কানের উপর হাত রেখে ছিদ্র বন্ধ করলেও চলে। ইকামতের মধ্যে কানে আঙ্গুল দেয়া জায়েয তবে সুন্নাত নয়।

৯. আযান ও ইকামত উভয়টিতে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ বলার সময় ডান দিকে মুখ ফিরানো এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরানো সুন্নাত। সীনা বা পা ঘুরবে না। মাইকে আযান ইকামত দিলেও এটা করা সুন্নাত। (الدر المختار و رد المحتار)

১০. আযানের শব্দগুলো টেনে টেনে এবং থেমে থেমে বলা সুন্নাত আর ইকামতের শব্দগুলো জলদী জলদী বলা সুন্নাত।

১১. বিনা প্রয়োজনে এদিক-ওদিক না দাঁড়িয়ে বরং ইমামের বরাবর পিছনে দাঁড়িয়ে ইকামত বলা উত্তম।

(بہشتی زیور، شامی، الفقه على المذاهب الأربعة. احسن الفتاوى প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

### আযান ও ইকামতের মাঝে সময়ের ব্যবধান কতটুকু হবে

* সুন্নাত হচ্ছে আযান ও ইকামতের মাঝে এতটুকু সময়ের ব্যবধান করা, যাতে নিয়মিতভাবে যেসব মুসল্লী জামাআতে শরীক হয়ে থাকে তারা যেন জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে এসে পৌঁছতে পারে।

* মাগরিবের নামাযের আযান ইকামতের মাঝে ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখতে বলা হয়েছে। (شامی و عالمگیری)

### আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ আদায় করার নিয়ম

| শব্দসমূহ | আদায় করার নিয়ম |
|---|---|
| اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ<br>আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ<br>اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ<br>আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ | 'আল্লাহ' ও 'আকবার' শব্দের শুরুতে যে হামযাহ্ (আলিফ) রয়েছে, তা শক্তির সাথে শক্তভাবে আদায় হবে। আল্লাহ শব্দের 'লাম' প্রথমেই খুব মোটা করে পড়তে হবে। লামের উপর যে আলিফ রয়েছে তাতে মদ্দে তবায়ী مد طبعی হবে, এতে শুধুমাত্র এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে, 'হা'-র পেশ খুব স্পষ্ট অথচ পাতলা হবে এবং واو مده এর আভাষ দিয়ে আদায় করতে হবে। 'আকবার'-এর 'রা' সাকিন অথচ মোটা করে পড়তে হবে। |



| | |
|---|---|
| أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই।<br>أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই। | 'আশ্‌হাদু'-র শীন উচ্চারণ কালে আওয়াজ মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে, لا -এর মধ্যে مد فرعی منفصل হবে, যা তিন থেকে চার আলিফ পর্যন্ত টানা যাবে, الله শব্দের প্রথম আলিফের মধ্যে যে কোনো প্রকার مد (টানা) করা থেকে বিরত থাকতে হবে, إِلَّا اللّٰهُ -র' মধ্যে আল্লাহ শব্দের লামের উপর যে আলিফ রয়েছে তাতে مد فرعی عارضی হবে, এটা পাঁচ আলিফ পর্যন্ত টানা জায়েয আছে। এর অতিরিক্ত টানা থেকে বিরত থাকতে হবে। |
| أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ<br>আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।<br>أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ<br>আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। | اَنَّ শব্দের নূন, এবং مُحَمَّد শব্দের তাশদীদ যুক্ত মীমের মধ্যে এক আলিফের অতিরিক্ত গুন্নাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সীনের মধ্যে مد طبعی কাজেই এক আলিফের অতিরিক্ত টানা যাবে না। رَسُوْل শব্দের 'রা' মোটা হবে। الله শব্দের হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, (অর্থাৎ, পাঁচ আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে) |
| حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ<br>নামাযের জন্য এসো।<br>حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ<br>নামাযের জন্য এসো। | حَيَّ শব্দের তাশ্‌দীদ আদায় করার সময় দুই আলিফ পরিমাণ সময় বিলম্ব করতে হবে। অবশ্য 'ইয়া'-র যবর তাড়াতাড়ি আদায় করতে হবে, এর উপর যেন আওয়ায আটকে না যায়। الصَّلٰوة এর صلوة এর صاد কে খুব মোটা করে পড়তে হবে। মধ্যে مد عارضی -এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ পাঁচ আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে। |
| حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ<br>নামাযের জন্য এসো।<br>حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ<br>নামাযের জন্য এসো। | حَيَّ শব্দ কিভাবে আদায় করতে হবে, এবং فَلَاح শব্দের 'লামের' مد عارضی-র হুকুম কি? তা পূর্ব বর্ণিত হয়েছে। |

| | |
|---|---|
| اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ<br>নামাযের জন্য এসো। | الصَّلٰوة শব্দের লামের পরে যে আলিফ আছে এতে مد طبعی হবে। কাজেই আলিফকে অতিরিক্ত লম্বা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। |
| اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ<br>নামাযের জন্য এসো। | النَّوْمِ-এর মধ্যে مد لين এতে قصر করা উত্তম, মদ করাও জায়েয আছে, যা সর্বোচ্চ পাঁচ আলিফ পরিমাণ করা যায়। |
| اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ<br>আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। | এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। |
| لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। | এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। |
| (একামতের শব্দ)<br>قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ<br>নামায প্রস্তুত,<br>قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ<br>নামায প্রস্তুত, | قَامَت শব্দের কাফের পরে যে আলিফ আছে তাতে مد طبعی হবে অর্থাৎ, এক আলিফ পরিমাণ লম্বা হবে। আর الصَّلٰوة শব্দের লামে মদ্দে আরযী হবে। তবে ইকামতে জলদী করা উদ্দেশ্য, তাই অল্প টানতে হবে। |

("আযান ইকামতের ফাযায়েল মাসায়েল ও তাজবীদ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## আযান বলার সুন্নাত তরীকা

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ দুই তাকবীর এক সঙ্গে এক শ্বাসে বলা, উভয় اَكْبَرُ শব্দের রা-তে সাকিন সহকারে– পেশ সহকারে মিলিয়ে নয়। অর্থাৎ, আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার বলবে না, বরং রা-তে সাকিন পড়বে। রা-তে যবরও পড়া যায়।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ উপরোক্ত নিয়মে শব্দের রা-তে সাকিন সহকারে– পেশ সহকারে মিলিয়ে নয়, বরং রা-তে সাকিন পড়বে। রা-তে যবরও পড়া যায়। শেষের اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও এই নিয়মে।

অবশিষ্ট প্রত্যেকটি বাক্য এক এক শ্বাসে বলা এবং প্রত্যেকটি বাক্যের শেষে সাকিন করা ও থামা। (احسن الفتاوی ج/۲)



## ইকামত বলার সুন্নাত তরীকা

| শব্দ সমূহ | আদায় করার নিয়মাবলী |
|---|---|
| اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ<br>اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ | এই চার তাকবীর এক শ্বাসে এবং প্রত্যেকটা রা-তে সাকিন সহকারে বলা। |
| أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ | এই দুই বাক্য এক শ্বাসে এবং اللّٰه শব্দের হা-তে সাকিন সহকারে। |
| اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ<br>اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ | উপরোক্ত নিয়ম। |
| حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ<br>حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ | দুই বাক্য এক শ্বাসে এবং صلوة শব্দের □ তে সাকিন সহকারে অর্থাৎ, হা সাকিন সহকারে। |
| حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ<br>حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ | দুই বাক্য এক সাথে এক শ্বাসে এবং হা-তে সাকিন সহকারে। |
| قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ<br>قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ | দুই বাক্য এক শ্বাসে এবং صلوة শব্দের তা-তে সাকিন সহকারে অর্থাৎ, হা-সাকিন উচ্চারণ সহকারে। |
| اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ<br>لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ | এই দুই তাকবীর এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এক শ্বাসে এবং উভয় اَكْبَرُ -এর রা-ও শেষ اللّٰه শব্দের হা-সাকিন সহকারে। |

(احسن الفتاوی ج/۲ থেকে গৃহীত।)

## আযানের ভুলসমূহ

(আযানের মধ্যে প্রচলিত ভুলসমূহ)

১. اَللّٰهُ কে آللّٰهُ (মদ করে) পড়া, অর্থাৎ, আল্লাহ শব্দের শুরুতে যে হামযাহ্ আছে; তা টেনে পড়া।

২. আল্লাহ (اللّٰه) শব্দের লামকে এক আলিফের চেয়ে অতিরিক্ত টানা।

৩. আল্লাহ (اللّٰهُ) শব্দের হা-র পেশকে মাজহুল পড়া অর্থাৎ, আল্লাহো পড়া।

৪. اَكْبَرُ কে اٰكْبَرُ (মদ করে) পড়া। অর্থাৎ, আকবারের শুরুতে যে হামযাহ্ আছে তা লম্বা করা।

৫. اَكْبَرُ কে اَكْبَارُ পড়া। অর্থাৎ, বা-র পরে আলিফ বৃদ্ধি করা।

৬. اَكْبَرْ কে اَكْبَرُ পড়া অর্থাৎ, রা-র উপর পেশ পড়া।

৭. اَكْبَرْ শব্দের রা মোটা না করা।

৮. اَشْهَدُ কে اٰشْهَدُ পড়া। অর্থাৎ, শুরুর আলিফ লম্বা করা।

৯. اَشْهَدُ শব্দের দালের পেশকে মাজহুল অর্থাৎ, আশহাদো পড়া।

১০ اَنْ এর নুনকে لا এর লামের সঙ্গে না মিলানো।

১১. لا কে চার আলিফের চেয়ে বেশী লম্বা করা।

১২. اِلٰه শব্দের লামের খাড়া যবর (আলিফ)-কে এক আলিফের চেয়ে বেশি লম্বা করা।

১৩. اِلَّا اللّٰهُ শব্দের মধ্যে اللّٰهُ -র আলিফকে পাঁচ আলিফের চেয়ে লম্বা করা।

১৪. مُحَمَّدًا –এর তানবীন (দুই যবর)কে رَسُوْلُ اللّٰهُ বাক্যের রা-র সাথে না মিলানো।

১৫. رَسُوْل শব্দের و কে এক আলিফের চেয়ে বেশি লম্বা করা।

১৬. رَسُوْلُ اللّٰهُ বাক্যের মধ্যে اللّٰهُ শব্দের আলিফকে পাঁচ আলিফের চেয়ে অতিরিক্ত লম্বা করা।

১৭. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ কে حَيَّ لَا الصَّلٰوةُ পড়া ( অর্থাৎ, عَلٰى কে لا পড়া।)

১৮. অথবা حَيَّ آلَا الصَّلَاةُপড়া। (অর্থাৎ, عَلٰى কে آلَا পড়া।)

১৯. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ -র মধ্যে الصَّلٰوةُ কে পাঁচ আলিফের চেয়ে অতিরিক্ত টানা।

২০. الصَّلٰوةُ শব্দের শেষে 'হা' কে (অর্থাৎ, ة [গোল তা] কে যা ওয়াক্ফ অবস্থায় 'হা' হয়ে যায়) ফেলে দেয়া।

২১. حَيَّ عَلَى الفَلَاحُ কে حَيَّ لَا الْفَلَاحُ পড়া। অর্থাৎ, عَلٰى কে لا পড়া।

২২. অথবা حَيَّ اَلَا الْفَلَاحُ পড়া। অর্থাৎ, عَلٰى কে اَلَا পড়া।

২৩. الفَلَاحُ এর আলিফকে পাঁচ আলিফের অতিরিক্ত টানা।



২৪. الفَلَاحُ শব্দের শেষে 'হা' ফেলে দেয়া।

২৫. اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمُ এর মধ্যে الصَّلٰوةُ শব্দের লাম-কে এক আলিফের চেয়ে বেশি টানা।

২৬. الصَّلٰوةُ শব্দের 'তা'র পেশকে মাজহুল পড়া অর্থাৎ, আসসালাতো পড়া।

২৭. الصَّلٰوةُ শব্দের 'তা' কে লম্বা করা।

২৮. خَيْرٌ শব্দের 'ইয়া'কে মাজহুল পড়া অর্থাৎ, ও–এর ন্যায় (খাইরোম) পড়া।

২৯. خَيْرٌ শব্দের 'রা' কে মোটা না করা।

৩০. النَّوْمُ শব্দের و কে পাঁচ আলিফের চেয়ে বেশি লম্বা করা।

৩১. النَّوْمُ শব্দের و কে মাজহুল পড়া অর্থাৎ, নাওম পড়া বরং পড়তে হবে নাঊম।

৩২. ترسل তারাচ্ছুল না করা। অর্থাৎ, দুই ব্যাক্যের মাঝে জওয়াব দেয়ার পরিমাণ সময় না থামা।

("আযান, ইকামতের ফাযায়েল মাসায়েল ও তাজবীদ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## ইকামতের ভুলসমূহ

১. اَكْبَرْ কে اَكْبَرُ পড়া, অর্থাৎ, আকবার শব্দের 'রা'-এর মধ্যে পেশ দেয়া।

২. اِلَّا اللّٰهْ কে اِلَّا اللّٰهُ পড়া। অর্থাৎ, 'হা' কে পেশ দেয়া।

৩. رَسُوْلُ اللّٰهْ কে رَسُوْلُ اللّٰهِ পড়া। অর্থাৎ, 'হা'-র মধ্যে যের দেয়া।

৪. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ কে حَيَّ اَلَا الصَّلٰوةْ পড়া। অর্থাৎ, عَلٰى কে لَا পড়া।

৫. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ কে حَيَّ لَا الصَّلٰوةْ পড়া। অর্থাৎ, عَلٰى কে পড়া اَلَا পড়া।

৬. الصَّلٰوةْ কে الصَّلٰوةِ পড়া। অর্থাৎ, 'তা' কে যের দেয়া।

৭. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কে حَيَّ لَا الْفَلَاحْ পড়া। অর্থাৎ, عَلٰى কে لَا পড়া।

৮. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কে حَيَّ اَلَا الْفَلَاحْ পড়া। অর্থাৎ, عَلٰى কে اَلَا পড়া।

৯. الفَلَاحْ কে الفَلَاحِ পড়া। অর্থাৎ, 'হা' কে যের দিয়ে পড়া।

১০. الصَّلٰوةِ -এর الصَّلٰوةُ কে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ পড়া। অর্থাৎ, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'তা' কে পেশ দিয়ে পড়া।

১১. প্রত্যেক শব্দে থামা।

বি. দ্র. আযান ও ইকামতের শব্দসমূহকে মিলিয়ে (وصل) পড়তে হবে; কিন্তু শেষ অক্ষরে কোনো হরকত প্রকাশ করা যাবে না। সব বাক্যের শেষ শব্দেই শেষে সাকিন তথা জযম হবে। (কান্‌জুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫১)

("আযান ইকামতের ফাযায়েল মাসায়েল ও তাজবীদ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## আযান ও ইকামতের জওয়াব প্রসঙ্গ

* আযান ও ইকামতের জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। নারী পুরুষ সকলের জন্যই আযানের জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে রয়েছে তার জন্যও মুখে জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। পাক নাপাক সকলেরই জন্য আযানের জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ও নেফাস-ওয়ালী মহিলার জন্য আযানের জওয়াব দেয়ার হুকুম নেই।

* যে ব্যক্তি মসজিদের বাইরে রয়েছে তার জন্য ইজাবাত বিল্লিছান অর্থাৎ, মৌখিক জওয়াব (যে সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।) ছাড়াও ইজাবাত বিল কদম অর্থাৎ, মসজিদে জামাআতের জন্য গমন–এর মাধ্যমে জওয়াব দেয়া জরুরি। তবে অপরাগতার ক্ষেত্রে শুধু মুখে জওয়াব দেয়াই যথেষ্ট হবে।

* কয়েক স্থানের আযান শোনা গেলে সর্বপ্রথম যে আযান শোনা যায় (নিজের মহল্লার হোক বা ভিন্ন মহল্লার) তার জওয়াব দিলেই যথেষ্ট। তবে সবটার জওয়াব দিতে পারলে ভাল। (احسن الفتاوى ج/٢ نقلا عن العلائية و رد المحتار)

* জুমুআর ছানী (দ্বিতীয়) আযানের জওয়াব দিতে হয় না, তবে মনে মনে (মুখে উচ্চারণ ব্যতীত) দেয়া যায়। (فتاوى دار العلوم)

* যদি কেউ আযানের জওয়াব না দিয়ে থাকে এবং আযান শেষ হওয়ার পর বেশিক্ষণ অতিবাহিত না হয়ে থাকে, তাহলে তখন জওয়াব দিবে।

* উযূ অবস্থায় আযান হতে থাকলে উযূও করতে থাকবে আযানের জওয়াবও দিতে থাকবে। (فتاوى محمودية ج/٢)



## যেসব অবস্থায় আযানের জওয়াব দেয়া উচিৎ নয়

১. নামাযের অবস্থায়।
২. খুতবার সময়; জুমুআর খুতবা হোক বা বিয়ের খুতবা।
৩. হায়েয অবস্থায়।
৪. নেফাসের অবস্থায়।
৫. দ্বীনী ইল্‌ম বা শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল শিখবার বা শিক্ষা দেয়ার সময়। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের সময় আযান হলে তিলাওয়াত বন্ধ করে তার জওয়াব দেয়া উত্তম বলা হয়েছে। (فتاوى محمودية ج/٢)
৬. স্ত্রী সহবাস করা অবস্থায়।
৭. পেশাব-পায়খানার সময়।
৮. খানা খাওয়ার সময়।

আযান ও ইকামতের কোন্ বাক্যের কি জওয়াব হবে তার একটা নকশা পেশ করা হল।

## আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ এবং তার জওয়াবের শব্দসমূহ

| আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ | আযান ও ইকামতের জওয়াবের শব্দসমূহ |
|---|---|
| اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ | اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ |
| اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ | اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ |
| أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ | أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ |
| أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ | أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ |
| اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ | اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ |
| اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ | اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ |
| حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ |
| حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ |

| | |
|---|---|
| حَيَّ عَلَى الفَلَاحْ | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ |
| حَيَّ عَلَى الفَلَاحْ | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ |
| قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ | اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا |
| قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ | اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا |
| (শুধু ইকামতের শব্দ) | |
| اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمْ | صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ |
| اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمْ | صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ |
| (শুধু ফজরের আযানের শব্দ) | |
| اَللّٰهُ أَكْبَرْ اَللّٰهُ أَكْبَرْ | اَللّٰهُ أَكْبَرْ اَللّٰهُ أَكْبَرْ |
| لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ | لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ |

* আযানের বাক্যগুলোর জওয়াব দেয়ার পর (আযান শেষ হওয়ার পর) দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের রব, তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান কর ওছীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁকে পৌছাও মাকামে মাহ্মূদে (প্রশংসনীয় স্থানে) যার ওয়াদা তুমি তাঁর সাথে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

উল্লেখ্য, এই দুআর মধ্যে কেউ কেউ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ এবং وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ পড়ে থাকে। এই শব্দের/বাক্যের কোনো প্রমাণ নেই। অতএব তা থেকে বিরত থাকুন।

* তারপর পড়বে–

وَأَنَا اَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا



عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا.

অর্থ: আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক– তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌র প্রতি রব হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রসূল হিসাবে।

* উপরোল্লেখিত দুআ (আযান পরবর্তী দুআ) পড়ার সময় হাত উঠানো-র কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। (احسن الفتاوى ج/٢)

## আযানের সময়কার বিশেষ কয়েকটি আমল

আযানের সময় (বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে) কথা-বার্তা না বলাই উত্তম। চুপ থাকাই মোস্তাহাব। (احسن الفتاوى ج/٢)

* আযান শুরু হওয়ার পর ইস্তেন্জায় লিপ্ত হবে না, ইস্তেন্জাখানায় প্রবেশ করবে না। তবে নামাযের জামাআত ভঙ্গ হওয়ার আশংকা বা বিশেষ কোন ওজর দেখা দিলে ভিন্ন কথা। (فتاوى دار العلوم)

## মসজিদে যাওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. শরীর পবিত্র করে নিবে।
২. কাপড় পবিত্র করে নিবে।
৩. ঘর থেকে উযূ করে মসজিদে যাবে। মসজিদে যেয়ে উযূ করার চেয়ে ঘর থেকে উযূ করে যাওয়া উত্তম।
৪. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ ও বের হওয়ার দুআ পড়বে। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এই–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি লাভ হয় না।

৫. ধীরস্থিরভাবে চলবে।
৬. গাম্ভীর্যের সাথে চলবে।

৭. চলার পথে হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকবে।

৮. চলতে চলতে এই দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا. (كتاب الاذكار بحوالۂ مسلم)

অর্থ: হে আল্লাহ. তুমি দান কর আমার অন্তরে নূর এবং জবানে নূর। দান কর আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর, দান কর আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর, দান কর আমার পশ্চাতে নূর এবং আমার সম্মুখে নূর, দান কর আমার উপরে নূর এবং আমার নিচে নূর। হে আল্লাহ! তুমি দান কর আমাকে নূর।

৯. প্রত্যেকটা কদমে কদমে ছওয়াব হবে– এই বিশ্বাস ও আশা মনে বদ্ধমূল রেখে পথ চলবে।

১০. পথ চলার অন্যান্য আমল পালন করবে। (দ্রষ্টব্য: পৃষ্ঠা নং ৫১২)

## মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. নত চোখে, ভীত মনে মসজিদে প্রবেশ করবে।

২. মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতো খুলে নিবে। জুতো ভিতরে নিতে হলে ঝেড়ে পরিষ্কার পূর্বক নিবে। কোনো প্যাকেট বা ব্যাগের মধ্যে জুতো/স-ান্ডেল রাখলে খুবই ভাল হয়, তাতে মসজিদ নোংরা হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

৩. প্রথমে বাম পায়ের জুতো তারপর ডান পায়ের জুতো খুলবে।

৪. প্রবেশের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ পড়বে।

৫. দুরূদ ও সালাম পড়বে।

৬. দুআ পড়বে।

এই তিনটিকে একত্রে এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং আমার জন্য



তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

দুআর শেষ অংশটুকু এভাবেও পড়া যায়– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

৭. প্রবেশকালে এই দুআও পড়বে–

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ. (الفتاوى الظهيرية)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি কল্যাণকর ভাবে আমাকে অবতরণ করাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

## মসজিদের ভিতরের সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. মসজিদে প্রবেশ করত (নফল) এ'তেকাফের নিয়ত করবে।

২. শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (كتاب الأذكار)

৩. যে বা যারা নামাযে রত নয় তাদেরকে এমনভাবে সালাম দিবে যেন নামাযে রত লোকদের নামাযে ব্যাঘাত না ঘটে।

৪. মসজিদে কেউ না থাকলে বা অবসর কেউ না থাকলে এই বলে (আস্তে) সালাম দিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. (معارف القران)

৫. হারাম এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে মসজিদে প্রবেশ পূর্বক দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ/দুখূলুল মাসজিদ নামায পড়বে। এই নামায বসার পূর্বেই পড়া উত্তম। এই নামায না পড়লে দুরূদ শরীফ পড়বে এবং নিম্নোক্ত দুআটি চার বার পাঠ করবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. (كتاب الأذكار)

৬. উপরোক্ত যিকিরসহ অন্যান্য যিকির বেশি বেশি করা উত্তম।

৭. মোনাছেবমত নেক কাজের কথা বলবে এবং গোনাহের কাজ দেখলে বাধা দিবে। এ দায়িত্ব মসজিদের বাইরেও রয়েছে, তবে মসজিদে থাকাকালীন এর গুরুত্ব অধিক।

৮. মসজিদে বেচা-কেনা না করা।

৯. কাউকে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে,

لَا أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ. (ترمذي)

অর্থ: আল্লাহ যেন তোমার বেচা-কেনায় লাভ না দেন।

১০. কোন হারানো বস্তু তালাশের উদ্দেশ্যে মসজিদে ঘোষণা না দেয়া।

১১. কাউকে উপরোক্ত ঘোষণা করতে শুনলে বলবে,

لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا. (مسلم)

অর্থ: আল্লাহ যেন ওটা তোমার কাছে ফিরিয়ে না দেন। মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।

১২. আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত আওয়াজ উঁচু না করা।

১৩. কোনো শোরগোল না করা।

১৪. তলোয়ার বা ভীতিমূলক কিছু উন্মুক্ত না রাখা।

১৫. মসজিদে নিজের জন্য কিছু সওয়াল করা নিষেধ এবং এরূপ সওয়ালকারীকে কিছু প্রদান করা মাকরূহ (الفقه على المذاهب الأربعة), তবে কোন হাজতমান্দ ব্যক্তির সহযোগিতার জন্য অন্য কেউ বলে দিতে পারে। (آپکے مسائل اور ان کا حل)

১৬. মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলা। তবে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সংক্ষেপে হালতপুরছী করা (হাল অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করা) নিষেধ নয়।

১৭. মসজিদে রাজনৈতিক মিটিং সিটিং করা মসজিদের আদব এহ্‌তেরামের খেলাপ। (فتاوی رحیمیہ ج/۲)

১৮. মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে না যাওয়া।

১৯. মসজিদে কোন স্থান দখল নিয়ে ঝগড়া না করা।

২০. কেউ কোন স্থান থেকে প্রয়োজনে উঠে গিয়ে থাকলে এবং আবার সেখানে আসবে বুঝতে পারলে তার স্থান দখল না করা।

২১. কাতারের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে কারও উপর চাপ সৃষ্টি না করা।

২২. নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (নামাযীর সোজা সামনে কেউ বসা থাকলে তিনি একদিকে সরে যেতে পারেন।)

২৩. মসজিদে কফ, থুথু, শিকনি না ফেলা বা কোনোভাবে ময়লা-আবর্জনা কিংবা নাপাকী না ফেলা।

২৪. মসজিদে আঙ্গুল না ফোটানো।



২৫. মসজিদে বায়ু ত্যাগ না করা উত্তম, প্রয়োজন হলে বাইরে এসে বায়ু ত্যাগ করবে।

২৬. শিশু এবং পাগলদেরকে মসজিদে না আনা।[১] (الفقه على المذاهب الأربعة)

২৭. মসজিদের মধ্যে যেনা, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হদ্দ বা শাস্তি না দেয়া।

২৮. মসজিদে কিছু কুরআন, হাদীছ, ফেকাহ ইত্যাদি দ্বীনী ইল্‌মের তা'লীম করা উত্তম।

## মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. বের হওয়ার সময় দরজার/সিড়ির কাছে এসে বাইরে অপেক্ষমান শয়তান দলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ. (كتاب الأذكار)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ইবলীছ ও তার বাহিনী থেকে পানাহ চাই।

২. বিসমিল্লাহ পড়বে।

৩. দুরূদ ও সালাম পড়বে।

৪. বের হওয়ার দুআ পড়বে।

এই তিনটিকে একত্রে এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহ (বা রিযিকের) দরজাগুলো খুলে দাও।

দুআর শেষ অংশটুকু এভাবেও বলা যায়– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

৫. বাম পা আগে বের করবে।

৬. তারপর ডান পা বের করবে।

১. যে শিশু এবং পাগল দ্বারা মসজিদ নাপাক হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে তাদেরকে মসজিদে নেয়া মাকরূহ তাহ্‌রীমী। এরূপ ধারণা না হলেও মাকরূহ তানযীহী।

৭. ডান পায়ে আগে জুতো পরবে।

৮. তারপর বাম পায়ে জুতো পরবে।

বি. দ্র. মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩৬৫-৩৬৭ পৃষ্ঠা।

## শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায পড়ার তরীকা

(নামাযের মধ্যে যা যা করতে হয় এবং যেভাবে যেভাবে করতে হয়, তার ধারাবাহিক বর্ণনা।)

* নামায পড়ার জন্য পবিত্র স্থানে দাঁড়ানো ফরয।

* কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ফরয।

* পা দুটো সোজা কেবলামুখী করে রাখা সুন্নাত।

* পায়ের মাঝখানে সামনে পিছনে সমান ফাঁক রাখবে যাতে পা সোজা কেবলামুখী হয়।

* দুই পায়ের মাঝখানে হাতের মিলিত চার আঙ্গুলের পরিমাণ ফাঁক রাখা মোস্তাহাব। (احسن الفتاوى ج/٣)

* নামাযের নিয়ত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। (বাঁধা মাকরূহ।)

* উভয় পায়ের উপর সমান ভর করে দাঁড়াবে। এক পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভর করে দাঁড়ানো মাকরূহ। (شامی ج/١)

* নিয়ত করা ফরয। নিয়তের ক্ষেত্রে প্রচলিত লম্বা-চওড়া বাক্য বলা নিষ্প্রয়োজনীয়। ফরযের ক্ষেত্রে শুধু কোন্ ওয়াক্তের ফরয তার উল্লেখ এবং সুন্নাত নফলের ক্ষেত্রে শুধু নামাযের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। (احسن الفتاوى ج/٣)

* নিয়তের ক্ষেত্রে হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা অমুক নামায পড়ছি বলে ইচ্ছে করলে এতেই যথেষ্ট হবে। নিয়ত মূলত মনের ইরাদা বা ইচ্ছার নাম। তাই মনে মনে নিয়ত করলেই যথেষ্ট। তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করাকে এই অর্থে উত্তম বলা যায় যে, এতে হৃদয়ের আকর্ষণ বেড়ে যায় ও মনের খটকা দূর হয়।

* নিয়ত মুখে উচ্চারণ করলে আরবীতেও করা যায়। আরবীতে করা ফরয, ওয়াজিব বা মোস্তাহাব কিছুই নয়।

* নিয়ত বাঁধার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাতে মুআক্কাদা। হাত উঠানোর সময় পুরুষগণ চাদর পরিহিত থাকলে তার মধ্য থেকে হাত বের করবে। মহিলাগণ কাপড়ের মধ্য থেকে হাত বের করবে না। মহিলাগণ



সিনা পর্যন্ত হাত উঠাবে এমনভাবে যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাঁধ পর্যন্ত ওঠে। (شرح منية)

* পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য হাতের তালু আঙ্গুলের পেটসহ কেবলা-মুখী রাখা (উপর দিকে নয়) সুন্নাত।

* হাতের আঙ্গুলসমূহকে মিলাবে না বরং আঙ্গুলসমূহের মাঝে স্বাভাবিকভাবে যেমন ফাঁক থাকবে তেমনই থাকবে। এটিই সুন্নাত।

* পুরুষের জন্য দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ কানের লতির সাথে লাগানো মোস্তাহাব।

* আল্লাহু আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে নিয়ত বাঁধবে। এই তাকবীর ফরয। এটাকে তাক্বীরে তাহ্রীমা বলে।

* اَللّٰهُ এবং اَكْبَر শব্দ দুটোর আলিফে জোর দিয়ে উচ্চারণ করা এবং হা কে সামান্য টানের আভাস দিয়ে উচ্চারণ করা উত্তম।

* হাত উঠিয়ে কানের লতির সঙ্গে বৃদ্ধ আঙ্গুল স্পর্শ করার পর আল্লাহু আকবার বলতে শুরু করা উত্তম। হাত উঠাতে উঠাতে বা হাত উঠানো শুরু করার পূর্বেও আল্লাহু আকবার বলে নেয়া যায়।

* হাত বাঁধা সম্পূর্ণ হবে, আল্লাহু আকবার বলাও শেষ হবে- এরূপ করা উত্তম।

* কান থেকে হাত সোজা বাঁধার দিকে নিয়ে যাবে, হাত সোজা নিচের দিকে ছেড়ে দিবে না বা পিছনের দিকে ঝাড়া দিবে না।

* তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় স্বাভাবিকভাবে সোজা দাঁড়ানো থাকবে- মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাবে না।

* নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত (নাভির পরেও রাখা যায়।)

* ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে।

* ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কবজি ধরা সুন্নাত।

* ডান হাতের অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখা থাকবে। (মহিলাগণ সিনার উপর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে নিয়ত বাঁধবে। এটা সুন্নাত)

* ছানা পড়া সুন্নাত। ছানা এই-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

* আউযূ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পড়া সুন্নাত।

* বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম পড়া সুন্নাত।

* সুরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

* সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াক্‌ফ করে পড়া উত্তম।

* সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত।

* একাকী নামায পড়লে 'আমীন' আস্তে বলবে। ইমাম এবং মুক্তাদী হলে আমীন আস্তে বলা উত্তম।

* সূরা/কিরাত মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া মোস্তাহাব।

* তারপর সূরা/কিরাত মিলানো ওয়াজিব।

* প্রতি পরবর্তী রাকআতের সূরা/কিরাত তারতীব অনুযায়ী পড়া অর্থাৎ, সামনের থেকে কোনো সূরা/কিরাত পড়া, পিছন দিক থেকে না পড়া। এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এর বিপরীত করলে নামায মাকরূহ হবে তবে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে না।

* অধিক সহীহ মতানুসারে এতটুকু শব্দে কিরাত পড়া যেন নিজে শব্দ শুনতে পায়। তাকবীর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ মাসআলা প্রযোজ্য।

* সূরা **إِذَا زُلْزِلَتْ** থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত– এই ছোট সূরাগুলোর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রাকআতে যেটা পড়া হয়েছে পরবর্তী রাকআতে একটা বাদ দিয়ে তার পরেরটা পড়বে না। ফরয এবং ওয়াজিব নামাযে এরূপ করা মাকরূহ। বাদ দিয়ে পড়তে হলে কমপক্ষে দুটো বাদ দিয়ে পরেরটা পড়া যাবে।

* সূরা/কিরাত শেষ করার পর একটু বিরতি যোগে দম নিয়ে রুকুতে যাওয়ার তাক্‌বীর বলা সুন্নাত। (درس ترمذی)

* রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত।

* আল্লাহু আকবার বলে হাত রুকুতে হাঁটুর দিকে নিয়ে যাবে। হাত সোজা ছেড়ে দিবে না বা পিছনের দিকে ঝাড়া দিবে না।

* রুকুর জন্য ঝোঁকার সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলা শুরু করবে এবং রুকুতে সোজা স্থির হওয়ার সাথে বলা শেষ হবে। এটা সুন্নাত তরীকা।

* রুকুতে পিঠ বরাবর সোজা রাখা সুন্নাত।

* কোমর এবং মাথা এক বরাবর রাখবে– সামনে বা পিছনে ঝুঁকাবে না।

* পাঁজর থেকে বাহুকে পৃথক রাখবে।

* রুকুতে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা সুন্নাত।

* শক্তভাবে হাঁটু ধরা সুন্নাত।



* উভয় হাতের কনুই সোজা রাখবে- ভাজ করে রাখবে না। মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাটুর উপর হাত রাখবে, হাঁটু ধরবে না এবং হাতের বাহু পাজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে এবং হাঁটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে। (احسن الفتاوی ৩/□□)

* রুকুতে নজর উভয় পায়ের পাতা বা পায়ের আঙ্গুলের প্রতি নিবদ্ধ রাখা আদব।

* পুরুষগণ রুকুতে দুই টাখনুকে দাঁড়ানোর অবস্থার মত পৃথক রাখবে এবং নারীগণ মিলিয়ে রাখবে। (بہشتی زیور)

* রুকুতে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ** পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহ তিন/পাঁচ/স-াত এরূপ বেজোড় সংখ্যায় পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহের অর্থ হল আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

* **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** (অর্থাৎ, আল্লাহ শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।) বলে রুকু থেকে উঠা সুন্নাত।

* সোজা হওয়ার সঙ্গে **حَمِدَهُ** বলা শেষ হবে– এটা সুন্নাত।

* রুকুর থেকে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব।

* সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** (অর্থাৎ, হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য।) বলা সুন্নাত। **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** বলা আরও উত্তম। তার চেয়ে উত্তম **اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলা এবং তার চেয়েও উত্তম হল **اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** বলা। (الدر المختار ج/١)

* সাজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত।

* সাজদায় জমীনে কপাল লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে 'আকবার' বলা শেষ করবে– এটা সুন্নাত তরীকা।

* সাজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাঁটু একত্রে, তারপর উভয় হাত একত্রে, তারপর নাক এবং তারপর কপাল জমিনে রাখবে। এই তারতীব সুন্নাত। ওজরের সময় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতে হলে প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত, তারপর উভয় হাঁটু একত্রে রাখবে। (احسن الفتاوی ৩/□□)

* হাঁটু জমিনে লাগার পূর্বে কোমর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকানো মাকরূহ; বরং কোমর সোজা রাখবে। (احسن الفتاوی ৩/□□)

* সাজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ভর না করা, এতে হাঁটু মাটিতে লাগার পূর্বেই কোমর ও মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়। তদুপরি অনেকে এটাকে সুন্নাত মনে করে বিধায় এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

* সাজদায় যাওয়ার সময় কাপড় নাড়াচাড়া বা টানাটানি করবে না। এরূপ করা মাকরূহ।

* সাজদায় উভয় হাতের মাঝে চেহারার চওড়া পরিমাণ ফাঁক রাখবে।

* উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল খুব মিলিয়ে রাখা সুন্নাত।

* উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী রাখা সুন্নাত।

* উভয় হাতের মধ্যখানে বৃদ্ধ আঙ্গুলদ্বয়ের নখ বরাবর নাক রাখবে।

* নজর নাকের উপর রাখা আদব।

* দুই পায়ের টাখনু কাছাকাছি রাখবে, মিলাবে না। সাজদাতে টাখনু মিলানো বা পৃথক রাখা সম্পর্কে হাদীছে উভয় রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদুভয়ের মাঝে সমন্বয় হল কাছাকাছি রাখবে। احسن الفتاوى গ্রন্থে কয়েকটি যুক্তির ভিত্তিতে এটাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

* উভয় পা খাড়া রাখবে।

* পায়ের আঙ্গুলসমূহ জমিনের সাথে চেপে ধরে যথাসম্ভব আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী করে রাখবে।

* কপালের অধিকাংশ ও নাক জমিনের সংঙ্গে লাগিয়ে রাখা ওয়াজিব। (احسن الفتاوى ৩/□□)

* পুরুষগণ পেট রান থেকে, বাহু পাজর থেকে এবং কনুই জমিন থেকে পৃথক রাখা অবস্থায় সাজদা করবে।

* মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং পেট দুই রানের সঙ্গে এবং বাহু পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে ও কনুই পর্যন্ত হাত জমিনের সঙ্গে লাগিয়ে খুব চেপে সাজদা করবে। (مصنف ابن أبي شيبة برقم ٢٧٩٣ و ٢٧٩٤)

* সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহ তিন/পাঁচ/সাত-এরূপ বেজোড় সংখ্যায় পড়া সুন্নাত।

* আল্লাহু আকবার বলে সাজদা থেকে উঠা সুন্নাত। উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত জমিন থেকে উঠানো সুন্নাত।



* সোজা হয়ে বসার সাথে সাথে আকবার বলা শেষ করবে। এটাই সুন্নাত তরীকা।

* বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা সুন্নাত। মহিলাগণ দুই নিতম্বের উপর বসবে। (مصنف ابن أبي شيبة برقم ٢٧٩٩)

* বসার সময় পুরুষের জন্য ডান পা সোজা খাড়া রাখা সুন্নাত।
ডান পা জমিনের সঙ্গে চেপে ধরে যথাসম্ভব ডান পায়ের *
আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখা সুন্নাত। মহিলাগণ উভয় পা ডান
(شرح منية) ।দিকে বের করে দিবে
বসার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য ফাঁক রাখা *
(بہشتی زیور) ।মহিলাগণ আঙ্গুল মিলেয়ে রাখবে (شرح منية) ।মোস্তাহাব

* হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা কেবলামুখী করে রাখা মোস্তাহাব।
(شرح منية و شرح وقاية)

* হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ হাঁটুর কিনারা বরাবর রাখবে।

* বসার সময় নজর কোলের উপর নিবদ্ধ রাখা আদব।

* দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ওয়াজিব।

* দুই সাজদার মাঝখানে নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. (ترمذي) অথবা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.
(مستدرك حاكم)

২য় সাজদায় যাওয়ার এবং সাজদার মধ্যে উপরোক্ত আমলসমূহ (১৮টি) করা।

* দ্বিতীয় সাজদা থেকেও আল্লাহু আকবার বলে উঠা সুন্নাত। উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত এবং তারপর হাঁটু জমিন থেকে উঠানো সুন্নাত।

* ২য় সাজদা থেকে উঠে বসা ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাত।
(احسن الفتاوى ج/৩) ।হাঁটুর উপর হাতে ভর করে উঠা মোস্তাহাব *

* সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাথে আকবার শব্দের উচ্চারণ শেষ করবে।

* ২য় রাকআতে ২য় সাজদা থেকে উঠে বসে তাশাহ্হুদ পড়া ওয়াজিব। তাশাহহুদ এই–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرُسُوْلُهٗ.

* তাশাহ্হুদ-এর মধ্যে اَشْهَدُ اَنْ (আশহাদু আল) বলতে বলতে হাতের হলকা বাঁধা অর্থাৎ, ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ এবং মধ্যমার অগ্রভাগকে মিলানো এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকাকে হাতের তালুর সঙ্গে মিলানো। এটা মোস্তাহাব। 'লা ইলাহা' বলতে বলতে শাহাদাত আঙ্গুলকে উপর দিকে উঠানো, এতটুকু উঠানো যেন তার অগ্রভাগ কেবলা-মুখী হয়ে যায়। 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নিচের দিকে নামানো। তবে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত রানের সাথে না মিলিয়ে উঁচু করে রাখা নিয়ম। (احسن الفتاوى ১/□□) এই হলকা বৈঠকের শেষ পর্যন্ত রাখবে। (بہشتی زیور)

* তাশাহ্হুদের পর দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত। নিম্নে দুরূদ শরীফ পেশ করা হল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

* তারপর দুআয়ে মাছুরা পড়া মোস্তাহাব। "দুআয়ে মাছূরা" অর্থ যেসব দুআ কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ইত্যাদি।

* তারপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে উভয় দিকে সালাম ফিরানো ওয়াজিব। (احسن الفتاوى ৩/□□)

* সালাম ফিরানোর সময় নজর কাঁধের উপর রাখা মোস্তাহাব।



* ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের ফিরিশতাকে সালাম করার নিয়ত করবে। অনুরূপ বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের ফিরিশতাকে সালামের নিয়ত করবে।

* উভয় সালাম চেহারা কেবলামুখী থাকা অবস্থায় শুরু করবে। এবং কাঁধে নজর করে শেষ করবে।

* দ্বিতীয় সালামকে কম দীর্ঘ করা এবং আওয়াজ নিচু করা সুন্নাত।

* সালামের সময় ঘাড় এতটুকু ফিরানো যেন (পিছনে কেউ থাকলে) তার চেহারার উক্ত পাশ দেখতে পারে। (بدائع الصنائع ج/١)

* এতক্ষণ দুই রাকআত নামাযের বিবরণ পেশ করা হল। তিন/চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। আর সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা বা নফল নামায হলে প্রথম বৈঠকে দুরূদ এবং দুআয়ে মাছূরাও পড়ে তারপর উঠা উত্তম। উল্লেখ্য যে, এ নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বৈঠকে দুরূদ এবং দুআয়ে মাছূরা পড়ে উঠলে তৃতীয় রাকআতে ছানা এবং সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ ... –এর পূর্বে আউযুবিল্লাহ ...ও পড়া উত্তম।

* তিন/চার রাকআত বিশিষ্ট নামায ফরয হলে তৃতীয়/চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া উত্তম। আর ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামাযে ৩য়/৪র্থ রাকআতে সূরা/কিরাত মিলানো ওয়াজিব।

* শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত এবং দুআয়ে মাছূরা পড়া মোস্তাহাব।

## মুক্তাদী-র জন্য খাস মাসায়েল

* মুক্তাদী ইমামের পিছনে এক্তেদা করার নিয়ত করবে। এক্তেদার নিয়ত ব্যতীত মুক্তাদীর নামায সহীহ হয় না।

* ইমামের তাকবীরে তাহ্রীমা– 'আল্লাহু আকবার' শেষ হওয়ার পূর্বে মুক্তাদীর তাকবীর যেন শেষ না হয়।

* ইমামের তাকবীরে তাহরীমা শেষ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহ্রীমা বলা উত্তম।

* ইমাম সূরা/কিরাত শুরু করলে মুক্তাদী ছানা পড়বে না।

* মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা কিরাত কোনোটা পাঠ করবে না। সূরা ফাতিহার পূর্বে শুরুতে পঠিতব্য বিসমিল্লাহও পাঠ করবে না।

* মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ সَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ না বলে তদস্থলে বলতে বলতে উঠবে। (شرح منية)

* সালাম ফিরানোর সময় ইমামের "আস্‌সালামু" বলার পূর্বে মুক্তাদীর আস্‌সালামু বলা যেন শেষ না হয়।

* ইমামের সালাম ফিরানোর পর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীর সালাম ফিরানো উত্তম।

* ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের ফিরিশতা, ডান দিকের মুসল্লী এবং নেককার জিনদেরকে সালাম করার নিয়ত করবে, ইমাম ডান দিকে থাকলে ইমামকে সালাম করার নিয়তও করবে, আর বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের ফিরিশতা, বাম দিকের মুসল্লী এবং নেককার জিনদেরকে সালাম করার নিয়ত করবে। ইমাম বাম দিকে থাকলে বাম সালামে তাঁরও নিয়ত করবে। আর ইমাম সোজা বরাবর থাকলে উভয় সালামেই তাঁর নিয়ত করবে।

## মাছ্‌বূকের জন্য খাস মাসায়েল

(যে মুক্তাদী ইমামের সঙ্গে প্রথম রাকআত থেকে শরীক হতে পারেনি, শুরুর দিকে এক বা একাধিক রাকআত ছুটে গিয়েছে, তাকে মাছ্‌বূক বলে।)

* ইমামের শেষ বৈঠকে মাছ্‌বূক তাশাহ্‌হুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে, যেন তার তাশাহ্‌হুদ শেষ হতে হতে ইমামের দুরূদ ও দুআয়ে মাছূরা শেষ হয়ে যায়। তবে আগেই মুক্তাদির তাশাহ্‌হুদ শেষ হয়ে গেলে তাশাহ্‌হুদের শেষ বাক্যটা (অর্থাৎ, কালিমায়ে শাহাদাত) বারবার আওড়াতে পারে বা চুপচাপ বসে থাকতে পারে বা তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিয়্যাতু ...) পুনরায় পড়তে পারে। (احسن الفتاوى ج/٣)

* ইমাম সাজদায়ে সাহো দিলে মাছ্‌বূকও সাজদায়ে সাহো করবে, তবে সাজদায়ে সহো-র সালাম ফিরাবে না।

* মাছ্‌বূক ইমামের সাথে শেষ সালাম ফিরাবে না। তবে ভুলে ফিরিয়ে ফেললে সাজদায়ে সাহো দিবে।

* ইমাম উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সামান্য পর মাছ্‌বূক অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াবে। ইমামের এক সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীর উঠে দাঁড়ানো সুন্নাতের ফেলাফ।



* মাছ্‌বূক অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য উঠে ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে। প্রথমে কিরাত মিলানোর রাকআত/রাকআতগুলো, তারপর কিরাতবিহীন রাকআত/রাকআতগুলো পড়বে। ইমাম যে সূরা/কিরাত পড়েছেন তার সঙ্গে তারতীব রক্ষা করা মাছ্‌বূকের জন্য জরুরি নয়।

### মাছ্‌বূক এক রাকআত ছুটে গেলে তা কীভাবে পড়বে

ইমাম উভয় সালাম ফিরানোর পর মাছ্‌বূক আল্লাহু আকবার বলে উঠবে, ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা পড়বে, তারপর বিসমিল্লাহসহ সূরা মিলাবে এবং রুকু সাজদা ও বৈঠক করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

### মাছ্‌বূক দুই রাকআত ছুটে গেলে তা কীভাবে পড়বে

ইমাম উভয় সালাম ফিরানোর পর মাছ্‌বূক আল্লাহু আকবার বলে উঠবে এবং পূর্ববর্ণিত নিয়মে প্রথম রাকআত আদায় করবে। তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হলে বৈঠক করে (বৈঠকে শুধু তাশাহ্‌হুদ পড়তে হবে) আর চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হলে বৈঠক না করেই দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। এ রাকআতে ছানা ব্যতীত এবং শুধু বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও সূরা/কিরাত মিলিয়ে শুধু সাজদা ও বৈঠক করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

### মাছ্‌বূক তিন রাকআত ছুটে গেলে কীভাবে পড়বে

মাছবূক যদি ইমামের সঙ্গে এক রাকআত পায় এবং তিন রাকআত না পায়, তাহলে ইমামের উভয় সালাম ফিরানোর পর উঠে পূর্ববর্তী নিয়মে প্রথম রাকআত পড়বে এবং বৈঠক করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা/কিরাত মিলাতে হবে এবং বৈঠক না করেই তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে কোনো সূরা/কিরাত মিলাতে হবে না।

### মাছ্‌বূক কোনো রাকআত না পেলে কীভাবে পড়বে

মাছবূক যদি কোনো রাকআত না পায়, শুধু শেষ বৈঠকে এসে শরীক হয়, তাহলে ইমামের উভয় সালাম ফিরানোর পর উঠে একাকী যেভাবে নামায পড়া হয় সেভাবে পূর্ণ নামায আদায় করবে।

## ইমামের জন্য খাস মাসায়েল

* উত্তম লেবাছ পরিধান করে নামায পড়ানো এবং পড়া উত্তম। (فتاوى محمودية ج/٢)

* ইমাম ইমামতের নিয়ত করবেন। নতুবা ইমামতের ছওয়াব অর্জিত হবে না।

* ইমামের জন্য সম্পূর্ণ মেহরাবের মধ্যে দাঁড়ানো মাকরূহ তানযীহী। (فتاوى محمودية □□/٧)

* ইমাম প্রত্যেক উঠা-বসা ইত্যাদির তাকবীর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও সালাম জোরে বলবেন। প্রয়োজনের চেয়ে খুব বেশি জোরে বলা মাকরূহ।

* জেহ্‌রী নামাযে (অর্থাৎ, মাগরিব, ইশা ও ফজর ইত্যাদিতে) প্রথম দুই রাকআতে সূরা/কিরাত জোরে পড়বেন।

* মুসল্লীদের মধ্যে অসুস্থ্য বা হাজতমান্দ লোক থাকলে হালকা কিরাত পড়বেন। তবে সুন্নাত পরিমাণ ছেড়ে নয়।

* রুকুর থেকে উঠার পর রব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলবেন না।

* ইমামের জন্য রুকু সাজদায় তাসবীহ তিন/পাঁচবার এমনভাবে পড়া উত্তম, যেন মুক্তাদীগণ সাধারণভাবে তিনবার পড়তে পারে। তবে মুক্তাদীগণ কষ্ট বোধ করার আশংকা না থাকলে অধিকও পড়তে পারেন।

* ইমাম দুই সাজদার মধ্যখানে বৈঠকে দুআ পড়বেন না, তবে শুধু اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ -এতটুকু পড়তে পারেন।

* ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের মুক্তাদী এবং বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের মুক্তাদীদেরও নিয়ত করবেন।

* ফজর এবং আসর নামাযের সালামান্তে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসবেন। ডান দিক দিয়ে ফেরা এবং ডান দিকের মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসা উত্তম। তবে বাম দিক দিয়ে ফেরা কিংবা পিছনের দিকে ফিরে সোজা পূর্বমূখী হয়ে বসাও জায়েয। (مراقي الفلاح)

* ফরয নামাযের পর অন্যত্র সরে সুন্নাত পড়া উত্তম।

## দুআ/মুনাজাতের আদব ও আমলসমূহ

### (ক) দুআ কবূল হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ যা যা করণীয়

১. খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আয়-উপার্জন হালাল হওয়া।
২. পিতা-মাতার নাফরমানী থেকে বিরত থাকা।
৩. আম্‌র বিল' মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করা তথা ভাল কাজের



আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা।
৪. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা।
৫. কোনো মুসলমানের সাথে অন্যায়ভাবে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ না রাখা।
৬. গীবত না করা। গীবতকারী ব্যক্তির দুআ কবূল হয় না।
৭. হাছাদ বা হিংসা না করা। হিংসুকের দুআ কবূল হয় না।
৮. বখীলী বা কৃপণতা না করা। কৃপণ ব্যক্তির দুআ কবূল হয় না।
৯. দুআ কবূল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা।
১০. হৃদয় মরে গেলে দুআ কবূল হয় না। উল্লেখ্য, যিকির না করলে, বেশি হাসলে, বেশি কথা বললে হৃদয় মরে যায়।

### (খ) দুআর সময় বসার আদব

১. কেবলামুখী হয়ে বসা।
২. হাঁটু গেড়ে বসা।
৩. আদব, তাওয়াযু ও বিনয়ের সাথে বসা।
৪. পাক-সাফ হয়ে বসা।
৫. উযূ সহকারে বসা।
৬. দুআর সময় আসমানের দিকে নজর না উঠানো।

### (গ) দুআর সময় হাত উঠানোর নিয়মাবলী

১. সীনা বা কাঁধ বরাবর হাত উঠানো।
২. উভয় হাতের তালু আসমানের দিকে রাখা মোস্তাহাব।
৩. উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখা মোস্তাহাব।
৪. উভয় হাতের মাঝখানে সামান্য পরিমাণ ফাঁক রাখা মোস্তাহাব।
৫. উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে নয় বরং সামান্য ফাঁক রাখা মোস্তাহাব।
৬. দুআ শেষপূর্বক বরকতের জন্য মুখে হাত বুলিয়ে নেয়া।

### (ঘ) দুআ শুরু এবং শেষ করার বাক্যসমূহ

১. দুআর শুরু এবং শেষে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা) বয়ান করা।
২. দুআর শুরু এবং শেষে দুরূদ ও সালাম পড়া।
বি. দ্র. এ দুটি আমলের জন্য নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে দুআ শুরু করা যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

এবং শেষে নিম্নোক্ত বাক্য বলা যায়।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৩. 'আমীন' বলে দুআ শেষ করা।

### (ঙ) দুআর সময় মনের অবস্থা যেরকম রাখতে হয়

১. এখলাসের সাথে খালেস মনে দুআ করা অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে না– এই মনোভাব বদ্ধমূল রাখা।

২. দ্ব্যর্থহীন মনোভাব নিয়ে দুআ করা।

৩. আগ্রহ এবং অনুপ্রাণিত মনে দুআ করা।

৪. যথাসম্ভব মনোযোগ সহকারে দুআ করা।

৫. না-ছোড় মনোভাব নিয়ে দুআ করা।

৬. দুআ কবূল হওয়ার দৃঢ় আশা রাখা।

### (চ) চাওয়ার আদবসমূহ

১. আল্লাহ্র আছমায়ে হুছনা (উত্তম নামসমূহ) ও মহান গুণাবলী উল্লেখ-পূর্বক চাইতে হয়।

২. প্রথমে নিজের জন্য, তারপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য মুসলমান ভাইদের জন্য চাওয়া। ইমাম হলে জামাআতের সকলের জন্য চাইবেন।

৩. বারবার চাওয়া; অন্তত তিন বার। একই মজলিসে তিন বার বা তিন মজলিসে তিন বার। তবে তিন বার চাওয়ার এই নিয়ম একাকী দুআ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. নিম্নস্বরে চাওয়া। তবে মজলিসের লোকদেরকে শোনানোর প্রয়োজনে জোর আওয়াজে দুআ করা যায়। কিন্তু যদি কোন নামাযী ব্যক্তির নামাযে ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে তখন জোর আওয়াজে দুআ করা নিষিদ্ধ।

৫. কোন নেক কাজের উল্লেখ পূর্বক দুআ কবূল হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে আবেদন প্রার্থনা করা। যেমন: হে আল্লাহ! এই তিলাওয়াত, কিংবা দান-সদকার ওছিলায় আমাদের দুআ কবূল করুন।

৬. আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং অন্যান্য নেককার ও বুযুর্গদের ওছীলায় দুআ কবুল হওয়ার প্রার্থনা করা।

### (ছ) দুআর বিষয়বস্তু বিষয়ক আদবসমূহ

১. আখেরাত ও দুনিয়া উভয় জগতের প্রয়োজনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে দুআ



করা।

২. কোন পাপের বিষয় না চাওয়া।

৩. এমন বিষয় প্রার্থনা না করা, যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে; (যেমন: নারী দুআ করবে না যেন সে পুরুষ হয়ে যায়, কিংবা বেটে মানুষ লম্বা হওয়ার বা কাল মানুষ ফর্সা হওয়ার দুআ করবে না, ইত্যাদি।)

৪. কোনো অসম্ভব বিষয়ের দুআ না করা।

৫. নিজের মুখাপেক্ষিতা, প্রয়োজন ও অক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করা।

### (জ) দুআর ভাষা বিষয়ক আদবসমূহ

১. হযরত রসূল (সা.) থেকে বর্ণিত বা কুরআনে বর্ণিত ভাষায় দুআ করা।

২. কথার ছন্দ মিলানোর জন্য কসরত না করা।

৩. কবিতার মাধ্যমে দুআ করলে গানের ভঙ্গি থেকে বিরত থাকা।

### দুআ সম্পর্কে আরও বিশেষ কয়েকটি কথা

* দুআ কবূল হওয়ার জন্য ওলী বা মুত্তাকী হওয়া শর্ত নয়, পাপীদের দুআও আল্লাহ কবূল করে থাকেন। অবশ্য আল্লাহ্র খাস বান্দাদের দুআ আল্লাহ বেশি কবূল করে থাকেন। অতএব আমি পাপী বা আমি নগণ্য– এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়।

* কয়েকবার দুআ করে হতাশ হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা, মানুষের কল্যাণের জন্যই কখনও কখনও দুআ বিলম্বে কবূল হয়ে থাকে।

* দুআ কখনো বৃথা যায় না। কখনও এমন হয় যে, মানুষ যা দুআ করে হুবহু তা পায়। কখনও যা চাওয়া হয় তা না দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কোন নেয়ামত প্রদান করা হয় অথবা কোন বিপদকে তার থেকে হঠিয়ে দেয়া হয় বা দুআর ওছীলায় তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিংবা দুনিয়াতে যা চাওয়া হয় তা না দিয়ে পরকালের সঞ্চয় হিসাবে তা রেখে দেয়া হয়। মোটকথা, দুআ কখনও বৃথা যায় না, তবে তা কবূল হওয়ার প্রক্রিয়া এক নয়।

* সব সময়ই দুআ করা যায়; তবে এমন কিছু সময় রয়েছে যখন দুআ করলে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে কবূল করে থাকেন।

### দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত

১। ফরয নামাযের পর।

২। শেষ রাতে।
৩। রমযান মাসের দিবারাত্রির সব সময়, বিশেষভাবে ইফতারের সময়।
৪। কোন নেক কাজ সম্পাদনের পর।
৫। সফরের অবস্থায়। বিশেষভাবে যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের রাস্তায় সফর হয়।
৬। শবে কদরে।
৭। আরাফার দিনে।
৮। জুমুআর রাতে।
৯। জুমুআর দিন বিশেষ কোন এক মুহূর্তে। অনেকের মতে এ মুহূর্তটি জুমুআর দিন আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে রয়েছে।
১০। জুমুআর খুতবা শুরু হওয়া থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত, তবে খুতবা চলাকালীন দুআ করলে মনে মনে করতে হবে অথবা ইমাম খুতবার মধ্যে যে দুআ করবেন তাতে মনে মনে (মুখে কোনো প্রকার শব্দ করা ছাড়া) আমীন বলতে হবে।)

## কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত

(١) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

(১) হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ: ২৩)

(٢) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ.

(২) হে আমাদের রব! আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও। আর আমাদেরকে মৃত্যু দাও নেককার লোকদের সঙ্গে। (সূরা আলে ইমরান: ১৯৩)

(٣) رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

(৩) হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইবরাহীম: ৪১)

(٤) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

(৪) হে আমার রব! তাঁদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি রহম কর



যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৪)

(٥) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

(৫) হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়েত করার পর তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিও না। তুমি তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (সূরা আলে ইমরান: ৮)

(٦) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ.

(৬) হে আমার রব! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে নামায কায়েম-কারী বানাও। (সূরা ইবরাহীম: ৪০)

(٧) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

(৭) হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের স্ত্রীদের থেকে এবং আমাদের সন্তানাদি থেকে আমাদেরকে শান্তি দান কর। আর মুত্তাকীদের জন্য আমাদেরকে নেতা (আদর্শ স্বরূপ) বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান: ৭৪)

(٨) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(৮) হে আমাদের রব! তুমি দুনিয়াতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা: ২০১)

(٩) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

(৯) হে আমাদের রব! আমাদেরকে তুমি দান কর যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (সূরা আলে ইমরান: ১৯৪)

(١٠) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَ يَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

(১০) হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দাও (অর্থাৎ, মনোবল বৃদ্ধি করে দাও, জ্ঞান বহন করার উপযোগী বানিয়ে দাও এবং দ্বীন

প্রচার কার্যে হীনম্মন্যতা এবং বিরোধিতার কারণে সৃষ্ট সংকোচবোধ দূর করে দাও।) আর আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা: ২৫-২৮)

(١١) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

(১১) হে আমার রব! তুমি আমার ইল্‌ম বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা তাহা: ১১৪)

(١٢) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

(১২) হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। আর ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি বড় স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা হাশ্‌র: ১০)

(١٣) رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

(১৩) হে আমার রব! তুমি ক্ষমা কর এবং রহম কর, তুমি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনূন: ১১৮)

(١٤) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

(১৪) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও, তার শাস্তি তো নিশ্চিত ধ্বংস। (সূরা ফুরকান: ৬৫)

(١٥) رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

(১৫) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা শুআরা: ৮৩)

(١٦) رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

(১৬) হে আমার রব! আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর। (সূরা কাসাস: ২১)

(١٧) رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ.



(১৭) হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদী লোকদের মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আন্‌কাবূত: ৩০)

(١٨) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

(১৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম লোকদের উৎপীড়নের পাত্র বানিও না এবং তোমার রহমতে কাফের সম্প্রদায় থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা ইউনুস: ৮৫)

(١٩) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ.

(১৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাঝে এবং আমাদের জাতির মাঝে সঠিক ফয়সালা করে দাও। তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ: ৮৯)

(٢٠) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

(২০) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের থেকে কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শুনতে পাও, সবকিছু জান। (সূরা বাকারা: ১২৭)

## হাদীছে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত

(١) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ والغِنٰى.

(১) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, অন্যায় থেকে বিরত থাকার তওফীক এবং মনে অভাববোধ না থাকা ও সম্পদের স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(২) হে আল্লাহ! আমার পূর্বের গোনাহ, পরের গোনাহ, প্রকাশ্যেকৃত গোনাহ এবং গোপনেকৃত গোনাহ আর আমার যত গোনাহ সম্পর্কে তুমি অবহিত আছ, সব ক্ষমা করে দাও। তুমি যাকে চাও তাকে আগে রহমতের তওফীক দাও এবং যাকে চাও তাকে পরে দাও। তুমি সবকিছুর ক্ষমতা রাখ।

(٣) اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

(৩) হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(٤) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا.

(৪) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাই এমন ইল্‌ম যা উপকার দিবে, এমন আমল যা কবূল হবে এবং হালাল রিযিক।

(٥) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدَرِ.

(৫) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সুস্থ্যতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, সুচরিত্র এবং তাকদীরে রাজি থাকার তওফীক চাই।

(٦) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُوْرِ.

(৬) হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র করে দাও, আমার অন্তরকে মুনাফিকী থেকে, আমলকে রিয়া থেকে, জবানকে মিথ্যা থেকে এবং দৃষ্টিকে অন্যায় নজর থেকে। তুমি তো চোখের ফাঁকি এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল।

(٧) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ.

(৭) হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই তোমার ভালবাসা এবং তোমাকে যে ভালবাসে তার ভালবাসা আর এমন আমল, যা আমাকে তোমার ভালবাসায় উপনীত করবে। হে আল্লাহ! আমার জীবন, আমার ধন-সম্পদ এবং আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও।

(٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً.



(৮) হে আল্লাহ! আমার জাহিরী অবস্থার চেয়ে আমার বাতিনী অবস্থাকে সুন্দর বানিয়ে দাও, আর জাহিরী অবস্থাকে দুরস্ত বানিয়ে দাও।

(٩) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَتَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

(৯) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেরই মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

(١٠) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(১০) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফ্‌রী থেকে, অভাব- অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

(مشكاة المصابيح থেকে গৃহীত।)

আরও কতিপয় মুনাজাতের জন্য দেখুন ৩৫৪, ৫৭৬, ৫৭৯ ও ৫৮২ নং পৃষ্ঠা।

## নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয়

১. নামাযে সূরা/কিরাত, দুআ, দুরূদ, ইত্যাদি যা যা পড়া হয় তার প্রত্যেকটা শব্দ শব্দ খেয়াল করে পড়া, বে-খেয়ালীর সাথে মুখস্থ থেকে না পড়া। আর ইমামের সূরা/কিরাত শোনা গেলে সে ক্ষেত্রে মনোযোগের সঙ্গে সূরা/কিরাত শোনা।
২. নামাযের প্রত্যেক রুকন ও কাজ মাসআলা অনুযায়ী হচ্ছে কি না তার প্রতি খুব খেয়াল রেখে আদায় করা।
৩. আমি আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়েছি, আল্লাহ আমার নামাযের সবকিছু দেখছেন, কিয়ামতের দিন এই নামাযের সব কিছুর পুংখানুপুংখ হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে– এই ধ্যান জাগ্রত রাখা।

## ওয়াক্তিয়া নামায

* প্রতিদিন মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। যথা: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। বিতর নামায ওয়াজিব এবং এটা ইশার অধীন।

## ফজরের নামায

* ফজরে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং দুই রাকআত ফরয।

### ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের

ওয়াক্ত। তবে আলো পরিষ্কার হওয়ার পর সূর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে নামায শুরু করা উত্তম যেন সুন্নাত পরিমাণ কিরাত সহকারে নামায আদায় করার পর যদি নামায ফাসেদ হওয়ার কারণে পুনরায় পড়তে হয়, তাহলে পুনরায় মাছনূন (সুন্নাত পরিমাণ) কিরাত যোগে নামায আদায় করা যায়। অর্থাৎ, মোটামুটি সূর্যোদয়ের আধঘণ্টা পূর্বে নামায শুরু করলে উত্তম হয়।

## ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার বিশেষ কয়েকটি বিধান

* এ দুই রাকআত সুন্নাত যে কোনো সূরা/কিরাত দিয়ে পড়া যায়, তবে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া মোস্তাহাব। অথবা প্রথম রাকআতে সূরা বাকারার **قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا إلخ** (আয়াত নং ১৩৬) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আলে ইমরানের **قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ إلخ** (আয়াত নং ৬৪) পড়া মোস্তাহাব। (نسائي، باب الإفتتاح) তবে মাঝে মধ্যে অন্য সূরা দ্বারাও পড়বে যেন ঐ দুই সূরা দ্বারা পড়াই জরুরি- এরূপ বোধগম্য না হয়। (احسن الفتاوى ৩/□□)

* ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেলেও যদি আশা থাকে যে, সুন্নাত পড়ে নিয়েও অন্তত শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদে জামাআতের সাথে শরীক হতে পারব, তাহলে সুন্নাত পড়ে নিবে। তবে এরূপ অবস্থায় সুন্নাত পড়তে হবে মসজিদের বাইরে (ভিতরে জামাআত হতে থাকলে বারান্দায় পড়া বাইরের হুকুমে।) বা পিলার প্রভৃতির আড়ালে। আর যদি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদেও শরীক হতে পারার আশা না থাকে কিংবা সুন্নাত পড়ার মত অনুরূপ স্থান না পায়, তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। আর এরূপ ছেড়ে দেয়া সুন্নাত সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া জায়েয নেই। সূর্যদয়ের পর এবং সূর্য ঢলার পূর্বে পড়ে নেয়া উত্তম, জরুরি নয়। (احسن الفتاوى ৩/□□) আর যদি ফজরের ফরযসহ সুন্নাত কাযা হয়ে থাকে এবং সূর্য ঢলার পূর্বেই কাযা আদায় করা হয় তাহলে সুন্নাতসহ কাযা করবে। (احسن الفتاوى ৩/□□)

* যদি কোন দিন কোনো কারণে সুন্নাত পড়ার সময় না থাকে শুধু ফরয পড়ার সময় থাকে, তাহলে শুধু ফরয পড়ে নিবে এবং সুন্নাত উপরোক্ত নিয়মে কাযা করে নিবে।

* এই দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: **نَوَيْتُ أَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ**



বাংলায়: ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করছি।

ফজরের দুই রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি বিধান

* সফর বা জরূরতের অবস্থা না হলে ফজরের নামাযে তেওয়ালে মুফাস্সাল অর্থাৎ, সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে কিরাত পড়া সুন্নাত।

* ফজরের দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা প্রথম রাকআত লম্বা হওয়া উত্তম।

* জুমুআর দিন ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহ্র পড়া উত্তম। তবে মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম করবে যাতে সাধারণ মানুষ এটাকে জরুরি মনে না করে বসে। (احسن الفتاوى ৩/□□)

* ফজরের দুই রাকআত ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: **نَوَيْتُ أَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ فَرْضِ الْفَجْرِ**

বাংলায়: ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

## জোহরের নামায

* জোহরে প্রথম চার রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তারপর চার রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

## জোহরের ওয়াক্ত

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলার পর থেকে প্রতিটা বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। তবে শীতের মওসূমে ওয়াক্তের শুরু ভাগে এবং গরমের মওসূমে দেরীতে পড়া উত্তম। প্রতিটা বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত। (বেহেশতী জেওর: ১ম)

## জোহরের চার রাকআত সুন্নাতের বিশেষ বিধানসমূহ

* এই সুন্নাত শুরু করার পর ইমাম ফরযের জামআত শুরু করলে দুই রাকআতের কম পড়া হয়ে থাকলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। (এই দুই রাকআত নফল হয়ে যাবে।) এবং এই সুন্নাত পরে পড়ে নিতে হবে। আর তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকলে সুন্নাত শেষ করে তারপর জামাআতে শরীক হবে।

* জামাআত শুরু হওয়ার পর এই সুন্নাত শুরু করবে না বরং জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

* ফরযের পূর্বে এই সুন্নাত পড়তে না পারলে ফরযের পর প্রথমে পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নাত পড়ে নিবে তারপর এই চার রাকআত সুন্নাত পড়বে।

* এই চার রাকআত সুন্নাতের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَاتِ سُنَّةِ الظُّهْرِ

বাংলায়: জোহরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করছি।

### জোহরের চার রাকআত ফরযের বিশেষ মাসায়েল

* ফজরের ফরযের ন্যায় জোহরের ফরযের কিরাতও তিওয়ালে মুফাস্সাল থেকে হওয়া সুন্নাত। তবে জোহরে তিওয়ালে মুফাস্সালের মধ্য থেকে তুলনামূলক ছোট সূরা পড়া সুন্নাত এবং উভয় রাকআতের কিরাত সমান হওয়া বা প্রথম রাকআতে সামান্য পরিমাণ বেশি হওয়া উভয় রকম করা যায়।

* জোহরের ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আবরীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فَرْضَ الظُّهْرِ

বাংলায়: জোহরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

## আসরের নামায

* আসরে প্রথম চার রাকআত গায়র মুয়াক্কাদা, তারপর চার রাকআত ফরয।

### আসরের ওয়াক্ত

জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আসরের সময়। তবে সূর্যের হলুদ হয়ে যাওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত মাকরূহ হয়ে যায়। এর পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত।

### আসরের চার রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা

* সফর বা জরূরতের অবস্থা না হলে আসরের নামাযে আওছাতে মুফাস্সাল অর্থাৎ, সূরা তারেক থেকে সূরা বাইয়্যেনা পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে কিরাত পড়া সুন্নাত।

* আসরের ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فَرْضَ الْعَصْرِ

বাংলায়: আসরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

## মাগরিবের নামায



* মাগরিবে তিন রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

### মাগরিবের ওয়াক্ত

সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশের লাল বর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত (অর্থাৎ, প্রায় সোয়া ঘণ্টা)। তবে মাগরিবের নামায দেরি করে পড়া মাকরূহ। আযানের সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের নামায পড়ে নেয়া উত্তম। (نماز مسنون ও বেহেশ্তী জেওর)

### মাগরিবের তিন রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা

* মাগরিবের ফরযে কেছারে মুফাস্সাল অর্থাৎ, সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে কিরাত পড়া সুন্নাত।

* মাগরিবের ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فَرْضَ الْمَغْرِبِ

বাংলায়: মাগরিবের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

## ইশার নামায

* ইশার নামাযে প্রথম চার রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা, তারপর চার রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং দুই রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদাহ।

### ইশার ওয়াক্ত

মাগরিবের ওয়াক্তে বর্ণিত "পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণ" শেষ হওয়ার পর সাদা বর্ণ দেখা যায়, তারপর কাল বর্ণ দেখা যায়। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর মতে এখান থেকে শুরু করে সুব্হে সাদিক পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত। কিন্তু রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত, রাত্র দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ ওয়াক্ত আর রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুব্হে সাদেক পর্যন্ত ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত।

### ইশার চার রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা

* আওছাতে মুফাস্সাল থেকে কিরাত পড়া সুন্নাত।

* ইশার ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فَرْضَ الْعِشَاءِ

বাংলায়: ইশার ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

## জামাআতের মাসায়েল

* পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। অনেক মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে ওয়াজিব। বিনা ওজরে জামাআত তরক করা গোনাহ। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে সর্বদা জামাআত তরক করে সে ফাসেক।

* পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযে ইমাম ব্যতীত একজন মুক্তাদী হলেও জামাআত হয়ে যায়। চাই সে একজন সমঝদার নাবালেগ হোক বা মেয়েলোক হোক।

* স্ত্রীলোক, নাবালেগ, ক্রীতদাস এবং যাদের জামাআত তরক করার ওজর রয়েছে তাদের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়।

* জামাআত সহীহ হওয়ার জন্য ইমামকে মুসলমান হতে হবে, ইমামকে বোধশক্তিসম্পন্ন ও বালেগ হতে হবে। মুক্তাদীকে এক্তেদার নিয়ত করতে হবে এবং ইমাম ও মুক্তাদীর স্থান একই হতে হবে অর্থাৎ, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান বা গাড়ী চলার মত রাস্তার ব্যবধান থাকতে পারবে না বা একজন সওয়ারীতে অন্যজন মাটিতে থাকতে পারবে না। কিংবা ইমাম মুক্তাদী ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে থাকলেও হবে না।

* একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়লে ২৫ বা ২৭ গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়।

* মহিলাদের জন্য মসজিদ বা ঈদগাহে জামাআতে নামায পড়তে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। সাহাবাদের যুগ থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা চলে আসছে। (فتاوی دار العلوم ج/٣ نقلا عن الدر المختار)

* যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীরের) সাথে জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়বে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকার পরওয়ানা লিখে দেয়া হবে। (তিরমিযী) ইমামের কিরাত শুরু করার আগ পর্যন্ত জামাআতে শরীক হলেও তাকবীরে উলা পেয়েছে ধরা হবে।

* জামাআত পাওয়ার আশায় মসজিদে এসে যদি দেখে জামাআত হয়ে গিয়েছে তবুও জামাআতের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

* মসজিদে জামাআত হয়ে গেলে মসজিদের বাইরে জামাআত



সহকারে নামায পড়তে পারলে উত্তম। এমনকি ঘরে এসে যারা নামায পড়েনি তাদেরকে নিয়ে জামাআত করবে। যদি শুধু স্ত্রীকে নিয়েও জামাআত করা যায় তবুও উত্তম। তবে স্ত্রী একা মুক্তাদী হলে তাকে পিছনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। আর কোনভাবে অন্যত্র জামাআত করতে না পারলে ফরয নামায মসজিদেই পড়া উত্তম। (فتاوی دار العلوم ৩/□□)

* হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর মতে মসজিদে ফরয নামাযের জন্য ছানী জামাআত (অর্থাৎ, মসজিদে একবার জামাআত হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয়বার ঐ মসজিদে ঐ নামাযের জন্য জামাআত) মাকরূহ তাহরীমী। তবে তিন অবস্থায় ছানী জামাআত বরং আরও অধিক জামাআত করা মাকরূহ নয়।

(১) যদি মসজিদ এমন হয় যার ইমাম মুয়ায্যিন নির্দিষ্ট নেই। এরূপ অবস্থায় ছানী জামআত করা যায়।

(২) যদি প্রকাশ্যে আযান ইকামত ছাড়া প্রথম জামাআত হয়ে থাকে।

(৩) যদি মসজিদের এলাকার নির্দিষ্ট মুসল্লী ও কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যরা প্রথম জামাআত করে থাকে।

হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)–এর মতে এই তিন অবস্থা ছাড়াও সর্বাবস্থায় ছানী জামাআত করা যায়– মাকরূহ হবে না, যদি প্রথম জামাআত যে স্থানে হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করে (ঐ মসজিদেই) অন্য স্থানে ছানী (দ্বিতীয়) জামাআত করা হয়। অনেকে হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)–এর মতানুসারে ছানী জামাআত করে থাকেন, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর মত দলীলের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে মুহাক্কিক আলেমগণ তাঁর মতানুসারেই ফতওয়া দিয়ে থাকেন। (فتاوی دار العلوم ৩/□□ و بہشتی گوہر)

* একাকী ফরয নামায পড়ার পর যদি মসজিদে জামাআত হতে দেখা যায় তাহলে তাতে শরীক হওয়া যায়, যদি সেটা জোহর বা ঈশার জামাআত হয়। এরূপ অবস্থায় জামাআতের সাথে দ্বিতীয়বার যেটা পড়া হবে তা নফল বলে গণ্য হবে।

* যদি জোহরের চার রাকআত সুন্নাত শুরু করার পর জামাআত শুরু হয়ে যায় তাহলে তার মাসআলা পূর্বে ২০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

* যদি আসর বা ইশার চার রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা শুরু করার পর জামাআত শুরু হয়ে যায়, তাহলে দুই রাকআত পূর্ণ করার পূর্বে হলে দুই রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

পরে আর এই চার রাকআত বা অবিশিষ্ট দুই রাকআত পড়তে হবে না। আর তৃতীয় রাকআত বা চতুর্থ রাকআতে থাকা অবস্থায় জামাআত শুরু হলে চার রাকআত পূর্ণ করে তারপর জামাআতে শরীক হবে।

* একাকী ফরয নামায শুরু করার পর ঐ নামাযের জামাআত শুরু হলে তখন ছয়টা অবস্থা। যথা:

(এক) যদি দুই বা তিন রাকআতওয়ালা নামায হয় এবং যদি এখনও সে দ্বিতীয় রাকআতের সাজদা না করে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ (ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে ঐ নামায শেষ করে) জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

(দুই) আর যদি দুই বা তিন রাকআতওয়ালা নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের সাজদা করে থাকে, তাহলে ঐ নামাযই পূর্ণ করতে হবে। (জামাআতে শরীক হবে না।)

(তিন) যদি চার রাকআতওয়ালা নামায হয় এবং প্রথম রাকআতের সাজদা না করে থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ (ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে ঐ নামায শেষ করে) জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

(চার) কিন্তু যদি এক সাজদাও করে থাকে তবে দুই রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হবে। তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত এই হুকুম।

(পাঁচ) যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে এবং এখনও তৃতীয় রাকআতের সাজদা না করে থাকে তবে ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সালাম ফিরিয়ে (ঐ নামায শেষ করে) জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

(ছয়) যদি তৃতীয় রাকআতের সাজদা করে থাকে বা আরও পড়ে থাকে তাহলে ঐ নামায পূর্ণ করে নিবে। (বেহেশতী জেওর)

## জামাআত ছাড়ার ওজরসমূহ

যেসব ওজর থাকলে জামাআত তরক করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ।

১। ছতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় না থাকলে।

২। মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঝড়-তুফান হতে থাকলে এবং ছাতা না থাকলে ও কাপড়-চোপড় ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। তবে এরূপ অবস্থায়ও কোনোভাবে হাজির হতে পারলে উত্তম।

৩। মসজিদে যাওয়ার পথে ভীষণ কাদা থাকলে এবং চলা কষ্টকর ও



জুতো/স্যাণ্ডেল নোংরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। তবে এরূপ হওয়া সত্ত্বেও হাজির হতে পারলে উত্তম।

৪। প্রচণ্ড শীতের কারণে মসজিদে গেলে রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা বা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে।

৫। মসজিদে গেলে ঘরের মাল-সামান চুরি হওয়ার আশংকা থাকলে।

৬। মসজিদে গেলে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকলে।

৭। মসজিদে গেলে ঋণদাতার সাক্ষাৎ ও তার মাধ্যমে উৎপীড়িত হওয়ার আশংকা থাকলে। অবশ্য তার ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকলে এটা ওজর বলে গণ্য হবে না।

৮। রাতের বেলায় নামাযের সময় প্রবল ঝড়-তুফান আসলে।

৯। অন্ধকার রাতে পথ দেখা না গেলে এবং আলোর ব্যবস্থা না থাকলে।

১০। রোগীর সেবায় রত ব্যক্তি জামাআতে গেলে যদি রোগী কষ্ট পায় বা চিন্তাযুক্ত হয়, তাহলে জামাআত তরক করা জায়েয।

১১। খাবার প্রস্তুত হয়েছে বা এখনই হচ্ছে আবার ক্ষুধাও এত বেশি যে, খাবার না খেয়ে নামাযে দাঁড়ালে নামাযে মন বসবে না খাবারের দিকে মন থাকবে– এমন হলে।

১২। নামাযের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মত পেশাব-পায়খানার প্রচণ্ড বেগ থাকলে।

১৩। রোগের কারণে চলা ফেরা করতে না পারলে।

১৪। অধিক লেংড়া বা পা কাটা বা অন্ধ হলে। অবশ্য অন্ধ ব্যক্তি অনায়াসে মসজিদে পৌঁছতে সক্ষম হলে তার জন্য জামাআত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

১৫। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় জামাআতে গেলে কাফেলার সঙ্গীদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা ভ্রমণের যানবাহন সম্পূর্ণ তৈরী এবং জামাআতে গেলে যানবাহন চলে যাওয়ার ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে। (مراقي الفلاح و شرح المنية)

## কাতারের মাসায়েল

* মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান পাশে ইমামের সমান বা কিঞ্চিত পিছনে দাঁড়াবে। ইমামের বাম দিকে বা সোজা পিছনে দাঁড়ানো মাকরূহ।

* মুক্তাদী দুইজন বা বেশি হলে ইমামের পিছনে কাতার বেধে

দাঁড়াবে। যদি দুইজন হওয়া অবস্থায় ইমামের পাশে (একজন ডানে পাশে একজন বাম পাশে) দাঁড়ায়, তাহলে মাকরূহ তানযীহী হবে আর দুইজনের বেশি হওয়া অবস্থায় ইমামের পাশে দাঁড়ালে মাকরূহ তাহরীমী হবে। (فتاوی رحیمیة وطحطاوی)

* দুইয়ের অধিক মুক্তাদী হলে ইমামের জন্য আগে দাঁড়ানো ওয়াজিব। অতএব একজন মুক্তাদীকে ডানপাশে নিয়ে নামায শুরু করার পর যদি আরও মুসল্লী আসে তাহলে প্রথম মুক্তাদীর পিছনে সরে আসা উচিত, যাতে আগন্তুকদের নিয়ে পিছনে কাতার বাঁধতে পারে। যদি সে পিছনে না সরে তাহলেও আগন্তুক মুসল্লী আস্তে আস্তে হাত দিয়ে তাকে পিছনের দিকে টেনে আনবে। এরূপ না করে আগন্তুক মুসল্লীও যদি ইমামের পাশে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমাম সামনে জায়গা থাকলে আগে বেড়ে যাবে, তবে সাজদার জায়গা থেকে আগে বাড়বে না। অনুরূপভাবে যদি পিছনে জায়গা না থাকে তাহলে মুক্তাদীর অপেক্ষা না করে ইমামেরই আগে বেড়ে যাওয়া উচিত।

* মুক্তাদী যদি একজন স্ত্রীলোক বা একটি নাবালেগা বালিকা হয় তাহলেও তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে, ইমামের পাশে নয়।

* মুক্তাদীদের মধ্যে বালেগ পুরুষ, নাবালেগ, বালেগা নারী– এরূপ বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকলে নিম্নোক্ত নিয়ম ও তারতীব অনুসারে কাতার বাঁধতে হবে। প্রথম পুরুষগণের, তারপর নাবালেগদের, তারপর নাবালেগাদের তারপর বালেগা নারীদের কাতার হবে।

* একজন মাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে থাকলে তাকে বয়স্কদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে দিবে এবং একাধিক হলে বড়দের পিছনে কাতারের ব্যবস্থা করবে তারপর নারীদের।

* কোনো কাতার পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একজন মাত্র মুসল্লী আসলে তার জন্য একা একা ভিন্ন কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ। সে অন্য কারও আগমনের অপেক্ষা করবে। অন্য কেউ না আসলে ইমামের সোজা পিছনের লোকটাকে টেনে নিয়ে কাতার বেঁধে দাঁড়াবে। তবে পিছনে টেনে আনলে মাসআলা না জানার কারণে উক্ত লোকটার যদি এমন কোনো কাজ করার সম্ভাবনা থাকে যাতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে বা সে খারাপ মনে করে, তাহলে তাকে টেনে আনবে না, একা একাই দাঁড়িয়ে যাবে। (فتاوی دار العلوم ج/٣)

* কাতার সোজা করে এবং মিলে মিলে দাঁড়ানো জরুরি (গুরুত্বপূর্ণ



সুন্নাত)। এর জন্য মুসল্লীদের আদেশ ও হেদায়েত করা ইমামের দায়িত্ব এবং মুসল্লীদের তা মান্য করা কর্তব্য। তবে খুব বেশি চাপাচাপি করে কাউকে কষ্ট দেয়াও মোনাছেব নয়।

* আগের কাতারে জায়গা থাকতে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ।

* কাতার বাঁধার নিয়ম হল– প্রথমে একজন ঠিক ইমামের পিছনে দাঁড়াবে, তারপর একজন ডানে একজন বামে– এরূপে ক্রমাগত কাতার পূর্ণ হবে।

* কাতার সোজা করার নিয়ম হল কাঁধে কাঁধে এবং পায়ের টাখনু গিরাকে বরাবর করে দাঁড়ানো। (فتاوی دار العلوم ج/٣) পায়ের আঙ্গুলের মাথা বরাবর করে দাঁড়ালে কাতার ভালভাবে সোজা হয় না। কারণ পা ছোট-বড় হয়ে থাকে।

## নামাযে লোকমা দেয়া ও নেয়ার মাসায়েল

(ভুল সংশোধন করে দেয়াকে লোকমা দেয়া বলা হয়।)

* কিরাত বা উঠা বসায় ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীগণ লোকমা দিতে পারেন, চাই ফরয নামায হোক বা তারাবীহ ইত্যাদি যে কোনো নামায হোক।

* ইমাম যদি এমন কোনো লোকের লোকমা গ্রহণ করেন যে তার এক্তেদা করেনি, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র মুক্তাদীর লোকমাই গ্রহণ করা যায়।

* পেরেশান করার জন্য ভুল লোকমা দেয়া অন্যায়। যেমন: তারাবীহতে এক হাফেজকে পেরেশান করার জন্য অন্য হাফেজ কোথাও কোথাও এরূপ করে থাকে বলে শোনা যায়।

* ফরয পরিমাণ কিরাত পড়ার পর কিরাতে আঁটকে গেলে ইমামের রুকুতে চলে যাওয়া উচিত। (এরূপ অবস্থায় এদিক-সেদিক থেকে পড়ে বা চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থেকে) মুক্তাদীকে লোকমা দেয়ার জন্য বাধ্য করা মাকরূহ (তানযীহী)। ফরয পরিমাণ কিরাত হয়ে যাওয়ার পর লোকমা দেয়াও অনুরূপ মাকরূহ। আর ফরয পরিমাণ কিরাতের পূর্বে আঁটকে গেলে অন্য স্থান থেকে কিরাত পড়বে। (فتاوی دار العلوم ج/٢)

* ইমাম উঠার সময় বসে পড়লে বা বসার সময় উঠে গেলে ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে লোকমা দেয়া নিয়ম। অনেকে এসব ক্ষেত্রে ‘সুবহানাল্লাহ’ বলার পরিবর্তে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে লোকমা দিয়ে থাকেন, তাতেও

নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না।

* ইমাম চুপে চুপে কিরাত পড়ার নামাযে যদি জোরে কিরাত শুরু করেন বা জোরে কিরাত পড়ার নামাযে চুপে চুপে পড়তে থাকেন, তাহলেও 'সুবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দিতে হয়।

## ইমাম নিযুক্ত করার নীতি ও মাসায়েল

* যোগ্য ও উপযুক্ত লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মুসল্লীগণের দায়িত্ব। যোগ্য লোক থাকতে অযোগ্যকে ইমাম নিয়োগ করলে গোনাহ হবে। একাধিক যোগ্য লোক থাকলে সবচেয়ে অধিক যোগ্য লোককে ইমাম নিয়োগ করা কর্তব্য। সবচেয়ে যোগ্য লোককে বাদ দিয়ে অন্যকে নিয়োগ দেয়া সুন্নাতের খেলাফ।

* যদি একই পর্যায়ের গুণ ও যোগ্যতা বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তি থাকেন, তাহলে অধিক সংখ্যক মুসল্লী যাকে মনোনীত করবে তিনিই ইমাম নিযুক্ত হবেন।

১। ইমাম নিযুক্ত হওয়ার সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি হলেন আলেম অর্থাৎ, যিনি নামাযের মাসায়েল ভাল জানেন, যদি তিনি ফাসেক না হন, কুরআন অশুদ্ধ না পড়েন এবং সুন্নাত পরিমাণ কিরাত তার মুখস্ত থাকে।

২। উপরোক্ত গুণে সমান থাকলে তারপর যার কিরাত ভাল অর্থাৎ, তাজবী-দের নিয়ম অনুযায়ী যিনি কুরআন পড়তে সক্ষম।

৩। তারপর যার তাকওয়া বেশি অর্থাৎ, যিনি হারাম-হালাল বেছে চলায় অধিক অভ্যস্ত।

৪। তারপর বয়সে যিনি বড়।

৫। তারপর যার আখলাক-চরিত্র অধিক উত্তম।

৬। তারপর যার চেহারা অধিক সুন্দর।

৭। তারপর যে বংশের দিক থেকে শরীফ।

৮। তারপর যার আওয়াজ অধিক ভাল।

৯। তারপর যার লেবাস-পোশাক ভাল।

* যার মধ্যে একাধিক গুণ থাকবে সে এক গুণের অধিকারী থেকে অগ্রগণ্য হবে।

* একজন যদি বড় আলেম হন কিন্তু তার আমল ঠিক না হয় বা



কিরাত অশুদ্ধ পড়েন এবং অন্য একজন বড় আলেম নন কিন্তু কিরাত শুদ্ধ পড়েন এবং আমল ভাল, তাহলে এই দ্বিতীয় জনই অগ্রগণ্য হবে।

* কারও বাড়িতে জামাআত হলে বাড়িওয়ালাই ইমামতের জন্য অগ্রগণ্য। তারপর বাড়িওয়ালা যাকে বলবে সে অগ্রগণ্য। অবশ্য যদি বাড়িওয়ালা একেবারে অযোগ্য হয়, তাহলে অন্য যোগ্য ব্যক্তি অগ্রগণ্য হবে। একই স্থানে বাড়ির মালিক এবং উক্ত বাড়ির ভাড়াটিয়া উপস্থিত থাকলে ভাড়াটিয়াই মালিকের হুকুমে আসবে।

* নির্ধারিত ইমাম থাকলে সে-ই অগ্রগণ্য, তার অমতে অন্য কারও ইমামত করার অধিকার নেই।

* ইসলামী রাষ্ট্র হলে মুসলমান বাদশাহ বা তার নির্বাচিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে অন্য কারও ইমামতের হক নেই।

* যার শাহওয়াত (যৌন উত্তেজনা) প্রবল, চিন্তা বিক্ষিপ্ত থাকার সম্ভাব-না– এরূপ অবিবাহিত লোকের চেয়ে যার বিবি আছে এরকম লোককে ইমাম নিয়োগ করা উত্তম। (فتاوى محمودية ج/٢)

### যাদেরকে ইমাম বানানো মাকরূহ

যাদেরকে ইমাম বানানো এবং যাদের পিছনে নামায পড়া মাকরূহ তারা হল–

১। ফাসেক, অর্থাৎ, যে প্রকাশ্যে গোনাহ করে বেড়ায়। এরূপ লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ তাহরীমী।

২। বেদআতীকে ইমাম বানানো মাকরূহ তাহ্‌রীমী। অবশ্য ফাসেক ও বেদআতী ব্যতীত উপস্থিত লোকদের মধ্যে যদি অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকে অথবা তাকে ইমাম নিযুক্ত না করলে বা পূর্বে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে এখন তাকে বরখাস্ত করতে গেলে ফ্যাসাদ ও কলহ সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহলে তার পিছনে নামায পড়া যাবে– এতে মুসল্লীদের গোনাহ হবে না। তবে যাদের কারণে এ ধরনের নিয়োগ দিতে হল বা বরখাস্ত করা গেল না তারা দায়ী হবে।

৩। অন্ধ বা রাতকানাকে ইমাম বানানো মাকরূহ তানযীহী। তবে এরূপ লোক যোগ্য হলে এবং পাক নাপাক সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে থাকলে এবং তার ইমামতে কারও আপত্তি না থাকলে তার ইমামত মাকরূহ নয়।

৪। ওলাদুয্‌যিনা (যেনার সন্তান)-কে ইমাম বানানো মাকরূহ তানযীহী।

অবশ্য এরূপ ব্যক্তি ইল্‌ম ও তাকওয়ার অধিকারী হয়ে থাকলে এবং তার ইমামতে মুসল্লীদের আপত্তি না থাকলে তাকে ইমাম বানানো মাকরূহ হবে না।

৫। যে সুশ্রী নব্য যুবকের এখনও দাড়ি ভালমত ওঠেনি, তাকে ইমাম বানানো মাকরূহ (তানযীহী), যদি ফেতনার আশংকা থাকে। ফেতনার আশংকা না থাকলে মাকরূহ নয়।

## বিত্‌র নামায ও তার মাসায়েল

* বিত্‌র নামায ওয়াজিব এবং তিন রাকআত।

### বিতর নামাযের সময়

ইশার নামাযের পর থেকে সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত বিত্‌র নামাযের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে পড়া উত্তম। কিন্তু যার শেষ রাতে উঠার অভ্যাস নেই বা উঠতে পারার বিশ্বাস নেই, তার জন্য ইশার পর বিত্‌র পড়ে নেয়া উচিত। প্রথম রাতে পড়ে নিলে আর শেষ রাতে পড়ার অনুমতি নেই। (نماز مسنون)

* বিত্‌র নামাযে সব রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা/কিরাত মিলানো ওয়াজিব। যেকোনো সূরা/কিরাত মিলানো যায় তবে সূরা আ'লা, কাফিরূন ও ইখলাস দ্বারা পড়া উত্তম। মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রমও করবে। (احسن الفتاوی ج/۳)

* বিতরে তৃতীয় রাকআতে সূরা/কিরাত মিলানোর পর তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে আবার হাত বেঁধে দুআয়ে কুনূত পড়তে হবে। তারপর রুকু সাজদা ও বৈঠক পূর্বক নামায শেষ করবে। দুআয়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। দুআয়ে কুনূত এই–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ–اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

* দুআয়ে কুনূত মুখস্থ না থাকলে মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত তদস্থলে



নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে। মুখস্থ করার চেষ্টা না করে শুধু সহজ ভেবে এটা পড়তে থাকলে চলবে না।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অথবা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ তিনবার, কিংবা يَارَبِّ তিনবার পড়বে। (نماز مسنون عن کبیری)

* শুধু মাত্র রমযান মাসে বিতরের জামাআত করা মোস্তাহাব। এই জামাআতে ইমামের ন্যায় মুক্তাদীও দুআয়ে কুনূত পড়বে।

* বিতরের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ

বাংলায়: তিন রাকআত বিতরের নিয়ত করছি।

## জুমুআর নামায

* শুক্রবার দিন জোহরের পরিবর্তে জুমুআর নামায হয়ে থাকে। প্রথমে চার রাকআত "ক্বাবলাল জুমুআ" সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, তারপর জুমুআ-আর খুতবা ফরয, তারপর দুই রাকআত ফরয, তারপর চার রাকআত "বা'দাল জুমু'আ" সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, অতঃপর দুই রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা।

* সব মৌসুমেই জুমুআর নামায ওয়াক্ত হওয়ার পর আগেভাগেই পড়ে নেয়া মোস্তাহাব। (فتاوی دار العلوم)

* নবী কারীম (সা.) জুমুআর নামাযে ১ম রাকআতে সূরা জুমুআ ও ২য় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন অথবা ১ম রাকআতে সূরা আ'লা ও ২য় রাকআতে সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন। এরূপ করা মুস্তাহাব। (ترمذی– أبواب الجمعة)

* অসুস্থ্য ও মা'যূর ব্যক্তিদের জন্য মোস্তাহাব হল জুমুআর জামাআত হয়ে যাওয়ার পর জোহরের নামায পড়া (আযান ইকামত ও জামাআত ব্যতীত)। মহিলাগণ জুমুআর জামাআতের পূর্বেও জোহর পড়ে নিতে পারে। (احسن الفتاوی ج/٤)

* চার রাকআত ক্বাবলাল জুমুআর নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

বাংলায়: চার রাকআত ক্বাবলাল জুমুআর নামাযের নিয়ত করছি।

* জুমুআর দুই রাকআত ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيِ الْفَرْضِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

বাংলায়: জুমুআর দুই রাকআত ফরয নামায পড়ছি।

* চার রাকআত বা'দাল জুমুআ নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

বাংলায়: চার রাকআত বা'দাল জুমুআ নামাযের নিয়ত করছি।

### জুমুআর জামাআত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১. আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

২. পুরুষ হওয়া। স্ত্রীলোকের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

৩. মুকীম হওয়া। মুসাফিরের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

৪. সুস্থ্য হওয়া। অসুস্থ্য ব্যক্তি যে জুমুআর মসজিদ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় হেঁটে যেতে অক্ষম, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। যে বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুন জামে মসজিদে হেঁটে যেতে অক্ষম কিংবা অন্ধ, তাদেরকেও রোগী মনে করা হবে। অবশ্য অন্ধকে কেউ ধরে নিয়ে যাওয়ার থাকলে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব।

৫. যেসব ওজরের কারণে পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআত তরক করা জায়েয (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা নং ২১১) সেসব ওজর না থাকা। এরূপ কোন ওজর থাকলে জুমুআ ওয়াজিব হয় না।

৬. পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার জন্য যেসব শর্ত জুমুআর জন্যও সেগুলো শর্ত। যথা: বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া, মুসলমান হওয়া।

* যাদের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয় তারা জুমুআ পড়ে নিলে তাদের ফরযে ওয়াক্ত অর্থাৎ, জোহর আদায় হয়ে যাবে।

### জুমুআ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ

(১) শহর (ছোট হোক বা বড়) বা ছোট শহর তুল্য বড় গ্রাম হওয়া। উল্লেখ্য, যে গ্রামে ৩/৪ হাজার লোকের বসতি রয়েছে সেটাকে ছোট শহর তুল্য বড় গ্রাম ধরা হয়। সেখানে জুমুআ জায়েয। কিন্তু বন, চর বা বিলের মধ্যে আবাদী থেকে অনেক দূরে কোন ছোট গ্রাম থাকলে সেখানে জুমুআ দুরস্ত নয়।

(২) জুমুআর নামায ও খুতবা জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে।

(৩) খুতবা হওয়া শর্ত। খুতবা নামাযের পূর্বে হওয়া শর্ত।

(৪) জামাআত হওয়া। খুতবার সময় থেকে ফরযের প্রথম রাকআতের



সাজদা পর্যন্ত অন্তত তিনজন বালেগ পুরুষ ইমামের সঙ্গে থাকতে হবে।

(৫) ইজাযাতে আম্মা থাকা। অর্থাৎ, যে স্থানে জুমুআর নামায পড়া হবে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা চাই। অতএব জেলখানা, কয়েদখানা, বন্ধ দূর্গ প্রভৃতি স্থানে জুমুআ দুরস্ত নয়।

## জুমুআর খুতবার সুন্নাত, আদব ও মাসায়েল

### খুতবার জরুরি বিষয়সমূহ

১. খুতবা নামাযের পূর্বে হতে হবে।

২. খুতবার নিয়ত থাকতে হবে।

৩. খুতবা জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে।

৪. খুতবা কমপক্ষে এমন তিনজন লোকের সামনে হতে হবে যাদের দ্বারা জুমুআ কায়েম হয়।

৫. খুতবা এবং নামাযের মাঝে কোন আজনবী (অসংশ্লিষ্ট) কাজের ব্যবধান ঘটতে পারবে না।

৬. উভয় খুতবাই আরবী ভাষায় হওয়া জরুরি (অর্থাৎ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা)। আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুতবা পড়া বা অন্য কোনো ভাষায় পদ্য যোগ করা মাকরূহ তাহ্‌রীমী ও বিদআত।

(فتاوی دار العلوم ج/٥، امداد الفتاوی ج/١ ونماز مسنون থেকে গৃহীত)

### খুতবার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. খুতবার মধ্যে আল্লাহ্‌র শোকর বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।

২. খুতবার মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।

৩. খুতবার মধ্যে তাওহীদ ও রেছালাতের সাক্ষ্য বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।

৪. খুতবার মধ্যে রসূল (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

৫. খুতবার মধ্যে ওয়াজ-নছীহাত বয়ান করা সুন্নাত।

৬. খুতবার মধ্যে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা সুন্নাত।

৭. দুই খুতবা পড়া সুন্নাত। দ্বিতীয় খুতবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা সুন্নাত।

৮. দ্বিতীয় খুতবায় সমস্ত মুসলমান নর-নারীর জন্য দুআ ও এস্তেগফার করা সুন্নাত।

৯. খুতবা অত্যন্ত লম্বা না করা সুন্নাত বরং নামাযের চেয়ে কম রাখবে।

১০. ছানী (দ্বিতীয়) খুতবায় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর

আওলাদ, সাহাবীগণ ও হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর বিবি সাহেবাগণের প্রতি বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হামযা ও আব্বাস (রা.)–এর জন্য দুআ করা মোস্তাহাব। সমসাময়িক মুসলমান বাদশাহ্র জন্য দুআ করা জায়েয কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরূহ তাহ্রীমী।

* রমযান শরীফের শেষ জুমুআর খুতবায় আল বিদা জ্ঞাপন কিংবা বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া প্রমাণিত নয় বিধায় তা বিদআত।

(فتاوی دار العلوم ج/٥ و بہشتی گوہر থেকে গৃহীত)

## খতীবের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসআলা

* খতীবের উযূ গোসলের হাজত থেকে পবিত্র হয়ে নেয়া সুন্নাত।

* খতীব মিম্বরে উঠে কিছুক্ষণ বসবেন, তারপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। এটাই সুন্নাত।

* খতীবের জন্য প্রথম খুতবার শুরুতে শুধু আউযুবিল্লাহ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ চুপে চুপে (জোরে নয়) বলা সুন্নাত। (احسن الفتاوی ج/٤)

* উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খুতবা দেয়া সুন্নাত। খুতবার সময় ডানে বামে সীনা ঘুরিয়ে রুখ করা নিষিদ্ধ, তবে শুধু ডানে বামে নজর করা যায়। আর তারগীব-তারহীবের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে আওয়াজ ও আন্দাজের মধ্যে পরিবর্তন জায়েয বরং সুন্নাত। (فتاوی رحیمیہ ج/١)

* দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

* মিম্বরের উপর খুতবা দেয়া সুন্নাত।

* লাঠি হাতে খুতবা দেয়া সুন্নাত (গায়র মুয়াক্কাদা)। মিম্বার থাকলেও এটা সুন্নাত। (فتاوی دار العلوم ج/٥) তবে মাঝে মধ্যে লাঠি নেয়া পরিত্যাগ করা উচিত, অন্যথায় বিদআত হয়ে যাবে। (احسن الفتاوی ج/٤)

* খুতবার বই হাতে থাকলে লাঠি বাম হাতে নেয়া উত্তম আর বই হাতে না থাকলে লাঠি ডান হাতে নেয়া উত্তম। (فتاوی رحیمیہ ج/٣)

* খতীবের জন্য মুখস্থ খুতবা দেয়া বা কিতাব কিংবা অন্য কিছু দেখে খুতবা পড়া সবটাই জায়েয।

* খতীবের জন্য দুই খুতবার মাঝখানে তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময় বসা সুন্নাত।

* লোকে শুনতে পারে এ পরিমাণ আওয়াজের সঙ্গে খুতবা পড়া



সুন্নাত। কাছের লোকে শুনতে পারে অন্তত এতটুকু জোরে বলা জরুরি।

* খতীব খুতবার সময়েও নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করতে বা মাসআলার কথা বলতে পারেন বরং মুনকার (বদকাজ) দেখলে মুখেই নিষেধ করা তার উপর ফরয। (احسن الفتاوی ٤/□□)

* খতীবের জন্য খুতবার পূর্বে মেহরাবের মধ্যে নামায পড়া মাকরূহ। পড়তে হলে মিম্বরের ডান দিকে পড়বে। (الفقه المذاهب الأربعة)

* খতীবের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে খুতবা দেয়া জরুরি নয়।

* খুতবা এবং ইকামতের মাঝখানে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্তভাবে কোন মাসআলা বলতে পারেন। (احسن الفتاوی ٤/□□)

* খতীব খুতবার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে ওয়াজ-নছীহত করতে পারেন, এটা জায়েয বরং মোস্তাহাব, যদি মুসল্লীগণ চান। (فتاوی رحیمیہ ١/□□)

## খুতবার সময় শ্রোতাদের করণীয় আমলসমূহ

* জুমুআর দ্বিতীয় আযানের জওয়াব ও তার পরের দুআ জায়েয নেই। (فتاوی دار العلوم ٥/□□)

* যখন খতীব খুতবার জন্য দাঁড়াবেন, তখন থেকে খুতবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথা-বার্তা বলা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তারতীব তার জন্য কাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

* মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবার আওয়াজ শুনতে না পেলেও চুপ করে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব এবং যে কাজ বা কথা দ্বারা খুতবা শোনার ব্যাঘাত ঘটে তা মাকরূহ তাহরীমী। তখন হাঁটা-চলা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেয়া, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি এমনকি মুখে মাসআলা বলাও নিষিদ্ধ। দান বাক্স চালানো নিষিদ্ধ। তবে কোন বদকাজ (মুনকার) দেখলে ইশারায় নিষেধ করা ফরয। (احسن الفتاوی ٤/□□)

* সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ার মধ্যে খুতবা শুরু হলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকলে নামায পূর্ণ করে নিবে আর এর পূর্বে থাকলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে। (احسن الفتاوی ٣/□□) এবং এ সুন্নাত পরে পড়ে নিবে।

* খুতবার সময় নামাযের হালতে বসা আদব এবং কেবলামুখী হয়ে বসবে।

* খুতবার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম

মোবারক আসলে মুখে নয় বরং মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

## তারাবীহ্-র নামায ও তার মাসায়েল

* রমযান মাসে ইশার নামাযের পর ইশার ওয়াক্তের মধ্যে যে বিশ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তে হয়, তাকে তারাবীহ-র নামায বলে।

* তারাবীহ্-র নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (الدر المختار مع رد المحتار)

* বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা– আট রাকআত নয়।

* তারাবীহ্-র নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া।

* দুররে মুখতার গ্রন্থে মহিলাদের ইমামতে মহিলাদের তারাবীহ্-র জামাআত করাকে মাকরূহ তাহরীমী বলা হয়েছে।[১]

* প্রতি চার রাকআত তারাবীহ্-র পর এবং বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে চার রাকআত পরিমাণ বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। (الدر المختار) জামাআতের লোকদের কষ্ট হওয়ার বা জামাআতের লোকসংখ্যা কম হওয়ার আশংকা হলে এত সময় বিশ্রাম করবে না বরং কম করবে। (بہشتی گوہر)

* এই বিশ্রামের সময় চুপ করে বসে থাকা, তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, দুরূদ পড়া বা নফল নামায পড়া সবই জায়েয। আমাদের দেশে যে সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকূতি ... তিনবার পড়ার প্রচলন আছে তাও জায়েয, তবে তা-ই পড়া জরুরি নয় বরং এই দুআ কোনো হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এর চেয়ে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ বারবার পড়তে থাকা উত্তম। এবং এসব দুআ চিৎকার করে নয় বরং নীরবে (কিংবা স্বল্প শব্দে) পড়া মোনাসেব। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* প্রত্যেক চতুর্থ রাকআতে মুনাজাত করা জায়েয আছে কিন্তু বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে দুআ করাই আফযল। (শামসুল হক ফরীদপূরী, দ্র. বাংলা বেহেশতী জেওর: ১ম) তবে কোথাও প্রতি চার রাকআতের পর মুনাজাত করলে কঠোরভাবে তাতে বাঁধা দেয়া কিংবা না করা হলে মুসল্লী-

১. মহিলাদের ইমামত নাজায়েয হওয়ার রেওয়ায়েতও রয়েছে, আবার হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে মহিলাদের নামাযের ইমামত করার রেওয়ায়েত-তও রয়েছে। উভয় প্রকার রেওয়ায়েত দৃষ্টে মহিলাদের ইমামতে মহিলাদের নামাযকে মাকরূহ তাহরীমী নয় বরং মাকরূহ তানযীহী বলাই সংগত মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার রচিত "ফিক্হুন নিছা"।



গণের পক্ষ থেকে ইমামকে করার জন্য হুকুম দেয়া সংগত নয়। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* যদি কেউ মসজিদে এসে দেখেন ঈশার জামাআত হয়ে গিয়েছে এবং তারাবীহ শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি একা একা ইশা পড়ে নিয়ে তারপর তারাবীহ্-র জামাআত শরীক হবেন। ইত্যবসরে যে কয় রাকআত তারাবীহ ছুটে গিয়েছে তা তিনি তারাবীহ ও বেতর জামাআতের সাথে আদায় করার পর পড়বেন।

### খতম তারাবীহ্-র মাসায়েল

* রমযান মাসে তারাবীহ্-র মধ্যে তারতীব অনুযায়ী একবার কুরআন শরীফ খতম করা (পড়া/শোনা) সুন্নাত। (رد المحتار – مبحث صلاة التراويح)

* তারাবীহ্-র খতমের মধ্যে যেকোনো একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম জোরে পড়া চাই, নতুবা শ্রোতাদের খতম পূর্ণ হবে না।

* নাবালেগের পিছনে এক্তেদা করা দুরস্ত নয়, চাই ফরয নামাযে হোক বা তারাবীহ্-র নামাযে হোক। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল লোকমা দিয়ে হাফেজকে পেরেশান করা নিষিদ্ধ। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* তারাবীহ্তে এত দ্রুত তিলাওয়াত করা যে বুঝে আসে না– এরূপ তিলাওয়াত ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* হাফেজ সাহেব যদি ভুলে গিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে অথবা বৈঠকের সময় তাশাহ্হুদের আগে বা পরে চিন্তা করতে থাকেন এবং এর মধ্যে এক রুকন পরিমাণ (তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার পরিমাণ) সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহো দিতে হবে। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* কোন আয়াত ভুলে থেকে গেলে বা ভুল পড়া হয়ে থাকলে পরবর্তী দুগানায় (দুই রাকআতে) বা পরবর্তী যে কোন দিন সেটা পড়ে নিতে হবে, নতুবা খতম পূর্ণ হবে না। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* খতমের দিন তারাবীহ্-র মধ্যেই খতম করার পর শেষ রাকআতে সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়া মোস্তাহাব। (فتاوی دار العلوم ٤/□□)

* তারাবীহ্-র মধ্যে খতমের সময় সূরা এখলাস তিনবার পড়া মাকরূহ। (অর্থাৎ, শরীআতের বিশেষ নিয়ম মনে করে এরূপ আমল করা মাকরূহ।)

* তারাবীহ্-র মধ্যে সূরা وَالضُّحٰى থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোর পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা মাকরূহ। নামাযের বাইরে এরূপ আমল করা যায়।

* তারাবীহ্-র বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেয়া নেয়া জায়েয নয়, তবে হাফেজ সাহেবের যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়। (فتاوی دار العلوم □□/٤)

## ঈদুল ফিতরের নামায

* শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের ঈদকে ঈদুল ফিতর এবং এই দিনে মুসলমানদের একত্র হয়ে শোকর আদায়ের জন্য যে দুই রাকআত নামায পড়া হয় তাকে ঈদুল ফিতরের নামায বলে।

* ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত নামায ওয়াজিব।

* এই দুই রাকআতে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

* খুতবা ব্যতীত জুমুআর নামাযের জন্য যেসব শর্ত, ঈদের নামাযের জন্যও সেসব শর্ত।

* ঈদুল আযহা-র তুলনায় ঈদুল ফিতরের জামাআত একটু দেরি করে পড়া সুন্নাত।

* ঈদের নামায মাঠে পড়া উত্তম। মহল্লার মসজিদেও জায়েয।

* কোন ওজরবশত পহেলা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে না পারলে ২রা শাওয়াল পড়ে নেয়া জায়েয, তবে বিনা ওজরে এরূপ করলে নামায হবে না।

* ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পড়া উত্তম। (الفقه على المذاهب الأربعة)

* দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে:

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيِ الْوَاجِبِ صَلَاةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ.

বাংলায়: ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত নামায ছয়টি ওয়াজিব তাকবীরসহ আদায় করছি।



### ঈদুল ফিতরের নামায পড়ার তরীকা

* আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বাঁধবে।

* তারপর ছানা পড়বে।

* তারপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহ আকবার বলবে এবং হাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ বিলম্ব করে আবার অনুরূপ হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলবে ও হাত ছেড়ে দিবে। আবার অনুরূপ বিলম্ব পূর্বক হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে এবং আউযূ বিল্লাহ, বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও কিরাত ইত্যাদি সহকারে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে এবং সূরা ফাতেহা ও সূরা/কিরাত মিলিয়ে তারপর প্রথম রাকআতের ন্যায় অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে। এখানে তৃতীয় তাকবীরের পরও হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। তারপর রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে এবং যথা নিয়মে এই রাকআত শেষ করবে।

### ঈদুল ফিতরের খুতবা ও তখনকার আমলসমূহ

* ঈদুল ফিতরের দুই খুতবা পাঠ করা সুন্নাত। এই খুতবাদ্বয় নামাযের পরে হওয়া সুন্নাত।

* এই খুতবাদ্বয় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে পাঠ করা সুন্নাত।

* দুই খুতবার মাঝখানে জুমুআর খুতবার ন্যায় কিছুক্ষণ (তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময়) বসা সুন্নাত।

* এই খুতবা শোনা ওয়াজিব যেমন জুমুআর খুতবা শোনা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবা না শুনতে পেলে চুপ করে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব।

### ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে যেসব বিষয় থাকবে

* জুমুআর খুতবার মধ্যে যেসব বিষয় থাকবে ঈদের খুতবার মধ্যেও সেসব বিষয় থাকবে। পার্থক্য এই যে, মিম্বরে উঠে না বসেই ঈদের খুতবা শুরু করা সুন্নাত এবং ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে ছদকায়ে ফিতর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে হবে আর তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলে ঈদের খুতবা আরম্ভ করা সুন্নাত। প্রথম খুতবার শুরুতে তাকবীর ৯ বার একাধারে এবং দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে ৭ বার একাধারে বলা আর সব শেষে মিম্বর থেকে অবতরণের সময় ১৪ বার একাধারে বলা মোস্তাহাব। (بہشتی گوہر واحسن الفتاوی □□/٤ بحوالہ در المختار □□/١)

বি. দ্র. ঈদের নামাযের (বা খুতবার) পরে দুআ (মুনাজাত) করা যদিও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী এবং তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত নয়, কিন্তু অন্যান্য নামাযের পর যেহেতু দুআ করা সুন্নাত, তাই ঈদের নামাযের পরও দুআ করা সুন্নাত। (بہشتی گوہر) আহছানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার (৪র্থ খণ্ড দ্র.) খুতবার পর কিংবা নামায ও খুতবা উভয়টার পরও দুআ করা যেতে পারে বলে যুক্তি পেশ করেছেন।

## ঈদুল আয্হার নামায

* যিলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখের ঈদকে ঈদুল আযহা বলে। এই দিনও দুই রাকআত শোকরানা নামায পড়া ওয়াজিব। এটাই ঈদুল আযহার নামায।

* ঈদুল আযহার নামাযের মাসায়েল ঈদুল ফিতরের নামাযের ন্যায়। শুধু নিয়তের মধ্যে "ঈদুল ফিতর" শব্দের স্থলে "ঈদুল আযহা" শব্দ ব্যবহার করতে হবে। ঈদুল ফিতরের নামাযের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায একটু আগে ভাগে পড়ে নেয়া সুন্নাত। আর কোন ওজরবশত ১০ই তারিখে এই নামায পড়তে না পারলে ১১ই বা ১২ই তারিখ পর্যন্তও পড়া যায়, তবে বিনা ওজরে ১০ই তারিখে না পড়া মাকরূহ।

* ঈদুল আযহার নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। তাকবীরে তাশরীকের বিধান জানার জন্য দেখুন ৩৬০ পৃষ্ঠা। (احسن الفتاوی ج/٤)

### ঈদুল আযহার খুতবা ও তখনকার আমলসমূহ

ঈদুল আযহার খুতবাও ঈদুল ফিতরের খুতবার ন্যায়। পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল আযহার খুতবায় ছদকায়ে ফিতরের বর্ণনার স্থলে কুরবানী ও তাকরীরে তাশরীকের বিধান (৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বর্ণনা করতে হবে।

### তাহাজ্জুদের নামায

* ঈশার নামাযের পর থেকে সুব্হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে 'সালাতুল লাইল' বা 'তাহাজ্জুদের নামায' বলা হয়। নফল নামাযের মধ্যে এই প্রকার নফল অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে অধিক।

* ঈশার নামাযের পর থেকে সুব্হে সদিকের পুর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া উত্তম।

* তাহাজ্জুদের নামায ২ থেকে ১২ রাকআত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত ৮ রাকআত পড়তেন বিধায় এটাকেই



উত্তম বলা হয়েছে। পারলে ৮ রাকআত নতুবা ৪ রাকআত আর তা-ও হিম্মত না হলে ২ রাকআত হলেও পড়বে।

* তাহাজ্জুদের নামাযের কাযা নেই, তবে রাতে পড়তে না পারলে পরের দিন দুপুরের পূর্বে অনুরূপ পরিমাণ নফল পড়ে নেয়া উত্তম। (فتاوی دار العلوم ٤/[illegible])

* তাহাজ্জুদের নামায যে কোন সূরা দিয়ে পাঠ করা যায়, তবে কিরাত লম্বা হওয়া উত্তম।

* দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ التَّهَجُّدِ

বাংলায়: দুই রাকাত তাহাজ্জুদের নিয়ত করছি।

## তাহিয়্যাতুল উযূ নামায

* উযূ করার পর অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই (شامی) দুই রাকআত নফল নামায পড়া উত্তম। এই নামাযকে "তাহিয়্যাতুল উযূ" বা 'শুক্রুল উযূ'ও বলা হয়। এই নামাযের অনেক ফযীলত, এমনকি এই নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কথাও সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

* ফজরের নামাযের ওয়াক্তে বা কোনো মাকরূহ কিংবা হারাম ওয়াক্তে এই নামায পড়বে না।

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ

বাংলায়: দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযুর নিয়ত করছি।

### দুখূলুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর নামায

* মসজিদে প্রবেশ করলে এবং মাকরূহ বা হারাম ওয়াক্ত না হলে মসজিদের তথা আল্লাহ্র তাজীমের উদ্দেশ্যে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তে হয়, এই নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বা 'দুখূলুল মসজিদ বলা হয়।

* এক দিনে এক বার এই নামায পড়াই যথেষ্ট।

* মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই এই নামায পড়ে নেয়া উত্তম। আগে বসে তারপর এই নামায পড়লেও হয়, তবে তাতে ছওয়াব কমে যায়। কেউ কেউ মনে করে আগে বসে তারপর উঠে এই নামায পড়তে হয়, এ ধারণা ঠিক নয়।

* ওয়াক্ত সংকীর্ণ থাকলে কিংবা প্রবেশ করত দ্রুত অন্য কোন সুন্নাত অথবা ফরয নামায পড়লে সেই ফরয বা সুন্নাতের দ্বারাও এই নামাযের হক আদায় হয়ে যায় এবং তার ছওয়াব লাভ হয়।

* ওয়াক্ত সংকীর্ণ বা নিষিদ্ধ (যেমন: ফজরের ওয়াক্ত বা মাকরূহ ওয়াক্ত বা হারাম ওয়াক্ত) হওয়ার দরুন এই নামায পড়তে না পারলে এর বিকল্প হিসাবে নিম্নোক্ত দুআটি চারবার পড়ে নিবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. (الأذكار للنووي)

* তারপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে।

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আবরীতে: نَوَيْتُ أَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

বাংলায়: দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদের/দুখূলুল মসজিদের নিয়ত করছি।

## ইশ্‌রাক এর নামায

* সূর্য উদয়ের পর যে দুই বা চার রাকআত নফল নামায পড়া হয়, তাকে ইশ্‌রাক–এর নামায বলে। এই নামায দ্বারা এক হজ্জ ও এক উমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।

* সূর্য উদয়ের আনুমানিক দশ/বার মিনিট পর[1] থেকে ইশ্‌রাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেয়া উত্তম।

* ফজরের নামায আদায়ের পর সেই স্থানেই বসে থেকে দুআ দুরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে; দুনিয়াবী কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না এবং সময় হয়ে গেলে ইশ্‌রাকের নামায আদায় করবে। এভাবে ইশ্‌রাক–এর নামায আদায় করাতে ছওয়াব বেশি। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও সময় হওয়ার পর ইশ্‌রাকের নামায আদায় করা যায়, তবে তাতে ছওয়াব কিছু কমে যায়।

১. احسن الفتاوى ٢/[illegible] و ٣/[illegible] এবং نماز مسنون –এর বর্ণনা অনুযায়ী ইশ্‌রাকের ওয়াক্তের এই বিবরণ পেশ করা হল। যদিও সাধারণভাবে সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পরের কথা প্রসিদ্ধ আছে।



* ইশ্‌রাকের নামায যেকোনো সূরা/কিরাত দিয়ে পড়া যায়।

* দুই রাকআত ইশ্‌রাক নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ اَصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْإِشْرَاقِ

বাংলায়: দুই রাকআত ইশ্‌রাক নামাযের নিয়ত করছি।

## চাশ্‌ত এর নামায

* আনুমানিক নয়/দশটার দিকে যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাতুয যোহা বা চাশ্‌তের নামায (বা আওয়াবীনের নামাযও) বলা হয়। এই নামায দুই রাকআত করে পাঠ করলে তাকে গাফেলদের তালিকাভুক্ত করা হয় না। চার রাকআত পাঠ করলে তাকে আবিদীন বা ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ছয় রাকআত পাঠ করলে ঐ দিন তার (নফল ইবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আট রাকআত পাঠ করলে আল্লাহ তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন, আর বার রাকআত পাঠ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। (مجمع الزوائد بحوالہ طرانی)

* ইশ্‌রাক আদায়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত এই নামাযের ওয়াক্ত। তবে দিনের এক চতুর্থাংশ যাওয়ার পর অর্থাৎ, আনুমানিক নয়/দশটার দিকে পড়া উত্তম।

* এই নামায দুই থেকে বার রাকআত। তবে রসূল (সা.) সাধারণত চার রাকআত পাঠ করতেন। মাঝে মধ্যে বেশিও পাঠ করতেন।

* চাশ্‌ত এর নামায যেকোনো সূরা/কিরাত দিয়ে পড়া যায়।

* দুই রাকআত চাশ্‌তের নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى

বাংলায়: দুই রাকআত চাশ্‌তের নামাযের নিয়ত করছি।

## যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায

* দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলার পর চার রাকআত নফল আদায় করা হয়; তাকে বলা হয় যাওয়ালের নামায বা সুর্য ঢলার নামায। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই নফল আদায় করতেন। সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের দরজা খোলা হয় বিধায় তখন এই নফল পাঠের ফযীলত অধিক।

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সালামেই এই চার রাকআত নফল আদায় করতেন। (نماز مسنون)

* চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ

বাংলায়: চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়ত করছি।

## আওয়াবীন নামায

* মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ছয় রাকআত এবং সর্বাধিক বিশ রাকআত নফলকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়। হাদীছে এই ছয় রাকআত আওয়াবীনের ফযীলতে বার বৎসর ইবাদত করার ছওয়াব অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীছে বিশ রাকআত পাঠ করলে জান্নাতে আল্লাহ তার জন্য একটা ঘর তৈরি করবেন বলা হয়েছে।

* দুই রাকআত আওয়াবীনের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْاَوَّابِيْنَ

বাংলায়: দুই রাকআত আওয়াবীনের নিয়ত করছি।

## সালাতুত তাসবীহ

* চার রাকআত নফল নামায যার প্রত্যেক রাকআতে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ৭৫ বার এবং সর্বমোট ৪ রাকআতে ৩০০ বার এই তাসবীহ পাঠ করা হয়, এই নামাযকে সালাতুত্ তাসবীহ বলে। এই নামায দ্বারা জীবনের ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, গোপন-প্রকাশ্য সবরকমের পাপ আল্লাহ মাফ করে দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস (রা.)কে বলেছিলেন, চাচা! পারলে প্রতিদিন এই নামায পড়ুন, তা না পারলে প্রতি সপ্তাহে পড়ুন, তা না পারলে প্রতি মাসে, না পারলে প্রতি বৎসরে, না হয় অন্তত জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়ুন।[১]

* চার রাকআত সালাতুত্ তাসবীহ নফল নামাযের নিয়ত করত যথারীতি সূরা ফাতেহার পর সূরা/কিরাত পাঠ করে তারপর দাঁড়ানো

১. কিছু লোক বলে, সালাতুত তাসবীহ নামাযের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ এ সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত রয়েছে। এ সম্বন্ধে জানার জন্য আমার রচিত "ফাযায়েলে যিন্দেগী" গ্রন্থে আলোচনা দেখে নিন।



অবস্থাতেই উক্ত তাসবীহ ১৫ বার পড়বে, তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পড়ার পর উক্ত তাসবীহ ১০ বার, তারপর রুকু থেকে উঠে 'রব্বানা রাকাল হাম্‌দ' বলার পর উক্ত তাসবীহ ১০ বার, তারপর সাজদায় গিয়ে সাজদার তাসবীহ বলার পর উক্ত তাসবীহ ১০ বার, সাজদা থেকে উঠে দুই সাজদার মাঝখানে বসে ১০ বার পড়বে। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় অনুরূপ ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়বে। এই হল ১ রাকআতে ৭৫ বার। এরপর (আল্লাহু আকবার বলা ব্যতীতই) দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে এবং এইরূপে দ্বিতীয় রাকআত পড়বে। যখন দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু ... পড়ার জন্য বসবে, তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে তারপর আত্যাহিয়্যাতু ... পড়বে। তারপর আল্লাহ আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। অতঃপর তৃতীয় রাকআত ও চতুর্থ রাকআতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে।[১] কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম থেকে গেলে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে সেখানকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবে। আর এই নামাযে কোনো কারণে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হলে সেই সাজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলে গণনা করা যাবে না তবে আঙ্গুল চেপে চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে।

বি. দ্র. সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার আর একটি নিয়ম রয়েছে। তবে উপরোল্লেখিত নিয়মটি উত্তম।

দ্বিতীয় নিয়মে যদি কেউ পড়তে চায়, তাহলে নিয়ত বাঁধার পর প্রথম রাকআতে ছানা তথা সুবহানাকা ... পাঠ করার পর উক্ত দুআটি ১৫ বার এবং সূরা/কিরাত শেষ করে রুকূর পূর্বে ১০ বার পড়বে। তারপর রুকুতে, রুকূ থেকে খাড়া হয়ে, প্রথম সাজদায়, দুই সাজদার মাঝখানে এবং দ্বিতীয় সাজদায় পূর্বের নিয়মে ১০ বার করে পড়বে। এ নিয়মে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়তে হবে না বরং দ্বিতীয় সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতেও সূরা/কিরাতের পূর্বে

১. তৃতীয় রাকআতের সাজদা থেকে উঠে তাসবীহ পড়ার পর ৪র্থ রাকআতের জন্য উঠার সময়ও আল্লাহু আকবার বলবে না। (احسن الفتاوى ٣/□□)

১৫ বার এবং সূরা কিরাতের পর রুকূর পূর্বে ১০ বার করে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। এ নিয়মে প্রথম এবং শেষ বৈঠকে বসে আত্তাহিয়্যাতু-র পূর্বে ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না।

* এই নামায একাকী পড়তে হয়। জামাআতের সাথে এই নামায পড়া দুরস্ত নয়। (نماز مسنون)

* মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত দিবা-রাত্রির যেকোনো সময়ে এই নামায পড়া যায়, তবে সবচেয়ে উত্তম হল সূর্য ঢলার পর পড়া, তারপর দিনে, তারপর রাতে। (فضائل ذکر)

* যেকোনো সূরা/কিরাত দিয়ে এই চার রাকআত নামায পড়া যায়, তবে কেউ কেউ বলেছেন, এই নামাযে সূরা আছর, কাউছার, কাফিরূন ও ইখলাছ বা সূরা হাদীদ, হাশ্‌র, ছফ ও তাগাবুন পড়া ভাল। (رد المحتار مطلب في صلاة التسبيح)

* এই চার রাকআত নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلَاةِ التَّسْبِيْحِ

বাংলায়: চার রাকআত সালাতুত্ তাসবীহের নিয়ত করছি।

## এস্তেখারার নামায

* যখন কোনো মোবাহ ও জায়েয কাজের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় (ফরয, ওয়াজিব কিংবা নাজায়েয কাজের জন্য এস্তেখারা নেই।) যেমন: কোথায় বিয়ে-শাদি করব, বিদেশ যাত্রা করব কি না, বা হজ্জে কোন্ তারিখে যাব (হজ্জে যাব কি না– এরূপ এস্তেখারা হয় না।) ইত্যাদি বিষয়ে মন স্থির করতে না পারলে বিশেষ এক পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করাকে এস্তেখারা বলে।

* এস্তেখারার তরীকা হল– দুই রাকআত নফল নামায পড়ে মনোযোগের সাথে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা, তারপর মনের মাঝে যেদিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয় কিংবা যে বিষয়টা অধিক কল্যাণজনক মনে হয়, তাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে মনে করে সেটা করা। এক দিনে মনের অবস্থা এরূপ না হলে সাত দিন করা। তারপরও মন কোনো দিকে না ঝুঁকলে ভাল-মন্দ বিবেচনা পূর্বক কাজ করে ফেললে এস্তেখারার বরকতে এবং আল্লাহ্‌র রহমতে মঙ্গল হবে।



বি. দ্র. এস্তেখারা রাতের বেলায় করা এবং এস্তেখারার পর শয়ন করা এবং স্বপ্নের মাধ্যমেই এস্তেখারার ফল জানা যাবে– এরূপ জরুরি নয়। এস্তেখারা যেকোনো সময় করা যায়। এস্তেখারার পর শয়ন করাও জরুরি নয়। জাগ্রত অবস্থায়ও তার মন যেকোনো এক দিকে ঝুঁকে যেতে পারে, আবার স্বপ্নের মাধ্যমেও কিছু জানতে পারে। (اعلاط العوام)

এস্তেখারার দুআ এই:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ

(এখানে هٰذَا الْأَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে।)

خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ

(এখানেও هٰذَا الْأَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে।)

شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ.

* এস্তেখারার এই লম্বা দুআ মুখস্থ না থাকলে সংক্ষিপ্ত এই দুআটি পড়ে নিবে–

اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَاخْتَرْ لِيْ.

* এস্তেখারার উপরোক্ত আরবীতে বর্ণিত দুআটি পড়া উত্তম, না পারলে নিজের ভাষায়ও দুআ করা যায়। (اعلاط العوام)

* এস্তেখারার নামায পড়ার সময় না পেলে শুধু দুআ পড়াই যথেষ্ট।

সালাতুল কাতল বা নিহত হওয়াকালীন নামায

কোনো মুসলমান যদি অবগত হতে পারে যে, তাকে হত্যা করা হবে বা ফাঁসি দেয়া হবে, তার জন্য এই দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নেয়া মোস্তাহাব। নামায পাঠ পূর্বক আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এই

নামাযকে 'সালাতুল কাত্ল' বা নিহত হওয়াকালীন নামায বলে। এই নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।

## তওবার নামায

কারও থেকে কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকআত নফল নামায পাঠ পূর্বক আল্লাহ্‌র নিকট অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিজের পাপের কারণে অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার জন্য পাঁকা-পোক্ত ইরাদা করবে, তাহলে আল্লাহ তার পাপকে ক্ষমা করবেন। এই নামাযকে 'সালাতুত্ তাওবা' অর্থাৎ, তওবার নামায বলে। এর জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।

সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের মুহূর্তের নামায

আল্লাহ্‌র নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে কিংবা শারীরিক মানসিক যেকোনো পেরেশানী দেখা দিলে উত্তমভাবে উযূ করে দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহ্‌র হাম্দ ও ছানা (প্রশংসা) এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করবে। বিশেষভাবে হাদীছে নিম্নোক্ত দুআ পাঠের কথা বর্ণিত আছে।

**لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.** (رواه ابن ماجة والترمذي. وفي سنده بعض الضعف يتحمل في باب الفضائل.)

## ভয়াবহ পরিস্থিতির নামায

* যখন কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি আসে তখনও নামায পড়া সুন্নাত। যেমন: ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময়, প্লাবনের সময়, কলেরা বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে। তবে এই নামাযের জন্য জামাআত নেই– প্রত্যেকেই নিজে নিজে পৃথকভাবে পড়বে এবং নামায পড়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে দুআ করবে।

* এই নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।



## মারাত্মক ধরনের বিপদে কুনূতে নাযেলার আমল

মারাত্মক ধরনের বিপদ বা ফেতনার সময় ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলার আমল করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। যেমনঃ মুসলমানদের উপর শত্রুর আক্রমণ হলে বা যুদ্ধ লাগলে মুসলমানদের জন্য দুআ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করার উদ্দেশ্যে এ আমল করা হয়ে থাকে। ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর থেকে উঠার পর সোজা দাঁড়িয়ে হাত ছাড়া অবস্থায় কুনূতে নাযেলা পাঠ করা হয়। ইমাম কুনূত পাঠ করবেন আর মুক্তাদীগণ আস্তে আস্তে আমীন বলবেন। দুআ পাঠ শেষ হলে যথারীতি সাজদা করা হবে। কুনূতে নাযেলা (-এর দুআ) এভাবে পাঠ করা যায়–

**اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، إِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، نَخْشٰى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ. اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَآءَكَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُّوْفُوْا بِعَهْدِكَ الَّذِيْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلٰهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ. اَللّٰهُمَّ أَنْجِ .... وَأَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى ... وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ.** (كتاب الأذكار)

প্রথম শূন্যস্থানে যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায়ের জন্য দুআ করা হবে তার বা তাদের নাম, আর দ্বিতীয় শূন্যস্থানে যে বা যাদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করা হবে তার বা তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

## সফরের নামায

* সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকআত এবং সফর থেকে ফিরে দুই রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। একে সফরের নামায বলে।

* সফর থেকে ফিরে আগে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়বে তারপর বাড়ি যাবে। এরূপ করা মোস্তাহাব।

* সফরের মধ্যেও যদি কোন স্থানে কিছুকাল অবস্থান করার ইচ্ছা হয়, তবে সেখানে বসার পূর্বেই দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়া মোস্তাহাব।

(বেহেশতী জেওর: ১ম)

## কছরের নামায

* যদি কোনো ব্যক্তি মোটামুটি ৪৮ মাইল (৭৭. ২৩২ অর্থাৎ, প্রায় সোয়া সাতাত্তুর কিলোমিটার) রাস্তা অতিক্রম করে কোনো স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হয়, তাকে শরীআতের পরিভাষায় মুসাফির বলা হয়।

* মুসাফির ব্যক্তি পথিমধ্যে চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায (অর্থাৎ, জোহর, আসর ও ঈশার ফরয নামায)কে দুই রাকআত পড়বে। একে কছরের নামায বলে। তিন রাকআত বা দুই রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায, ওয়াজিব নামায এমনিভাবে সুন্নাত নামায পূর্ণ পড়তে হবে। এ হল পথিমধ্যে থাকাকালীন সময়ের বিধান। আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পর যদি সেখানে ১৫ দিন বা তদুর্ধকাল থাকার নিয়ত হয় তাহলে কছর হবে না– নামায পূর্ণ পড়তে হবে। আর যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত থাকে তাহলে কছর হবে। গন্তব্যস্থান নিজের বাড়ি হলে কছর হবে না, চাই যে কয়দিনই থাকার নিয়ত হোক।

* মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পিছনে এক্তেদা করলে কছর হবে না, পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে।

* মুসাফির ব্যক্তির ব্যস্ততা থাকলে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত ছেড়ে দেয়া দুরস্ত আছে। ব্যস্ততা না থাকলে সব সুন্নাত পড়তে হবে।



* যারা লঞ্চ, স্টীমার, প্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদির চালক বা কর্মচারী, তারাও অনুরূপ দূরত্বের সফর হলে পথিমধ্যে কছর পড়বে। আর গন্তব্য স্থানের মাসআলা উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী হবে।

* ১৫ দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত হয়নি এবং পূর্বেই চলে যাবে চলে যাবে করেও যাওয়া হচ্ছে না– এভাবে ১৫ দিন বা তার বেশি থাকা হলেও কছর পড়তে হবে।

## সালাতুত তালিবে ওয়াল মাতলূব

* যদি কোনো ব্যক্তি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে দ্রুত চলতে থাকে, তাহলে তার জন্য সেই চলন্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয নয়, সওয়ারীতে থাকলে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে তাকে নামায পড়তে হবে। এরূপ ব্যক্তির নামাযকে "সালাতুত্তালিব" বলে। (نماز مسنون)

* যদি কোনো ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক তাড়িত হয়ে দ্রুত পথ চলতে থাকে, তাহলে সওয়ারীতে থাকা অবস্থায় চলতে চলতে ইশারায় নামায পড়ে নিতে পারে। আর যদি পায়ে হেঁটে পথ চলতে থাকে বা পানিতে সাঁতরাতে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় নামায জায়েয নয়। এরূপ ব্যক্তির নামাযকে "সালাতুল মাতলূব" বলে। (نماز مسنون)

## সালাতুল মারীয বা অসুস্থ ব্যক্তির নামায

* অসুস্থ্য থাকার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হলে বসে নামায পড়বে, বসে রুকু করবে এবং উভয় সাজদা করবে। রুকুর জন্য এতটুকু ঝুঁকবে যেন কপাল হাঁটুর কিনারা বরাবর হয়ে যায়।

* রুকু সাজদা করার ক্ষমতা না থাকলে মাথার ইশারায় রুকু সাজদা করবে। রুকুর তুলনায় সাজদার জন্য মাথা বেশি ঝোঁকাবে। সাজদার জন্য বালিশ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। বরং বালিশ ইত্যাদি উঁচু বস্তুর উপর সাজদা করা ভাল নয়।

* দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অনেক কষ্ট হলে বা রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে বসে নামায পড়া দুরস্ত আছে।

* কেউ দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকূ সাজদা করতে সক্ষম নয়, তাহলে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে এবং রুকূ সাজদার জন্য ইশারা করতে পারে। তবে তার জন্য বসে নামায পড়া উত্তম। রুকূ সাজদার জন্য ইশারা করবে।

* যদি নিজ ক্ষমতায় বসতে সক্ষম না হয় কিছুতে হেলান দিয়ে বা টেক দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে হেলান দিয়ে বসে নামায পড়বে। হাঁটু খাড়া রাখতে পারলে খাড়া রাখবে নতুবা হাঁটুর নিচে বালিশ দিয়ে হাঁটু উঁচু করে রাখবে যেন যথাসম্ভব কেবলার দিক থেকে পা ফিরে থাকে।

* যদি হেলান দিয়েও বসতে সক্ষম না হয় তাহলে মাথার নিচে বালিশ ইত্যাদি দিয়ে মাথা উঁচু করে কেবলামুখী করে দিয়ে নামায পড়বে। এরূপ অবস্থায় মাথা উত্তর দিকে দিয়ে ডান কাতে শুয়ে বা মাথা দক্ষিণ দিকে দিয়ে বাম কাতে শুয়ে কেবলার দিকে মুখ করেও নামায পড়া দুরস্ত আছে। এসব অবস্থায়ই মাথার ইশারায় রুকূ সাজদা করবে।

* যদি মাথা দ্বারা রুকূ সাজদার জন্য ইশারা করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় হবে না। এরূপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না। এরূপ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্তের বেশি স্থায়ী হলে তার কাযাও করতে হবে না।

* কারও বেহুশ থাকা অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের বেশি নামায ছুটে গেলে তার কাযা করতে হবে না।

* দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার পর যদি এমন হয়ে যায় যে, দাঁড়ানোর শক্তি রইল না, তাহলে অবশিষ্ট নামায বসে পড়বে। রুকূ সাজদা করতে পারলে করবে নতুবা ইশারায় রুকূ সাজদা করবে। এমনকি বসতে না পারলে শুয়ে শুয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করে নিবে।

* কেউ বসে নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানোর শক্তি এসে গেল, তাহলে অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবে।

* যদি কেউ মাথার ইশারায় নামায পড়া শুরু করার পর বসে বা দাঁড়িয়ে রুকূ সাজদা করার মত শক্তি পায়, তাহলে নতুন নিয়ত বেঁধে নতুন করে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে– পূর্বের নামাযের নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

* রোগী পেশাব-পায়খানার পর পানি দ্বারা এস্তেন্‌জা করতে সক্ষম না হলে পুরুষ হলে তার স্ত্রী কিংবা স্ত্রী হলে তার স্বামী পানি দ্বারা এস্তেন্‌জা করিয়ে দিলে ভাল। নতুবা নেকড়ার দ্বারা মুছে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে। যদি নেকড়ার দ্বারা মুছবার মত শক্তি না থাকে (এবং পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী না থাকে) তাহলেও ঐ অবস্থায় নামায পড়ে নিবে।

* রোগীর বিছানা যদি নাপাক হয় এবং বিছানা বদলাতে যদি রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় বা ক্ষতি হয়, তাহলে ঐ বিছানাতেই নামায পড়ে নিবে।



* ডাক্তার চক্ষু অপারেশনের পর নড়াচড়া করতে নিষেধ করলে এমতাবস্থায় শুয়ে শুয়ে হলেও নামায পড়ে নিবে।

## সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামায

* মানুষ বা হিংস্র প্রাণী বা অজগর ইত্যাদি শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার মুহূর্তে যে নামায পড়া হয়, তাকে বলে 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়কালীন নামায।

* ভয়কালীন মুহূর্তে জামাআতে নামায পড়তে না পারলে একাকী নামায পড়ে নিবে। সওয়ারীতে বসা থাকলে আর নামতে না পারলে সওয়ারীতেই নামায পড়ে নিবে। তখন কেবলামুখী হওয়াও শর্ত নয়। আর যদি এতটুকুও অবকাশ না পায় তাহলে তখন নামায পড়বে না– পরে অবস্থা শান্ত হলে কাযা করে নিবে।

* যে মুহূর্তে যুদ্ধ চলে তখন নামায পড়ার অবকাশ না পেলে বিলম্ব করবে এবং এ অবস্থায় ওয়াক্ত চলে গেলে পরে কাযা করে নিবে। (نماز مسنون)

* যুদ্ধ চলাকালে সকলে একত্রে জামাআতে নামায পড়তে না পারলে মুসলমানদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা জামাআত করে নিবে। তবে যদি দলে এমন কোন বযুর্গ থাকেন যার পিছনে সকলেই নামায পড়তে চান এবং এক জামাআত করতে চান তার জন্যও নিয়ম রয়েছে, বিজ্ঞ আলেম থেকে সে নিয়ম জেনে নিবে।

* নৌকা জাহাজ ইত্যাদি ডুবে গেলে সন্তরণকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত যাওয়ার মত হয় এবং কিছুকাল বয়া, বাঁশ, তক্তা ইত্যাদির সাহায্যে হাত পা সঞ্চালন বন্ধ রাখা সম্ভব হয়, তাহলেও সম্ভব হলে মাথার ইশারা দ্বারা নামায পড়ে নিতে হবে।

## সালাতুল ফাতাহ্ বা বিজয়ের নামায

* মক্কা বিজয়ের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন, উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় এটাকে 'সালাতুল ফাতাহ্' বা বিজয়ের নামায বলা হয়। মুসলমান আমীরগণও বিভিন্ন দেশ এবং নগরী বিজয়ের পর বিজয়ের শোকর স্বরূপ আট রাকআত নামায পড়তেন। হহযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) মাদায়েন বিজয় ও খসরুর রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করত এক সালামে আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন। (سيرة المصطفىٰ [illegible]/٣ نقلا عن البخاري و روض الأنف)

## শোকরের নামায

কোন বিশেষ নেয়ামত পাওয়া বা কোন বিশেষ খুশীর খবর প্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্তে শোকর স্বরূপ দুই রাকআত নামায পড়ার প্রমাণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। একে শোকরের নামায বলা হয়। একে 'সাজদায়ে শোকর'ও বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী "সাজদায়ে শোকর" কথাটির মধ্যে 'সাজদা' দ্বারা রূপক অর্থে নামায বোঝানো হয়েছে। শোকর স্বরূপ এই দুই রাকআত নামায পড়ে নিবে, শুধু সাজদা করা সুন্নাত নয়। (نماز مسنون) তবে সাধারণ ফতওয়া গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী উযূ সহকারে কেবলামুখী হয়ে একটা সাজদা দেয়ার মাধ্যমেও শোকর আদায় করা যায়।

## সালাতুল কুছূফ (সূর্য গ্রহণের নামায)

* সূর্য গ্রহণের সময় মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নাত।

* সূর্য গ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

* এই নামায জামাআতের সাথে পড়তে হয়। বাদশাহ, তাঁর নায়েব এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদে কুছূফের নামায পড়াতে পারেন। এরূপ ইমাম পাওয়া না গেলে প্রত্যেকে একা একা আদায় করবে। আর স্ত্রীলোক নিজ নিজ গৃহে পৃথক পৃথকভাবে এই নামায আদায় করবে।

* এই নামায সূরা বাকারার ন্যায় অনেক লম্বা কিরাত, লম্বা রুকূ ও লম্বা সাজদা সহকারে পড়া সুন্নাত।

* এই নামাযে কিরাত আস্তে পড়া উত্তম।

* নামায শেষে ইমাম কেবলামুখী হয়ে বসে বা লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না ছুটে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাকবে। অবশ্য কোনো নামাযের সময় এসে গেলে দুআ বন্ধ করে নামায পড়ে নিবে। (বেহেশতী জেওর: ১ম)

* দুই রাকআত সালাতুল কুছূফের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

বাংলায়: দুই রাকআত কুছূফের নামায পড়ছি।



## সালাতুল খুছূফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায)

* চন্দ্র গ্রহণের সময়ও দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। তবে এই নামাযে জামাআত সুন্নাত নয় বরং প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়বে এবং নিজ ঘরে থেকে পড়বে। মসজিদে যাওয়াও সুন্নাত নয়।

* চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

* দুই রাকআত সালাতুল খুছূফের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

বাংলায়: দুই রাকআত খুছূফের নামায পড়ছি।

## এস্তেস্কার নামায

* যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হতে থাকে, তখন দুই রাকআত নামায আদায় পূর্বক আল্লাহ্র নিকট পানির জন্য দরখাস্ত করা এবং দুআ করা সুন্নাত। এই নামাযকে 'এস্তেস্কার নামায' বলে।

* এস্তেস্কার মোস্তাহাব তরীকা এই যে, দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ, বালক, বৃদ্ধসহ সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে গরীবানা লেবাস-পোশাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে ময়দানে হাজির হবে। ময়দানে গমনের পূর্বেই খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্র নিকট তওবা-এস্তেগফার করবে। কেননা পাপের দরুনই প্রায়শই বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কারও হক নষ্ট করে থাকলেও তা আদায় করে যাবে। ময়দানে সাথে কোনো কাফেরকে নিবে না। জীব-জানোয়ার সাথে নেয়া যায়, তাতে আল্লাহ্র রহমত আকর্ষিত হয়। ময়দানে আযান ইকামত ব্যতীত দুই রাকআত নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে। এই নামাযে কিরাত উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়। নামাযের পর ঈদের খুতবার ন্যায় দুইটা খুতবা পাঠ করতে হয়। তবে এই খুতবা পড়তে হয় মাটিতে দাঁড়িয়ে এবং হাতে লাঠি বা তলোয়ার নিয়ে। খুতবার পর ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে আল্লাহ্র নিকট পানির জন্য দুআ করবে। উপস্থিত সকলেও দুআ করবে। পরপর তিন দিন এরূপ করা মোস্তাহাব। এই তিন দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব। যদি ময়দানে পৌঁছার পূর্বেই কিংবা তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি হয়ে যায়, তবুও তিন দিন এরূপে পূর্ণ করা মোস্তাহাব। ময়দানে যাওয়ার পূর্বে সদকা-খয়রাত করাও মোস্তাহাব।

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদর মোবারক উল্টিয়েছেন, দুআর মধ্যে হাতের পিঠ আসমানের দিকে করেছেন এবং হাত এতটুকু উঁচু করেছেন যে, বগল দৃষ্টি গোচরে এসেছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)– এর মতে এগুলো করা জরুরি নয় তবে অবস্থা পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত ও শুভ লক্ষণ হিসাবে করা যেতে পারে।

* এস্তেস্কার নামাযের জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

(بہشتی گوہر، نماز مسنون والفقه على الذاهب الأربعة)

## নামাযের ফরযসমূহ

নামাযে তেরটি ফরয। নামায আরম্ভ করার পূর্বে সাতটি ও নামায আরম্ভ করার পর ছয়টি ফরয। নামাযের পূর্বের সাতটিকে নামাযের আহকাম বা শর্ত বলে আর মধ্যেরগুলোকে নামাযের আরকান বলে। এই আরকান বা শর্তসমূহের কোনো একটিও ছুটে গেলে নামায হবে না।

### নামাযের আহ্কাম বা শর্তসমূহ

১. সময়মত নামায পড়া। নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে নামায পড়লে নামায হবে না।

২. প্রকৃত অপ্রকৃত সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে শরীর পবিত্র হতে হবে। অর্থাৎ, উযূ না থাকলে উযূ করে নিতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে নিতে হবে। শরীরে কোন নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করে নিতে হবে।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদ পাক হতে হবে। কাপড়ে গাঢ় অথবা পাতলা যে কোন প্রকারের নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করে নিতে হবে।

৪. যে জায়গায় নামায পড়বে তা পাক হতে হবে।

৫. ছতর বা ঢাকবার স্থান ঢাকতে হবে অর্থাৎ, নামাযীর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। পুরুষ এরূপ কাপড় পরিধান করবে যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যায়। স্ত্রীলোক এমন কাপড় পরিধান করবে যেন দু' হাতের কব্জি দু' পা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত হয়ে যায়। যে উড়না এত পাতলা যে, তাতে চুল দেখা যায় তাতে নামায হবে না। পুরুষের পায়ের গিট কাপড়ে ডেকে গেলে নামায মাকরূহ হবে। স্ত্রীলোকের সমস্ত গিট অনাবৃত থাকলে নামায মাকরূহ হবে।

৬. কেবলার দিকে মুখ করতে হবে।



৭. নামাযের নিয়ত করতে হবে। হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা অমুক নামায পড়ছি বলে ইচ্ছে করলে এতেই যথেষ্ট হবে, মুখে নিয়ত করা ফরয ওয়াজেব বা মুস্তাহাবও নয়, তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা উত্তম এই অর্থে যে, এতে হৃদয়ের আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং খটকা আসতে পারে না।

### নামাযের আরকান

১. তাকরীরে তাহরীমা বলা। অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা।

২. কিয়াম করা। অর্থাৎ, কোনো অসুবিধা না থাকলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৩. কিরাত পাঠ করা। পবিত্র কুরআন থেকে কমপক্ষে তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পাঠ করতে হবে।

৪. রুকূ করা।

৫. দুই সাজদা করা।

৬ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ বিলম্ব করা।

## নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের কোনো একটি ফরয কাজ ছুটে গেলে নামায হবে না। দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। যেমনঃ তাকবীরে তাহরীমা– আল্লাহু আকবার বলল না কিংবা সাজদা করল না, বা রুকূ করতে ভুলে গেল। এ সমস্ত অবস্থায় নামায হবেই না। তবে নামাযের কোন একটি ওয়াজিব কাজ ভুলে ছুটে গেলে নামায পুরোপুরি ভঙ্গ হবে না। তবে নামাযের একটি কাজ বাদ পড়ায় এ ঘাটতি মোচন করার জন্য শরীআত সাজদায়ে সাহো বা ভুলের সাজদা দেয়ার নিয়ম করেছে। এ সাজদা ওয়াজিব হলে সে সাজদা আদায় না করলে দ্বিতীয়বার নামায পড়ে নেয়া ওয়াজিব। সাজদায়ে সাহো (ভুলের সাজদা) আদায় করার নিয়মাবলী সামনে আলোচনা করা হবে।

### নামাযের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ–

১. ফরযের প্রথম দুই রাকআত কিরাত পাঠের জন্যে নির্দিষ্ট করা।

২. সূরা ফাতিহা পাঠ করা অর্থাৎ, ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে এবং সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

৩. নফল অথবা বিতর নামাযের সমস্ত রাকআতে সূরা ফাতিহাসহ কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফরয নামযের শুধু প্রথম দুই রাকআতে সুরা ফাতিহাসহ কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব।

৪. প্রথমে ফাতিহা পড়া তারপর সূরা/কিরাত পড়া।

৫. নামাযের অঙ্গগুলো ক্রমাগত আদায় করা। অর্থাৎ, অমনোযোগিতা অথবা ভুলবশত নামাযের এক অঙ্গ আদায় করার পর অন্য অঙ্গ আদায় করতে যদি তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয়, তখন সাজদায়ে সাহো দেয়া ওয়াজিব হবে। দুআ ইত্যাদি পড়ার মধ্যে যত বিলম্বই হোক না কেন সাজদায়ে সাহো দিতে হবে না।

৬. কিয়াম, রুকু, কিরাত ও সাজদার মধ্যে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ, রুকুর আগে সাজদা অথবা সাজদার আগে কা'দা (বৈঠক) করলে সাজদায়ে সাহো দেয়া ওয়াজিব হবে।

৭. রুকূ ও সাজদার মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করা যাতে একবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى অথবা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পাঠ করতে পারে। এ চেয়ে অতি তাড়াতাড়ি করে রুকূ সাজদা করলে নামায হবে না।

৮. কওমা করা। অর্থাৎ, রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এতে বহুলোক তাড়াহুড়া করে অর্থাৎ, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সাজদায় চলে যায়, এরূপ করলে নামায হবে না।

৯. জলসা করা। অর্থাৎ, এক সাজদা করার পর ভাল করে বসা, অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করা।

১০. প্রথম বৈঠকে অর্থাৎ, তিন অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকআত পড়ার পর তাশাহ্হুদ পাঠ করতে পারা যায় এতটুকু সময় বসা।

১১. উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করা। অর্থাৎ, দুই রাকআতবিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে, তিন রাকআতবিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চার রাকআতবিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে।

১২.তা'দীলে আরকান। অর্থাৎ, নামাযের অঙ্গগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। কওমা, রুকূ, সাজদা ও জলসা ইত্যাদি শান্ত-শিষ্টভাবে আদায় করা। নামাযের দুআগুলোও ধীরস্থিরভাবে পড়তে হবে যেন কোনো কিছু ছুটতে না পারে।



১৩. যে নামাযে কুরআন পাঠ আস্তে করার বিধান আছে, যেমনঃ জোহর ও আসরের নামাযের কিরাত, আর যে নামাযে জোরে কিরাত পাঠ করার বিধান আছে, যেমনঃ ফজর, মাগরিব ও ইশা, এগুলোতে যথাক্রমে আস্তে ও জোরে সূরা/কিরাত পড়তে হবে।

১৪.'আসসলামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করতে হবে।

১৫.বিতরের তৃতীয় রাকআতে দুআ কুনূত পড়া।

১৬.দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। তবে জামাআত অতি বড় হলে তাকবীর ছুটে গেলে অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহো দিতে হবে না।

## নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

যে সমস্ত কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায় ও দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হয়, সে কাজগুলো হল–

১. ভুলে ইচ্ছা করে কথা বলা।

২. নামাযরত অবস্থায় সালাম দেয়া অথবা উত্তর দেয়া।

৩. কেউ হাঁচি দিলে হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। তবে নামাযে নিজের হাঁচি আসলে ভুল করে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু ইচ্ছা করে এরূপ বলা ঠিক নয়।

৪. নামাযের বাইরে দুআ করা হলে নামাযে থেকে তার উত্তরে 'আমীন' বলা।

৫. কোনো দুঃসংবাদ শুনে 'ইন্নালিল্লাহ' বা অন্য কোনো দুআ বলা।

৬. কোনো সুসংবাদ শুনে 'আল-হামদুলিল্লাহ' অথবা অন্য কোনো শব্দ উচ্চারণ করা।

৭. আশ্চর্যজনক কোনো কথা শুনে 'সুবহানাল্লাহ' অথবা অন্য কোনো বাক্য উচ্চারণ করা।

৮. উহ্-আহ্ শব্দ করা বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা।

৯. নামাযে থাকাকালীন নামাযের বাইরে কোন ব্যক্তির কুরআন পাঠে লোকমা দেয়া।

১০. নামাযের মধ্যে দেখে কুরআন পাঠ করা।

১১.কোনো পুস্তক অথবা লিখিত বস্তু দেখে পাঠ করা। তবে মনে মনে লিখিত বস্তুর মর্ম বুঝে নিলে নামায ভঙ্গ হবে না, কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়।

১২.'আমলে কাছীর' করা অর্থাৎ, এমন কোনো কাজ করা যা অন্য লোক দেখলে নামাযী বলে বুঝতে না পারে যেমন দুই হাতে শরীর চুলকানো অথবা পরিধানের কাপড় দুই হাতে ঠিক করা, ইত্যাদি।

১৩. বিনা প্রয়োজনে জোরে কাশি দেয়া অথবা গলা পরিষ্কার করা। ইমাম গলার আওয়াজ পরিষ্কার করার জন্য কাশি দিতে পারেন।

১৪. ইচ্ছা করে অথবা ভুল করে কোনো বস্তু খাওয়া অথবা পান করা।

১৫. কুরআন পাঠে ভীষণভাবে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়– এমন ভুল পড়া।

১৬. নামাযের ভিতর হাঁটা। তবে প্রয়োজনে দুই এক কদম আগে পিছে সরা যায়। সাজদার জায়গা থেকেও আগে বেড়ে গেলে নামায হবে না।

১৭. কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে সিনা ফিরানো। কোনো কারণ ব্যতীত মুখ ফিরিয়ে নিলেও নামায মাকরূহ হয়ে যাবে।

১৮. এক চতুর্থাংশ ছতর এতটুকু সময় খুলে রাখা যতক্ষণে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায়।

১৯. আল্লাহ তাআলার নিকট এমন বস্তু চাওয়া যা মানুষের নিকট চাওয়া যায়। যেমন: পানাহার ইত্যাদি বিষয়ে চাওয়া।

২০. আল্লাহু এবং আকবার শব্দের আলিফ বা আকবার শব্দের বা-কে লম্বা করা।

২১. জানাযার নামায ব্যতীত অন্য নামাযে অট্টহাসি হাসা।

২২. ইমামের আগে রুকু অথবা সাজদা করে নেয়া।

২৩. একই নামাযে নারী-পুরুষের একত্রে দণ্ডায়মান হওয়া, আর এই দাঁড়ানো এতটুকু বিলম্ব হওয়া যার মধ্যে একবার সাজদা করা যেতে পারে।

২৪. তাইয়াম্মুমকারী ব্যক্তির পানি পেয়ে যাওয়া।

২৫. পূর্ণ সাজদার মধ্যে উভয় পা যদি মোটেই মাটিতে লাগানো না হয়। তবে পা উঠে গেলে আবার মাটিতে রাখলে অসুবিধা নেই।

২৬. নামাযের মধ্যে সন্তান দুধ পান করলে। তবে দুধ বের না হলে নামায ভাঙ্গবে না, কিন্তু তিন বা ততোধিক বার টানলে দুধ বের না হলেও নামায ভেঙ্গে যাবে।

২৭. স্ত্রী নামাযে থাকা অবস্থায় স্বামী তাকে চুম্বন করলে।

### নামাযের মাকরূহসমূহ

যে সমস্ত কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না, তবে দোষণীয়, সে কাজগুলো নিম্নরূপ।



১. শরীরে চাদর না জড়িয়ে উভয় কাঁধে লটকিয়ে ছেড়ে দেয়া অথবা জামা কিংবা শেরওয়ানীর হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধে নিক্ষেপ করা, তেমনি মাফলারের উভয় দিক ছেড়ে দেয়া।

২. কাপড় অথবা কপালে ধুলাবালি লাগার ভয়ে কাপড় টেনে ধরা অথবা মুখে ফুঁক দিয়ে ধুলাবালি সরানো। সাজদার জায়গায় পাথর-কণা থাকলে হাত দিয়ে প্রয়োজনে দুই একবার সরালে কোনো দোষ নেই।

৩. নিজের শরীর, কাপড় অথবা দাড়ি নিয়ে খেলা করলে। বহু লোক এরূপ করে থাকে, এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

৪. এমন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যে কাপড় পরে বাজারে অথবা সভা-সমিতিতে যাওয়া অপছন্দনীয় বোধ হয়।

৫. মুখে এমন জিনিস রেখে নামায পড়া যা রাখার ফলে কুরআন পাঠ করাকষ্টকর হয়।

৬. শৈথিল্য অথবা অমনোযোগিতার দরুন মাথা খালি রেখে অথবা নাভির উপরে খোলা দেহে নামায পড়া। তবে কোন লোক বিনয়ের কারণে খালি মাথায় নামায পড়লে মাকরূহ হবে না, তবে মসজিদের মধ্যে এরূপ করা উচিত নয়, ঘরের মধ্যে করা যায়। মসজিদের ভিতর এরূপ করা হলে অন্য লোকের মন থেকে এর গুরুত্ব উঠে যাবে।

৭. আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে দেয়া।

৮. বিনা প্রয়োজনে কোমরের কাপড়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত রাখা।

৯. সাজদায় দুই হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেয়া।

১০. এদিক-সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

১১. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া, যে লোক তার দিকে মুখ করে আছে বা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে কেউ হাসিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে।

১২. হাত অথবা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে কারও কথার উত্তর দেয়া।

১৩. কোনো অসুবিধা ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে বসা বা দুই পা খাড়া রেখে বসা বা আসন গেড়ে বসা। কোনো ওজর থাকলে যেরকম সম্ভব বসা চলে।

১৪. ইচ্ছা করে হাই তোলা অথবা হাই বন্ধ করার চেষ্টা না করা।

১৫. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও একাকী পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

১৬. কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধানরত অবস্থায় নামায পড়া।

১৭. প্রথম রাকআত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকআতের কিরাত তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ লম্বা করা।

১৮. ইমামের পক্ষে একাকী কোনো উঁচু স্থানে দাঁড়ানো। তবে এক বিঘত পরিমাণ পর্যন্ত উঁচুতে দাঁড়ালে কোনো ক্ষতি নেই।

১৯. এমনভাবে চাদর জড়িয়ে নামায পড়া, যাতে হাত বের করতে অসুবিধে হয়।

২০. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড়ানো।

২১. টুপী, পাগড়ী, অথবা রুমালের ভাঁজে সাজদা করা। অর্থাৎ, এগুলো পরিধান করার পর সাজদার জন্য জায়গা খোলা রাখতে হবে।

২২. কোন নামাযে বিশেষ সূরা নির্দিষ্ট করে সব সময় সেটা পড়া। (এ সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা দেখুন ১১৩ নং পৃষ্ঠায়।)

২৩. কুরআনের তারতীবের বিপরীত কুরআন পাঠ করা। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো যে তারতীবে (যে পর্যায়ক্রমে) লেখা হয়েছে– এর ব্যতিক্রম পাঠ করা।

২৪. পেশাব-পায়খানার জোর অনুভূতি হওয়া সত্ত্বেও সে অবস্থায় নামায পড়া।

২৫. খুব ক্ষুধা অনুভব হলে এবং খাবার তৈরী থাকলে না খেয়ে নামায পড়া।

২৬. নামাযরত অবস্থায় ছারপোকা, মাছি ও পিপড়া মারা। তবে ছারপোকা অথবা পিপড়ায় কামড় দিলে তা ধরে ছেড়ে বা সরিয়ে দেয়া যায়। কামড় না দিলে ধরাও মাকরূহ।

২৭. কনুই পর্যন্ত জামা ইত্যাদির হাতা গুটিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। জামা যদি এমনিতেই হাতা-কাটা হয়, –যেমনঃ শার্ট– তাহলে তা পরিধান করে নামায পড়া খেলাফে আওলা বা অনুত্তম।

## যেসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যায়

কোন কোন অবস্থায় নিজেই নামায ছেড়ে দিতে হয়, ছেড়ে না দিলে কবীরা গোনাহ হয়। আবার কোন কোন অবস্থায় নামায ছেড়ে না দিলে সামান্য গোনাহ হয়। সেগুলো নিম্নরূপ।

১. কোনো অনিষ্টকারী প্রাণীর ভয় থাকলে। যেমনঃ নামাযরত অবস্থায় সাপ সামনে আসলে নামায ছেড়ে দিয়ে মারতে হবে অথবা বিচ্ছু ও



ভীমরুল কাপড়ের ভিতর ঢুকে গেলে তা দংশন করার ভয় থাকলে এ অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে। তদ্রূপ বিড়ালে মুরগি ধরলে অথবা ধরে ফেলার সম্ভাবনা থাকলে তখন নামায ভঙ্গ করা যায়।

২. যদি এমন কোনো বস্তুর ক্ষতির আশংকা থাকে যার মূল্য অন্তত সাড়ে ৪ রত্তি[১] রূপার সমান, যেমনঃ চুলায় পাতিল থাকলে তা জ্বলে যাওয়ার ভয় থাকলে আর এর মূল্য উক্ত পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক হলে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে পাতিল নামিয়ে নিতে হবে। এভাবে কুকুর, বিড়াল ও বানর ঘরে ঢুকলে আটা, ডাল, দুধ, ঘি ইত্যাদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নামায ছেড়ে দেয়া যাবে। মসজিদে অথবা ঘরে নামায পড়ছে অথচ কোন বস্তু ভুলবশত এমন স্থানে রেখে এসেছে যেখান থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন নামায ছেড়ে দিয়ে আসবাবপত্র রক্ষা করবে। তবে নামাযীকে নামায আরম্ভ করার পূর্বেই এগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

৩. নামায পড়লে যানবাহন ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে আর গাড়ীতে আসবাবপত্র ও শিশু-সন্তান থাকলে বা গাড়ী চলে গেলে ক্ষতির আশংকা থাকলে নামায ছেড়ে দিতে পারবে।

৪. নামাযরত অবস্থায় পেশাব-পায়খানার চাপ অসহ্য মনে হলে।

৫. নামাযরত অবস্থায় কাউকে বিপদ বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হলে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয, নামায ছেড়ে না দিলে কঠিন গোনাহগার হবে। যেমনঃ কোন অন্ধ যাচ্ছে এবং তার সম্মুখে কূপ অথবা গভীর গর্ত রয়েছে, অথবা মোটরগাড়ী বা রেলগাড়ীতে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে, অথবা কারও কাপড়ে আগুন লেগে তাতে জ্বলে যাওয়ার অথবা পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে, অথবা পানিতে কেউ ডুবে যাচ্ছে অথবা ডাকাত কিংবা শত্রু কাউকে ভীষণভাবে প্রহার করছে এবং সে সাহায্যের জন্য ডাকছে– এসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য, তা না হলে গোনাহগার হতে হবে।

৬. পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কোনো বিপদে পড়ে ডাকলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাদের কাছে যাওয়া কর্তব্য। যেমনঃ তাদের কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল অথবা আঘাত পেল এবং তারা ডাকল, এমতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করার জন্য কেউ না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে

১. ৬ রত্তি-তে ১ আনা এবং ১৬ আনায় ১ ভরি হয়ে থাকে। এক ভরি = ১১. ৬৬৫ গ্রাম।

হবে। যদি তাদের কেউ পায়খানা অথবা পেশাব করতে যাচ্ছে, অথচ তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ নেই, তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। তবে তাকে সাহায্য করার লোক রয়েছে অথবা অনর্থক চিৎকার করছে, তখন নামায ছেড়ে দেয়া যাবে না। যদি সে নফল অথবা সুন্নাত নামায পড়তে থাকে আর সে নামায পড়ছে বলে তারা না জানে (বিপদের সময় ডাকুক কিংবা এমনি ডাকুক) তাহলে এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে উত্তর দিতে হবে। তবে নামায পড়ছে বলে জ্ঞাত হলে এবং ডাকলে তখন কোনো বিপদের ভয় না হলে নামায ছাড়া যাবে না, নতুবা ছেড়ে দিবে।

(مرافي الفلاح مع الطحطاوي)

## সাজদায়ে সাহোর মাসায়েল

* নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোন একটি বা কয়েকটি ভুলে ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হয়। সাজদায়ে সাহো করতেও ভুলে গেলে নামায আবার পড়া ওয়াজিব। এমনিভাবে কোনো ফরয ছুটে গেলে বা কোনো ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলেও নামায আবার পড়তে হবে– সাজদায়ে সাহো দিলে চলবে না।

* সাজদায়ে সাহো করার নিয়ম হল– শেষ রাকআতে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু ...) পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরাবে, তারপর নিয়মমত দুটো সাজদা করে আবার তাশাহ্হুদ, দুরূদ ও দুআয়ে মাছূরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

* ভুলবশত এক রাকআতে দুই রুকূ বা তিন সাজদা করে ফেললে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা/কিরাত মিলাতে ভুলে গেলে শেষের দুই রাকআতে সূরা/কিরাত মিলাবে বা যেকোনো এক রাকআতে সূরা/কিরাত মিলাতে ভুলে গেলে শেষের যেকোনো এক রাকআতে সূরা/কিরাত মিলাবে এবং উভয় অবস্থায় সাজদায়ে সাহো করবে। এ নিয়মে শেষের দুই রাকআত বা এ রাকআতে সূরা/কিরাত মিলাতেও যদি ভুলে যায় তবুও সাজদায়ে সাহো করলে নামায হয়ে যাবে।

* সূরা ফাতিহা পড়ে কোন্ সূরা মিলাবে– এই চিন্তা করতে করতে যদি চুপ চাপ অবস্থায় তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে নামাযের যেকোনো স্থানে ভুলে বা চিন্তা করার কারণে কোনো ফরয বা ওয়াজিব



আদায় করতে তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* তিন বা চার রাকআতবিশিষ্ট ওয়াজিব বা ফরয বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহ্হুদ–এর পর ভুলবশত দুরূদ পড়া শুরু করলে যদি اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পর্যন্ত বা আরও বেশি পড়ে ফেলে, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে। এর কম পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে না। তবে সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা ও নফলে (তদ্রূপ জুমুআর পরের সুন্নাতে) প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়াও জায়েয আছে; কাজেই তাতে দুরূদ পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে না। (احسن الفتاوى ٣/[illegible])

* যেকোনো নামাযের প্রথম বৈঠকে ভুলে পূর্ণ তাশাহ্হুদ দুই বার পড়লে বা তার এতটুকু অংশ দ্বিতীয়বার পড়লে যা তিন তাসবীহ পরিমাণ হয়ে যায় তাতে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* তাশাহ্হুদের স্থলে ভুলে ছানা বা দুআয়ে কুনূত বা সূরা ফাতিহা পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* দুআয়ে কুনূতের স্থলে সূরা ফাতিহা বা তাশাহহুদ পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হয় না।

* ভুলে সূরা ফাতিহার স্থলে তাশাহ্হুদ পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* মাছবূক ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেললে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* ইমামের জন্য যেসব নামাযে কিরাত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব, তাতে যদি ইমাম ছোট তিন আয়াত পরিমাণ উচ্চ স্বরে পড়ে বা উচ্চস্বরের নামাযে তিন আয়াত পরিমাণ চুপে চুপে পড়ে, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* ফরয নামাযের প্রথম বৈঠক না করেই যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং শরীরের নিচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়ে, তাহলে সাজদায়ে সহো করতে হবে না। আর নিচের অর্ধেক সোজা হয়ে গেলে আর বসবে না– তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআত পড়ে শেষ বৈঠকে সাজদায়ে সাহো করবে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর বসে তাশাহ্হুদ পড়লে গোনাহ্গার হবে, তবে নামায হয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সহো করতে হবে।

* সুন্নাত বা নফল নামাযের প্রথম বৈঠক না করে ভুলে উঠে গেলে তৃতীয় রাকআতের সাজদা না করা পর্যন্ত স্মরণ আসলে বসে যাবে। আর তৃতীয়

রাকআতের সাজদা করার পর স্মরণ এল বসবে না– চার রাকআত পূর্ণ করে বসবে এবং এই উভয় অবস্থায় সাজদায়ে সাহো করলে নামায হয়ে যাবে।

* ফরয নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে শরীরের নিচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়লে সাজাদয়ে সাহো করতে হবে না। আর নিচের অর্ধেক সোজা হয়ে গেলেও বসে যাবে, এমনকি ঐ রাকআতের সাজদা করার আগ পর্যন্ত স্মরণ এলেও বসে পড়বে এবং বসে সাথে সাথে সাজদায়ে সাহো করবে। আর যদি ঐ রাকআতের সাজদা করার পর স্মরণ হয় তাহলে আরও এক রাকআত মিলাবে; তাহলে প্রথম দুই/চার রাকআত ফরয এবং শেষ দুই রাকআত নফল হবে। এ অবস্থায় সাজদায়ে সাহোও করতে হবে। আর যদি ঐ রাকআতে সালাম ফিরায় এবং সাজদায়ে সাহো করে, তাহলেও নামায হবে কিন্তু অন্যায় হবে। এ অবস্থায় প্রথম দুই/চার রাকআত ফরয হবে এবং শেষের এক রাকআত বৃথা যাবে।

* শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পূর্বে ভুলে উঠে গেলে শরীরের নিচের অর্ধের সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়লে সাজদায়ে সাহো করতে হবে না। আর নিচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পর স্মরণ এলেও বসে পড়বে, এমনকি আর এক রাকআতের সাজদা করার আগ পর্যন্ত স্মরণ এলেও বসে পড়বে এবং সাজদায়ে সাহো করবে। কিন্তু আর এক রাকআতের সাজদা করে ফেললে আর বসবে না বরং আরও এক রাকআত মিলাবে এবং শেষে সাজদায়ে সাহো করবে না। এ অবস্থায় সব রাকআত নফল হয়ে যাবে, ফরয পুনরায় পড়তে হবে।

## নামাযের মধ্যে রাকআত নিয়ে সন্দেহ হলে তার মাসায়েল

* যদি নামাযের মধ্যে এরূপ সন্দেহ হয় যে, প্রথম রাকআত না কি দ্বিতীয় রাকআত? তাহলে যেদিকে মন ঝুঁকবে সে দিককে গ্রহণ করবে। যদি কোন এক দিক মন না ঝুঁকে তাহলে এক রাকআতই (অর্থাৎ, কমটাই) ধরতে হবে, কিন্তু এই প্রথম রাকআতে বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, কেননা হতে পারে প্রকৃতপক্ষে এটাই দ্বিতীয় রাকআত। দ্বিতীয় রাকআতেও বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, তৃতীয় রাকআতেও বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, (কেননা, হতে পারে প্রকৃতপক্ষে এটাই চতুর্থ রাকআত) তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সাহো করবে।

* যদি কারও সন্দেহ হয় যে, দ্বিতীয় রাকআত না তৃতীয় রাকআত, তার হুকুমও এরূপ– যদি মন কোন দিকে না ঝুঁকে তাহলে দ্বিতীয় রাকআত



ধরে নিবে এবং এই রাকআতে বসে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং এটা বেতর নামায হলে এ রাকআতেও দুআয়ে কুনূত পড়বে। তৃতীয় রাকআতেও বসবে। তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সাহো সহকারে নামায শেষ করবে।

* যদি কারও সন্দেহ হয় তৃতীয় রাকআত না চতুর্থ রাকআত, তাহলে তার হুকুম অনুরূপ– কোন দিকে মন না ঝুঁকলে তিন রাকআত ধরে নিবে কিন্তু এই তৃতীয় রাকআতেও বসে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে। তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সাহো সহকারে নামায শেষ করবে।

* যদি নামায শেষ করার পর সন্দেহ হয় যে, এক রাকআত কম রয়ে গেল কি না? তাহলে এই সন্দেহের কোনো মূল্য দিবে না, নামায হয়ে গেছে। অবশ্য যদি সঠিকভাবে স্মরণ আসে যে, এক রাকআত কম রয়ে গেছে, তাহলে দাঁড়িয়ে আর এক রাকআত পড়ে নিবে এবং সাজদায়ে সাহো সহকারে নামায শেষ করবে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে এমন কোনো কাজ করে থাকে যাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় (যেমন: কেবলা থেকে ঘুরে বসে থাকা বা কথা বলে থাকা) তাহলে নতুন নিয়ত বেঁধে সম্পূর্ণ নামায দোহরায়ে পড়তে হবে। আর প্রথম অবস্থায়ও নতুনভাবে নামায দোহরায়ে নেয়া উত্তম– জরুরি নয়।

বি. দ্র. রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হওয়ার ব্যাপার যদি কারও ক্ষেত্রে কদাচিৎ হয়ে থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না বরং তাকে নতুন নিয়ত বেঁধে নামায পড়তে হবে।

* সাজদায়ে সাহো করার পরও যদি সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হওয়ার মত আবার কোনো ভুল হয়, তাহলে পুনর্বার সাজদায়ে সাহো করতে হবে না– ঐ পূর্বের সাজদাই যথেষ্ট হবে।

* সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ সাজদায়ে সাহো করে, তাহলে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা ঠিক নয়।

* সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি সাজদায়ে সাহো না করে উভয় সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তারপর কোনো কথা বলার পূর্বে বা নামায ভঙ্গ হয়– এমন কোনো কিছু করার পূর্বে সাজদায়ে সাহোর কথা স্মরণ হয়, তাহলে তখনই যদি 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায়ে সাহো করে, তারপর তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবুও নামায হয়ে যাবে।

* শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়ার পর বা দুআয়ে মাছূরা পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে যদি সাজদায়ে সাহোর কথা স্মরণ হয়, তখনই সাজদায়ে সাহো করে নিবে।

## কাযা নামাযের মাসায়েল

* কারও কোনো ফরয নামায ছুটে গেলে স্মরণ আসা মাত্রই কাযা পড়া ওয়াজিব। বিনা ওজরে কাযা করতে বিলম্ব করা পাপ।

* কাযা নামায পড়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই– হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া যেকোনো সময় পড়া যায়।

* কারও যদি এক, দুই, তিন, চার বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয় এবং এর পূর্বে তার কোনো কাযা নেই, তাহলে তাকে 'ছাহেবে তারতীব' বলে। তাকে দুই ধরনের তারতীব রক্ষা করতে হবে। যথা:–

(১) ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে এই কাযাগুলো পড়ে নিতে হবে, অন্যথায় ওয়াক্তিয়া নামায শুদ্ধ হবে না।

(২) এই কাযা নামাযগুলোও ধারাবাহিকভাবে (আগেরটা আগে এবং পরেরটা পরে) পড়তে হবে। ছাহেবে তারতীবের জন্য এই ধরনের তারতীব রক্ষা করা ফরয। যদি কারও যিম্মায় ছয় বা আরও বেশি ওয়াক্তের কাযা থাকে, তাহলে সে কাযা রেখে ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে পারে এবং কাযা নামাযগুলোও তারতীব ছাড়া পড়তে পারে, সে ছাহেবে তারতীব থাকে না।

* কারও যিম্মায় ছয় বা ততোধিক নামায কাযা ছিল, সে কারণে সে ছাহেবে তারতীব ছিল না, সে সব কাযা পড়ে ফেলল, তাহলে সে এখন থেকে আবার ছাহেবে তারতীব হবে। অতএব আবার যদি পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা হয় তাহলে আবার তারতীবের হুকুম ফিরে আসবে। তারতীব রক্ষা করা ফরয হবে।

* বহুসংখ্যক নামাযের অল্প অল্প করে কাযা পড়তে পড়তে পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কম চলে আসলেও তারতীব ওয়াজিব হবে না।

* তিন কারণে তারতীব মাফ হয়ে যায়। যথা:–

(১) ওয়াক্ত যদি এত সংকীর্ণ হয় যে, আগে কাযা পড়তে গেলে ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় থাকে না, তাহলে আগে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নিবে।

(২) কাযা নামায যদি পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয়।

(৩) যদি আগে কাযা পড়তে ভুলে যায়।



* শুধু ফরয এবং বেতরের কাযা পড়ার নিয়ম। নফল বা সুন্নাতের কাযা হয় না। তবে কোনো নফল বা সুন্নাত শুরু করে পূর্ণ না করেই ছেড়ে দিলে তার কাযা করতে হবে। সুন্নাতের মধ্যে ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২০৫ নং পৃষ্ঠা।

* যদি কোনো কারণবশত দলশুদ্ধ লোকের নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে তারা ওয়াক্তিয়া নামায যেমন জামাআতে পড়ত তেমনি কাযা নামাযও জামাআতে পড়বে। ছির্‌রিয়া নামাযের কাযার মধ্যে কিরাত চুপে চুপে পড়বে এবং জিহ্‌রিয়া নামাযের কাযার মধ্যে কেরাত উচ্চ স্বরে পড়বে।

## উম্‌রী কাযার মাসায়েল

* যদি কোনো লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে জীবনের প্রথম দিকে বা কোন একটা দীর্ঘ সময় বহু নামায ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে সে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে, তাহলে বিগত জীবনের এই ছেড়ে দেয়া নামাযগুলো শুধু তওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে না বরং সব নামাযের কাযা পড়া ওয়াজিব। সাধারণভাবে জীবনের এরূপ দীর্ঘ ছুটে যাওয়া নামাযের কাযাকে 'উম্‌রী কাযা' বলা হয়।

* বালেগ হওয়ার পর থেকে যত নামায ছুটে গিয়েছে তার একটা হিসাব করে সবগুলোর কাযা করতে হবে। যথাশীঘ্রই সম্ভব এবং যতবেশি করে সম্ভব এই কাযাগুলো পড়ে নিবে। এক এক ওয়াক্তে কয়েক ওয়াক্তের কাযা পড়ে নিতে পারলেও পড়ে নিবে। এক এক ওয়াক্তে কয়েক ওয়াক্তের কাযা পড়ে নিতে পারলে ভাল। জোহরের কাযা জোহরের ওয়াক্তে, আসরের কাযা আসরের ওয়াক্তে– এমনিভাবে ওয়াক্তের কাযা সেই ওয়াক্তেই পড়া জরুরি নয়।

* উম্‌রী কাযার নিয়তের মধ্যেও কোন্ নামাযের কাযা করছে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। সাধারণভাবে কোন্ দিন কোন্ তারিখের নামায কাযা পড়া হচ্ছে তা মনে করা এবং নির্দিষ্ট করা মুশকিল, তাই নিয়তের মধ্যে নির্দিষ্ট করার সহজ উপায় হল এরূপ নিয়ত করবে– আমার যিম্মায় যতগুলো ফজরের নামায কাযা রয়েছে তার প্রথমটা কাযা করার নিয়ত করছি। এমনিভাবে জোহরের নামাযের কাযা করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ত করবে যে, আমার যিম্মায় যতগুলো জোহরের নামাযের কাযা রয়েছে তার

প্রথমটা কাযা করার নিয়ত করছি। এরূপ প্রত্যেক ওয়াক্তের কাযা করার ক্ষেত্রে এ রকম নিয়ত করে কাযা করতে থাকবে।

**বি. দ্র.** আজকাল কিছু লোক বলছে, "উমরী কাযা"–র কথা কুরআন-হাদীছে কোথাও নেই।" তাদের এ কথা বিভ্রান্তিকর। কুরআন-হাদীছে উমরী কাযা শব্দটা না থাকলে কি পুরাতন কাযা মাফ হয়ে যাবে? কাযা পুরাতন হয়ে গেলে আর আদায় করতে হয় না তা কুরআন-হাদীছের কোথায় আছে? পুরাতন কাযাকে উমরী কাযা শব্দ দিয়ে বোঝালে কী অসুবিধা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা নামায আদায় করেছেন বলে সহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে। অতএব প্রমাণিত হল কাযা আদায় করতে হবে, চাই সে কাযা নগদ নামাযের হোক বা পুরাতন নামাযের হোক।

## নামাযের ফেদিয়ার মাসায়েল

* যদি কারও নামায ছুটে গিয়ে থাকে এবং তার কাযা করার পূর্বে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে মৃতের ঐ সব নামাযের জন্য ফেদিয়া দেয়ার ওছিয়াত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। এরূপ অবস্থায় ওয়ারিছগণ তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে এই ফেদিয়া আদায় করবে। পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ফেদিয়া আদায় হলে তা আদায় করা ওয়ারিছদের উপর ওয়াজিব। এক তৃতীয়াংশের মধ্যে আদায় না হলে যতটুকু অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে তা সকল ওয়ারিছদের সম্মতিতে হতে হবে। তবে না-বালেগদের সম্মতি হলেও তার অংশ থেকে নেয়া যাবে না।

* ছদকায়ে ফিতর বা ফিতরার পরিমাণ যা, নামাযের ফেদিয়ার পরিমাণও তাই। প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামায এবং বিতর নামাযের বদলে এক একটা ফেদিয়া আদায় করতে হবে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং বিতর নামায এই ছয়টা নামাযের অর্থাৎ, প্রতিদিনের ছয়টা ফেদিয়া আদায় করতে হবে।

* ছদকায়ে ফিতির যাদেরকে দেয়া যায় নামাযের ফেদিয়াও তাদেরকে দেয়া যায়।

* মৃত ব্যক্তির যিম্মায় কাযা রয়ে গেছে, কিন্তু তিনি ওছিয়াত করে যাননি, এমতাবস্থায় তার বালেগ উত্তরসূরীরা যদি নিজেদের সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় তার ফেদিয়া আদায় করে, তাহলেও আশা করা যায় আল্লাহ এর ওছীলায় মৃতকে ক্ষমা করবেন।



## রমযানের রোযা

* সুব্হে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার ও যৌন তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। প্রত্যেক আকেল (বোধসম্পন্ন), বালেগ (বয়সপ্রাপ্ত) ও সুস্থ্য নর-নারীর উপর রমযানের রোযা রাখা ফরয।

* ছেলে মেয়ে দশ বৎসরের হয়ে গেলে তাদের দ্বারা (শাস্তি দিয়ে হলেও) রোযা রাখানো কর্তব্য। এর পূর্বেও শক্তি হলে রোযা রাখার অভ্যাস করানো উচিত।

## রোযার নিয়তের মাসায়েল

* রমযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না।

* মুখে নিয়ত করা জরুরি নয়। অন্তরে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে, তবে মুখে নিয়ত করা উত্তম এই অর্থে যে, তাতে মনের খটকা দূর হয়ে যায়।

* মুখে নিয়ত করলেও আরবীতে হওয়া জরুরি নয়- যেকোনো ভাষায় নিয়ত করা যায়। নিয়ত এভাবে করা যায়-

আরবীতে: نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ অথবা نَوَيْتُ بِصَوْمِ غَدٍ

বাংলায়: আমি আজ রোযা রাখার নিয়ত করলাম।

* সূর্য ঢলার দেড় ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে, তবে রাতেই নিয়ত করে নেয়া উত্তম। (جواهر الفقه ج/١)

* রমযান মাসে অন্য যেকোনো প্রকার রোযা বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও এই রমযানের রোযা আদায় হবে– অন্য যে রোযার নিয়ত করবে সেটা আদায় হবে না।

* রাতে নিয়ত করার পরও সুব্হে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও যৌনকর্ম জায়েয। নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গেই রোযা শুরু হয়ে যায় না, বরং রোযা শুরু হয় সুব্হে সাদেক থেকে।

## সেহ্রীর মাসায়েল

* সেহ্রী খাওয়া জরুরি নয় তবে সেহ্রী খাওয়া সুন্নাত, অনেক ফযীলতের আমল, তাই ক্ষুধা না লাগলে বা খেতে ইচ্ছে না করলেও সেহ্রীর ফযীলত হাছিল করার নিয়তে যা-ই হোক কিছু পানাহার করে নিবে।

* নিদ্রার কারণে সেহ্‌রী খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে। সেহ্‌রী না খেতে পারায় রোযা না রাখা অত্যন্ত পাপ।

* সেহ্‌রী-র সময় আছে বা নেই নিয়ে সন্দেহ হলে সেহ্‌রী না খাওয়া উচিত। এরূপ সময়ে খেলে রোযা কাযা করা ভাল। আর যদি পরে নিশ্চিত- ভাবে জানা যায় যে, তখন সেহ্‌রীর সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব।

* সেহ্‌রীর সময় আছে মনে করে পানাহার করল অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সেহ্‌রীর সময় ছিল না, তাহলে রোযা হবে না; তবে সারাদিন তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং রমযানের পর ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

* বিলম্বে সেহ্‌রী খাওয়া উত্তম। আগে খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সেহ্‌রী করার ফযীলত অর্জিত হবে।

## ইফ্‌তার-এর মাসায়েল

* সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মোস্তাহাব। বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ।

* মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা ভাল। মেঘের দিনে ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরে সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত ছবর করা ভাল। শুধু ঘড়ি বা আযানের উপর নির্ভর করা ভাল নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে পারে।

* সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত ইফতার করা দুরস্ত নেই।

* সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার করা, তারপর কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা, তারপর পানি দ্বারা।

* লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম–এই আকীদা ভুল।

* ইফতার করার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে। দুআ পাঠ করা মোস্তাহাব।

**اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.** (رواه أبو داود مرسلا)

* ইফতার করার পর নিম্নের দুআ পাঠ করবে।



**ذَهَبَ الظَّمَآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ.** (أبو داود والنسائي)

* ইফতার–এর সময় দুআ কবূল হয়, তাই ইফতারের পূর্বে বা কিছু ইফতার করে বা ইফতার থেকে সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে দুআ করা মোস্তাহাব। (جواہر الفتاوی ১/□□)

* পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুব্‌হে সাদেক থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূর্যাস্ত ঘটলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও সূর্যাস্ত না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে নিবে। (احسن الفتاوی ج/٤)

* পূর্ব দিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সূর্যাস্ত পাবে তখনই ইফতার করবে।

## যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না

১। মেসওয়াক করা। যে কোন সময় হোক, কাঁচা হোক বা শুষ্ক।
২। শরীর বা মাথা বা দাড়ি গোঁপে তেল লাগানো।
৩। চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষুধ দেয়া। (احسن الفتاوی)
৪। খুশবু লাগানো বা তার ঘ্রাণ নেয়া।
৫। ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বা স্ত্রী সম্ভোগ করা।
৬। গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা বারবার কুলি করা।
৭। অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোঁয়া, ধুলাবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা।
৮। কানে পানি দেয়া বা অনিচ্ছাবশত চলে যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না, তবে ইচ্ছাকৃত দিলে সতর্কতা হল সে রোযা কাযা করে নেয়া। (جواہر الفتاوی)
৯। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া। ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরূহ হয় না, তবে এরূপ করা ঠিক নয়।
১০। স্বপ্ন দোষ হওয়া।
১১। মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা।
১২। যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা লাগানো। (جواہر الفتاوی) তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না হয়– এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা স্যালাইন লাগানো মাকরূহ। (جواہر الفتاوی)
১৩। রোযা অবস্থায় দাঁত উঠালে এবং রক্ত পেটে না গেলে।
১৪। পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং গালার মধ্যে যায় তার কারণে। (فتاوی رحیمیہ ৩/□□)

১৫। সাপ ইত্যাদিতে দংশন করলে। (৩/□□ فتاوی محمودیہ)

১৬। পান খাওয়ার পর ভালভাবে কুলি করা সত্ত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায়।

১৭। শাহওয়াতের সাথে শুধু নজর করার কারণেই যদি বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে রোযা ফাসেদ হয় না।

১৮। রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের সাহায্যে রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মত দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে মাকরূহও হয় না। (٤/□□ احسن الفتاوی)

## যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায়

১। বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো।

২। তরকারী ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলা দেয়া। তবে কোনো চাকরের মুনিব বা কোনো নারীর স্বামী বদ-মেজাজী হলে জিহবার অগ্রভাগ দিয়ে লবণ চেখে তা ফেলে দিলে এতটুকুর অবকাশ আছে।

৩। কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা টুথপেষ্ট ব্যবহার করা মাকরূহ। আর এর কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (١/□□ جواہر الفتاوی)

৪। গোসল ফরয– এ অবস্থায় সারাদিন অতিবাহিত করা।

৫। কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেয়া। (١/□□ جواہر الفتاوی)

৬। গীবত করা, চোগলখোরী করা, অনর্থক কথাবার্তা বলা, মিথ্যা বলা।

৭। ঝগড়া-ফ্যাসাদ করা, গালি-গালাজ করা।

৮। ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা।

৯। মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে ফেলা।

১০। দাঁতে ছোলা বুটের চেয়ে ছোট কোনো বস্তু আঁটকে থাকলে তা বের করে মুখের ভিতরে থাকা অবস্থায় গিলে ফেলা।

১১। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না– এরূপ মনে হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে ক্ষতি নেই, তবে যুবকদের এহেন অবস্থা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আর রোযা অবস্থায় স্ত্রীর ঠোঁট মুখে নেয়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ।

১২। নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোনো বস্তু শিশুর মুখে দেয়া। তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ করলে অসুবিধা নেই।



১৩। পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধৌত করা যে, ভিতরে পানি পৌঁছে যাওয়ার সন্দেহ হয়– এরূপ করা মাকরূহ। আর প্রকৃতপক্ষে পানি পৌঁছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ জন্য রোযা অবস্থায় পানি দ্বারা ধৌত করার পর কোনো কাপড় দ্বারা বা হাত দ্বারা পানি পরিষ্কার করে ফেলা নিয়ম।

১৪। ঠোটে লিপিষ্টিক লাগালে যদি মুখের ভিতর চলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তা মাকরূহ।

## যেসব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

১। কানে বা নাকে ওষুধ দিলে।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প বমি আসার পর তা গিলে ফেললে।

৩। কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালীতে পানি চলে গেলে।

৪। স্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ প্রভৃতি করার কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে।

৫। এমন কোন জিনিস খেলে যা সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমনঃ কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি।

৬। বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা সেবন করলে।

৭। আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা হলকে পৌছালে।

৮। ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পানাহার করলে।

৯। রাত আছে মনে করে সুব্হে সাদেকের পরে সেহ্রী খেলে।

১০। ইফতারীর সময় হয়নি, দিন রয়ে গেছে অথচ সময় হয়ে গেছে -এই মনে করে ইফতারী করলে।

১১। দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে।

১২। দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালীর নিচে চলে যায়।

১৩। কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে।

১৪। দাঁতে কোনো খাদ্য-টুকরো আঁটকে ছিল, সুব্হে সাদেকের পর তা যদি পেটে চলে যায়, তবে সে টুকরো ছোলা বুটের চেয়ে ছোট হলে রোযা

ভেঙ্গে যায় না, তবে এরূপ করা মাকরূহ। কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর গিলে ফেললে তা যতই ছোট হোক না কেন রোযা কাযা করতে হবে।

১৫। হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয়।

১৬। পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যোনিতে কোনো ওষুধ প্রবেশ করালে।

১৭। পানি বা তেল দ্বারা ভিজা আঙ্গুল যোনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে।

১৮। শুকনো আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পুরোটা বা কিছুটা বের করে আবার প্রবেশ করালে। আর যদি শুকনো আঙ্গুল একবার প্রবেশ করিয়ে একবারেই পুরোটা বের করে নেয়– আবার প্রবেশ না করায়, তাহলে রোযার অসুবিধা হয় না।

১৯। মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ অবস্থায় সুব্‌হে সাদেক হয়ে গেলে।

২০। নস্যি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে।

২১। কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

২২। স্ত্রীর বেহুঁশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে ঐ স্ত্রীর উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

২৩। রমযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

২৪। এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের দেশের হিসাবে যে কয়টা রোযা বাদ গিয়েছে তার কাযা করতে হবে। আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দু'টো বেড়ে যায় তাহলে সেই এক দু'টো রাখতে হবে।

## যেসব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা, কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়

১। রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।

২। রোযার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে। স্ত্রীর উপরও কাযা কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। স্ত্রী যোনির মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করালেই কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩। রোযার নিয়ত করার পর (পাপ হওয়া সত্ত্বেও) যদি পুরুষ তার পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করায় এবং অগ্রভাগ ভিতরে প্রবেশ করে (চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক), তাহলেও পুরুষ স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।



৪। রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করল –যেমনঃ স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল দিল– তা সত্ত্বেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট হয়ে গিয়েছে; আর তার পরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

## যেসব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

১। যদি কেউ শরীআতসম্মত সফরে থাকে তাহলে তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে; পরে কাযা করে নিতে হবে। কিন্তু সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে রোযা রাখাই উত্তম। আর যদি কোনো ব্যক্তি রোযা রাখার নিয়ত করার পর সফর শুরু করে, তাহলে সে দিনের রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়, রাখা জরুরি।

২। কোনো রোগী ব্যক্তি রোযা রাখলে যদি তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় অথবা অন্য কোনো নতুন রোগ দেখা দেয়ার আশংকা হয় অথবা রোগ মুক্তি বিলম্বিত হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে। তবে অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছাড়তে হলে কোনো দ্বীনদার পরহেযগার চিকিৎসকের পরামর্শ থাকা শর্ত, কিংবা নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে হবে, শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হয়ে আশংকাবোধ করে রোযা ছাড়া দুরস্ত হবে না। তাহলে কাযা কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। (بہشتی زیور)

৩। রোগ মুক্তির পর যে দুর্বলতা থাকে তখন রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা হয়, তাহলে তখন রোযা না রাখার অনুমতি আছে, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৪। গর্ভবতী বা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীলোক রোযা রাখলে যদি নিজের জীবনের ব্যাপারে বা সন্তানের জীবনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে বা রোযা রাখলে দুধ শুকিয়ে যাবে আর সন্তানের সমূহ কষ্ট হবে– এরূপ নিশ্চিত হয়, তাহলে তার জন্য তখন রোযা ছাড়া জায়েয, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৫। হায়েয-নেফাস অবস্থায় রোযা ছেড়ে দিতে হবে এবং পবিত্র হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে।

## যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে

১। যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে। পরে কাযা করে নিতে হবে।

২। যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় যে, ওষুধ-পত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা ত্যাগ করতে হয়, তাহলেও অনুরূপ মাসআলা।

৩। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তাহলেও অনুরূপ মাসআলা।

৪। বেহুঁশ বা পাগল হয়ে গেলেও অনুরূপ মাসআলা।

* উল্লেখ্য যে, এসব অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেয়া হবে তার কাযা করে নিতে হবে।

* কেউ যদি অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো কাজ করতে পারে, তা সত্ত্বেও সে টাকার লোভে রোদে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল কিংবা বিনা অপারগতায় আগুনের কাছে যাওয়ার কারণে পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই।

## রমযান মাসের সম্মান রক্ষার মাসায়েল

* রমযান মাসে দিনের বেলায় লোকদের পানাহারের উদ্দেশ্যে হোটেল রেস্তোরা প্রভৃতি খাবার দোকান খোলা রাখা রমযানের অবমাননা বিধায় তা পাপ। অন্য ধর্মাবলম্বী বা মাযূর ব্যক্তিদের খাতিরে খোলা রাখার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। (২/□□ فتاوی رحیمیة)

* কোন কারণবশত রোযা ভেঙ্গে গেলেও বাকি দিনটুকু পানাহার পরিত্যাগ করে রোযাদারের ন্যায় থাকা ওয়াজিব। (বেহেশতী জেওর)

* দুর্ভাগ্যবশত কেউ যদি রোযা না রাখে তবুও অন্যের সামনে পানাহার করা বা প্রকাশ করা যে, আমি রোযা রাখিনি– এতে দ্বিগুণ পাপ হয়, প্রথম হল রোযা না রাখার পাপ, দ্বিতীয় হল গোনাহ প্রকাশ করার পাপ।

## রোযার কাযার মাসায়েল

* রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রমযানের পর যথাশীঘ্র কাযা করে নিতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা গোনাহ।



* কাযা রোযার জন্যে সুব্হে সাদেকের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে, অন্যথায় কাযা রোযা সহীহ হবে না। সুব্হে সাদেকের পর নিয়ত করলে সে রোযা নফল হয়ে যাবে।

* ঘটনাক্রমে একাধিক রমযানের কাযা রোযা একত্র হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে যে, আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা আদায় করছি।

* যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে রাখা মোস্তাহাব। বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত আছে।

* কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রমযান এসে গেলে তখন ঐ রমযানের রোযাই রাখতে হবে। কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে।

## রোযার কাফ্ফারা-র মাসায়েল

* একটি রোযার কাফ্ফারা ৬০টি রোযা (একটি কাযা বাদেও)। এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে হবে। মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ ৬০টি একাধারে রাখতে হবে। এই ৬০ দিনের মধ্যে নেফাস বা রমযানের মাস এসে যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফ্ফারা আদায় হবে না।

* কাফ্ফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য, বৎসরে পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম। সেই পাঁচ দিন হল– ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন ও ঈদুল আযহার দিনের পরের তিন দিন।

* কাফ্ফারার রোযা রাখার মধ্যে হায়েযের দিন (নেফাসের নয়) এসে গেলেও যে কয়দিন সে হায়েযের কারণে বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই।

* কাযা রোযার ন্যায় কাফ্ফারার রোযার নিয়তও সুব্হে সাদেকের পূর্বে হওয়া জরুরি।

* একই রমযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে কাফ্ফারা একটাই ওয়াজিব হবে। দুই রমযানের ছুটে গেলে দুই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

* কাফ্ফারা বাবত বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার সামর্থ না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে– এমন ৬০ জন মিসকীনকে (অথবা এক জনকে ৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে অথবা সদকায়ে ফিত্র-য়ে যে পরিমাণ গম বা তার মূল্য দেয়া হয় প্রত্যেককে সে পরিমাণ দিতে হবে। এই গম ইত্যাদি বা মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০

দিনেরটা এক দিনেই দিয়ে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। তাতে মাত্র এক দিনের কাফ্ফারা ধরা হবে।

* ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেয়ার মাঝে ২/১ দিন বিরতি গেলে ক্ষতি নেই।

## রোযার ফেদিয়ার মাসায়েল

* "ফেদিয়া" অর্থ ক্ষতিপূরণ। রোযা রাখতে না পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাকে ফেদিয়া বলে। প্রতিটা রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক রোযার ফেদিয়া। (ফিতরা–এর পরিমাণ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২৮২ পৃষ্ঠা)

* যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে– জীবদ্দশায় আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছগণ তার রোযার ফেদিয়া আদায় করবে। মৃত ব্যক্তি ওছিয়াত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ফেদিয়া আদায় করা হবে। আর ওছিয়াত না করে থাকলেও যদি ওয়ারিছগণ নিজেদের মাল থেকে ফেদিয়া আদায় করে দেয়, তবুও আশা করা যায় আল্লাহ তা কবূল করবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

* অতি বৃদ্ধ/বৃদ্ধা রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদী রোগ হলে এবং সুস্থ হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা রাখায় ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফেদিয়া আদায় করার অনুমতি আছে। তবে এরূপ বৃদ্ধ/বৃদ্ধা বা এরূপ রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফেদিয়া দান করেছিল তার ছওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে।

## নফল রোযার মাসায়েল

* পাঁচদিন ব্যতীত সারা বৎসরে যেকোনো দিন নফল রোযা রাখা যায়। উক্ত পাঁচ দিন হল– ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন ও ঈদুল আযহার দিনের পরের তিন দিন অর্থাৎ, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিলহজ্জ। এই পাঁচ দিন যে কোনো রোযা রাখা হারাম।

* যে ব্যক্তি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩ই, ১৪ই, ও ১৫ই তারিখে নফল রোযা রাখল, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখল। (বোখারী ও মুসলিম) এটাকে 'আইয়্যামে বীযের রোযা' বলে।



* প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল রোযা রাখতেন। (رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب) এতেও অনেক ছওয়াব আছে।

* বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে।

* নফল রোযা শুরু করলে সেটা পুরো করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই নফল রোযার নিয়ত করার পর সেটা ভাঙ্গলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

* স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা দুরস্ত নয়। রাখলে স্বামী হুকুম করলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং পরে কাযা করে নিতে হবে।

* মেহমান যদি একা খেতে মনে কষ্ট পায়, তাহলে তার খাতিরে মেযবান (বাড়ীওয়ালা) নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ভাঙলে পরে কাযা করে নিতে হবে। তবে এই ভাঙ্গার অনুমতি সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত। (عمدة الرعاية)

## মানতের রোযার মাসায়েল

* যদি কেউ আল্লাহ্‌র নামে রোযা রাখার মানত করে তাহলে সেই রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোনো শর্তের ভিত্তিতে মানত মানলে সেই শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না– শর্ত পূরণ হলেই ওয়াজিব হয়।

* কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মানত করলে এবং সেই দিন রোযা রাখলে রাতেই নিয়ত করা জরুরি নয়, দুপুরের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা দুরস্ত আছে।

* কোনো নির্দিষ্ট দিনের রোযা রাখার মানত করলে এবং সেই দিন সে রোযা রাখলে মানতের রোযা বলে নিয়ত করুক বা শুধু রোযা বলে নিয়ত করুক বা নফল বলে নিয়ত করুক মানতের রোযাই আদায় হবে। তবে কাযা রোযার নিয়ত করলে কাযাই আদায় হবে– মানতের রোযা আদায় হবে না।

* কোনো দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মানত না করলে যেকোনো দিন সে মানতের রোযা রাখা যায়। এরূপ মানতের রোযার নিয়ত সুব্‌হে সাদেকের পূর্বেই হওয়া শর্ত।

* কোনো নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখার মানত করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখে বা মাসে রোযা রাখাই জরুরি নয়– অন্য যেকোনো সময় রাখলেও চলবে।

* যদি এক মাস রোযা রাখার মানত করে তাহলে পুরো এক মাস লাগাতার রোযা রাখতে হবে।

* যদি কয়েক দিন রোযা রাখার মানত করে তাহলে একত্রে রাখার নিয়ত না থাকলে সে কয়দিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখলেও চলবে। আর একত্রে রাখার নিয়ত করলে একত্রেই রাখতে হবে।

## সুন্নাত এ'তেকাফ (রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ) এর মাসায়েল

* এ'তেকাফ অর্থ স্থির থাকা, অবস্থান করা। পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছওয়াবের নিয়তে মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও স্থির থাকাকে এ'তেকাফ বলে।

* রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া, অর্থাৎ, বড় গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে কেউ কেউ এ'তেকাফ করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নাত তরকের জন্য দায়ী হবে।

* রমযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এ'তেকাফের সময়।

## এ'তেকাফের শর্তসমূহ

এ'তেকাফের জন্য তিনটি শর্ত। যথা:

(১) এমন মসজিদে এ'তেকাফ হতে হবে যেখানে নামাযের জামাআত হয়। জুমুআ-র জামাআত হোক বা না হোক। এ শর্ত পুরুষদের এ'তেকাফের ক্ষেত্রে। মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে এ'তেকাফ করবে।

(২) এ'তেকাফের নিয়ত করতে হবে।

(৩) হায়েয নেফাস শুরু হলে এ'তেকাফ ছেড়ে দিবে।

## যেসব কারণে এ'তেকাফ ফাসেদ তথা নষ্ট হয়ে যায় এবং কাযা করতে হয়

(১) স্ত্রী সহবাস করলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যায়, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। চুম্বন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে এ'তেকাফ বাতিল হয় না, তবে এ'তেকাফের অবস্থায় তা করা হারাম।



(২) এ'তেকাফের স্থান থেকে শরীআতসম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। শরীআতসম্মত প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়; যেমন: সে মসজিদে জুমুআর জামাআত না হলে জুমুআর নামাযের জন্য জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয বা সুন্নাত গোসলের জন্য বের হওয়া ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনেও বের হওয়া যায়; যেমন: পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া, খাদ্য-খাবার এনে দেয়ার লোক না থাকলে তা আনার জন্য বের হওয়া, মসজিদের ভিতর উযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং পানি দেয়ার কেউ না থাকলে উযুর পানির জন্য বাইরে যাওয়া।

* যে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার পর সত্বর ফিরে আসবে, বিনা প্রয়োজনে কারও সঙ্গে কথা বলবে না।

* গোসল ফরয হওয়া ছাড়াও আমরা শরীর ঠাণ্ডা করার নিয়তে বা শরীর পরিষ্কার করার নিয়তে সাধারণত যে গোসল করে থাকি, শুধু এরূপ গোসলেরই উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। তবে কাউকে বলে যদি পথের মধ্যে পানির ব্যবস্থা করে রাখে বা পুকুর ইত্যাদি থাকে আর পেশাব-পায়খানা থেকে ফেরার পথে অতিরিক্ত সময় না লাগিয়ে জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢেলে বা ডুব দিয়ে গোসল সেরে চলে আসে, তাহলে এ'তেকাফের ক্ষতি হবে না।

## এ'তেকাফের অবস্থায় যেসব জিনিস মাকরূহ

১. এ'তেকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে ছওয়াব হয় এই মনে করে চুপ থাকা মাকরূহ তাহরীমী।
২. বিনা জরুরতে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ তাহরীমী। যেমন: ক্রয়-বিক্রয় করা ইত্যাদি। তবে নেহায়েত জরুরত হলে যেমন: ঘরে খোরাকী নেই এবং সে ব্যতীত কোনো বিশ্বস্ত লোকও নেই– এরূপ অবস্থায় মসজিদে মাল-পত্র উপস্থিত না করে কেনা-বেচার চুক্তি করতে পারে।

## এ'তেকাফের মোস্তাহাব ও আদবসমূহ

১. এ'তেকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করবে। সর্বোত্তম মসজিদ হল মসজিদুল হারাম, তারপর মসজিদে নববী, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস, তারপর যে জামে মসজিদে জামাআতের এন্তেজাম আছে, তারপর মহল্লার মসজিদ, তারপর যে মসজিদে বড় জামাআত হয়।

২. নেক কথা ব্যতীত অন্য কথা না বলা।

৩. বেকার বসে না থেকে নফল নামায, তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকা উত্তম।

* এ'তেকাফে খাস কোন ইবাদত করা শর্ত নয়– যে কোনো নফল নামায, যিকির-আযকার, তিলাওয়াত, দ্বীনী কিতাব পড়া, পড়ানো বা যে ইবাদত মনে চায় করতে পারে।

* এ'তেকাফ শুরু করার পর নিজের বা অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনন্যোপায় অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান থেকে বের হলে গোনাহ নেই বরং তা জরুরি, তবে তাতে এ'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে।

* কোনো শরীআতসম্মত প্রয়োজনে বা স্বাভাবিক প্রয়োজনে বের হলে ইত্যবসরে কোনো রোগী দেখলে বা জানাযায় শরীক হলে তাতে কোনো দোষ নেই।

* পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ'তেকাফে বসা অথবা বসানো উভয়টা না-জায়েয ও গোনাহ। (১/[illegible] جواہر الفتاوی)

* মহিলাদের জন্য মসজিদে এ'তেকাফ করা মাকরূহ তাহরীমী। তারা ঘরে এ'তেকাফ করবে। স্বামী মওজুদ থাকলে এ'তেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্বামীর খেদমতের প্রয়োজন থাকলে এ'তেকাফে বসবে না। শিশুর তত্ত্বাবধান ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজন থাকলে এ'তেকাফে না বসাই সমীচীন। মহিলাগণ নির্দিষ্ট কোন কামরায় বা ঘরের কোণে এক স্থানে পর্দা ঘিরে এ'তেকাফে বসবে। মহিলাদের জন্য এ'তেকাফের অন্যান্য মাসায়েল পুরুষদেরই ন্যায়।

### ওয়াজিব এ'তেকাফ (মানতের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল

* এ'তেকাফের মানত করলে এ'তেকাফ ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোন শর্তের ভিত্তিতে মানত করলে (যেমন: আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে এ'তেকাফ করব ইত্যাদি) শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না।

* ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত। যখনই এ'তেকাফ করবে রোযাও রাখতে হবে।

* ওয়াজিব এ'তেকাফ কমপক্ষে একদিন হতে হবে। বেশি দিনের নিয়ত করলে তা-ই করতে হবে।

* যদি শুধু এক দিনের এ'তেকাফের মানত করে, তাহলে তার সঙ্গে রাত শামেল হবে না। তবে যদি রাত দিন উভয়ের নিয়ত করে বা একত্রে



কয়েক দিনের মানত করে তাহলে রাতও শামেল হবে। দিন বাদে শুধু রাতে এ'তেকাফের মানত হয় না।

* উপরোল্লিখিত মাসায়েল ব্যতীত সুন্নাত এ'তেকাফের ক্ষেত্রে যেসব মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, ওয়াজিব এ'তেকাফের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রয়োজ্য।

### মোস্তাহাব/নফল এ'তেকাফের মাসায়েল

* সুন্নাত এ'তেকাফ (রমযানের পূর্ণ শেষ দশক) ও ওয়াজিব এ'তেকাফ ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো সময়ের এ'তেকাফের জন্য কোনো পরিমাণ সময় নির্ধারিত নেই– সামান্য সময়ের জন্যও তা হতে পারে।

* যেসব জিনিস দ্বারা এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যায় এবং কাযা করতে হয় সেসব দ্বারা মোস্তাহাব এ'তেকাফও নষ্ট হয়ে যাবে। তবে মোস্তাহাব এ'তেকাফের জন্য যেহেতু সময়ের পরিমাণ নির্ধারিত নেই, তাই তার কাযাও নেই।

## যাকাতের মাসায়েল

### কোন্ কোন্ অর্থ/সম্পদ কি পরিমাণ থাকলে যাকাত ফরয হয়

* যদি কারও নিকট শুধু সোনা থাকে– রুপা, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা[১] বা তার বেশি (সোনা) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

* যদি কারও নিকট শুধু রুপা থাকে- সোনা, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (রুপা) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

* যদি কারও নিকট কিছু সোনা থাকে এবং তার সাথে কিছু রুপা বা কিছু টাকা-পয়সা বা কিছু ব্যবসায়িক পণ্য থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সোনার সাড়ে সাত তোলা বা রুপার সাড়ে বায়ান্ন তোলা দেখা হবে না বরং সোনা, রুপা এবং টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য যা কিছু আছে সবটা মিলে যদি সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার যেকোনো একটার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে (বৎসরান্তে) তার উপর যাকাত ফরয হবে।

১. বর্তমান গ্রামের হিসাবে এক তোলা তথা এক ভরি = ১১. ৬৬৫ গ্রাম।

* যদি কারও নিকট শুধু টাকা-পয়সা থাকে– সোনা, রুপা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছু না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার যেকোনো একটার মূল্যের সমপরিমাণ (টাকা-পয়সা) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* কারও নিকট সোনা, রুপা ও টাকা-পয়সা কিছুই নেই শুধু ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে, তাহলে উপরোক্ত পরিমাণ সোনা বা রুপার যেকোনো একটার মূল্যের সমপরিমাণ থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* কারও নিকট সোনা, রুপা নেই শুধু টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে, তাহলে টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য মিলিয়ে যদি উক্ত পরিমাণ সোনা বা রুপার যেকোনো একটার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

## যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

* আকেল (বুদ্ধিসম্পন্ন) বালেগ, ছাহেবে নেছাব মুসলমানের উপর বৎসরে একবার যাকাত আদায় করা ফরয। যে পরিমাণ অর্থের উপর যাকাত ফরয হয় তাকে বলে 'নেছাব' আর এ পরিমাণ অর্থের মালিককে বলা হয় 'ছাহেবে নেছাব'। গরীব, পাগল ও না-বালেগের সম্পত্তিতে যাকাত ফরয হয় না।

* নেছাব পরিমাণ অর্থের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হয়। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যাকাত ফরয হয় না। যাকাতের ক্ষেত্রে ইংরেজি বা বাংলা নয় বরং চান্দ্র বৎসরের হিসাব করতে হবে।

* অর্থ সম্পদের প্রত্যেকটা অংশের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং শুধু নেছাব পরিমাণের উপর বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। কাজেই বৎসরের শুরুতে যে পরিমাণ ছিল (নেছাবের চেয়ে কম না হওয়া চাই) বৎসরের শেষে যদি তার চেয়ে পরিমাণ বেশি দেখা দেয় তাহলে ঐ বেশি পরিমাণের উপরও যাকাত ফরয হবে। এখানে দেখা গেল ঐ বেশি পরিমাণ –যেটা বৎসরের মাঝে যোগ হয়েছে– তার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া সত্ত্বেও তার উপর যাকাত আসছে।

* কেউ যদি বৎসরের শুরুতে মালেকে নেছাব হয় এবং বৎসরের শেষেও মালেকে নেছাব থাকে, মাঝখানে কিছু কম হয়ে যায় (নেছাবের



ন্যুনতম পরিমাণের চেয়ে কমে গেলেও) তাহলে বৎসরের শেষে তার নিকট যে পরিমাণ থাকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে মাঝখানে যদি এমন হয়ে যায় যে, মোটেই অর্থ-সম্পদ না থাকে, তাহলে পূর্বের হিসাব বাদ যাবে। পুনরায় যখন নেছাবের মালিক হবে তখন থেকে নতুন হিসাব ধরা হবে এবং তখন থেকেই বৎসরের শুরু ধরা হবে।

## যেসব অর্থ/সম্পদের যাকাত আসে না

* ব্যবসায়িক পণ্য ছাড়া ঘরে যে আবসাব-পত্র, কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল, ফ্রিজ, আলমারি, শোকেজ, পড়ার বই ইত্যাদি থাকে তার উপর যাকাত আসে না।

* থাকা বা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে যে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করা হয় বা ক্রয় করা হয় কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে যে জমি ক্রয় করা হয় সে ঘর-বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর যাকাত আসে না। তবে ব্যবসা/বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর যাকাত আসে।

* কারও কারখানা থাকলে এবং উক্ত কারখানায় কোন উৎপাদন হলে সে উৎপানের কাজে যে মেশিন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়, মিল- ফ্যাক্টরীতে যে গাড়ী ও যানবাহন ব্যবহৃত হয়, তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না বরং যাকাত আসে উৎপাদিত মালামাল ও ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর।

* রিকশা, বেবী, টেম্পু, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি যা ভাড়ায় খাটানো হয় অথবা যা দিয়ে উপার্জন করা হয়, তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। অবশ্য এসব যানবাহনই যদি কেউ ব্যবসার (বিক্রয়ের) উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

* পেশাজীবীরা তাদের পেশার কাজ চালানোর জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ও আসবাব-পত্র ব্যবহার করে থাকে, তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। যেমনঃ কৃষকের ট্রাক্টর, ইলেকট্রিশিয়ানদের ড্রিল মেশিন ইত্যাদি।

* যদি কারও নিকট ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হীরা, মণি, মুক্তা, ডায়মন্ড ইত্যাদির অলংকার থাকে, তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। তবে এরূপ নিয়তে রাখা হলে যে, এটা একটা সঞ্চয়– প্রয়োজনের মুহূর্তে বিক্রি করে নগদ অর্থ অর্জন করা যাবে– এরূপ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। (جواہر الفتاوی ١/□□)

* প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ হাতে পাওয়ার পূর্বে তার উপর যাকাত আসে না। তবে যে টাকাটা কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক নয় বরং চাকরিজীবী স্বেচ্ছায় কর্তন করায় তার উপর যাকাত আসবে। এটা হল সরকারী চাকরির প্রভিডেন্ট ফান্ডের মাসআলা। আর প্রাইভেট কোম্পানীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা হাতে পাওয়ার পূর্বেও তার যাকাত দিতে হবে। এমনিভাবে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও চাকরিজীবী যদি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় কোনো ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে অংশ নেয় তাহলেও তার যাকাত দিতে হবে। (احسن الفتاوى ج/٤)

* না-বালেগ ও পাগল–এর অর্থ/সম্পত্তিতে যাকাত আসে না।

## যাকাত হিসাব করার তরীকা ও মাসায়েল

* যে অর্থ/সম্পদে যাকাত আসে সে অর্থ/সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করা ফরয। মূল্যের আকারে নগদ টাকা দ্বারা বা তা দ্বারা কোনো আসবাব-পত্র ক্রয় করে তা দ্বারাও যাকাত দেয়া যায়।

* যাকাতের ক্ষেত্রে চন্দ্র মাসের হিসাবে বৎসর ধরা হবে। যখনই কেউ নেছাব পরিমাণ অর্থ/সম্পদের মালিক হবে তখন থেকেই তার যাকাতের বৎসর শুরু ধরতে হবে।

* সোনা রুপার মধ্যে যদি ব্রঞ্জ, রাং, দস্তা, তামা ইত্যাদি কোনো কিছুর মিশ্রণ থাকে আর সে মিশ্রণ সোনা রুপার চেয়ে কম হয়, তাহলে পুরোটাকেই সোনা রুপা ধরে যাকাতের হিসাব করা হবে– মিশ্রিত দ্রব্যের কোনো ধর্তব্য হবে না। আর যদি মিশ্রিত দ্রব্য সোনা রুপার চেয়ে অধিক হয়, তাহলে সেটাকে আর সোনা রুপা ধরা হবে না। বরং ঐ মিশ্রিত দ্রব্যই ধরা হবে।

* যাকাত হিসাব করার সময় অর্থাৎ, ওয়াজিব হওয়ার সময় সোনা, রুপা, বাবসায়িক পণ্য ইত্যাদির মূল্য ধরতে হবে তখনকার (ওয়াজিব হওয়ার সময়কার) বাজার দর হিসাবে এবং সোনা রুপা ইত্যাদি যে স্থানে রয়েছে সে স্থানের দাম ধরতে হবে। (احسن الفتاوى ٤/□□)

* শেয়ারের মূল্য ধরার ক্ষেত্রে মাসআলা হল– যারা কোম্পানীর লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করার উদ্দেশ্যে নয় বরং শেয়ার ক্রয় করেছেন শেয়ার বেচা-কেনা করে লাভবান হওয়া (Capital Gain)–এর উদ্দেশ্যে, তারা শেয়ারের বাজার দর (Market Value) ধরে যাকাত হিসাব করবেন। আর শেয়ার ক্রয় করার সময় যদি মূল উদ্দেশ্য থাকে কোম্পানী থেকে লভ্যাংশ (Divdend) অর্জন করা এবং সাথে সাথে এ উদ্দেশ্যও থাকে যে,



শেয়ারের ভাল দর বাড়লে বিক্রিও করে দিব, তাহলে যাকাত হিসাব করার সময় শেয়ারের বাজার দরের যে অংশ যাকাতযোগ্য অর্থ/সম্পদের বিপরীতে আছে তার উপর যাকাত আসবে, অবশিষ্ট অংশের উপর যাকাত আসবে না। উদাহরণ স্বরূপ শেয়ারের মার্কেট ভ্যালূ (বাজার দর) ১০০ টাকা, তার মধ্যে ৬০ ভাগ কোম্পানীর বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির বিপরীতে, আর ৪০ ভাগ কোম্পানীর নগদ অর্থ, কাঁচামাল ও তৈরী মালের বিপরীতে, তাহলে যাকাতের হিসাব করার সময় শেয়ারের বাজার দর অর্থাৎ, ১০০ টাকার ৬০ ভাগ বাদ যাবে। কেননা সেটা এমন অর্থ/সম্পদের বিপরীতে যার উপর যাকাত আসে না। অবশিষ্ট ৪০ ভাগের উপর যাকাত আসবে। (فقہی مقالات)

* যাকাতদাতার যে পরিমাণ ঋণ আছে সে পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে বাকিটার যাকাত হিসাব করবে। ঋণ পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে যদি যাকাতের নেছাব পূর্ণ না হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে না। তবে হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উছমানী সাহেব বলেছেন, যে লোন নিয়ে বাড়ি করা হয় বা যে লোন নিয়ে মিল ফ্যাক্টরী তৈরি করা হয় বা মিল ফ্যাক্টরীর মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়, এমনিভাবে যেসব লোন নিয়ে এমন কাজে নিয়োগ করা হয় যার মূল্যের উপর যাকাত আসে না –যেমন: বাড়ি ও ফ্যাক্টরী বা ফ্যাক্টরীর মেশিনারিজের মূল্যের উপর যাকাত আসে না– এসব লোন যাকাতের জন্য বাধা নয় অর্থাৎ, এসব লোনের পরিমাণ অর্থ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে না। হাঁ যে লোন নিয়ে এমন কাজে নিয়োগ করা হয় যার মূল্যের উপর যাকাত আসে; যেমন: লোন নিয়ে ফ্যাক্টরীর কাচামাল ক্রয় করল (এখানে কাঁচামালের মূল্যের উপর যাকাত আসে) এরূপ ক্ষেত্রে এ লোন পরিমাণ অর্থ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে। মুফতী তাকী উছমানী সাহেব এ মাসআলাটিকে শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন, অতএব তার মতটি গ্রহণ করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে।

* কারও নিকট যাকাতদাতার টাকা পাওনা থাকলে সে পাওনা টাকার যাকাত দিতে হবে। পাওনা তিন প্রকার। যথা: **(এক)** কাউকে নগদ টাকা ঋণ দিয়েছে কিংবা ব্যবসায়ের পণ্য বিক্রি করেছে এবং তার মূল্য বাকি রয়েছে। এরূপ পাওনা কয়েক বৎসর পর উসূল হলে যদি পাওনা টাকা এত পরিমাণ হয় যাতে যাকাত ফরয হয়, তাহলে অতীত বৎসরসমূহের যাকাত দিতে হবে। যদি একত্রে উসূল না হয়– ভেঙ্গে ভেঙ্গে উসূল হয়, তাহলে ১১

তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণ উসূল হলে তার যাকাত ওয়াজিব হবে না– তবে অল্প অল্প করে সেই পরিমাণে পৌছে গেলে তখন ওয়াজিব হবে। আর যখনই ওয়াজিব হবে তখন অতীত সকল বৎসরের যাকাত দিতে হবে। আর যদি এরূপ পাওনা টাকা নেছাবের চেয়ে কম হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। **(দুই)** নগদ টাকা ঋণ দেয়ার কারণে বা ব্যবসায়ের পণ্য বাকিতে বিক্রি করার কারণে পাওনা নয় বরং ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র, কাপড়-চোপড়, চাষাবাদের গরু ইত্যাদি বিক্রয় করেছে এবং তার মূল্য পাওনা রয়েছে, এরূপ পাওনা যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং কয়েক বৎসর পর উসূল হয় তাহলে ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দিতে হবে। আর যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উসূল হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ না হবে ততক্ষণ যাকাত ওয়াজিব হবে না। যখন উক্ত পরিমাণ উসূল হবে তখন বিগত বৎসরসমূহের যাকাত দিতে হবে। **(তিন)** মহরের টাকা, পুরস্কারের টাকা, খোলা তালাকের টাকা, বেতনের টাকা ইত্যাদি পাওনা থাকলে এরূপ পাওনা উসূল হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব হয় না। উসূল হওয়ার পর ১ বৎসর মজুদ থাকলে তখন থেকে তার যাকাতের হিসাব শুরু হবে। পাওনা টাকার যাকাত সম্পর্কে উপরোল্লিখিত বিবরণ শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে যখন এই টাকা ব্যতীত তার নিকট যাকাতযোগ্য অন্য কোনোঅর্থ/সম্পদ না থাকে। আর অন্য কোনো অর্থ/সম্পদ থাকলে তার মাসআলা উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিবেন।

* যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আসা নেই, এরূপ ঋণের উপর যাকাত ফরয হয় না। তবে পেলে বিগত সমস্ত বৎসরের যাকাত দিতে হবে।

* যৌথ কারবারে অর্থ নিয়োজিত থাকলে যৌথভাবে পূর্ণ অর্থের যাকাত হিসাব করা হবে না বরং প্রত্যেকের অংশের আলাদা আলাদা হিসাব হবে। (ইসলামী ফিকাহঃ ১ম)

* যেসব সোনা রুপার অলংকার স্ত্রীর মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় সেটাকে স্বামীর সম্পত্তি ধরে হিসাব করা হবে না বরং সেটা স্ত্রীর সম্পত্তি। আর যেসব অলংকার স্ত্রীকে শুধু ব্যবহার করতে দেয়া হয়, মালিক থাকে স্বামী, সেটা স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে ধরে হিসাব করা হবে। আর যেগুলোর মালিকানা অস্পষ্ট রয়েছে তা স্পষ্ট করে নেয়া উচিত। যেসব অলংকার স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ থেকে তৈরী বা যেগুলো বাপের বাড়ি থেকে অর্জন করে,



সেগুলো স্ত্রীর সম্পদ বলে গণ্য হবে। মেয়েকে যে অলংকার দেয়া হয় সেটার ক্ষেত্রেও মেয়েকে মালিক বানিয়ে দেয়া হলে সেটার মালিক সে। আর শুধু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেয়া হলে মেয়ে তার মালিক নয়। নাবালেগা মেয়েদের বিয়ে-শাদি উপলক্ষে তাদের নামে যে অলংকার বানিয়ে রাখা হয় বা নাবালেগ ছেলে কিংবা মেয়ের বিবাহ-শাদীতে ব্যয়ের লক্ষ্যে তাদের নামে ব্যাংকে বা ব্যবসায় যে টাকা লাগানো হয় সেটার মালিক তারা। অতএব সেগুলো পিতা/মাতার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না এবং পিতা/মাতার যাকাতের হিসাবে সেগুলো ধরা হবে না। আর বালেগ সন্তানের নামে শুধু অলংকার তৈরী করে রাখলে বা টাকা লাগালেই তারা মালিক হয়ে যায় না যতক্ষণ না সেটা সে সন্তানদের দখলে দেয়া হয়। তাদের দখলে দেয়া হলে তারা মালিক, অন্যথায় সেটার মালিক পিতা/মাতা। (جواہر الفتاوی ج۱/ وغیرہ)

* হিসাবের চেয়ে কিছু বেশি যাকাত দিয়ে দেয়া উত্তম। যাতে কোনো রূপ কম হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেটুকু যাকাত না হলেও তাতে দানের ছওয়াব তো হবেই।

## গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রাণীর যাকাত

* গরু, বলদ, মহিষ, ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতি প্রাণী ক্ষেত-খামারের কাজে বা গাড়ী টানার জন্য অথবা বোঝা বহনের নিমিত্তে প্রতিপালন করা হলে তার উপর যাকাত আসে না।

* গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণী ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করলে অর্থাৎ, ক্রয় করার সময় স্বয়ং ঐ প্রাণী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং সেগুলোর মূল্য যাকাতের হিসাবে আসবে। যাকাত আদায় করার দিন তার যে মূল্য সেই মূল্য ধরা হবে। ক্রয় করার সময় যদি বিক্রয়ের নিয়ত না থাকে পরে বিক্রয়ের নিয়ত হয় কিংবা মূলটা রেখে তার বাচ্চা বিক্রয়ের নিয়ত থাকে বা পরে এরূপ নিয়ত হয়, সেসব ক্ষেত্রে সেগুলো বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে না এবং তার উপর যাকাত আসবে না।

* গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ যদি দুধের জন্য অথবা বংশ বৃদ্ধির জন্য কিংবা শখবশত পালন করা হয়, তাহলে তাতে যাকাত আসে; তবে সেগুলোতে যাকাত আসার শর্ত হল সেগুলো 'সায়েমা' হতে হবে অর্থাৎ, সেগুলোর বেশির ভাগ সময়ের খাদ্য বা বেশির ভাগ খাদ্য নিজেদের দিতে হয় না বরং ময়দান জংগল ও চারণভূমির ঘাসপাতা ও তৃণলতা খেয়ে জীবন

ধারণ করে, তাহলে তার উপর যাকাত আসে। তবে এরূপ ছাগল, ভেড়া অন্তত ৪০টা এবং গরু, মহিষ ৩০টার কম হলে তার উপর যাকাত আসে না। সাধারণত আমাদের দেশে এরূপ গরু ছাগল ইত্যাদি পাওয়া যায় না, তাই তার যাকাতের পরিমাণ ও বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা থেকে বিরত রইলাম। আমাদের দেশের গরু মহিষের ফার্মে গরু মহিষকে নিজেরা খাদ্য দিতে হয় তাই সেগুলো সায়েমা নয়। অতএব দুধের উদ্দেশ্যে বা বংশ বৃদ্ধির জন্য সেগুলো পালন করলেও তার উপর যাকাত আসবে না।

* হাঁস, মুরগি যদি ডিমের উদ্দেশ্যে বা তার বাচ্চা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, তাহলে সেই হাঁস মুরগির উপর যাকাত আসে না। তবে হাঁস মুরগি বা তার বাচ্চা ক্রয়ের সময় যদি স্বয়ং সেটাকেই বিক্রি করার নিয়তে ক্রয় করা হয় তাহলে সেটা বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

* বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাছ চাষ করা হলে সেই মাছ বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

(ماخوز از احسن الفتاوی ج/٤)

## কোন্ কোন্ লোকদেরকে বা কোন্ কোন্ খাতে যাকাত দেয়া যায় না

নিম্নলিখিত লোকদেরকে বা নিম্নলিখিত খাতে যাকাত দেয়া যায় না, দিলে যাকাত আদায় হয় না।

১। যার নিকট নেছাব পরিমাণ অর্থ/সম্পদ আছে।

২। যারা সাইয়্যেদ অর্থাৎ, হাসানী, হুসাইনী, আলাবী, জা'ফরী ইত্যাদি।

৩। যাকাতদাতার মা, বাপ, দাদা, দাদী, পরদাদা, পরদাদী, পরনানা, পরনানী ইত্যাদি উপরের সিঁড়ি।

৪। যাকাতদাতার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি পোতা, পৌত্রী, ইত্যাদি নিচের সিঁড়ি।

৫। যাকাতদাতার স্বামী বা স্ত্রী।

৬। অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যায় না।

৭। যার উপর যাকাত ফরয হয়– এরূপ মালদার লোকদের নাবালেগ সন্তান।

৮। মসজিদ, মাদ্রাসা বা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতির নির্মাণ কাজের জন্য।

৯। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের জন্য বা মৃত ব্যক্তির ঋণ ইত্যাদি আদায়ের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না।



১০। রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপন কার্যে –যেখানে নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানানো হয় না সেখানে– যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না।

১১। সরকার যদি যাকাতের মাসআলা অনুযায়ী সঠিক খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করে, তাহলে সরকারের যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়া যাবে না।

১২। যাকাত দ্বারা মসজিদ মাদ্রসার স্টাফকে (গরীব হলেও) বেতন দেয়া যায় না।

## যে লোকদেরকে যাকাত দেয়া যায়

১। ফকীর অর্থাৎ, যাদের নিকট সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন সমাধা করার মত সম্বল নেই অথবা যাদের নিকট যাকাত ফেৎরা ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই।

২। মিসকীন অর্থাৎ, যারা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত অথবা যাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা নেই।

৩। ইসলামী রাষ্ট্র হলে তার যাকাত তহবিলের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ।

৪। যাদের উপর ঋণের বোঝা চেপেছে।

৫। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত।

৬। মুসাফির ব্যক্তি (বাড়িতে সম্পদশালী হলেও) সফরে রিক্ত হস্ত হয়ে পড়লে।

৭। যাকাতদাতার ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজী, ভগ্নিপতি, ভাগনা-ভাগনী, চাচা-চাচী, খালা-খালু, ফুপা-ফুফী, মামা-মামী, শ্বাশুড়ী, জামাই, সৎবাপ ও সৎমা ইত্যাদি (যদি এরা গরীব হয়)।

৮। নিজের গরীব চাকর-নওকর বা কর্মচারীকে দেয়া যায়। তবে এটা বেতন বাবদ কর্তন করা যাবে না।

## যাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম

১। দ্বীনী ইল্‌ম পড়নেওয়ালা এবং পড়ানেওয়ালা যদি যাকাতের হকদার হয়, তাহলে এরূপ লোককে যাকাত দেয়া সবচেয়ে উত্তম। (جواہر الفتاوی ج/١)

২। তারপর যাকাত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তারা।

৩। তারপর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তারা।

৪। তারপর যাকাতের অন্যান্য প্রকার হকদারগণ।

## যাকাত আদায় করার তরীকা ও মাসায়েল

* বৎসর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যাকাত আদায় করতে হবে। বিনা ওজরে বিলম্ব করলে পাপ হবে।

* যাকাত আদায় করার সময় নিয়ত করতে হবে যে, এ সম্পদ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যাকাত হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে, নতুবা যাকাত আদায় হবে না।

* নেছাবের মালিক হওয়ার পর বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও অর্থাৎ, যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেও অগ্রিম প্রদান করা যায়।

* যাকাত প্রদানের সময় গ্রহণকারীকে একথা জানানো প্রয়োজন নেই যে, এটা যাকাতের টাকা। আপনজনকে যাকাত দিলে তাকে একথা না বলাই শ্রেয়, কেননা বললে তার খারাপ লাগতে পারে।

* যে পরিমাণ টাকা থাকলে কারও উপর যাকাত ফরয হয়– এত পরিমাণ যাকাতের টাকা একজনকে দেয়া মাকরূহ। তবে ঋণী ব্যক্তির ঋণ-মুক্তির জন্য বা অধিক সন্তান-সন্ততিওয়ালাকে এত পরিমাণ দিলেও ক্ষতি নেই।

* যাকাত দেয়ার নিয়তে কোনো টাকা পৃথক করে রাখলে পরে দেয়ার সময় যাকাতের নিয়তের কথা মনে না আসলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

* যাকে যাকাত দিবে অন্তত এত পরিমাণ দিবে যেন ঐ দিনের খরচের জন্য সে আর অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। কমপক্ষে এত পরিমাণ দেয়া মোস্তাহাব, এর চেয়ে কম দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

* কারও নিকট টাকা পাওনা থাকলে যাকাতের নিয়তে সেই পাওনা মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না বরং তার নিকট যাকাতের টাকা দিয়ে পরে তার নিকট থেকে ঋণ পরিশোধ বাবদ সে টাকা নিয়ে নিলে যাকাতও আদায় হবে ঋণও উসূল হবে।

* যাকাতের টাকা নিজের হাতে গরীবদেরকে না দিয়ে অন্য কাউকে উকীল বানিয়ে তার দ্বারা দিলেও যাকাত আদায় হবে।

* যাকাত ফরয হওয়ার পর কেউ নিজের সমস্ত মাল দান করে দিলে তার যাকাত মাফ হয়ে যায়।

* যাকাতদাতার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না।

* যাকাতদাতা কাউকে পুরস্কার বা ঋণের নামে কিছু দিল আর অন্তরে নিয়ত রাখল যাকাত হতে দিলাম, তবুও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। মুখে যাকাত কথাটা বলার আবশ্যকতা নেই।



## সদকায়ে ফিতর/ফিতরা-এর মাসায়েল

* ঈদুল ফিতরের দিন সুব্‌হে সাদেকের সময় যার নিকট যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে তার উপর সদকায়ে ফিতর বা ফিতরা ওয়াজিব। তবে যাকাতের নেছাবের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাব-পত্র বা ঘরের মূল্য ইত্যাদি হিসাবে ধরা হয় না কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আসবাব-পত্র ব্যতীত অন্যান্য আসবাব-পত্র, সৌখিন দ্রব্যাদি, খালি ঘর বা ভাড়ার ঘর (যার ভাড়ার উপর জীবিকা নির্ভরশীল নয়) এসব কিছুর মূল্য হিসাবে ধরা হবে।

* রোযা না রাখলে বা রাখতে না পারলে তার উপরও ফিতরা দেয়া ওয়াজিব। এ কথা নয় যে, রোযা না রাখলে ফিতরাও দিতে হয়না।

* সদকায়ে ফিতর/ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে নিজের না-বালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব। বালেগ সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, চাকর-চাকরানী, মাতা-পিতা প্রমুখের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বালেগ সন্তান পাগল হলে তার পক্ষ থেকে দেয়া পিতার উপর ওয়াজিব।

* একান্নভুক্ত পরিবার হলে বালেগ সন্তান, মাতা, পিতার পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিতরা দেয়া মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। (বেহেশতী জেওর [বাংলা])

* সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব না হলেও সঙ্গতি থাকলে দেয়া মোস্তাহাব এবং অনেক ছওয়াবের কাজ। (প্রাগুক্ত)

* ফিতরায় ৮০ তোলার সেরের হিসাবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) গম বা আটা কিংবা তার মূল্য দিতে হবে। পূর্ণ দুই সের (১ কেজি ৮৬৬ গ্রাম) বা তার মূল্য দেয়া উত্তম।

* ফিতরায় যব দিলে ৮০ তোলার সেরের হিসাবে ৩ সের নয় ছটাক (প্রায় ৩ কেজি ৩২৫ গ্রাম) দিতে হবে। পূর্ণ ৪ সের (৩ কেজি ৭৩২ গ্রাম) দেয়া উত্তম।

* গম, আটা ও যব ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন ধান, চাউল, বুট, কলাই, মটর ইত্যাদি দ্বারা ফিতরা আদায় করতে চাইলে বাজার দরে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের যে মূল্য হয় সেই মূল্যের ধান চাউল ইত্যাদি দিতে হবে।

* ফিতরায় গম, যব ইত্যাদি শষ্য দেয়ার চেয়ে তার মূল্য– নগদ টাকা পয়সা দেয়া উত্তম।

* ফিতরা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই দিয়ে দেয়া উত্তম। নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দিলেও চলবে। ঈদের দিনের পূর্বে রমযানের মধ্যে দিয়ে দেয়াও দোরস্ত আছে।

* যাকে যাকাত দেয়া যায় তাকে ফিতরা দেয়া যায়।

* একজনের ফিতরা একজনকে দেয়া বা একজনের ফিতরা কয়েকজনকে দেয়া উভয়ই দুরস্ত আছে। কয়েকজনের ফিতরাও একজনকে দেয়া দুরস্ত আছে কিন্তু তার দ্বারা যেন সে মালেকে নেছাব না হয়ে যায়। অধিকতর উত্তম হল একজনকে এই পরিমাণ ফিতরা দেয়া, যার দ্বারা সে ছোট-খাট প্রয়োজন পূরণ করতে পারে বা পরিবার-পরিজন নিয়ে দু'তিন বেলা খেতে পারে।

## কুরবানী

### কুরবানীর ফযীলত

* কুরবানীর জন্তুর শরীরে যত পশম থাকে, প্রত্যেকটা লোমের বদলে এক একটি নেকী পাওয়া যায়। (মুসনাদে আহমদ)

* কুরবানী-র দিনে কুরবানী করাই সবচেয়ে বড় ইবাদত। (তিরমিযী)

### কাদের উপর কুরবানী দেয়া ওয়াজিব

* ১০ই যিলহজ্জের ফজর থেকে ১২ই যিলহজ্জের সন্ধা পর্যন্ত অর্থাৎ, কুরবানীর দিনগুলোতে যার নিকট সদকায়ে ফিতর/ফিতরা ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

* মুসাফিরের উপর (সফরের হালতে থাকলে) কুরবানী করা ওয়াজিব হয় না।

* কুরবানী ওয়াজিব না হলেও নফল কুরবানী করলে কুরবানীর ছওয়াব পাওয়া যাবে।

* কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়– সন্তানাদি, মাতা-পিতা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না, তবে তাদের পক্ষ থেকে করলে তা নফল কুরবানী হবে।

* যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় সে কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করলে সেই পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

* কোনো মকসূদের জন্য কুরবানীর মানত করলে সেই মকসূদ পূর্ণ হলে তার উপর (গরীব হোক বা ধনী) কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।



* যার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে কুরবানী না করলে কুরবানীর দিনগুলো চলে যাওয়ার পর একটা বকরীর মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

### কোন্ কোন্ জন্তু দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত আছে

* বকরী, পাঠা, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, গাভী, ষাড়, বলদ, মহিষ, উট– এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত।

### কুরবানী-র জন্তুর বয়স প্রসঙ্গ

* বকরী, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা কমপক্ষে পূর্ণ এক বৎসর বয়সের হতে হবে। তবে ভেড়া, ভেড়ী ও দুম্বার বয়স যদি কিছু কমও হয় কিন্তু এরূপ মোটা তাজা হয় যে, এক বৎসর বয়সীদের মধ্যে ছেড়ে দিলেও তাদের চেয়ে ছোট মনে হয় না, তাহলে তার দ্বারা কুরবানী দুরস্ত আছে তবে অন্তত ছয় মাস বয়স হতে হবে। বকরীর ক্ষেত্রে এরূপ ব্যতিক্রম নেই। বকরী কোনো অবস্থাতেই এক বৎসরের কম বয়সের হতে পারবে না।

* গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দুই বৎসর হতে হবে।

* উট–এর বয়স কম পক্ষে পাঁচ বৎসর হতে হবে।

### কুরবানীর জন্তুর স্বাস্থ্যগত অবস্থা প্রসঙ্গ

* কুরবানীর পশু ভাল এবং হৃষ্ট পুষ্ট হওয়া উত্তম।

* যে প্রাণী লেংড়া অর্থাৎ, যা তিন পায়ে চলতে পারে– এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা রাখতে পারলেও তার উপর ভর করতে পারে না, এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

* যে পশুর একটিও দাঁত নেই তা দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত নয়। তবে দাঁত না থাকা সত্ত্বেও ঘাস খেতে সক্ষম হলে তা দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত আছে। (العالمغيرية جـ/ ٥)

* যে পশুর কান জন্ম থেকেই নেই তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়। তবে কান ছোট হলে অসুবিধা নেই।

* যে পশুর শিং মূল থেকে ভেঙ্গে যায় তা দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত নয়। তবে শিং ওঠেইনি বা কিছু পরিমাণ ভেঙ্গে গিয়েছে এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত আছে।

* যে পশুর উভয় চোখ অন্ধ বা যার একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি এক তৃতীয়াংশের বেশি নষ্ট, তা দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত নয়। (العالمغيرية جـ/٥)

* যে পশুর একটি কান বা লেজের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি কেটে গিয়েছে তা দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত নয়। (العالمغيرية ج/ ٥)

* অতিশয় কৃশকায় ও দুর্বল পশু যার এতটুকু শক্তি নেই যে, জবেহের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে তা দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত নয়।

* ভাল পশু ক্রয় করার পর এমন দোষ ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার কারণে কুরবানী দুরস্ত হয় না– এরূপ হলে ঐ জন্তুটি রেখে আর একটি ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে সেটাই কুরবানী দিতে পারবে।

* গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তবে সে বাচ্চাও জবেহ করে দিবে। তবে প্রসবের নিকটবর্তী হলে সেরূপ গর্ববতী পশু কুরবানী দেয়া মাকরূহ।

* বন্ধা পশু কুরবানী করা জায়েয।

**শরীকের মাসায়েল এবং একটা পশুতে কয়জন শরীক হতে পারে?**

* বকরী, খাসী, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী ও দুম্বায় এক জনের বেশী শরীক হয়ে কুরবানী করা যায় না। এগুলো একটা একজনের নামেই কুরবানী হতে পারে।

* একটা গরু, মহিষ ও উটে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারে। সাতজন হওয়া জরুরি নয়– দুইজন বা তিনজন বা চারজন বা পাঁচজন বা ছয়জন কুরবানী দিতে পারে, তবে কারও অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারবে না।

* মৃতের নামেও কুরবানী হতে পারে।

* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বিবিগণ ও বুযুর্গদের নামেও কুরবানী হতে পারে।

* যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করে না বরং গোশ্‌ত খাওয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি নিয়তে কুরবানী করে, তাকে অংশীদার বানিয়ে কোন পশু কুরবানী করলে সকল অংশীদারের কুরবানী-ই নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীক নির্বাচনের সময় খুবই সতর্ক থাকা দরকার।

* কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় ক্রেতার শরীক রাখার এরাদা ছিল না, পরে শরীক গ্রহণ করতে চাইলে ক্রেতা গরীব হলে তা পারবে না, অন্যথায় পারবে।



* যার সমস্ত উপার্জন বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তাকে শরীক করে কুরবানী করলে অন্যান্য সকল শরীকের কুরবানী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। (احسن الفتاوى ۵/□□)

**কুরবানীর পশু জবেহ করা প্রসঙ্গ**

* নিজের কুরবানীর পশু নিজেই জবেহ করা উত্তম। নিজে জবেহ না করলে বা করতে না পারলে জবেহের সময় সামনে থাকা ভাল। মেয়েলোকের পর্দার ব্যাঘাত হওয়ার কারণে সামনে না থাকতে পারলে ক্ষতি নেই।

* কুরবানীর পশুকে মাটিতে শুইয়ে তার মুখ কেবলামুখী করে নিম্নের দুআ পাঠ করা উত্তম।

**اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَلْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.**

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে জবেহ করবে। কেউ দুআ পড়তে না পারলে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবেহ করলেও চলবে।

অতঃপর এই দুআ পড়া উত্তম–

**اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّ خَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.**

জবেহকারী যদি উক্ত পশুর কুরবানীদাতা না হয় তাহলে مِنِّيْ এর স্থলে مِنْهُ পড়বে। আর কুরবানীদাতা একাধিক হলে مِنِّيْ এর স্থলে مِنَّا বা مِنْهُ এর স্থলে مِنْهُمْ হবে।

* কুরবানীদাতা বা কুরবানীদাতাগণের নাম মুখে উচ্চারণ করা বা কাগজে লিখে পড়া জরুরি নয়। আল্লাহ পাক জানেন এটা কার কুরবানী। সে অনুযায়ীই সে কুরবানী গৃহীত হবে।

বি. দ্র. জবেহ করার মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫৮৭ পৃষ্ঠা।

* কুরবানীর পশু রাতের বেলায়ও জবেহ করা জায়েয তবে ভাল নয়।

* ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নয়। তবে যেখানে জুমুআ ও ঈদের নামায দুরস্ত নয় সেখানে সুব্‌হে সাদেকের পর থেকেই কুরবানী করা দুরস্ত আছে।

## গোশ্ত বণ্টনের তরীকা

* অংশীদারগণ সকলে একান্নভুক্ত হলে গোশত বণ্টনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় বন্টন করতে হবে।

* অংশীদারগণ গোশ্ত অনুমান করে বণ্টন করবে না বরং বাটখারা দিয়ে ওজন করে বণ্টন করতে হবে। অন্যথায় ভাগের মধ্যে কমবেশ হয়ে গেলে গোনাহগার হতে হবে। অবশ্য কোন অংশীদার মাথা, পায়া ইত্যাদি বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করলে তার ভাগে গোশত কিছু কম হলেও তা দুরস্ত হবে। কিন্তু যে ভাগে গোশ্ত বেশি সেভাগে মাথা পায়া ইত্যাদি বিশেষ অংশ দেয়া যাবে না।

* অংশীদারগণ সকলে যদি সম্পূর্ণ গোশত দান করে দিতে চায় বা সম্পূর্ণটা রান্না করে বিলাতে বা খাওয়াতে চায় তাহলে বণ্টনের প্রয়োজন নেই।

## কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া ও দান করার মাসায়েল

* কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, পরিবারবর্গকে খাওয়ানো, আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং গরীব-মিসকীনকে দেয়া সবই জায়েয। মোস্তাহাব ও উত্তম তরীকা হল তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজেদের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয়- স্বজনকে দেয়া এবং এক ভাগ গরীব-মিসকীনকে দান করা।

* মানতের কুরবানীর গোশত হলে নিজে খেতে পারবে না এবং মালদারকেও দিতে পারবে না, বরং পুরোটাই গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দেয়া ওয়াজিব।

* যদি কোনো মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কুরবানীর জন্য ওছিয়াত করে গিয়ে থাকে তবে সেই কুরবানীর গোশ্তও মানতের কুরবানীর গোশ্তের ন্যায় পুরোটাই খয়রাত করা ওয়াজিব।

* কুরবানীর গোশ্ত বা বিশেষ কোন অংশ (যেমন: মাথা) পারিশ্রমিক রূপে দেয়া জায়েয নয়।

* কুরবানীর গোশ্ত শুকিয়ে (বা ফ্রীজে রেখে) দীর্ঘ দিন খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। (فتاوى محمودية ٤/□□)

## কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কিত মাসায়েল

* কুরবানীর পশুর চামড়া শুকিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে নিজেও ব্যবহার করা জায়েয।



* কুরবানীর চামড়া খয়রাতও করা যায় তবে বিক্রি করলে সে টাকা নিজে ব্যবহার করা যায় না– খয়রাতই করা জরুরি এবং ঠিক ঐ টাকাটাই খয়রাত করতে হবে। ঐ টাকাটা নিজে খরচ করে অন্য টাকা দান করলে আদায় হবে বটে, তবে অন্যায় হবে।

* কুরবানীর চামড়ার দাম মসজিদ মাদ্রসার নির্মাণ কাজে বা বেতন বাবত বা পারিশ্রমিক বাবত বা অন্য কোনো নেক কাজে খরচ করা দুরস্ত নয়। খয়রাতই করতে হবে।

## আকীকার মাসায়েল

* আকীকা করা সুন্নাত।

* ছেলে বা মেয়ে জন্মের পর সপ্তম দিনে আকীকা করা মোস্তাহাব। সপ্তম দিনে না করতে পারলে যখনই করুক না কেন যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে। যেমন: শনিবার সন্তান হয়ে থাকলে শুক্রবার আকীকা করবে, তাহলেও এক রকম সপ্তম দিনে আকীকা করা হবে; এটাই উত্তম। এ ছাড়াও যেকোনো দিন ইচ্ছা আকীকা করা যায়।

* সন্তান বালেগ হওয়ার পরও আকীকা করা দুরস্ত আছে, তবে মৃত্যুর পর আকীকা নেই।

* আকীকা করা দ্বারা সন্তানের বালা-মুসীবত দূর হয় এবং সন্তান যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

* ছেলে হলে আকীকায় দুটো বকরী বা ভেড়া উত্তম, আর মেয়ে হলে একটা বকরী বা ভেড়া। কিংবা কুরবানীর গরু ইত্যাদি বড় পশুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ নেয়া উত্তম আর মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলের পক্ষ থেকে একটা বকরী বা কুরবানী-র এক অংশ দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর আকীকা না করলেও কোনো দোষ নেই। তবে আকীকা করা সুন্নাত।

* যে জন্তু দ্বারা কুরবানী দুরস্ত তার দ্বারাই আকীকা দুরস্ত।

* সন্তানের মাথা মুণ্ডানোর জন্য মাথায় খুর/ব্লেড রাখার সাথে সাথে আকীকার পশু জবেহ করতে হবে– এরূপ ধারণা ভুল এবং এটা বেহুদা রছম।

* আকীকার প্রাণী জবেহ করার সময় (জবেহ করার পূর্বে) এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ.

(অর্থ: হে আল্লাহ! এই আকীকা অমুকের সন্তান অমুকের, তুমি তা কবূল কর।) প্রথম فُلَان শব্দের স্থলে সন্তানের নাম বলবে আর দ্বিতীয় فُلَان শব্দের স্থলে তার পিতার নাম বলবে। আর পিতা নিজে জবেহ করলে বলবে এটা আমার অমুক সন্তানের আকীকা।

* আকীকার গোশত মাতা, পিতা, দাদা, দাদী, নানা, নানীসহ সকলেই খেতে পারে।

* আকীকার গোশত কাঁচা ভাগ করে দেয়া বা রান্না করে ভাগ করে দেয়া বা দাওয়াত করে খাওয়ানো সবই দুরস্ত আছে।

* কোন কোন ফকীহ বলেছেন, আকীকার পশুর চামড়া বিক্রি করলে তার মূল্য দান করেই দেয়া উচিত। যদিও এ ব্যাপারে কুরবানীর চামড়ার অর্থের ন্যায় অত কড়াকড়ি নেই। (فتاوی رحیمیہ ج/۲)

## মানতের মাসায়েল

* কোন ইবাদতজাতীয় মানত মানলে যদি যে উদ্দেশ্যে মানত করেছে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তাহলে ঐ মানত আদায় করা ওয়াজিব। উদ্দেশ্য পূর্ণ না হলে মানত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। আর কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতেই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোনো কিছুর মানত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

* শরীআতের খেলাফ মানত মানলে তা পূর্ণ করা যাবে না, যেমন: মাজারে কোনো কিছু দেয়ার মানত করলে বা নাচ গানের মানত করলে ইত্যাদি।

* মীলাদের মানত মানলে সে মানত বাতিল– তা পুরো করার দরকার নেই। (فتاوی رحیمیہ ج/۴)

* নির্দিষ্ট গরু, বকরী বা মুরগি মানত করলে সেটাই দিতে হবে। আর যদি নির্দিষ্ট করে না বলে, তাহলে কুরবানীর উপযুক্ত যেকোনো গরু বা খাশী দিতে হবে।

* নির্দিষ্ট কোন স্থানে দেয়ার মানত করলে সেখানেই দেয়া জরুরি নয়, যেমনধ মক্কা শরীফে বা মদীনায় দেয়ার মানত করলে সেখানেই দেয়া জরুরি নয়– অন্য স্থানেও দেয়া যাবে।

* নির্দিষ্ট কোন দিনে বা নির্দিষ্ট কোন মিসকীনকে দেয়ার মানত করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে বা সেই নির্দিষ্ট মিসকীনকে দেয়া জরুরি নয়– অন্য যেকোনো দিন বা অন্য যেকোনো মিসকীনকে দিলেও চলবে।



* নির্দিষ্ট কোন মসজিদে নামায পড়ার মানত করলে সে মসজিদেই নামায পড়া জরুরি নয়, বরং যেকোনো মসজিদে নামায পড়লে মানত আদায় হয়ে যাবে।

* যদি কেউ মানত করে যে, দশজন হাফেজ বা দশজন আলেমকে খাওয়াব, তাহলে হাফেজ বা আলেমকে খাওয়ানো জরুরি নয়– দশজন মিসকীনকে খাওয়ালেও চলবে।

* যে কয়জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মানত করবে সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার নিয়ত কি ছিল; যদি এক ওয়াক্ত খাওয়ানোর নিয়ত থাকে তাহলে এক ওয়াক্ত খাওয়ালেই চলবে। আর যদি দুই ওয়াক্ত খাওয়ানোর নিয়ত থাকে বা কিছু নিয়ত ঠিক করে না বলে থাকে, তাহলে দুই ওয়াক্ত পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

* যদি এক বা আকাধিক মিসকীনকে কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট না করেই চাউল, ডাউল ইত্যাদি দেয়ার মানত করে থাকে, তাহলে প্রত্যেক মিসকীনকে একটা সদকায়ে ফিতর–এর পরিমাণ দিতে হবে।

* যদি রোযার মানত করে থাকে তাহলে এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২৬৮ নং পৃষ্ঠা।

* এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে মানত মানা দুরস্ত নয়।

## কছমের মাসায়েল

* বিনা প্রয়োজনে কথায় কথায় কছম খাওয়া (শপথ করা) অন্যায় কাজ।

* কছমের খেলাফ করলে বা খেলাফ হলে কাফ্‌ফারা দেয়া ওয়াজিব।

* যদি কেউ বলে, আল্লাহ্‌র কছম বা খোদার কছম বা আল্লাহ্‌র বুযুর্গী ও বড়ত্বের কছম, আমি অমুক কাজ করব বা করব না, তাহলে কছম হয়ে যাবে, তার খেলাফ করা কিছুতেই জায়েয হবে না।

* যদি কেউ আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম উচ্চারণ করে কছম খায় তবুও কছম হয়ে যাবে।

* যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে শুধু বলে, কছম খাচ্ছি, অমুক কাজ করব বা করব না, তবুও কছম হয়ে যাবে।

* যদি কেউ বলে, আল্লাহ সাক্ষী বা খোদা সাক্ষী বা আল্লাহ্‌কে হাজির নাযির জেনে বলছি, তবুও কছম হয়ে যাবে।

* কুরআন বা আল্লাহ্‌র কালামের কছম করলেও কছম হয়ে যায়। কিন্তু শুধু কুরআন হাতে নিয়ে বা কুরআন ছুয়ে যদি কিছু বলে কিন্তু কছম না খায় তাহলে কছম হবে না।

* যদি কেউ বলে, আমি যদি অমুক কাজ করি বা না করি, তাহলে যেন বেঈমান হয়ে যাই বা মৃত্যুর সময় যেন ঈমান নছীব না হয় বা অমুক কাজ করলে আমি মুসলমান নই, তাহলেও কছম হয়ে যাবে। তার খেলাফ করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে, তবে ঈমান যাবে না।

* যদি কেউ বলে অমুক কাজ করলে আমার উপর যেন আল্লাহ্‌র গযব পড়ে বা খোদার অভিশাপ হয়, বা বলে, যদি অমুক কাজ করি তাহলে আমি শুকর খাই বা তাহলে যেন আমার অঙ্গহানি হয় বা কুষ্ঠরোগ হয়– ইত্যাদি কথায় কছম হয় না।

* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খেলে কছম হয় না। যেমন: রসূলের কছম, কা'বা শরীফের কছম, বা মাতা-পিতার কছম, বা সন্তানের কছম, বা যে কোন মানুষের কছম। তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খাওয়া শেরেকী পর্যায়ের শক্ত গোনাহ।

* যদি কেউ বলে, তোমার ঘরের ভাত পানি আমার জন্য হারাম বা অমুক জিনিস আমি আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি, তাহলে কছম হয়ে যাবে– সে জিনিস খেলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

* যদি কেউ অন্যকে কছম দেয় যে, তোমার আল্লাহ্‌র কছম তুমি অমুক কাজটা করে দাও বা কর না, তাহলে কছম হয় না– সেই অন্য ব্যক্তির জন্য তার খেলাফ করা দুরস্ত আছে।

* আল্লাহ্‌র কছম খেয়ে অতীত বা বর্তমানের কোনো বিষয়ে কোনো মিথ্যা তথ্য দিলে বা মিথ্যা বললে কঠিন পাপ হয়; তবে তাতে কোনো কাফ্‌ফারা দিতে হয় না। ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে কছম সহকারে কিছু বললে যদি তার খেলাফ করে বা খেলাফ হয়, তাহলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

* কোনো কাজ করার কছম খেলে তা করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, না করলে গোনাহ হবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হবে। পক্ষান্তরে কোনো কাজ না করার কছম খেলে সেটা করা তার জন্য হারাম হয়ে যায়, করলে গোনাহ হবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তবে কোনো গোনাহের কছম করলে তার জন্য কছম ভঙ্গ করা ওয়াজিব, কছম ভেঙ্গে কাফ্‌ফারা দিবে, নতুবা গোনাহগার হবে।



* বিগত কোনো ঘটনার বা কথার উপর এই ভেবে কছম দেয়া যে, সে ঠিক বলছে, অথচ বাস্তব তার বিপরীত, এরূপ কছমের কোনো কাফ্‌ফারা নেই, এতে গোনাহও হয় না।

### কছমের কাফফারা

* কছম ভঙ্গ করলে তার কাফ্‌ফারা হল দশজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে এক সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) আটা বা তার মূল্য দেয়া। (পূর্ণ দুই সের দেয়া উত্তম। আর ধান চাউল দিলে গমের মূল্য হিসাবে দিতে হবে)। অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে এই পরিমাণ কাপড় দিবে যার দ্বারা শরীরের অধিকাংশ ঢাকতে পারে। যেমন: জামা ও পায়জামা বা লুঙ্গি। মহিলাকে কাপড় দিলে এত পরিমাণ দিবে যার দ্বারা সে সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়তে পারে।

* যদি কেউ দশ মিসকীনকে খাওয়ানো বা কাপড় দেয়ার মত সঙ্গতি না রাখে, তাহলে তাকে এক সঙ্গে (বিরতি না দিয়ে) তিনটি রোযা রাখতে হবে।

* কছম ভঙ্গ করার আগেই কাফ্‌ফারা দিলে সেটা কাফ্‌ফারা বলে গণ্য হবে না– পরে কছম ভঙ্গ হলে আবার কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

* একটা বিষয়ে একাধিক বার কছম খেলে তার কাফ্‌ফারা একটাই।

* কয়েকটা কছমের কাফফারা ওয়াজিব হলে সব কাফ্‌ফারাই পৃথক পৃথক আদায় করতে হবে।

* যারা যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত কাফ্‌ফারা শুধু তাদেরকেই দেয়া যাবে। (বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।)

## হজ্জ ও যিয়ারত

### হজ্জ ও উমরার ফযীলত

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে পবিত্র হয়, জান্নাতই হল তার পুরস্কার। (বোখারী ও মুসলিম)

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক উমরার পর আর এক উমরা করলে দুই উমরার মধ্যবর্তী সব গোনাহ মোচন হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং হজ্জের প্রাক্কালে অশ্লীল কথা

কাজ ও পাপ থেকে বিরত থাকে, সে মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণের দিনের ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসে। (প্রাগুক্ত)

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একাধারে হজ্জ ও উমরা করতে থাক। এটা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে দেয়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

## কাদের উপর হজ্জ ফরয

* যার নিকট মক্কা শরীফ থেকে হজ্জ করে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের আবশ্যকীয় খরচ বাদে মক্কা শরীফ যাতায়াতের মোটামুটি খরচ পরিমাণ অর্থ থাকে তার উপর হজ্জ ফরয। ব্যবসায়িক পণ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির মূল্য এ অর্থের হিসাবে গণ্য করতে হবে।

* মেয়েলোকের জন্য নিজ স্বামী বা নিজের কোনো বিশ্বস্ত দ্বীনদার মাহরাম পুরুষ ব্যতীত হজ্জে যাওয়া দুরস্ত নয়। শুধু এমন কোন মহিলা থাকা যথেষ্ট নয়, যার সাথে তার মাহরাম পুরুষ রয়েছে।

* অন্ধের উপর হজ্জ ফরয নয় যত ধনই থাকুক না কেন।

* নাবালেগের উপর হজ্জ ফরয হয় না। নাবালেগ অবস্থায় হজ্জ করলেও বালেগ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সামর্থ হলে পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

## হজ্জ ফরয হওয়ার পর না করা বা বিলম্ব করা

* হজ্জ ফরয হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরই হজ্জ করা ওয়াজিব− বিনা ওজরে বিলম্ব করা পাপ। ছেলে-মেয়ের বিবাহ-শাদী দেয়ার জন্য বা বাড়ি তৈরি করার জন্যে বিলম্ব করা কোন গ্রহণযোগ্য ওজর নয়। শেষ বয়সে হজ্জ করব− এরূপ ধারণাও ভুল। বরং বয়স থাকতে হজ্জ করতে গেলেই হজ্জের ক্রিয়াদি ভালভাবে আদায় করা সহজ হয়।

* হজ্জ ফরয হওয়ার পর আলস্য করে বিলম্ব করলে এবং পরে গরীব বা শক্তিহীন হয়ে গেলেও ঐ ফরয তার যিম্মায় থেকে যাবে− মাফ হবে না, যেকোনো উপায়ে তাকে হজ্জ করতে হবে বা মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জের ওছিয়াত করে যেতে হবে।

* পিতা-মাতার হজ্জের পূর্বে সন্তান হজ্জ করতে পারে না− এই ধারণা ভুল। অতএব এ ধারণার বশবর্তী হয়ে হজ্জে বিলম্ব করা গ্রহণযোগ্য ওজর নয়।



* হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য ভীষণ আযাবের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এরূপ লোক সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে, সে ইয়াহুদী হয়ে মরুক বা নাছারা হয়ে মরুক। (সুনানে দারিমী)

## হজ্জের সফরের আদবসমূহ

১. নিয়ত খালেছ করে নিবেন অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ্কে রাজি-খুশি করারনিয়ত রাখবেন। নাম-শোহ্রত, দেশ ভ্রমণ, আবহাওয়া পরিবর্তন, হাজী উপাধি অর্জন ইত্যাদি নিয়ত রাখবেন না।

২. খাঁটি অন্তরে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ, কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, এখনই গোনাহ বর্জন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার পাকাপোক্ত নিয়ত করতে হবে। কারও টাকা-পয়সা বা সম্পদের হক নষ্ট করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে হবে। পাওনাদাররা জীবিত না থাকলে তাদের উত্তরাধীকারীদের থেকে তার নিষ্পত্তি করে নিতে হবে। সেরূপ কারও সন্ধান না পেলে পাওনাদারদের ছওয়াবের নিয়তে পাওনা পরিমাণ অর্থ তাদের পক্ষ থেকে দান করে দিতে হবে। কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে।

৩. মাতা-পিতা জীবিত থাকলে এবং তাদের খেদমতে থাকার প্রয়োজন থাকলে তাদের এজাযত ব্যতীত নফল হজ্জে গমন করা মাকরূহ। খেদমতের প্রয়োজন থাকলে ফরয হজ্জে এজাযত ব্যতীত যাওয়া মাকরূহ নয়, যদি পথ ঘাট নিরাপদ থাকে। পিতা-মাতারও উচিত এজাযত দিয়ে দেয়া।

৪. সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় খরচাদির ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

৫. কোনো ঋণ নগদ আদায় করার থাকলে পাওনাদারের অনুমতি গ্রহণ করবেন। তার অনুমতি ব্যতীত হজ্জে গমন করা মাকরূহ। তবে যদি কাউকে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করে যাওয়া যায়, এবং পাওনাদারগণ তাতে সম্মত থাকে, তাহলে অনুমতি ব্যতীতও যাওয়া মাকরূহ হবে না। আর ঋণ যদি নগদ আদায় করার না হয়, বরং মেয়াদ বাকি থাকে এবং মেয়াদের পূর্বেই হজ্জ থেকে ফিরে আসার হয়, তাহলে সেই পাওনাদারের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীতও হজ্জে গমনে কোনো অসুবিধা নেই। তবে পাওনা- দাওনা সম্পর্কিত একটা তালিকা তৈরি করে রেখে যাবেন।

৬. নিজের কাছে কারও থেকে ধার করা জিনিস বা কারও আমানত থাকলে তা মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া চাই।

৭. সফরে গমনের পূর্বে কোন বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে সফরের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ করে নিন।

৮. উত্তম সফরসঙ্গী নির্বাচন করুন। পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আলেম হলে উত্তম হয়, যার কাছে প্রয়োজনে হজ্জের মাসায়েল ইত্যাদি জেনে নেয়া যাবে। আলেম না পেলে অন্তত একজন অভিজ্ঞ দ্বীনদার হাজীকে সফরসঙ্গী বানানোর চেষ্টা করবেন।

৯. হজ্জের মাসায়েল শিক্ষা করে নিবেন। হজ্জের মাসায়েল শিক্ষা করাও ফরয। দুআ কালামের ফযীলত আছে, তবে দুআ কালামের উপর জোর দিতে যেয়ে জরুরি মাসায়েল থেকে অমনোযোগী ও উদাসীন হওয়া চাই না। হজ্জ ও উমরা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য মাসায়েলের কিতাবও সঙ্গে রাখা চাই। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে কিতাব দেখে নেয়া যায়। অনেকে তওয়াফ, সায়ী ইত্যাদির দুআ মুখস্থ করতে পারেন না বলে হতাশ হন। হতাশ হওয়ার কিছু নেই, একান্তই মুখস্থ করতে না পারলে এসব দুআ ব্যতীতও হজ্জ উমরা হয়ে যাবে। তবে এসব দুআ সুন্নাত বা মুস্তাহাব, তাই সম্ভব হলে হিম্মত করে আমল করার চেষ্টা করুন।

১০. হজ্জ উমরার সফর একটি বরকতময় সফর। এ সফরে সফরের যাবতীয় সুন্নাত, আদব ইত্যাদি আমল করা চাই। সফরের সুন্নাত ও আদবসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫১৪-৫১৯ পৃষ্ঠা।

### উমরাতে যা যা করতে হয়

* সাধ্য থাকলে জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (معلم الحجاج)

* তিনটা আমলের সমষ্টিকে উমরা বলা হয়। যথা:

১। এহ্‌রাম বাঁধা। এহ্‌রামের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩০০ পৃষ্ঠা।

২। বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা। এটাকে তওয়াফে উমরা বলা হয়। তওয়াফের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৩। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। সায়ী সম্পর্কিত মাসায়েলজানার জন্য দেখুন ৩১১ পৃষ্ঠা।

৪। সায়ী করার পর হলক (মাথা মুণ্ডন) করে বা কছর (চুল ছোট) করে এহ্‌রাম খুলতে হয়। হলক বা কছর-এর মাসায়েল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১৩ পৃষ্ঠা।



### কোন্ প্রকার হজ্জ করা উত্তম

* হজ্জ তিন প্রকার। যথা: (১) হজ্জে ইফ্‌রাদ, (২) হজ্জে কেরান, (৩) হজ্জে তামাত্তু। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হজ্জে কেরান, তারপর হজ্জে তামাত্তু, তারপর হজ্জে ইফ্‌রাদ। উল্লেখ্য, হজ্জে কেরানে দীর্ঘ দিন এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকতে হয় এবং দীর্ঘ দিন এহ্‌রামের বিধি-নিষেধ মেনে চলা বেশ কঠিন, তাই অধিকাংশ হাজীকেই হজ্জে তামাত্তু করতে দেখা যায়। তবে এহ্‌রাম বাঁধা থেকে নিয়ে হজ্জ পর্যন্ত সময়টুকু কম হলে –যেমন: যিলহজ্জ মাসে মক্কা পৌঁছা হলে– তখন হজ্জে কেরান করাই সমীচীন।

বি, দ্র. বিভিন্ন প্রকার হজ্জের মাসায়েল পড়ে মনে রাখতে অসুবিধে বোধ করলে আপনি যে প্রকার হজ্জ করতে চান শুধু সে সম্পর্কেই পড়ুন। প্রত্যেক প্রকার হজ্জে যা যা করতে হয় তা ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হল।

### ইফরাদ হজ্জে যা যা করতে হয়

(হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে শুধু মাত্র হজ্জের এহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে হজ্জে ইফরাদ বা ইফরাদ হজ্জ বলে।)

১। হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধতে হবে। এটা ফরয। এহ্‌রাম সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩০০ পৃষ্ঠা।

২। বায়তুল্লার তওয়াফ করতে হবে। এটাকে তওয়াফে কুদূম বলে। এটা সুন্নাত। তওয়াফের মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৩। ৮ই যিলহজ্জ যোহর থেকে ৯ যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত এই পাঁচ ওয়াক্ত সেখানে আদায় করতে হবে। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় রাত্র যাপন সুন্নাত। মিনায় গমন ও সেখানে অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৪ পৃষ্ঠা।

৪। ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান করতে হবে। এটা হজ্জের প্রধানতম ফরয। আরাফায় অবস্থানের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৫ পৃষ্ঠা।

৫। ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে। এই অবস্থান (পুরুষদের জন্য) ওয়াজিব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১৬ পৃষ্ঠা।

৬। ১০ই যিলহজ্জ মিনায় এসে জামরায়ে আকাবায় (বড় শয়তানে) কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব। কংকর নিক্ষেপের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠা।

৭। তারপর কুরবানী করা। ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয় ঐচ্ছিক; কুরবানী না করলেও চলবে।

৮। মাথা মুণ্ডন করে এহ্‌রাম খুলতে হবে। মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করে ছাঁটা ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৩ পৃষ্ঠা।

৯। তওয়াফে যিয়ারত করতে হবে। এটা ফরয। তওয়াফে যিয়ারত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১৯ পৃষ্ঠা।

১০। তওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করা ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য এই সায়ী তওয়াফে যিয়ারতের পর করা উত্তম। তওয়াফে কুদুমের পরও এই সায়ী করে নেয়া যায়। তওয়াফে কুদূমের পর এই সায়ী করে থাকলে তওয়াফে যিয়ারতের পর আর করতে হবে না। সায়ী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১১ পৃষ্ঠা।

১১। ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ মিনায় প্রতিদিন তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১৭–৩১৮ পৃষ্ঠা।

১২। সর্বশেষে মক্কা থেকে বিদায় নেয়ার সময় বিদায়ী তওয়াফ করলে হজ্জে ইফরাদের কার্যাবলী শেষ হবে। এই বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩২১ পৃষ্ঠা।

## কেরান হজ্জে যা যা করতে হয়

(হজ্জের মাসসমূহে এক সাথে উমরা ও হজ্জ উভয়টির এহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে এহরাম না খুলে ঐ একই এহ্‌রামে হজ্জ সমাপন করাকে হজ্জে কেরান বা কেরান হজ্জ বলে।)

১। প্রথমে উমরা ও হজ্জ উভয়টার নিয়তে এহ্‌রাম বাঁধবে। এহ্‌রাম বাঁধা উমরার ফরয। এহ্‌রামের মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩০০ পৃষ্ঠা।

২। বায়তুল্লায় প্রবেশ করে তওয়াফে উমরা বা উমরার তওয়াফ আদায় করবে। এই তওয়াফ উমরার ফরয। তওয়াফ সম্পর্কিত মাসায়েলের জন্য দেখুন ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৩। তওয়াফের পর উমরার সায়ী করবে। এই সায়ী উমরার ওয়াজিব। সায়ী সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১১ পৃষ্ঠা।

৪। তারপর তওয়াফে কুদূম করবে। মীকাতের বাইরে থেকে মক্কায় প্রবেশকারীদের জন্য এই তওয়াফ সুন্নাত।



৫। তারপর সায়ী করবে। এই সায়ী ওয়াজিব। কেরানকারীর জন্য এই সায়ী এখানেই করে নেয়া উত্তম। না করলে তওয়াফে যিয়ারতের পর এই ওয়াজিব সায়ী আদায় করতে হবে।

৬। ৮ই যিলহজ্জ যোহর থেকে ৯ই যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় থেকে আদায় করবে। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় রাত্র যাপন সুন্নাত। রাতের অধিকাংশ সময় থাকলেও এই সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১৪ পৃষ্ঠা।

৭। ৯ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলা থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত উকূফে আরাফা (আরাফায় অবস্থান) করবে। এটা হজ্জের অন্যতম ফরয। উকূফে আরাফার বিস্তারিত মাসায়েলের জন্য দেখুন ৩১৫ পৃষ্ঠা।

৮। ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত উকূফে মুযদালিফা (মুযদালিফায় অবস্থান) করবে। এটা ওয়াজিব। উকূফে মুযদালিফার মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৬ পৃষ্ঠা।

৯। ১০ই যিলহজ্জ মিনায় এসে জামরায় আকাবায় (বড় শয়তানে) কংকর নিক্ষেপ করবে। এই কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কংকর নিক্ষেপের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৬–৩১৭ পৃষ্ঠা।

১০। তারপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

১১। তারপর মাথা মুণ্ডিয়ে বা চুল ছোট করে এহরাম খুলবে। এই মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৩ পৃষ্ঠা।

১২। তওয়াফে যিয়ারত করা ফরয। তওয়াফে যিয়ারতের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৯ পৃষ্ঠা।

১৩। ১১ ও ১২ যিলহজ্জ প্রতিদিন তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এ কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩১৬–৩১৭ পৃষ্ঠা।

১৪। বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। এই বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব। মক্কা থেকে বিদায় নেয়ার সময় বিদায়ী তওয়াফ করলে হজ্জে কেরানের কার্যাবলী শেষ হবে। বিদায়ী তওয়াফ সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩২১ নং পৃষ্ঠা।

## তামাত্তু হজ্জে যা যা করতে হয়

(হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে শুধু উমরার এহ্‌রাম বেঁধে উমরা পালন করে এহ্‌রাম খুলে ফেলা। তারপর হজ্জের সময় পুনরায় হজ্জের এহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা– একে বলে হজ্জে তামাত্তু বা তামাত্তু হজ্জ।)

১। প্রথমে শুধু উমরার নিয়তে এহ্‌রাম বাঁধতে হবে। এই এহ্‌রাম উমরার ফরয। এহ্‌রামের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩০০ পৃষ্ঠা।

২। বায়তুল্লায় প্রবেশ করে উমরার তওয়াফ করতে হবে। এই তওয়াফ উমরার ফরয। তওয়াফের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৩। তারপর উমরার সায়ী করতে হবে। এই সায়ী ওয়াজিব। সায়ীর মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১১ পৃষ্ঠা।

৪। তারপর মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছোট করে উমরার এহ্‌রাম খুলতে হবে। এই মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৩ পৃষ্ঠা।

৫। তারপর ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের উদ্দেশ্যে এহ্‌রাম বাঁধতে হয়। এহ্‌রাম বাঁধা হজ্জের একটি ফরয। এই এহ্‌রাম মক্কা শরীফে থেকেই বাঁধা হবে।

৬। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় গমন করে সেখানে থেকে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ৯ই যিলহজ্জের ফজর সর্বমোট এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় রাত্র যাপন সুন্নাত।

৭। ৯ই যিলহজ্জ উকূফে আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হবে। এই উকূফে আরাফা হজ্জের একটি অন্যতম ফরয। আরাফায় গমন ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৫ পৃষ্ঠা।

৮। ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত উকূফে মুযদালিফা বা মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে। এটা ওয়াজিব। উকূফে মুযদালিফার বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৬ পৃষ্ঠা।

৯। ১০ই যিলহজ্জ মিনায় এসে জামরায়ে আকাবায় (বড় শয়তানে) কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব। কংকর নিক্ষেপের বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৬–৩১৭ পৃষ্ঠা।

১০। তারপর কুরবানী করতে হবে। এটা ওয়াজিব।

১১। তারপর মাথা মুণ্ডাতে হবে বা চুল ছোট করতে হবে। এটা ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৩ পৃষ্ঠা।



১২। তওয়াফে যিয়ারত করতে হবে। এটা ফরয। তওয়াফে যিয়ারতের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩১৯ পৃষ্ঠা।

১৩। তওয়াফে যিয়ারত–এর সায়ী করতে হয়। এই সায়ী ওয়াজিব।

১৪। ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ মিনায় প্রত্যেক দিন তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব। দেখুন ৩১৬–৩১৭ পৃষ্ঠা।

১৫। সর্বশেষে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। এই বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। মক্কা থেকে বিদায় নেয়ার সময় এই বিদায়ী তওয়াফ করার মাধ্যমেই তামাত্তু হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত হবে। বিদায়ী তওয়াফের মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩২১ পৃষ্ঠা।

## এহ্‌রামের মাসায়েল

* এহরামের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান পূর্বক (পুরুষের জন্য) হজ্জ অথবা উমরা কিংবা হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়ত করে তালবিয়া পড়া এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সায়ী করার পর মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছোট করে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে এহ্‌রাম বলে।

### কোথা থেকে এহ্‌রাম বাঁধবেন

হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে মীকাত অর্থাৎ, শরীআত কর্তৃক এহ্‌রাম বাঁধার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার পূর্বেই এহ্‌রাম বেঁধে নেয়া জরুরি। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের জন্য এই নির্ধারিত স্থানটি হল ইয়ালামলাম (মক্কা থেকে দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম)। সামুদ্রিক জাহাজযোগে হজ্জ যাত্রীগণ এ স্থান বরাবর অতিক্রম করার পূর্বে অবশ্যই এহ্‌রাম বেঁধে নিবেন। প্লেন এ স্থান বরাবর রেখা কখন অতিক্রম করে তা টের পাওয়া কঠিন; তাই প্লেনযোগে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকারীর জন্য প্লেনে আরোহণের পূর্বেই এহ্‌রাম বেঁধে নেয়া উচিত। বিমানবন্দরে যেয়ে বা হাজী ক্যাম্প থেকে বা বাসা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বাসায় বা মসজিদে যেকোনো স্থানে এহরাম বাঁধা যায়।

* যারা মদীনা শরীফ আগে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন, তারা বিনা এহরামেই রওয়ানা হবেন। মদীনা যিয়ারতের পর যখন মক্কা শরীফ–এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, তখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ গমনকরীদের মীকাত যেহেতু যুলহুলাইফা, তাই যুলহুলাইফা নামক স্থান (বর্তমানে বীরে আলী নামে পরিচিত) থেকে বা মদীনায় থেকেই এহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফ রওয়ানা হবেন।

* যারা মক্কা শরীফে থেকে নফল উমরা করতে চান এহ্‌রাম বাঁধার জন্য তাদেরকে হারামের সীমানার বাইরে যেয়ে এহরাম বেঁধে আসতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হল তানয়ীম। বর্তমানে সেখানে মসজিদে আয়েশা নামক একটি মসজিদ আছে। তাই মসজিদে আয়েশায় গিয়ে এহ্‌রাম বেঁধে এসে নফল উমরা করবেন। জে'রানা নামক স্থান থেকেও এহ্‌রাম বেঁধে আসা যায়।

## এহ্‌রাম বাঁধার তরীকা

* এহ্‌রাম বাঁধার ইরাদা হলে প্রথমে ক্ষৌরকার্য করে নিন– নখ কাটুন, বগল ও নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করুন। এগুলো মোস্তাহাব। মাথা মুণ্ডানোর অভ্যাস থাকলে মাথা মুণ্ডিয়ে নিন অন্যথায় চুল আঁচড়িয়ে নিন। স্ত্রী সম্ভোগও মোস্তাহাব।

* তারপর এহরামের নিয়তে গোসল করুন, না পারলে উযূ করে নিন। এটা সুন্নাত। ভালভাবে শরীরের ময়লা দূর করবেন।

* তারপর সেলাইবিহীন (ফাড়া) লুঙ্গি পরিধান করুন অর্থাৎ, একটা চাদর পরিধান করুন এবং একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিন। এখন ডান বগলের নিচ দিয়ে পরবেন না। এহ্‌রামের কাপড় সাদা রংয়ের হলে উত্তম। পুরুষের জন্য এহরামের অবস্থায় শরীরের পরিমাপে সেলাই করা হয়েছে– এমন কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। মহিলাগণ যেকোনো পোশাক পরিধান করতে পারেন। এহ্‌রামের কাপড় নতুন বা পরিষ্কার হওয়া উত্তম।

* তারপর সুগন্ধি লাগিয়ে নিন। এটা সুন্নাত।

* তারপর এহ্‌রামের নিয়তে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিন। এটা সুন্নাত। এই দুই রাকআতের মধ্যে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। এই নামায মাথায় টুপি সহকারে (বা মাথা ঢেকে)ই পড়তে হয়। নামাযের নিষিদ্ধ বা মাকরূহ ওয়াক্তে এহ্‌রাম বাঁধতে হলে এহ্‌রামের নামায না পড়েই এহ্‌রাম বাঁধতে হয়।

* নামাযের পর টুপি খুলে রেখে বা মাথা খালি করে কেবলামুখী থেকেই এহ্‌রামের নিয়ত করতে হবে। বসে বসেই নিয়ত করা উত্তম এবং নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম।

* শুধু উমরার এহ্‌রাম হলে এভাবে নিয়ত করুন–



আরবীতে: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

বাংলায়: হে আল্লাহ, আমি উমরা করতে চাই, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং কবূল কর।

* শুধু হজ্জের এহ্‌রাম হলে এভাবে নিয়ত করুন–

আরবীতে: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

বাংলায়: হে আল্লাহ, আমি হজ্জ করতে চাই, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার থেকে তা কবূল কর।

* উমরা ও হজ্জ উভয়টার এহ্‌রাম হলে এভাবে নিয়ত করুন–

আরবীতে: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

বাংলায়: হে আল্লাহ, আমি হজ্জ ও উমরা উভয়টার নিয়ত করছি, তুমি সহজ করে দাও এবং কবূল কর।

* তারপর তালবিয়া পড়ুন। তালবিয়া পড়া সুন্নাত, তবে নিয়তের সাথে একবার তালবিয়া বা যেকোনো যিকির থাকা শর্ত। তালবিয়া জোর আওয়াজে পড়া সুন্নাত এবং তিনবার পড়া সুন্নাত। মহিলাদের জন্য তালবিয়া জোর আওয়াজে পড়া নিষিদ্ধ, তারা এতটুকু শব্দে পড়বে যেন নিজের কানে শোনা যায়। তালবিয়া আরবীতেই পড়া উত্তম।

**তালবিয়া এই:** لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

لَا شَرِيْكَ لَكَ.

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক,
লা শারীকা লাক)

অর্থ: আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির। আমি হাজির, কোনো শরীক নেই তোমার, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোনো শরীক নেই তোমার।

**বি. দ্র.** নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করার পর এহ্রাম বাঁধা সম্পন্ন হয়ে গেল।

* তারপর দুরূদ শরীফ পড়ুন এবং যা ইচ্ছা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন, তবে এই দুআ করা উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত। আর তোমার অসন্তোষ ও জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

* মহিলাগণ হায়েয-নেফাসের অবস্থায় থাকলে নামায না পড়ে শুধু নিয়ত করে এবং তালবিয়া পড়ে নিলেই এহ্রাম শুরু হয়ে যাবে।

## এহ্রামের অবস্থায় যা যা করা উত্তম

* এহ্রামের অবস্থায় অধিক পরিমাণে তালবিয়া পড়তে থাকা উত্তম। বিশেষত গাড়ীতে উঠতে, গাড়ী থেকে নামতে, কোনো উঁচু স্থানে উঠতে, নিচ স্থানে নামতে, প্রত্যেক নামাযের পর ইত্যাদি মুহূর্তে তালবিয়া পড়া মোস্তাহাব। তালবিয়া পুরুষগণ জোর আওয়াজে পড়বেন, তবে এত জোরে নয় যেন নিজের বা কোনো নামাযীর বা ঘুমন্ত মানুষের অসুবিধা হয়।

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, প্রবেশের সময়, সাক্ষাতের সময়, বিদায়ের সময়, উঠতে-বসতে, সকাল-সন্ধ্যায়, মোটকথা যে কোনভাবে অবস্থার পরিবর্তন হলে সে সময় তালবিয়া পড়া মোস্তাহাব।

* তালবিয়ার স্থলে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাক্যগুলোও বলা যায়, তবে তালবিয়ার শব্দগুলো বলাই সুন্নাত।

## এহ্রাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ

* পুরুষের জন্য শরীরের পরিমাপে বানানো হয়েছে– এমন সেলাইযুক্ত পোশাক নিষিদ্ধ। যেমনঃ জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া, টুপি, গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার ইত্যাদি। মহিলাদের জন্য হাত মোজা, পা মোজা, অলংকার পরিধান করা জায়েয, তবে না করা উত্তম।

* ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত পুরুষের জন্য মাথা ও চেহারা এবং মহিলাদের জন্য শুধু চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য মাথা ঢাকা রাখা ওয়াজিব। পুরুষগণ কান ও গলা ঢাকতে পারেন।



* এমন জুতো/স্যাণ্ডেল পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে যায়। মহিলাগণ এরূপ জুতো/স্যাণ্ডেল পরিধান করতে পারেন।

* সর্বপ্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ।

* নখ, চুল ও পশম কাটা ও কাটানো নিষিদ্ধ।

* স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা বা সে কাজে কোনো রূপ সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। তবে মশা, মাছি, ছারপোকা, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক প্রাণী মারা জায়েয।

* স্ত্রী সহবাস বা এসম্পর্কিত কোনো আলোচনা, চুমু দেয়া এবং শাহওয়াত (উত্তেজনা) সহকারে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

* ঝগড়া-বিবাদ করা বা কোনো গোনাহের কাজ করা নিষিদ্ধ। এগুলো এমনিতেও নিষিদ্ধ; এহ্রামের অবস্থায় আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

* উকুন মারা নিষিদ্ধ।

**বি. দ্র.** মহিলাদের জন্য চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ– এর অর্থ এই নয় যে, চেহারা সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে যাতে পর পুরুষে চেহারা দেখতে পায়, বরং এর অর্থ হল চেহারার সাথে নেকাব বা কোন কাপড় লাগিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। তাদের জন্য এহ্রামের অবস্থায় পর্দাও করা জরুরি, আবার চেহারায় কোনো কাপড় বা নেকাব লাগানোও নিষিদ্ধ। এর উপায় হল– তারা চেহারার সাথে লাগতে না পারে এমন কিছু কপালের উপর বেঁধে তার উপর নেকাব ঝুলিয়ে দিবে। মহিলাগণ এ ব্যাপারে গাফিলতি করে থাকেন, এরূপ করা চাই না।

## এহ্রাম অবস্থায় যা যা মাকরূহ

* শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা মাকরূহ।

* চুল বা দাড়ি বা শরীরে সাবান লাগানো মাকরূহ।

* চুল বা দাড়িতে চিরুনি করা মাকরূহ।

* এমনভাবে চুলকানো মাকরূহ যাতে চুল, পশম বা উকুন পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এরূপ আশংকা হয় না– এমন আস্তে চুলকানো জায়েয।

* এমনভাবে দাড়ি খেলাল করা মাকরূহ যাতে দু'একটা দাড়ি খসে পড়ার আশংকা হয়।

* এহ্‌রামের কাপড় সেলাই করে বা গিরা কিংবা পিন ইত্যাদি দিয়ে আঁটকানো মাকরূহ, তবে কোমরে বেল্ট বাঁধা জায়েয। টাকার থলি রাখাও জায়েয।

* বালিশের উপর মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরূহ।

* সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য যদি পাকানো না হয় তাহলে তা খাওয়া মাকরূহ। পাকানো হলে মাকরূহ নয়।

* শাহওয়াতের (উত্তেজনার) সাথে স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখা মাকরূহ।

* নাক গাল কাপড় দিয়ে ঢাকা মাকরূহ, তবে হাত দিয়ে ঢাকা যায়।

* ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া মাকরূহ।

* এলাচি, লঙ্গ বা সুগন্ধিযুক্ত তামাক/জর্দা সহকারে পান খাওয়া মাকরূহ। (معلم الحجاج)

## মক্কা ও হারাম শরীফে প্রবেশের সুন্নাত ও আদবসমূহ

জেদ্দার পথে মক্কা শরীফে আসতে গেলে মক্কা শরীফের প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থান (বর্তমান নাম শুমাইসিয়া) অবস্থিত, সম্ভব হলে এখানে দুই রাকআত নামায পড়ে দুআ করুন। এখনই আপনি মক্কার সীমানায় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দরবারের বিশেষ সীমানায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন; তাই অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে তওবা-ইস্তেগফার করতে করতে এবং তালবিয়া পড়তে পড়তে প্রবেশ করুন।

* মসজিদে হারামের উত্তর দিক অর্থাৎ, জান্নাতুল মুআল্লার দিক থেকে প্রবেশ করা মোস্তাহাব।

* মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মোস্তাহাব। তবে আজকাল গাড়ী ড্রাইভারগণ পথিমধ্যে সময় দেন না, তাই জেদ্দার থেকেই সম্ভব হলে এ গোসল সেরে নেয়া যেতে পারে।

* মক্কা মুকাররমায় এসে মাল-সামান বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি জরুরি কাজ থাকলে তা সেরে যথাসম্ভব দ্রুত মসজিদে হারামে হাজির হওয়া মোস্তাহাব।

* মসজিদে হারামের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়, তবে "বাবুস সালাম" নামক দরজা (২৪ নং গেট) দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব। এ দরজাটি সাফা মারওয়ার মাঝে অবস্থিত[১]। প্রবেশের সময়, এমনিভাবে ভিতরে গিয়ে মসজিদে প্রবেশের ও মসজিদে অবস্থানের যে সুন্নাত ও আদব রয়েছে (দেখুন ১৮০–১৮৪ পৃষ্ঠা) তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

১. উল্লেখ্য, বাবুস সালাম নামক এ দরজাটি ২০০9 ইং সনে পূর্বদিকে সায়ীর স্থান সম্প্রসারিত করার সময় আর রাখা হয়নি।



* প্রবেশ করার সময় তালবিয়া পড়তে পড়তে আল্লাহ্‌র আজমত ও বড়ায়ী মনে জাগ্রত রেখে অত্যন্ত বিনয় ও খুশু-খুযুর সাথে প্রবেশ করুন।

* প্রবেশের সময় কা'বা শরীফ প্রথমে নজরে আসলেই তখন তিনবার পড়ুন اللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এরপর দাঁড়িয়ে বুক পর্যন্ত হাত তুলে আপনার আবেগ থেকে যে দুআ আসে আল্লাহ্‌র কাছে তা প্রার্থনা করুন। এ মুহূর্ত দুআ কবূল হওয়ার একটি বিশেষ মুহূর্ত। এ মহূর্তে এ দুআটি পড়াও মোস্তাহাব–

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থাৎ, আমি এই গৃহের রবের কাছে পানাহ চাই ঋণী হওয়া, দরিদ্র হওয়া, মন সংকুচিত হওয়া এবং কবরের আযাব থেকে।

* বায়তুল্লাহ (কা'বা শরীফ) প্রথমে নজরে আসার সময় পারলে এ দুআটিও পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ. اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَكَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا.

* মসজিদে হারামে প্রবেশ করে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তে হলে পড়ুন নতুবা তওয়াফ শুরু করুন। এখানে দুখূলুল মসজিদ (দুই রাকআত) পড়া নিয়ম নয়। তবে তওয়াফ করতে গেলে ফরয নামায কাযা হওয়ার বা জামাআত ছুটে যাওয়ার বা মোস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা হলে তওয়াফের স্থলে দুই রাকআত দুখূলুল মসজিদ পড়ে নেয়া চাই, যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়।

## তওয়াফের তরীকা ও মাসায়েল

* তওয়াফ শুরু করার পূর্ব মহূর্তে চাদরের ডান অংশকে ডান বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দিন। এরূপ করাকে 'এজতেবা' বলে। সম্পূর্ণ তওয়াফে এরূপ রাখতে হবে। এই এজতেবা করা সুন্নাত। তওয়াফ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো সময় এজতেবা করবেন না। যে তওয়াফের পর সায়ী নেই সে তওয়াফেও এজতেবা' করবেন না। নফল তওয়াফের পর যেহেতু সায়ী নেই, তাই নফল তওয়াফেও এজতেবা' হবে না।

* অতঃপর কা’বা শরীফের দিকে ফিরে হাজরে আসওয়াদকে ডান দিকে রেখে দাঁড়ান অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ বরাবর মসজিদে হারামের গায়ে যে সবুজ বাতি আছে সেটাকে পিছনে ডান দিকে রেখে এমনভাবে দাঁড়ান, যেন হাজরে আসওয়াদ ডান কাঁধ বরাবর থাকে এবং এ পর্যন্ত যে তালবিয়া পড়ে আসছিলেন তা পড়া বন্ধ করুন। এই এহ্‌রাম শেষ হওয়া পর্যন্ত আর তালবিয়া পড়বেন না। তবে কেরান ও ইফরাদ হজ্জকারী তওয়াফ সায়ীর পর থেকে আবার তালবিয়া চালু করবেন।

* তারপর তওয়াফের নিয়ত করুন। নিয়ত করা শর্ত। শুধু এতটুকু নিয়ত করলেই যথেষ্ট যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘর তওয়াফ করার নিয়ত করছি, তুমি তা সহজ করে দাও এবং কবূল কর। তবে কোন্ তওয়াফ– উমরার তওয়াফ, না তওয়াফে যিয়ারত, না বিদায়ী তওয়াফ, না নফল তওয়াফ– ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা উত্তম।

* আরবীতে নিয়ত করতে চাইলে এভাবে করা যায়–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘরের তওয়াফ করার নিয়ত করছি, তুমি সহজ করে দাও এবং কবূল করে নাও।

* নিয়ত করার পর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফেরা অবস্থায়ই ডান দিকে এতটুকু চলুন যেন হাজ্‌রে আসওয়াদ ঠিক আপনার বরাবর হয়ে যায়। অতঃপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দুই হাত কান পর্যন্ত (মহিলাগণ সিনা পর্যন্ত) উঠিয়ে হাজ্‌রে আসওয়াদের দিকে মুখ করে পড়ুন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (مناسك على القارس وزبدة المناسك)

* তারপর হাত নামিয়ে ফেলুন।

* তারপর ধাক্কাধাক্কি করে কাউকে কষ্ট দেয়া ছাড়া সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিন। এই চুমু দেয়া সুন্নাত। তিনবার চুমু দেয়া মোস্তাহাব। চুমুতে যেন শব্দ না হয়। প্রতিবার চুমু দেয়ার পর মাথা হাজ্‌রে আসওয়াদের উপর রাখাও মোস্তাহাব। ভিড়ের কারণে মুখ দিয়ে চুমু দেয়া সম্ভব না হলে উভয় হাত দিয়ে কিংবা শুধু ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে হাতে চুমু দিন। তাও সম্ভব না হলে কোন লাঠি থাকলে তা দ্বারা



স্পর্শ করে তাতে চুমু দিন। তাও সম্ভব না হলে দুই হাতের তালু দিয়ে এমনভাবে হাজ্‌রে আসওয়াদের দিকে ইশারা করুন যেন হাজরে আসওয়াদের উপর উভয় হাত রাখছেন। এভাবে দুই হাতে ইশারা করে দুই হাতেই চুমু খান। হাত দ্বারা ইশারা করার সময় হাত এতটুকু উঠাবেন যে, হাতের তালু হাজ্‌রে আসওয়াদের দিকে থাকবে এবং হাতের পিঠ চেহারার দিকে থাকবে। এ সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِنِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (بضوء ما فى المناسك لعلي القارى)

তবে উল্লেখ্য যে, আজকাল অনেকে হাজরে আসওয়াদ, মুলতাযাম, রুক্‌নে ইয়ামানী প্রভৃতি স্থানে সুগন্ধি মেখে গিয়ে থাকেন, তাই এহ্‌রামের অবস্থায় যে তাওয়াফ হয় তাতে সরাসরি এসব স্থান স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আরও মনে রাখা দরকার যে, হাজ্‌রে আসওয়াদের চতুর্পাশে যে রূপার বেষ্টনী রয়েছে তাতে চুমু দেয়া বা মাথা কিংবা হাত রাখা জায়েয নয়।

* চুমু দেয়ার পর পা স্বস্থানে রেখে একটু ডান দিকে ঘুরে দাঁড়ান। এখন কা’বা শরীফ আপনার বাম দিকে হয়ে যাবে। এভাবে কা’বা শরীফকে বাম দিকে রেখে তওয়াফ আরম্ভ করতে হবে। কখনও যেন বুক কা’বা শরীফের দিকে ফিরিয়ে তওয়াফ না হয়। দুই এক কদমও যেন এমন না হয়। এমন হলে সেই পরিমাণ জায়গা পিছে এসে কা’বা শরীফকে বাম দিকে রেখে পুনরায় সামনে অগ্রসর হবেন। এস্তেলাম (হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া ও রুকনে ইয়ামানীতে হাত লাগানো)–এর সময় ব্যতীত তওয়াফের সময় কা’বা শরীফের দিকে দৃষ্টিও ফেরাবেন না।

* তওয়াফের সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে বীরের ন্যায় কাঁধ দুলিয়ে কাছাকাছি কদম ফেলে ও শক্তির সাথে কদম তুলে তুলে কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতে হবে। এরূপ করাকে ‘রমল’ বলা হয়। রমল করা সুন্নাত। তবে যে তওয়াফের পর সায়ী নেই সে তওয়াফে রমলও নেই। রমল ও এজতেবা শুধু পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।

* তওয়াফ হাতীমের বার দিয়ে করা ওয়াজিব।

* ভিড় না থাকলে এবং কাউকে কষ্ট দেয়া না হলে পুরুষের জন্য যথাসম্ভব বায়তুল্লাহ্‌র কাছাকাছি দিয়ে তওয়াফ করা উত্তম। মহিলাদের

জন্য পুরুষদের থেকে দূরে থেকে, এমনিভাবে তাদের জন্য রাতে তওয়াফ করা উত্তম।

* প্রথম চক্করে রুক্‌নে ইয়ামানীতে (কা'বা শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) পৌঁছার পূর্বে বিভিন্ন দুআ পড়া হয়ে থাকে; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সে সব দুআ বর্ণিত নেই। তবে সে সব দুআ পড়া যায় বা অন্য যে কোন দুআ করা যায়, যেকোনো যিকির করা যায়। সাত চক্করে এরকম বিভিন্ন দুআ বর্ণিত আছে, সবগুলো সম্পর্কেই এ কথা। দুআ কিতাব দেখেও পড়া যায়। দুআ মুনাজাতের জন্য হাত উঠাবেন না।

* রুক্‌নে ইয়ামানীতে পৌঁছে সম্ভব হলে দুই হাতে কিংবা শুধু ডান হাতে রুক্‌নে ইয়ামানী স্পর্শ করা মোস্তাহাব। চুমু খাবেন না বা হাতের দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুমু খাবেন না বা স্পর্শ করা সম্ভব না হলে দূর থেকে ইশারাও করবেন না।

* তারপর রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজ্‌রে আসওয়াদের কোণে যাওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন। রসূল (সা.) এখানে এ দুআটি পড়তেন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

* তারপর হাজ্‌রে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল। এখন সম্ভব হলে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে আবার পূর্বের নিয়মে হাজ্‌রে আসওয়াদে চুমু খাবেন বা হাতে স্পর্শ করে বা ইশারা করে হাতে চুমু খাবেন। প্রত্যেক চক্করের শুরুতেই এভাবে চুমু খাবেন, তবে প্রথম বারের ন্যায় হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন না, এটা শুধু তওয়াফ শুরু করার সময়েই করতে হয়। তবে চুমু খাওয়ার জন্য হাত দ্বারা ইশারা করতে হলে পূর্বের নিয়মে তা করবেন। চুমু খাওয়ার পর দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবেন এবং পূর্বের ন্যায় রুক্‌নে ইয়ামানীতে সম্ভব হলে হাত দ্বারা স্পর্শ করবেন। তারপর রব্বানা আতিনা ... পড়তে পড়তে হাজ্‌রে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছবেন, এভাবে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল। এভাবে সাত চক্কর শেষ হওয়ার পর আবার হাজ্‌রে আসওয়াদে পূর্বের মত চুমু খাবেন। এটা হবে অষ্টমবার চুমু খাওয়া। এখন আপনার তওয়াফ শেষ হল। এখন চাদরের এজতেবা খুলে ডান কাঁধ ঢেকে নিন।

* সম্পূর্ণ তওয়াফ উযূ অবস্থায় হতে হবে। যদি তিন চক্কর বা এর কম আদায়ের পর উযূ ছুটে যায় তাহলে উযূ করে এসে আবার শুরু থেকে সাত চক্কর পূর্ণ করা মোস্তাহাব। শুরু থেকে সাত চক্কর না করে অবশিষ্ট



চক্করগুলো করে নিলেও তওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি চার চক্কর বা তার চেয়ে বেশি করার পর উযূ ছোটে, তাহলে উত্তম হল উযূ করে আবার প্রথম থেকে শুরু না করে শুধু অবশিষ্ট চক্করগুলো করে নেওয়া। তবে এ ক্ষেত্রেও কেউ যদি উযূ করে এসে পুনরায় শুরু থেকে সাত চক্করই করে নেয়, তাহলে সেটাও সহীহ হবে। (غنية الناسك وزبده المناسك)

* তওয়াফ শেষ করার পর যদি বেশি ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি না হয়, তাহলে হাজ্‌রে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে (এ স্থানকে 'মুল্‌তাযাম' বলা হয়।) আঁকড়ে ধরবেন, বুক এবং চেহারা দেয়ালের সাথে লাগাবেন এবং উভয় হাত উপরে উঠিয়ে দেয়ালে স্থাপন করে খুব কাকুতি মিনতি সহকারে দুআ করবেন। এটা দুআ কবূলের স্থান। এ স্থানে এরূপ দুআ করা সুন্নাত।

* তারপর কা'বা শরীফের দরজা মোবারকের চৌকাঠ ধরে খুব দুআ করুন। সম্ভব হলে গেলাফ আঁকড়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করুন। তবে এহরাম অবস্থায় থাকলে এসব স্থানে সতর্ক থাকতে হবে যেন কা'বা শরীফের গেলাফ মাথায় না লাগে। এমনিভাবে এসব সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে কাউকে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, কেননা কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম। এরূপ কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকলে এসব ছেড়ে দিতে হবে। মহিলাদের পর্দা ও শালীনতা রক্ষার স্বার্থেও এ থেকে এবং কা'বা শরীফের দরজা মোবারকের চৌকাঠ ধরে দুআ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ মোস্তাহাব আদায় করার চেয়ে পর্দার ফরয রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

* তারপর দুই রাকআত নামায পড়া ওয়াজিব, এটাকে সালাতুত্তাওয়াফ বা তওয়াফের নামায বলে। এই নামায 'মাকামে ইবরাহীম'-এর পিছনে পড়া মোস্তাহাব। ভিড়ের কারণে সেখানে পড়া সম্ভব না হলে আশে পাশে পড়ে নিবেন। তাও সম্ভব না হলে দূরবর্তী যেখানে সম্ভব পড়ে নিবেন। তখন নিষিদ্ধ বা মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে তওয়াফ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এ নামায পড়ে নেয়া সুন্নাত। আর তখন নিষিদ্ধ ওয়াক্ত বা মাকরূহ ওয়াক্ত হলে তখন পড়বেননা বরং পরে সহীহ ওয়াক্তে পড়ে নিতে হবে। মাকামে ইবরাহীমের কাছে যেখানে নামায পড়বেন সেখানে এসে وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى আয়াতটি পড়বেন। তারপর দুই রাকআত নামায পড়বেন। এই নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন

এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পড়ুন। এই নামাযের পরও দুআ কবূল হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, 'মাকামে ইবরাহীম' একটি বেহেশ্‌তী পাথরের নাম, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা শরীফের উঁচু দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। তখন প্রয়োজন অনুসারে এ পাথরটি আপনা আপনি উপরে নিচে উঠানামা করত। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কদম মুবারকের চিহ্ন রয়েছে। পাথরটি কা'বা শরীফের পূর্ব দিকে একটি পিতলের জালির মধ্যে রাখা অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

* তওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়ার পর যমযম কুয়ার নিকট গিয়ে যমযমের পানি পান করা এবং দুআ করা মোস্তাহাব। এটাও দুআ কবূল হওয়ার স্থান। (উল্লেখ্য, আজকাল যমযম কুয়ার নিকটে যাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আশপাশ থেকেই যমযমের পানি পান করে নিন।)

* যমযমের পানি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে পান করা মোস্তাহাব। এ পানি দঁড়িয়ে বসে উভয়ভাবে পান করা যায় (১/□□ شامی)। যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়।

**اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ.**

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাই উপকারী জ্ঞান এবং প্রশস্ত রিযিক, আর সব রোগ-ব্যাধি থেকে শেফা। (مستدرك حاكم)

এ পর্যন্ত তওয়াফ ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পন্ন হল।

## সায়ীর তরীকা ও মাসায়েল

(সাফা ও মারওয়া নামক দু'টি পাহাড়ের মাঝে বিশেষ নিয়মে সাতটা চক্কর দেয়াকে সায়ী বলা হয়।)

* তওয়াফ ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী শেষ করার পর সায়ী করার উদ্দেশ্যে ছাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে তওয়াফে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী চুমু দিয়ে যাবেন। এটা মোস্তাহাব। এটা হবে নবম চুমু দেয়া।

* তওয়াফের পর বিলম্ব না করেই সায়ী করা সুন্নাত।

* সায়ী করার জন্য 'বাবুস সাফা' অর্থাৎ, সাফা দরজা দিয়ে বের হওয়া মোস্তাহাব। অন্য যেকোনো দরজা দিয়ে বের হওয়া জায়েয। মনে রাখতে



হবে এখান থেকে বের হওয়ার সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার নিয়ম ও দুআগুলোও আমল করতে হবে। তার জন্য দেখুন ১৮৪ পৃষ্ঠা।

* তারপর সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী গিয়ে এই দুআ পড়া মোস্তাহাব–

**اَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.** (مناسك على القاري)

* সাফা পাহাড়ের এতটুকু উঁচুতে উঠবেন যেন বাবুস সাফা দিয়ে কা'বা শরীফ নজরে আসে, এর চেয়ে বেশি উপরে উঠা নিয়মের খেলাফ বরং এতটুকুই উপরে উঠা সুন্নাত। পুরুষদের ভিড় থাকলে মহিলাগণ উঁচুতে উঠবেন না।

* কা'বা শরীফ নজরে আসলে কা'বার দিকে নজর করে দুআ করার সময় যে রকম হাত উঠানো হয় সে রকম করে দুই হাত কাঁধ বরারব উঠিয়ে (কান পর্যন্ত হাত উঠানো ভুল এবং সুন্নাতের খেলাফ) তিন বার আওয়াজ সহকারে নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন। এটা মোস্তাহাব।

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.** (رد المحتار و مناسك على القارى)

তারপর আস্তে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দুআ করুন। এটাও দুআ কবূল হওয়ার স্থান।

* সায়ীর নিয়ত করে নেয়াও উত্তম।

* অতঃপর দুআ কালাম পাঠ করতে করতে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হোন। যথাসম্ভব মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে সায়ী করার চেষ্টা করবেন। স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকুন। মাঝখানে সবুজ বাতির ছাউনি দেয়া স্থান নজরে পড়বে, এই স্থানটুকু পুরুষের জন্য কিছুটা দ্রূত গতিতে চলা সুন্নাত– একেবারে দৌড়ে নয়। নারীগণ এ স্থানেও স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। এ স্থানটুকু পার হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন-

**رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.** (مصنف ابن ابى شيبة)

অর্থ: হে আমার রব, তুমি ক্ষমা কর এবং রহমত দান কর, তুমি তো সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশালী। সবচেয়ে বড় মেহেরবান!

পুরুষগণ ভিড়ের কারণে দ্রূত চলা সম্ভব না হলে ভিড় কমার অপেক্ষা করবেন। এই মধ্যবর্তী স্থানটুকু পার পাওয়ার পর আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে চলতে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছান। মারওয়া পাহাড়ের সামান্য উঁচুতে উঠে কা'বামুখী হয়ে পূর্বের ন্যায় হাত উঠিয়ে তিনবার নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন এবং অন্যান্য দুআ করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. (رد المحتار مطلب فى السعى بين الصفا والمروة)

* সাফা থেকে এই মারওয়া পর্যন্ত আপনার এক চক্কর হয়ে গেল। আবার এখান থেকে সাফা পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে যাবেন তাতে দ্বিতীয় চক্কর হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর দিবেন, তাতে মারওয়ার উপর এসে আপনার সপ্তম চক্কর শেষ হবে। সাফা থেকে আবার সাফা পর্যন্ত এক চক্কর হিসাব করবেন না, তাতে চৌদ্দ চক্কর হয়ে যাবে– সেটা ভুল।

* মহিলাগণ মাসিক অবস্থায় সায়ী করতে পারেন। তবে পবিত্র হওয়ার পরই সায়ী করা সুন্নাত।

* সায়ীর চক্কর কয়টা হল এ নিয়ে সন্দেহ হলে কমটা ধরে নিয়ে বাকিটা পূর্ণ করতে হবে।

* আন্ডারগ্রাউন্ডে, উপরে দ্বিতীয় তলায় এবং ছাদেও সায়ীর জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব স্থানেও সায়ী করা যেতে পারে।

* সায়ীর সপ্তম চক্কর শেষ হওয়ার পর মসজিদে হারামের ভিতর এসে দুই রাকআত নফল নামায পড়া মোস্তাহাব, যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়।

এ পর্যন্ত আপনার সায়ীর কার্যাবলী শেষ হল। যদি এটা আপনার উমরার সায়ী হয়ে থাকে তাহলে এখন আপনি মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেঁটে এহ্‌রাম খুলতে পারেন।

## মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছাঁটার মাসায়েল

* এহরাম খোলার জন্য মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব। মাথা মুণ্ডানোকে 'হলক' এবং চুল ছাঁটাকে 'কছর' বলা হয়। চুল ছাঁটার চেয়ে মাথা মুণ্ডানো উত্তম।

* মাথার কম পক্ষে এক চতুর্থাংশ চুল মুণ্ডালে বা ছাঁটালে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে তবে তা মাকরূহ তাহরীমী। বরং পুরো মাথা মুণ্ডানো বা পুরো মাথার চুল ছাঁটাই মোস্তাহাব বা উত্তম।



* মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো হারাম। তারা কছর করবেন অর্থাৎ, চুল ছাঁটাবেন।

* চুল ছাঁটার ক্ষেত্রে চুলের লম্বার দিক থেকে আঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ ছাঁটা জরুরি; সাবধানতার জন্য একটু বেশি ছেঁটে নিতে হবে। পুরুষের চুল যদি এত ছোট হয় যে, আঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ ছাঁটা যায় না, তাহলে মুণ্ডানো জরুরি। মাথায় চুল একেবারে না থাকলে মাথার উপর দিয়ে ক্ষুর বা ব্লেড শুধু চালিয়ে নিতে হবে।

* মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটার সময় কেবলামুখী হয়ে বসে নিজের ডান দিক থেকে মুণ্ডানো বা ছাঁটানো শুরু করতে বা করাতে পারলে উত্তম।

* নাপিত দ্বারা বা নিজেই চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা যায়। আপনার মত যার এখন মাথা মুণ্ডিয়ে বা চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার মুহূর্ত, তার দ্বারাও মুণ্ডানো বা ছাঁটানো যায়।

* হলক বা কছর করা হলেই এহ্‌রাম শেষ হয়ে যাবে। এখন এহ্‌রামের অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়ে যাবে।

## ৮ই যিলহজ্জ মিনায় গমন ও সেখানে অবস্থানের মাসায়েল

* ৮ই যিলহজ্জ থেকে হজ্জের প্রস্তুতি শুরু হবে। হজ্জের এহরাম বাঁধা না থাকলে এহরাম বাঁধতে হবে। এহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুরুষদের জন্য মসজিদে হারামে গিয়ে এই এহ্‌রাম বাঁধা মোস্তাহাব। এহ্‌রাম বেঁধে মিনায় যেতে হবে। আজকাল ৭ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতেই মুআল্লিমের গাড়ীতে হাজীদেরকে মিনায় পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়, তাই যারা মুআল্লিমের গাড়ীতে মিনায় যাবেন তারা ৭ই তারিখেই এহ্‌রাম বেঁধে নিবেন। এহ্‌রামের পর তালবিয়া শুরু হবে। তওয়াফে যিয়ারত–এর পর (ওয়াজিব) সায়ী করার সময় প্রচণ্ড ভিড় হতে পারে, সেই ভিড়ে সায়ী করতে না চাইলে এখন এহ্‌রামের পর একটি নফল তওয়াফ করে (এহরাম না বাঁধলে হবে না।) সেই সায়ী অগ্রিম করে নিতে পারেন। এরূপ করলে পুরুষদের জন্য এই নফল তওয়াফে রমল ও এজতেবাও করতে হবে। তবে তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য তওয়াফে যিয়ারতের সায়ী অগ্রিম না করে তওয়াফে যিয়ারতের পরেই করা উত্তম।

* ৮ই যিলহজ্জের জোহর, আসর মাগরিব, ইশা এবং ৯ই যিলহজ্জের ফজর সর্বমোট এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া মোস্তাহাব এবং ৮ই

যিলহজ্জের রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। মিনায় যথাসম্ভব মসজিদে খায়েফের কাছাকাছি অবস্থান করা উত্তম।

* ৮ই যিলহজ্জের পূর্বে যদি আপনি মক্কা শরীফে মুকীম হিসাবে অন্তত ১৫ দিন অবস্থান করে থাকেন, তাহলে মিনায় এমনিভাবে আরাফায় এবং মুযদালিফায়ও পুরা নামায পড়বেন, আর তা না হলে এসব স্থানেও কছরের বিধান চলবে। (উল্লেখ্য, এ মাসআলায় সম্প্রতি কিছু মুফতী ভিন্ন মত পোষণ করছেন। এ সম্বন্ধে আপনার আস্থা হয়– এমন মুফতী থেকে ভালভাবে বিষয়টি বুঝে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করতে পারেন।)

## ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় গমন ও উকূফে আরাফার মাসায়েল

* ৯ই যিলহজ্জ পূর্বের আকাশ বেশ উজালা হওয়ার পর ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয়ের সামান্য কিছু পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। এখানে আরও একটি মাসআলা স্মরণ রাখতে হবে। তা হল ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জের আসর পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩৬০ পৃষ্ঠা। নামাযের পর প্রথম তাকবীরে তাশরীক বলবেন তারপর তালবিয়া পড়বেন।

* আরাফায় যাওয়ার পথে তালবিয়া পড়তে পড়তে, দুআ ও যিকির করতে করতে, অত্যন্ত খুশু-খুযুর সাথে চলতে থাকুন।

* আরাফার ময়দানে অবস্থিত জাবালে রহমতের উপর দৃষ্টি পড়তেই এই দুআ পড়া মোস্তাহাব–

**اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ تَوَجَّهْتُ اِلَيْكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، وَاَعْطِنِىْ سُؤْلِيْ، وَوَجِّهْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.**

* এ সময় দুআ করুন। এটা দুআ কবূল হওয়ার সময়।

* তারপর তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করুন।

* আরাফার ময়দানে জাবালে রহমত পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থান করতে পারলে ভাল, তবে পাহাড়ে আরোহণ করবেন না। 'বাত্নে উরনা' (আরাফার ময়দানের একটি অংশের নাম, যার কিছু অংশ মসজিদে নামিরার ভিতর কেবলার দিকে পড়েছে) ব্যতীত আরাফার যেকোনো স্থানে অবস্থান করা যায়।



* সূর্য ঢলা থেকে উকূফে আরাফা শুরু এবং সূর্য অস্ত গেলে উকূফে আরাফা শেষ হবে। উকূফে আরাফা হজ্জের অন্যতম ফরয।

* আরাফায় পৌঁছার পর তালবিয়া, দুআ ও দুরূদ শরীফ পাঠ বেশি বেশি করতে থাকবেন, সূর্য ঢলার পূর্বেই খানা পিনা থেকে ফারেগ হয়ে যাবেন। সূর্য ঢলার পর গোসল করা উত্তম, না পারলে অন্তত উযূ করে নিবেন।

* যারা তাঁবুতে নামায পড়বেন তারা জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসরের নামায পড়বেন। মসজিদে নামিরায় জোহরের এবং আসরের নামায একত্রে জোহরের ওয়াক্তে পড়ে নেয়া হয়, কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে এরূপ করা জায়েয। তবে যদি মসজিদে নামিরার ইমাম মুকীম হওয়া সত্ত্বেও কসর পড়েন, এরূপ অবস্থায় হানাফী মাযহাব অনুসারীদের নামায তাঁর পিছনে সহীহ হবে না।

* উকূফে আরাফার সময় যথাসম্ভব দাঁড়িয়ে থাকা এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তালবিয়া, তাসবীহ-তাহলীল, দুরূদ পাঠ ও দুআ করতে থাকা মোস্তাহাব। না পারলে বসে বসে বা শুয়ে শুয়ে এগুলো করলেও চলবে। নিদ্রা এসে গেলেও অসুবিধা নেই, তবে বিনা ওজরে নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ।

* মহিলাগণ হায়েয/নিফাস অবস্থায় থাকলেও উকূফে আরাফা করে নিবেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

* সূর্যাস্তের পূর্বে কোনোক্রমেই আরাফা ময়দানের সীমানা ত্যাগ করা যাবে না। করলে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানার মধ্যে ফিরে আসা কর্তব্য। না ফিরলে জরিমানা স্বরূপ দম দিতে হবে।

* সূর্যাস্ত গেলে মাগরিবের নামায না পড়ে যথাসম্ভব বিলম্ব না করেই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। বিনা ওজরে রওনা দিতে বিলম্ব করা মাকরূহ। এই মাগরিবের নামায মুযদালিফায় গিয়ে ইশার ওয়াক্তে পড়তে হবে।

## মুযদালিফায় গমন ও উকূফে মুযদালিফার মাসায়েল

* (৯ই যিলহজ্জ) সূর্যাস্ত যাওয়ার পর আরাফায় বা রাস্তায় কোথাও মাগরিবের নামায না পড়ে সোজা মুযদালিফার দিকে চলুন। তালবিয়া, তাকবীর, দুরূদ ও দুআ পাঠ করতে করতে চলুন।

* ধাক্কাধাক্কিতে কারও কষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে কিছু দ্রুত গতিতে চলা উত্তম। গাড়ীতেও যাওয়া যায়।

* মুযদালিফার নিকটবর্তী য়েয়ে গাড়ীতে এসে থাকলে নেমে পায়ে হেঁটে মুযদালিফায় প্রবেশ করা মোস্তাহাব। সম্ভব হলে মুযদালিফায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব। মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে এক আযান ও এক ইকামতে প্রথমে মাগরিবের ফরয তারপর ইশার ফরয পড়ুন তারপর মাগরিবের ও ইশার সুন্নাত তারপর বেতর পড়ুন। (প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়ার কথাও স্মরণ রাখবেন।) এখানে মাগরিবের নামায ইশার ওয়াক্তে পড়া হলেও কাযার নিয়ত নয় বরং ওয়াক্তিয়ার নিয়ত করবেন। এখানে উভয় ওয়াক্তের নামায জামাআত সহকারে পড়া উত্তম। একাকী পড়লেও উপরোক্ত নিয়মে পড়বেন।

* মাগরিব ও ইশার নামায পড়ার পর সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এ রাত্রে জাগরণ করা এবং নামায, তিলাওয়াত, দুআ ইত্যাদিতে মশগুল থাকা মোস্তাহাব। কারও কারও মতে এ রাতে শবে কদর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

* সুব্‌হে সাদেক থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত অন্তত কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। (মহিলা, বৃদ্ধ ও মাজূরদের জন্য ওয়াজিব নয়।)

* সুব্‌হে সাদেক হওয়ার পর উকূফে মুযদালিফার জন্য গোসল করা মোস্তাহাব। সম্ভব হলে গোসল করে নিন।

* সুব্‌হে সাদেক হওয়ার পর আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে নেয়া উত্তম এবং জামাআত সহকারে পড়া উত্তম। নামাযের পর যিকির এস্তেগফার ও মুনাজাতে মশগুল থাকবেন। সূর্যোদয়ের ২/৪ মিনিট পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

* পুরুষগণ সুব্‌হে সাদেকের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করলে ওয়াজিব তরক হওয়ার কারণে গোনাহ হবে এবং দমও দিতে হবে।

* মুযদালিফা থেকে ছোলা-বুটের সমান ৭০টি কংকর সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন, এগুলো মিনায় জামরাতে নিক্ষেপ করা হবে। এ কংকর মিনা থেকেও সংগ্রহ করা যায়, তবে কংকর নিক্ষেপের জায়গা থেকে নেয়া নিষেধ।

## ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত সময়ের আহকাম

* ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে মুযদালিফা থেকে রওনা হয়ে মিনায় এসে সামানপত্র সাথে থাকলে তা হেফাজতে রেখে বড় জামরায় (যা



মসজিদে খায়েফ থেকে দূরবর্তী এবং মক্কা শরীফের দিকে নিকটবর্তী) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এই কংকর নিক্ষেপ করার সুন্নাত সময় হল ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত, আর সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত হল জায়েয সময় এবং সূর্যাস্ত যাওয়ার পর থেকে পরবর্তী সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত মাকরূহ সময়, তবে মহিলা ও মাজূরদের জন্য মাকরূহ নয়।

* কংকর নিক্ষেপের মোস্তাহাব তরীকা হল: কংকর নিক্ষেপের সময় যে স্তম্ভে কংকর নিক্ষেপ করা হবে তার দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে মিনাকে ডান দিকে এবং কা'বা শরীফকে বাম দিকে রেখে স্তম্ভের অন্তত পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে (এর চেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে কংকর মারা মাকরূহ।) ডান হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা এক একটি কংকর ধরে হাত এতটুকু উঁচু করে নিক্ষেপ করবেন যেন বগল দেখা যায়। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলবেন। পারলে আরও কয়েকটি বাক্য যোগে নিম্নোক্ত দুআ পড়বেন–

**بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ، رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ، وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا، وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا، وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا.** (بيهقى)

অর্থ: মহান আল্লাহ্‌র নামে কংকর মারছি। শয়তানকে অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা করছি। হে আল্লাহ! আমার এই হজ্জ কবূল কর, গোনাহ মাফ কর এবং চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত কর।

* প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর আর তালবিয়া নেই।

* কংকর নিক্ষেপের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন স্তম্ভের নিচের দিকে চারপাশে কিছুটা উঁচু করে দেয়াল দিয়ে যে ঘেরা আছে কংকরটি তার বাইরে না পড়ে বা সজোরে স্তম্ভে লেগে বাইরে ছিটকে না যায়। যে কংকরটা এ ঘেরার মধ্যে না পড়বে সেটা বাদ বলে গণ্য হবে।

* উপর থেকে বা যেকোনো দিক থেকে কংকর নিক্ষেপ করলেও জায়েয় হবে।

* ভিড়ের ভয়ে বা কিছুটা কষ্টের ভয়ে অন্যের মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করালে ওয়াজিব আদায় হবে না। তাহলে দম দিতে হবে। অন্যের দ্বারা কংকর নিক্ষেপ করানো কেবল তখনই সহীহ হবে, যখন কংকর নিক্ষেপের

স্থানে যাওয়ার মত শক্তি সামর্থ্য না থাকে অর্থাৎ, এমন পর্যায়ের অপারগ যে, শরীআতের দৃষ্টিতে বসে নামায পড়া তার জন্য জায়েয হয়। এ পর্যায়ের অপারগ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে অপরের দ্বারা কংকর নিক্ষেপ করানোর অনুমতি নেই। কংকর নিক্ষেপের পর জামরার নিকট বিলম্ব না করেই নিজ স্থানে চলে আসবেন।

* কংকর নিক্ষেপের পর দমে শোকর বা হজ্জের শোকর স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানী নিজে গিয়েও করা যায়, কাউকে পাঠিয়েও করানো যায়। তবে ১০ই যিলহজ্জ বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা যায় না, করলে দম ওয়াজিব হবে। ইফরাদ হজ্জকারীদের জন্য এই কুরবানী ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। কুরবানীর অন্যান্য মাসায়েল সাধারণ ঈদুল আযহার কুরবানীর ন্যায়। এর জন্য দেখুন ২৮৪−২৮৭ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ্য যে, ৭ বা ৮ তারিখ মিনায় রওনা হওয়ার পূর্বে কেউ যদি মক্কায় ১৫ দিন বা তার বেশি অবস্থানের কারণে মুকীম হয়ে গিয়ে থাকে এবং সে ছাহেবে নেছাব হয়, তাহলে হজ্জের কুরবানী ব্যতীত ঈদুল আযহার কুরবানীও তার উপর ওয়াজিব হবে।

* দমে শোকর বা হজ্জের কুরবানী করার পর হলক (মাথা মুণ্ডানো) বা কছর করা (চুল ছাঁটা) ওয়াজিব। এই হলক বা কছর বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ ও কুরবানী করার পরে করা ওয়াজিব, পূর্বে করা যাবে না, করলে দম দিতে হবে। এই হলক বা কছর করার পর এহ্‌রামের পোশাক খোলা যাবে এবং এহ্‌রামের অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ ছিল তা জায়েয হয়ে যাবে। শুধু তওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে স্ত্রী সম্ভোগ হালাল হবে না। হলক বা কছর সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩১৩ পৃষ্ঠা।

*** তওয়াফে যিয়ারত** করা ফরয। ১০ই যিলহজ্জ সুব্‌হে সাদেক থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এই তওয়াফ করা যায়। তার পরে করলে মাকরূহ তাহরীমী হবে এবং দম দিতে হবে। তবে মহিলাগণ এই সময়ের মধ্যে হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে তওয়াফ করতে না পারলে পরে করবেন, তাতে তাদেরকে দম দিতে হবে না। এই তওয়াফ ১০ই যিলহজ্জেই করে নেয়া উত্তম। তওয়াফের তরীকা ও অন্যান্য মাসায়েল পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এ তওয়াফের বেলায়ও তা চলবে।



* তওয়াফে যিয়ারতের সায়ী করা ওয়াজিব। তবে পূর্বে তামাত্তুকারী নফল তওয়াফ করে বা ইফরাদ ও কেরানকারী তওয়াফে কুদূমের পর এই সায়ী অগ্রিম করে থাকলে আর এখন সায়ী করতে হবে না। যদি পূর্বে এই সায়ী করা হয়ে থাকে তাহলে তওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী থাকবে না, তাই তখন তওয়াফে যিয়ারতে রমলও করতে হবে না। আর তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে এহ্‌রামের কাপড় খুলে থাকলে এজতেবাও নেই। সায়ীর অন্যান্য মাসায়েল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ৩১১ পৃষ্ঠা।

* ১০ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত মিনায় থাকা সুন্নাত। তাই এই রাতে তওয়াফে যিয়ারত করলে তওয়াফ সেরে মিনায় ফিরে যাবেন।

* ১১ই যিলহজ্জ পর্যায়ক্রমে ছোট জামরা (সর্বপূর্বের জামরা) তারপর মধ্যম জামরা, তারপর বড় জামরায় ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন। এই কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। ছোট জামরা ও মধ্যম জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর ভিড় থেকে একটু দূরে সরে কেবলামুখী হয়ে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পড়বেন এবং দুআ করবেন। তবে বড় জামরায় নিক্ষেপের পর এরূপ করবেন না।

* ১১ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের সময় শুরু হবে সূর্য ঢলার পর থেকে, এর পূর্বে করলে আদায় হবে না। সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত হল সুন্নাত সময়, আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে দুর্বল, মাজূর ও মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়। কংকর নিক্ষেপের তরীকা ও মাসায়েল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ১১ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতও মিনায় থাকবেন।

* ১২ই যিলহজ্জ তারিখও ১১ই যিলহজ্জের ন্যায় তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। অনেকেই ১২ই যিলহজ্জ তারিখে জলদি জলদি মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে ফেলেন, অথচ এটা না জায়েয। এরূপ করলে পুনরায় সূর্য ঢলার পর তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, নতুবা দম দিতে হবে।

* ১২ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরে যাওয়া জায়েয, তবে ১৩ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মক্কায় ফিরে যাওয়া উত্তম। ১২ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চাইলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যাবেন। সূর্যাস্তের পর ফিরা মাকরূহ। তবে দুর্বল, মাজূর ও মহিলাগণ সুব্‌হে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত কারাহাত ছাড়াই

ফিরতে পারেন। আর যদি মিনার সীমানাতেই সুব্হে সাদেক হয়ে যায়, তাহলে সকলেরই জন্যে ১৩ তারিখেও তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হয়ে যায়- না করলে দম দিতে হবে।

* ১৩ই যিলহজ্জ যদি সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চান তা করতে পারেন, কিন্তু তা উত্তম নয় মাকরূহ। এ তারিখেও কংকর নিক্ষেপ করার সুন্নাত সময় হল সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। এ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সময় একেবারেই শেষ হয়ে যায়। অতএব এ দিনের কংকর অবশ্যই সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই করে নিতে হবে।

* ১২ বা ১৩ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের পর মক্কায় ফেরার সময় সুন্নাত হল 'মুহাস্সাব' নামক স্থানে (বর্তমান নাম মু'আবাদা) কিছুক্ষণ অবস্থান করা। বরং পূর্ণ সুন্নাত হল সেখানে জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায পড়া। অনন্তর কিছুক্ষণ শুয়ে বা নিদ্রা যেয়ে তারপর মক্কায় ফিরে যাওয়া। মক্কায় পৌঁছার পর বিদায়ী তওয়াফ ছাড়া হজ্জের আর কোন জরুরি কাজ বাকি নেই।

*** বিদায়ী তওয়াফ** করা ওয়াজিব। হায়েয নেফাস সম্পন্ন মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়, তবে মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে ওয়াজিব হয়ে যায়। এ তওয়াফে রমল ও এজতেবা করতে হয় না। এ তওয়াফের পর সায়ীও নেই। মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে এ তওয়াফ করতে হয়। তওয়াফ শেষে মুলতাযাম, কা'বা শরীফের দরজা, হাতীম প্রভৃতি স্থানে দুআ ও যমযমের পানি পান করে সর্বশেষ মুহূর্তে বিরহের বেদনা নিয়ে দুআ করুন, বিশেষভাবে এটাই যেন বায়তুল্লাহর শেষ যিয়ারত না হয়, আবারও যেন আসার তওফীক হয়– এই মর্মে দুআ করে বিদায় নিন।

মহিলাদের হায়েযের দিনগুলোতে রওয়ানা হতে হলে, বিদায়ী তওয়াফ না করেই রওয়ানা হবে, তাতে দম দিতে হবে না। এ অবস্থায় তারা মসজিদে হারামে প্রবেশ না করে যেকোনো দরজার দিকে বাইরে দাঁড়িয়ে দুআ করে নিবেন। এভাবে দূর থেকেই কা'বা শরীফের যিয়ারত করে বিদায় নিবে।

* তওয়াফে যিয়ারতের পর কোন নফল তওয়াফ করে থাকলেও বিদায়ী তওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়।

* বিদায়ী তওয়াফের পর আর মসজিদে হারামে যাওয়া যায় না– এ ধারণা ভুল বরং নামাযের সময় হলে সেখানে গিয়ে নামায আদায় করা, সময় সুযোগ হলে আরও নফল তওয়াফ করা জায়েয। অযথা নিজেকে এই বরকত থেকে বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়। তবে বিদায়ী তওয়াফের পর রওয়ানা করতে বিলম্ব হয়ে গেলে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আবার বিদায়ী তওয়াফ করে নেয়া মোস্তাহাব ও উত্তম।



## বদলী হজ্জের মাসায়েল

* হজ্জ ফরয হওয়ার পর যে হজ্জ করেনি বা দরিদ্র হয়ে যাওয়ার কারণে বা পঙ্গু, অন্ধ, লেংড়া প্রভৃতি রোগ কিংবা যানবাহনে বসতে অক্ষম হওয়ার মত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে বা পথ নিরাপদ না থাকার কারণে বা মহিলার মাহরাম না পাওয়ার কারণে হজ্জ করতে পারেনি মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করানোর ওছিয়াত করে যাওয়া ওয়াজিব। ওছিয়াত না করলে পাপ হবে। সামান্য অর্থের মায়ায় পড়ে হজ্জ ত্যাগ করা বা ওছিয়াত ত্যাগ করা বড়ই বোকামী।

* মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে যদি বদলী হজ্জ করানো সম্ভব হয়, তাহলে ওয়ারিছদের উপর ওছিয়াত মোতাবেক বদলী হজ্জ করানো ওয়াজিব। আর এর চেয়ে বেশী অর্থের প্রয়োজন হলে ওয়ারিছগণ রাজী খুশী হয়ে সে পরিমাণ দিতে পারে।

* মৃত ব্যক্তি ওছিয়াত না করে গেলেও যদি তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিছ বা কেউ স্বেচ্ছায় নিজের অর্থ দিয়ে বদলী হজ্জ করায় তবুও আশা করা যায় মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

* বদলী হজ্জ পুরুষদের দ্বারা করানো উত্তম এমন আলেম দ্বারা করানো উত্তম যার আমল ভাল, যিনি হজ্জের মাসায়েল সম্পর্কে ভাল অবগত এবং যিনি নিজের ফরয হজ্জ পূর্বে আদায় করেছেন।

* মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল হজ্জ বা নফল উমরা অন্যের দ্বারা করানো যায়। এমনকি জীবিত সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকেও নফল হজ্জ বা উমরা অন্যের দ্বারা করানো যায়।

* বদলী হজ্জে ইফরাদ হজ্জ করতে হবে। হজ্জ করানেওয়ালা অনুমতি দিলে কেরান হজ্জও করতে পারবে। কিন্তু কেরান হজ্জ করলে কুরবানী (দমে শোকর) হজ্জকারীর নিজের অর্থ থেকে করতে হবে। হজ্জ করানেওয়ালা অনুমতি দিলে তার অর্থ থেকেও করা যায়। হজ্জ করানেওয়ালা অনুমতি দিলে বদলী হজ্জে তামাত্তু হজ্জও করা যায়। দলীলের ভিত্তিতে এ মতটিই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। তবে এ ব্যাপারে

ভিন্ন মতও রয়েছে বিধায় এহরাম লম্বা হওয়া জনিত পরিস্থিতি সইতে পারা যাবে না– এমন না হলে তামাত্তু করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। (جواہر الفقہ ١/□□ অবলম্বনে)

* বদলী হজ্জে এহ্রাম বাঁধার সময় কার পক্ষ থেকে হজ্জের এহ্রাম বাঁধা হচ্ছে মুখে সেটা বলে নেয়া উত্তম, যদিও শুধু অন্তরে নিয়ত থাকলেও যথেষ্ঠ।

## নফল উমরা ও নফল তওয়াফের মাসায়েল

* বৎসরের পাঁচ দিন ব্যতীত যেকোনো সময় উমরার এহ্রাম বাঁধা যায়। উক্ত পাঁচ দিন হল ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ।

* রমযানে উমরা করা মোস্তাহাব ও উত্তম। হাদীছ শরীফে এসেছে, রমযানে উমরা করা হজ্জের সমতুল্য। (বোখারী ও মুসলিম)

* তামাত্তু হজ্জকারী ব্যক্তি ওয়াজিব উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার পর হজ্জের পূর্বে নফল উমরা করতে পারেন।

* এহ্রাম মুক্ত অবস্থায় যত বেশি সম্ভব নফল তওয়াফ করা উত্তম বরং হাজীদের জন্য নফল উমরার চেয়ে নফল তওয়াফ করা অধিক উত্তম।

* নফল তওয়াফে রমল ও এজতেবা নেই এবং তওয়াফের পর সায়ীও নেই। তবে তওয়াফের পর দুই রাকআত নামায পড়তে হবে যা মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া উত্তম।

* নিজের জন্য বা জীবিত কিংবা মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, উস্তাদ, পীর বুযুর্গ বা যেকোনো মুসলমানকে ছওয়াব পৌঁছানোর জন্য উমরা ও তওয়াফ করা যেতে পারে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিবিদের নামেও নফল উমরা বা নফল তওয়াফ করা যেতে পারে।

বি. দ্র. উমরা ও তওয়াফের অন্যান্য মাসায়েল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

## যেসব কারণে দম বা সদকা দিতে হয়

হজ্জ বা উমরার মধ্যে কিছু এমন ভুল-ক্রটিও হতে পারে যার কারণে দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আবার এমন কিছু ভুল-ক্রটিও হয় যার কারণে দম ওয়াজিব হয় না তবে সদকা ওয়াজিব হয়। “দম” বলতে সাধারণভাবে একটা পূর্ণ বকরী বা ভেড়া বা দুম্বা, কিংবা গরু, মহিষ ও উটের এক সপ্তমাংশ বোঝায়। আর “সদকা” বলতে সাধারণভাবে একটা ফিতরা পরিমাণ (দেখুন ২৮২ পৃষ্ঠা।) দান করাকে বোঝায় এবং একজন ফকীরকে এই পরিমাণের চেয়ে কম দেয়া যাবে না। এই দম–এর প্রাণী



হারামের সীমানার মধ্যে জবাই হওয়া জরুরি এবং কুরবানীর যোগ্য হয়ে যাওয়া জরুরি।

* এহরাম অবস্থায় মাথা, চেহারা, দাড়ি, হাত, হাতের তালু, পায়ের গোছা, রান ইত্যাদি বড় অঙ্গের পূর্ণ স্থানে খুশবু লাগালে দম ওয়াজিব হয়। নাক, কান, গোঁপ, আঙ্গুল প্রভৃতি ছোট অঙ্গেও বেশি পরিমাণ খুশবু লাগালে দম ওয়াজিব হয়। তবে ছোট অঙ্গে অল্প পরিমাণ খুশবু লাগালে দম নয় বরং সদকা ওয়াজিব হয়।

* শরীরের বিভিন্ন স্থানে খুশবু লাগালে দেখতে হবে যদি তা সব একত্র করলে বড় অঙ্গের সমপরিমাণ হয়ে যেত বলে মনে হয়, তাহলেও দম দিতে হবে।

* যদি কাপড়ে খুশবু লাগায় বা খুশবু লাগানো কাপড় পরিধান করে, তাহলে খুশবুর পরিমাণ এক বর্গবিঘত বা তার বেশি হলে এবং পূর্ণ এক রাত বা পূর্ণ একদিন পরিধান করলে দম ওয়াজিব হবে। আর খুশবুর পরিমাণ তার চেয়ে কম হলে বা পূর্ণ একরাত কিংবা পূর্ণ একদিনের চেয়ে কম সময় পরিধান করলে সদকা ওয়াজিব হবে।

* জাফরান বা কুসুম রঙ্গের কাপড় পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ একরাত পরিধান করলে দম ওয়াজিব হবে। আর তার চেয়ে কম সময় পরিধান করলে সদকা ওয়াজিব হবে।

* এহরাম অবস্থায় মহিলাগণ হাতে মেহেদি লাগালে দম ওয়াজিব হয়। পুরুষগণ পূর্ণ হাতের তালু বা সমস্ত দাড়িতে মেহেদি লাগালে দম ওয়াজিব হবে।

* পুরুষগণ শরীরের পরিমাপে বানানো হয়েছে– এমন সেলাইযুক্ত পোশাক এহরামের সময় স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ একরাত পরিমাণ সময় বা তার চেয়ে বেশি সময় পরিধান করলে দম ওয়াজিব হবে। তার চেয়ে কম সময় (সর্বনিম্ন এক ঘণ্টা) পরিধান করলে সদকা ওয়াজিব হবে। আর এক ঘণ্টার চেয়ে কম সময় পরিধান করলে নিয়মিত সদকা নয় বরং এক মুঠ গম সদকা করলে (অর্থাৎ, সামান্য কিছু পয়সা দান করলে) চলবে।

* পুরুষগণ এহ্রাম অবস্থায় পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে– এমন জুতো, বুট বা মোজা পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ একরাত পরিমাণ সময় পরিধান করে থাকলে দম ওয়াজিব হবে। তার চেয়ে কম সময় হলে সদকা ওয়াজিব হবে।

* এহ্‌রাম অবস্থায় পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ একরাত কিংবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সময় পুরো মাথা বা পুরো চেহারা কিংবা অন্তত চার ভাগের একভাগ কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব হবে। আর তার চেয়ে কম সময় হলে সদকা ওয়াজিব হবে। মহিলাদের চেহারায় কাপড় লাগানোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মাসআলা, তবে বরতন টুকরি ইত্যাদি –যা দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ঢাকা হয় না এরূপ কিছু– দ্বারা ঢাকলে (পূর্ণ মাথা, চেহারা ঢাকুক বা কম) কিছু ওয়াজিব হবে না।

* এহ্‌রাম অবস্থায় (এহ্‌রাম খোলার সময় হওয়ার পূর্বে) মাথা বা দাড়ির চুলের এক চতুর্থাংশ কিংবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মুণ্ডন করলে বা কাটলে বা উপড়ালে বা কোনো কিছু দ্বারা দূর করলে দম ওয়াজিব হবে। আর তার চেয়ে কম পরিমাণ হলে সদকা ওয়াজিব হবে।

* পূর্ণ ঘাড় বা পূর্ণ একটা বগল বা নাভির নিচের পশম দূর করলে দম ওয়াজিব হবে। আর তার চেয়ে কম পরিমাণ হলে সদকা ওয়াজিব হবে।

* উযূ করতে যেয়ে বা কোনোভাবে মাথা কিংবা দাড়ির তিনটি চুল পড়ে গেলে এক মুঠ গম (পরিমাণ) সদকা করবে, আর ইচ্ছাকৃত উপড়ালে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে এক মুঠ পরিমাণ দিতে হবে। আর তিনের অধিক চুল উপড়ালে পূর্ণ সদকা দিতে হবে।

* পূর্ণ সীনা বা পূর্ণ পায়ের নলার চুল মুণ্ডালে সদকা ওয়াজিব হয়।

* রান্না করতে গিয়ে কিছু চুল জ্বলে গেলে সদকা করবে।

* রোগের কারণে চুল পড়ে গেলে বা ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বলে গেলে কিছু ওয়াজিব হয় না।

* এহরামের অবস্থায় হালাল ব্যক্তির মাথা মুণ্ডন করে দিলে মুহ্‌রিম (এহ্‌রামরত) ব্যক্তি যৎ সামান্য কিছু দান করবে।

* কোনো মুহ্‌রিম (এহ্‌রাম রত ব্যক্তি) অন্য কোনো মুহ্‌রিম বা হালাল ব্যক্তির গোঁপ মুণ্ডন করে বা কেটে দিলে কিংবা নখ কেটে দিলেও কিছু পরিমাণ (যা ইচ্ছা হয়) সদকা করে দিবে।

* এহ্‌রাম অবস্থায় এক হাত বা এক পা, কিংবা দুই হাত বা দুই পা, অথবা চার হাত পায়ের নখ একই মজলিসে কাটলে একটা দম ওয়াজিব হয়। চার মজলিসে চার অঙ্গের নখ কাটলে চারটা দম ওয়াজিব হয়। দুই মজলিসে দুই হাতের নখ কাটলে দুটো দম ওয়াজিব হয়।



* পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কাটলে বা পাঁচ আঙ্গুলের নখ ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে কাটলে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে চার হাত পায়ের ষোলটা নখ কাটলে প্রত্যেকটা নখের বদলে এক একটা সদকা দিতে হবে। অবশ্য সবগুলো সদকার মূল্য একত্রে একটা দমের মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে গেলে কিছুটা কম করে দিবে।

* ভাঙ্গা নখ কাটলে কিছু দেয়া ওয়াজিব হয় না।

* শাহওয়াত (উত্তেজনা) সহকারে কোনো নারী বা বালককে চুমু দিলে কিংবা পরস্পরে লজ্জাস্থান মিলিত করলে দম ওয়াজিব হয়, বীর্যপাত হোক বা না হোক। তবে হজ্জ ফাসেদ হবে না।

* শাহওয়াত (উত্তেজনা) সহকারে কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কারণে বা মনে মনে কল্পনা করার কারণে বীর্যপাত হলে বা স্বপ্নেদোষ হলে কিছু ওয়াজিব হয় না। তবে গোসল ওয়াজিব হয়।

* হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটালে কিংবা কোনো প্রাণী কিংবা শাহওয়াতের অযোগ্য ছোট মেয়ের সাথে সঙ্গম করলে এবং বীর্যপাত হলে দম ওয়াজিব হবে। বীর্যপাত না হলে কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে গোনাহ তো হবেই।

* উকূফে আরাফা-র পূর্বে সঙ্গম করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক দম ওয়াজিব হবে। নারী পুরুষ উভয়ে মুহ্‌রিম হলে উভয়ের উপর পৃথক পৃথক দম ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে এ বৎসরও অবশিষ্ট হজ্জের ক্রিয়াদি যথারীতি আদায় করতে হবে। পরবর্তী বৎসর হজ্জের কাযা আদায় করতে হবে।

* উকূফে আরাফা-র পর মাথা হলক বা কছর ও তওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে সঙ্গম করলে হজ্জ ফাসেদ হবে না তবে পূর্ণ একটা গরু বা উট দম দিতে হবে। মাথা হলক বা কছর করার পর এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সঙ্গম হলেও মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে অনুরূপ পূর্ণ একটা গরু বা উট দম দিতে হবে।

* জানাবাত বা হায়েয নেফাস অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করলে পূর্ণ গরু বা উট দম দিতে হবে।

* কারেন (কেরান হজ্জকারী) ব্যক্তি উমরা-র তওয়াফ এবং উকূফে আরাফা-র পূর্বে সঙ্গম করলে হজ্জ উমরা উভয়টা ফাসেদ হয়ে যাবে এবং দুটো দম ওয়াজিব হবে। আর আগামীতে হজ্জ উমরা উভয়টা কাযা করতে হবে।

* উমরা করনেওয়ালা তওয়াফের পর সায়ীর পূর্বে কিংবা তওয়াফ ও সায়ীর পর মাথা হলক বা কছর করার পূর্বে সঙ্গম করলে উমরা ফাসেদ হয় না তবে দম দিতে হয়।

* এহ্রাম অবস্থায় একটা উকুন মারলে রুটির এক টুকরা অথবা একটা খেজুর দান করবে এবং দুটো বা তিনটা উকুন মারলে এক মুঠ গম (এর পরিমাণ) দান করবে। আর তিনের অধিক উকুন মারলে পূর্ণ একটা সদকা দিতে হবে। উকুন মারার জন্য কাপড় রৌদ্রে দিলে বা উকুন মারার উদ্দেশ্যে কাপড় ধৌত করলে এবং উকুন মারা গেলেও একই মাসায়েল। অন্যের দ্বারা উকুন মারানো বা ধরে মাটিতে জীবিত ছেড়ে দেয়াও অনুরূপ।

* ৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ময়দানের সীমানা ত্যাগ করলে এবং পুনরায় ময়দানের সীমানার মধ্যে ফিরে না এলে দম দিতে হবে।

* পুরুষগণ সুব্হে সাদেক হওয়ার পূর্বে মুযদালেফা ময়দান ত্যাগ করলে দম দিতে হবে।

* যদি কেউ সব কয়দিনের রমী (কংকর নিক্ষেপ) পরিত্যাগ করে অথবা এক দিনের রমী পূর্ণ পরিত্যাগ করে কিংবা এক দিনের রমী-র অধিকাংশ পরিত্যাগ করে (যেমন: দশ তারিখে ৪টা কংকর কম নিক্ষেপ করল কিংবা অন্য যেকোনো দিন ১১টা কংকর কম নিক্ষেপ করল) তাহলে এ সকল অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক দিনের রমী থেকে অল্প সংখ্যক কংকর কম থেকে যায় তাহলে প্রত্যেক ছুটে যাওয়া কংকরের বদলায় একটা পূর্ণ সদকা ওয়াজিব হবে। তবে সব সদকা একত্রে একটা দম-এর সমমূল্যের হয়ে গেলে কিছুটা কম করে দিবে।

* কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য দমে শোকর বা হজ্জের কুরবানী করা ওয়াজিব। না করলে দম দিতে হবে।

* কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য ১০ই যিলহজ্জ প্রথম বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ, তারপর কুরবানী ও তারপর মাথা মুন্ডানো-এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ইফরাদ হজ্জকারী-র জন্য প্রথমে কংকর নিক্ষেপ তারপর মাথা মুণ্ডানো– এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এই তারতীবের মধ্যে ওলট পালট হলে দম ওয়াজিব হবে।

* ১১ও ১২ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করলে পুনরায় সূর্য ঢলার পর কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। না করলে দম দিতে হবে।



* মীনার সীমানাতেই ১৩ই যিলহজ্জের সুব্হে সাদেক হয়ে গেলে ১৩ই তারিখেও তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। না করলে দম দিতে হবে।

* বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজেব। না করলে দম দিতে হবে।

* এহ্রাম অবস্থায় হারামের সীমানার ভিতরে বা বাইরে যে কোন স্থানে স্থলভাগে জন্মগ্রহণকারী প্রাণী শিকার করা হারাম। আর এহরাম অবস্থায় না থাকলে শুধু হারামের সীমানার ভিতরে এরূপ প্রাণী শিকার করা হারাম। এরূপ (হারাম) শিকার করলে উক্ত প্রাণীর স্থানীয় মূল্য (যা শিকারী ব্যতীত অন্য দু'জন বা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তখনকার বাজার দর হিসাবে নির্ধারণ করবে।) গরীব সিমকীনদেরকে দান করবে অথবা তা দ্বারা প্রাণী ক্রয় করে হারামের সীমানার ভিতরে জবাই করে দিবে কিংবা তা দ্বারা গম ক্রয় করে মিসকীনদেরকে দিবে। এই টাকা বা গম দেয়ার ক্ষেত্রে একজনকে এক ফিতরা পরিমাণ দিবে। অবশিষ্ট কিছু এক ফিতরা পরিমাণের চেয়ে কম রয়ে গেলে বা শিকারকৃত প্রাণীর মূল্যই এত কম হলে তা-ই একজনকে দিবে। একজন মিসকীনকে দেয় পরিমাণের বদলে একটা করে রোযা রাখলেও চলবে। এ রোযা যেকোনো স্থানে রাখা চলে।

* যে সমস্ত গাছ সাধারণত কেউ রোপন করে না– এমন কোনো গাছ হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে আপনা-আপনি জন্মালে তা কাটা বা ভাঙ্গা নিষেধ। কাটলে বা ভাঙ্গলে তার মূল্য দান করা ওয়াজিব।

বি. দ্র. যেসব ভুল-ক্রটির কারণে দম ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা যদি কোন ওজরবশত হয়, তাহলে দম-এর পরিবর্তে ছয়টা ফিতরা পরিমাণ অর্থ ছয়জন মিসকীনকে দান করলে বা তিনটা রোযা রাখলেও চলবে। তবে বিনা ওজরে হলে দমই দিতে হবে। আর যেসব ভুল-ক্রটির কারণে সদকা ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে তা যদি ওজরবশত হয়, তাহলে 'সদকা'-এর পরিবর্তে তিনটা রোযা রাখলেও চলবে, তবে বিনা ওজরে হলে সদকাই দিতে হবে। ওজর বলতে বোঝানো হয়েছে–

(১) যেকোনো ধরনের জ্বর,
(২) প্রচণ্ড গরম বা প্রচণ্ড শীত,
(৩) জখম,
(৪) পূর্ণ মাথায় বা অর্ধেকে বেদনা,

(৫) মাথায় খুব বেশি উকুন হওয়া,
(৬) ঢুস লাগানো,
(৭) রোগ বা শীতের কারণে মৃত্যুর প্রবল ধারণা হয়ে যাওয়া এবং
(৮) যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়া।

## মক্কা মুকার্‌রমায় যিয়ারতের বিশেষ কয়েকটি স্থান

### ১. মাকবারাতুল মুআল্লাত/জান্নাতুল মুআল্লা

এটি মক্কার কবরস্থান। এ কবরস্থান যিয়ারত করা মোস্তাহাব। এখানে সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্গদের কবর রয়েছে। হযরত খাদীজা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর কবরও এখানে রয়েছে। এ কবরস্থানটি হারাম শরীফ থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর পাশে রয়েছে মসজিদে জিন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

* কবরস্থানে প্রবেশ করে সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্ন বাক্যে সালাম করবে–

**اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَنَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةُ.** (احسن الفتاوى ج/٤)

অর্থ: হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আবাস স্থলের অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য শান্তির আবেদন করছি।

* অতঃপর যথাসম্ভব কুরআন শরীফ পড়ে মাইয়েতকে ছওয়াব পৌঁছে দিবে। বিশেষভাবে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফ্‌লিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরছী, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা ফাতেহা, সূরা ইয়াসীন, সূরা মূল্‌ক, সূরা তাকাছুর বা সূরা এখলাস ১০/১১/১২ বার কিংবা ৭ বার বা যে পরিমাণ সহজে পড়তে পারেন পড়ে দুআ করবেন। মাইয়েতের মাগফিরাতের জন্যও দুআ করবেন। (مناسك ملا علي القاري)

### ২. মাওলিদুন্নবী বা নবী (সা.)-এর জন্মস্থান

এটি হারাম শরীফের পূর্ব দিকের চত্বরের পূর্বে অবস্থিত। বর্তমানে এটিকে একটি পাঠাগার বানিয়ে রাখা হয়েছে। এ স্থানটিই রসূল সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ। আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ–এর মাতা খাইযুরান এস্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে (১৩৭০ হিজরী মোতাবেক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে) শায়খ আব্বাস ক্বাত্তান (রহ.) সেটিকে ভেঙ্গে একটি পাঠাগার বানান। বর্তমানে (২০১৪ ইং) সেই পাঠাগারটিই রয়েছে।

### ৩. জাবালে ছওর

এটি মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত একটি পাহাড়। হিজরতের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)সহ তিন রাত এ পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় অবস্থান করেছিলেন। যে গুহাকে 'গারে ছওর' বলা হয়।

### ৪. জাবালে নূর ও গারে হেরা

মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম জাবালে নূর। পাহাড়টি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৮১ মিটার উঁচু। এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহাকে বলা হয় 'গারে হেরা' বা 'হেরা গুহা;। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এখানেই সর্বপ্রথম ওহী নাযেল হয়েছিল।

### ৫. মুযদালিফার ময়দান

এটি একটি ময়দান। এর এক প্রান্তে মসজিদে মাশআরুল হারাম রয়েছে। যাকে মুযাদালিফার মসজিদ বলা হয়। মুয্‌দাফিলা শব্দের অর্থ নিকটবর্তী বা রাতের অংশ। জাহিলী যুগের লোকেরা এখানে জড় হয়ে বংশীয় গৌরবগাথা ও বীরত্ব বর্ণনায় লিপ্ত হত। ইসলাম তার পরিবর্তে এখানে জড় হয়ে যিক্‌র তথা আল্লাহ্‌র বড়ায়ী বর্ণনা করার শিক্ষা দিয়ে সেই কুসংস্কারের মূলোৎপাঠন করেছে। (احکام اسلام عقل کی نظر میں)

### ৬. আরাফাত ময়দান

এখানে মসজিদে নামিয়া রয়েছে। আরাফাত শব্দের অর্থ পরিচিতি। এক বর্ণনা মতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাত থেকে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবতরণের পর এ ময়দানে দুজনের মধ্যে সাক্ষাত ও পরিচিতি ঘটেছিল বলে এ ময়দানকে আরাফার ময়দান বলা হয়। আর এক বর্ণনামতে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে হজ্জের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেয়ার পর এখানে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের পরিচিতি লাভ করেছেন কি? এ থেকেই এখানের নাম হয় আরাফাত। (القاموس المحيط)

### ৭. মিনা ও মসজিদে খায়েফ

মসজিদে হারাম থেকে পূর্ব দিকে ৭ কিলোমিটার (সুড়ং পথে ৪ কিলোমিটার) দূরত্বে অবস্থিত মিনার ময়দান। এ ময়দানের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ পাশে মসজিদে খায়েফ রয়েছে, যাতে বহু নবী ইবাদত-বন্দেগী করেছেন। 'মুসনাদে বায্যার' নামক হাদীছের কিতাবে এক সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এখানে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে। এ ময়দানের উত্তর পূর্ব দিকে কুরবানীর স্থান।

### ৮. মসজিদে জিন

এখানে জিনগণ হাজির হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিল। আর এক বর্ণনামতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়ার সময় হযরত ইব্নে মাসঊদ (রা.)কে এখানে রেখে যান। (مناسك ملا علي القاري) এটি জান্নাতুল মুআল্লার গেট থেকে সামান্য উত্তর পূর্বে অবস্থিত। এ মসজিদের আর এক নাম মসজিদে হার্‌ছ।

### ৯. মসজিদে তানঈম/মসজিদে আয়েশা

হযরত আয়েশা (রা.) এখান থেকে উমরার এহ্‌রাম বেঁধে উমরা করেছিলেন। হাজীগণ সাধারণত এখানে গিয়ে এহরাম বেঁধে এসে উমরা করে থাকেন। এ মসজিদটি মসজিদে হারাম থেকে উত্তর দিকে মদীনা রোডে মসজিদে হারাম থেকে ৭০৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

### ১০. মুআবাদা

এটি মক্কার একটি স্থান। এখানে কুরায়শ ও বনূ কিনানা গোত্রের লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরায়শদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য বনু মুত্তালিব ও বনু হাশেমকে চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বনূ মুত্তালিব এবং বনু হাশেম শিআবে আবী তালিবে (বর্তমান নাম শিআবে আলী) অন্তরীণ হয়ে পড়েন। মুআবাদা নামক বর্তমান এ স্থানটির প্রাচীন অনেকগুলো নাম ছিল। তা হল– আব্‌তাহ, বাত্‌হা, বাত্‌নে মুহাস্‌সাব ও খায়ফে বনী কিনানা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে এখানে অবস্থান করেছিলেন।



### ১১. জাবলে আবী কুবায়ছ

এটি একটি পাহাড়। এ পাহাড়টি মসজিদে হারামের দক্ষিণ পূর্ব পাশে অবস্থিত, যার কিছু অংশ কেটে পূর্বের চত্বরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট অংশের উপর রাজপ্রাসাদ রয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় থেকে হাজরে আসওয়াদ এ পাহাড়ের উপর রাখা ছিল। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী 'মুজাহিদ' (রহ.)–এর বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের মধ্যে সর্বপ্রথম এ পাহাড়টি সৃষ্টি করেন।

## মদীনা মুনাওয়ারা-র যিয়ারত

* মদীনা মুনাওওয়ারা যিয়ারত করা হজ্জের অংশ নয় তবে একটা শ্রেষ্ঠতম ছওয়াবের কাজ এবং বরকত, মর্যাদা ও উন্নতি লাভের একটা শ্রেষ্ঠ ও বড় মাধ্যম। বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই মোবারক যিয়ারতে মদীনার তওফীক লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের মতে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য এই যিয়ারত ওয়াজিব।

* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর যে আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করল। (مشكاة عن شعب الإيمان للبيهقي) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে গেল। (رواه ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي. قال النيموي إسناده حسن)

* মদীনা সফরের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা যিয়ারত ও মসজিদে নববীর যিয়ারত উভয়টার নিয়ত করবেন।

* মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পর থেকেই বেশি বেশি দুরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়তে থাকা আদব এবং খুব বেশি আগ্রহ, ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে অগ্রসর হতে থাকবেন।

* মদীনার নিকট পৌঁছে গেলে যওক-শওক ও দুরূদ শরীফ পাঠ আরও বৃদ্ধি করবেন।

* মদীনার শহর দৃষ্টিগোচর হলে দুরূদ সালাম পাঠ এবং দুআ করতে থাকবেন। সম্ভব হলে যানবাহন থেকে নেমে খালি পায়ে হেঁটে মদীনায় প্রবেশ করতে পারলে উত্তম।

* মদীনায় প্রবেশের পূর্বে না পারলে প্রবেশের পর গোসল করে নেয়া উত্তম। অন্তত উযূ করে নিবেন। তারপর উত্তম পোশাক পরিধান করে (নতুন কাপড় হলে ভাল) খুশবূ মেখে শহরে প্রবেশ করবেন।

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযার উপরে অবস্থিত সবুজ গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হলে ভক্তি ভালবাসা মনে জাগরূক করবেন।

* মদীনায় প্রবেশের পর থাকার জায়গা ঠিক করে মাল-সামান রেখে ও বিশেষ প্রয়োজন থাকলে তা সেরে যথাসম্ভব দ্রুত মসজিদে নববীতে গমন করবেন। মহিলাদের জন্য রাতে যিয়ারত করা উত্তম।

* মসজিদে নববীর যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায় তবে 'বাবে জিব্রীল' দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম।

* মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা প্রথমে প্রবেশ করাবেন এবং পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

* প্রবেশ করার পর রিয়াযুল জান্নাত (বেহেশতের বাগান) নামক স্থানে পৌঁছে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা না হলে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবেন। সম্ভব হলে মেহরাবে নবীর কাছে এই দুই রাকআত নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম। অতঃপর শোকর আদায় করবেন এবং যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য পূর্বেই দুআ করে নিবেন।

* অতঃপর অত্যন্ত আদব ও তাজীম সহকারে রওযার সামনে পৌঁছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়াবেন। রওযার সামনের দেয়ালে জালির মাঝে এ সোজা একটি বড় ছিদ্র আছে। (এ ছিদ্রটি রওযার সামনে দাঁড়ালে বাম দিক থেকে তিন নম্বর ছিদ্র।) একেবারে কাছে গিয়ে নয় বরং একটু দূরে দাঁড়ানো আদব। দৃষ্টি নত রাখবেন এবং মধ্যম আওয়াজে সালাম পেশ করবেন। সালাম পেশ করার সময় এই খেয়াল রাখবেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলামুখী হয়ে শুয়ে আরাম করছেন এবং সালাম কালাম শ্রবণ করছেন। নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম পেশ করা যায়–



اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا نَبِيَّ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا حَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا شَفِعَ الْمُذْنِبِيْنَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

* পারলে এ জাতীয় আরও বাক্য যোগ করা যায়। পারলে বা বেশী সময় না পেলে যতটুকু সম্ভব বলবেন, অন্তত প্রথম বাক্যটি বলবেন। অন্য কেউ সালাম পাঠিয়ে থাকলে তার পক্ষ থেকেও সালাম পেশ করবেন। অন্যের পক্ষ থেকে আরবীতে এভাবে সালাম পেশ করা যায়–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَّسْتَشْفِعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ.

এখানে প্রথম فُلَان -এর স্থলে সালাম প্রেরণকারী এবং দ্বিতীয় فُلَان -এর স্থলে তার পিতার নাম বলবেন।

* অনেকে সালাম পেশ করে থাকলে এবং সকলের নাম মনে না থাকলে বা এত বেশি সময় না পেলে সকলের পক্ষ থেকে একযোগে এভাবে সালাম পেশ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ جَمِيْعِ مَنْ اَوْصَانِيْ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ.

* অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওছীলা দিয়ে দুআ করবেন এবং শাফাআতের দরখাস্ত করবেন। আরবীতে নিম্নোক্ত বাক্যে এটা করা যায়।

يٰا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللّٰهِ فِيْ أَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ.

* অতঃপর কিছুটা ডান দিকে সরে আর একটি ছিদ্রের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ান। এবার আপনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়িয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করুন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَثَانِيَهٗ فِي الْغَارِ وَرَفِيْقَهٗ فِي الْأَسْفَارِ وَأَمِيْنَهٗ عَلَى الْأَسْرَارِ أَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرًا.

* অতঃপর আর কিছুটা ডান দিকে সরে হযরত উমর (রা.)-এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পেশ করুন। এ সোজাও জালিতে একটি ছিদ্র আছে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يٰا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ الَّذِيْ أَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الْإِسْلَامَ إِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

* তারপর পারলে আবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর রওযা মোবারকে সালাম পেশ করে তাঁর ওছীলা দিয়ে শাফাআতের জন্য দুআ করুন। সবশেষে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে প্রাণ ভরে নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দুআ করুন। এ নিয়মে সময় সুযোগ পেলেই যিয়ারত করুন।

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হুজ্‌রা (যেখানে রসূল [সা.]-এর রওযা মোবারক অবস্থিত) এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি রিয়াযুল জান্নাত বা বেহেশতের বাগান নামে পরিচিত। এ স্থানটির বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এখানে নফল পড়ুন ও তিলাওয়াত করুন। তবে নামাযের জামাআতে প্রথম কাতারের ফযীলত অগ্রগণ্যতা রাখে।

* রিয়াযুল জান্নাত অংশের মধ্যে সাতটি উস্তুওয়ানা বা স্তম্ভ রয়েছে, এগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলা হয়। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে এগুলোর পাশে নফল নামায পড়ুন। স্তম্ভ সাতটি এই–

১। **উস্তুওয়ানা হান্নানাহ:** মিম্বরে নববীর ডান পাশে অবস্থিত খেজুর বৃক্ষের গুড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। যে গুড়িটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার স্থানান্তরের সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। **উস্তুওয়ানা ছারীর:** এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ'তেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন



করা হতো। এ স্তম্ভটি হুজ্‌রা শরীফের পশ্চিম পাশে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩। **উস্তুওয়ানা উফূদ:** বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে এখানেই বসে কথা বলতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪। **উস্তুওয়ানা হার্‌ছ:** রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুজ্‌রা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কোনো না কোনো সাহাবী পাহারার জন্য এখানে বসতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারক ঘেঁষে রয়েছে।

৫। **উস্তুওয়ানা আয়েশা:** (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মসজিদে এমন একটি জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফযীলত জানতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিতো। (مجمع الزوائد ٤/١٠) স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর ভাগ্নে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্তম্ভ। এটি উস্তুওয়ানা উফূদের পশ্চিম পার্শ্বে রওযায়ে জান্নাতের ভিতর অবস্থিত।

৬। **উস্তুওয়ানা আবূ লুবাবা:** (রা.) হযরত আবূ লুবাবা (রা.) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে এই স্তম্ভের সাথে বেঁধে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে না খুলে দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না। এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর তওবা কবূল হল। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তুওয়ানা উফূদের পশ্চিম পাশে রওযায়ে জান্নাতের ভিতর অবস্থিত।

৭। **উস্তুওয়ানা জিব্রীল (আ.):** হযরত জিব্রীল (আ.) যখনই হযরত দেহ্‌ইয়া কাল্‌বী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করে রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেত।

* মসজিদে নববীতে একাধারে কেউ ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি এবং আযাব ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে বলে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات- مجمع الزوائد. ج/٤) তাই সম্ভব হলে মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে পড়ার বিশেষ চেষ্টা করা যেতে পারে।

## মদীনা মুনাওওয়ারায় যিয়ারতের বিশেষ কয়েকটি স্থান

### ১. জান্নাতুল বাকী

মদীনা শরীফের কবরস্থানের নাম 'জান্নাতুল বাকী'। মসজিদে নববীর সন্নিকটে পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আহ্‌লে বায়ত (নবী [সা.]-এর পরিবার), আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (নবী [সা.]-এর স্ত্রীগণ খাদীজা ও মায়মূনা ব্যতীত), শোহাদা, আইম্মায়ে কেরাম, ও আওলিয়ায়ে কেরাম এই কবরস্থানে সমাধিস্থ রয়েছেন। এখানে হযরত উসমান (রা.)-এর মাযার থেকে যিয়ারত শুরু করুন। অনেকের মত হল হযরত আব্বাস (রা.)-এর কবর থেকে যিয়ারত শুরু করা।

### ২. শোহাদায়ে উহুদ

এটি উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে একটি কবরস্থান। বৃহস্পতিবার সকালে উহুদের শহীদগণের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে যান। প্রথমে কবরস্থানের পাশে অবস্থিত মসজিদে হামযায় দুই রাকআত নামায আদায় করুন। অতঃপর হযরত হামযা (রা.)-এর কবর যিয়ারত করুন। পাশেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ (রা.) এবং হযরত মুস্‌আব ইবনে উমাইর (রা.)-এর কবর রয়েছে, তাঁদেরকেও সালাম পেশ করুন। সত্তরজন শহীদ সাহাবায়ে কেরাম এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন। সম্ভব হলে পাহাড়ে আরোহণ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা উহুদ পাহাড়ে আগমন করলে এখানকার বৃক্ষ থেকে কিছু খাও, এমনকি কাঁটাদার বৃক্ষ হলেও।" (رواه الطبراني في الأوسط)

### ৩. মসজিদে কোবা

হিজরতের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এটিই মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। যেদিন



সুযোগ হয় এই মসজিদের যিয়ারত করুন, তবে শনিবার দিন উত্তম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে কোবায় এসে দুই রাকআত নামায আদায় করবে, তার একটি উমরার সমতুল্য ছওয়াব হবে। (سنن النسائي)

### ৪. মসজিদে জুমুআ

এ মসজিদটি কোবার পথের সন্নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম এই মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন।

### ৫. মসজিদে কেবলাতাইন

এই মসজিদে এই মসজিদের মুসল্লীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তে থাকা অবস্থায় কেবলা পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাত নামাযের মধ্যেই কা'বা শরীফের দিকে ফিরে যায়। একই নামাযে দুই কেবলার দিকে ফিরে নামায পড়ার কারণে এটাকে মসজিদে কেবলাতাইন বলা হয়।

### ৬. মাসাজিদে সাবআ

সালা' পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদে ফাতাহ অবস্থিত। এই মসজিদের নিকটেই পাশাপাশি মসজিদে সালমান ফার্সী, মসজিদে আবূ বকর, মসজিদে ওমর, মসজিদে আলী, মসজিদে সাআদ ইবনে মুআয নামক মসজিদসমূহ ছিল। অতীতের মত এখনও এগুলোকে 'মাসাজিদে সাবআ' বা সাত মসজিদ বলা হয়। যদিও মসজিদে ফাতাহসহ মোট মসজিদের সংখ্যা ছিল ৬টি। বর্তমানে (২০০৬ সালে) রয়েছে মাত্র তিনটি (মসজিদে ফাতাহ, মসজিদে ওমর এবং মসজিদে সা'দ ইব্‌নে মুআয। ২০০৩ সালের হজ্জের পর মসজিদে সালমান ফার্সী ও মসজিদে আবূ বকর ভেঙ্গে তদস্থলে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।)। যিয়ারতের গাড়ী হাজীদেরকে সাধারণত এসব মসজিদের স্থানে নিয়ে যেয়ে থাকে। নিম্নে ছয়টি মসজিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল।

**মসজিদে ফাতাহ:** এটি সালা' পাহাড়ের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। মসজিদটি ভূমি থেকে প্রায় সাড়ে চার মিটার উঁচু। খন্দক যুদ্ধের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তিন দিন– সোম, মঙ্গল ও বুধবার দুআ করেছিলেন, আল্লাহ পাক দুআ কবূল করেন এবং মুসলমানগণ বিজয়ী হন। সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইব্‌নে আব্দুল আজীজ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

**মসজিদে সালমান ফার্সী:** এটি মসজিদে ফাতাহ থেকে দক্ষিণে নিচে অবস্থিত। খন্দক যুদ্ধের খন্দকের পরিকল্পনাকারী সাহাবী হযরত সালমান ফার্সীর নামে মসজিদটির নামকরণ করা হয়। খন্দক যুদ্ধের সময় এখানেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন। এ মসজিদটিও সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইব্‌নে আব্দুল আজীজ নির্মাণ করেন। ২০০৩ সালে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

**মসজিদে আলী:** মসজিদে সালমান ফার্সী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। সর্বশেষ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৬৮ হিজরীতে সুলতান আব্দুল মজীদ (১ম) এ মসজিদটির সংস্কার করেছিলেন। এ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হত। ১৪১৪ হিজরীতে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

**মসজিদে আবূ বকর:** এ মসজিদটি মাসাজিদে সাবআ এলাকার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। অনেকগুলো সিড়ি ঘেঁটে উপরে উঠতে হয়। কেউ কেউ এটাকে "মসজিদে আলী" নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। ২০০৩ সালে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

**মসজিদে ওমর:** এটি মসজিদে সালমান ফার্সী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হয়।

**মসজিদে সা'দ ইব্‌নে মুআয:** এটি মসজিদে ওমর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। কেউ কেউ এটাকে মসজিদে ফাতেমা নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়।

### ৭. মসজিদে বনী হারাম

মসজিদে ফাতাহের নিকটবর্তী এই মসজিদেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন। সালা' পাহাড়ের পিছনে অবস্থিত জাবালে যুবাব (বর্তমানে বিলুপ্ত)–এর পাশ দিয়ে মসজিদে বনী হারামে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে।

### ৮. মসজিদে গামামাহ

এ মসজিদটি মসজিদে নববীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের নামায এখানে আদায় করতেন।

### ৯. মসজিদে অবূ বকর

মসজিদে গামামা-র নিকট উত্তর দিকে অবস্থিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এখানে ঈদের নামায আদায় করেছিলেন বিধায় এর নাম মসজিদে আবূ বকর হয়ে থাকবে।



### ১০. মসজিদে আলী

এই মসজিদও মসজিদে গামামাহ-র নিকট অবস্থিত। হযরত উছমান (রা.) যখন গৃহে অন্তরীণ ছিলেন, তখন হযরত আলী (রা.) এখানে ঈদের নামায আদায় করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই এর নাম হয়ে থাকবে মসজিদে আলী।

### ১১. মসজিদে ওমর

এখানে হযরত ওমর (রা.) কখনও কখনও নামায পড়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এখানে ঈদের নামায পড়েছেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। মসজিদে ওমর মসজিদে গামামাহ-র সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত।

### ১২. মসজিদু'স সাজদাহ

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদায়ে শোকর আদায় করেছিলেন। দীর্ঘ সাজদা থেকে মাথা তুলে তিনি উপস্থিত হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রা.)কে বলেছিলেন, হযরত জিব্রীল (আ.) এসে আমাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করে আমি তার প্রতি রহমত করি, যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করে আমি তাকে সালাম করি। তাই আমি শোকর আদায় করণার্থে সাজদা করলাম। মসজিদটি বর্তমানে "মসজিদে আবূ যর" নামে পরিচিত। এ মসজিদটি মসজিদে নববীর পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে তার কিছুটা সামনে গিয়ে চৌরাস্তা পার হয়ে সামনে ডান দিকে রাস্তা মোড় নেয়ার সময় ডান দিকে অবস্থিত।

### ১৩. মসজিদুল-ইজাবাহ

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়ে তিনটি দুআ করেছিলেন, যার দুটো কবূল হয়। দুআ তিনটি ছিল এই– **(এক)** আল্লাহ তা'আলা যেন এই উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করেন। এটি কবূল হয়। **(দুই)** আল্লাহ তা'আলা যেন এই উম্মতকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস না করেন। এটিও কবূল হয়। **(তিন)** এই উম্মত পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে যেন লিপ্ত না হয়। এটি কবূল হয়নি। এ মসজিদটি মসজিদে নববীর পূর্ব পাশ এবং জান্নাতুল বাকী'র উত্তর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি পূর্ব দিকে গিয়েছে সে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে জান্নাতুল বাকী'র

উত্তর পূর্ব কোণে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে (উত্তর দিকে) তাকালেই দৃষ্টিগোচর হয়।

## ১৪. মসজিদুল মুছতারাহ

এটাকে পূর্বে মসজিদে বানু হারেছা বলা হত। বানু হারেছা নামক আনছারী গোত্র এখানে বসবাস করত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এখানে আরাম গ্রহণ করেছিলেন। মসজিদটি গাড়ীতে উহুদ পাহাড়ে যাওয়ার সময় উহুদ পাহাড়ের কিছু পূর্বেই রাস্তার বাম পাশে রাস্তা সংলগ অবস্থিত। এটাকে মসজিদুল এছতেরাহা-ও বলা হয়।

## ১৫. মসজিদুশ শায়খাইন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে গমন কালে শুক্রবার আসর, মাগরিব ও ইশার নামায এখানে আদায় করেন এবং রাত্রযাপন করে শনিবার সকালে এখান থেকে উহুদ প্রান্তরে গমন করেন। এখানেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈনিক নির্বাচন করেন এবং ছোট সাহাবীদের ফেরত পাঠান। এ মসজিদটি মসজিদুল মুছতারাহ থেকে ৩০০ মিটার দক্ষিণে চৌরাস্তা থেকে ২০ মিটার পূর্বে অবস্থিত। এ মসজিদকে মসজিদুল উদ্ওয়া, মসজিদুল বাদায়ে', মসজিদুদ্দির্য়ে প্রভৃতি নামেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

## ১৬. মসজিদুর রায়া

এটাকে 'মসজিদে যুবাব'-ও বলা হয়। এ মসজিদটি যুবাব নামক একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত, যে পাহাড়ে খন্দক খননের কাজ পরিদর্শনের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল এবং তিনি এখানে নামাযও পড়েছেন। তরীকুল উয়ূন–এর শুরুতে বাম পাশে মসজিদটি অবস্থিত।

## ১৭. মসজিদুল ফাযীখ

এটাকে 'মসজিদে শাম্স' বা 'মসজিদে বানূ নাযীর'-ও বলা হয়। বানূ নাযীর গোত্রের সাথে যুদ্ধের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নামায পড়েছিলেন। মসজিদটি কোবার পাশে 'আওয়ালী' নামক এলাকায় অবস্থিত।



## ১৮. মাশ্রাবাহ উম্মে ইবরাহীম

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়া কিব্তিয়া বসবাস করতেন। এখানেই ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যাতায়াত করতেন এবং বিবিদের সঙ্গে ঈলা করার সময় দীর্ঘ একমাস এখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, যাকে 'মসজিদে মাশরাবাহ উম্মে ইবরাহীম' বলা হত। বর্তমানে এখানে কোনো মসজিদ নেই। এটি একটি কবরস্থান। যা আওয়ালী নামক এলাকাতে মুছতাশ্ফা ঝাহ্রা (مستشفى الزهراء) ও মুছতাশ্ফা ওয়াতানী (مستشفى الوطني)–এর মাঝে অবস্থিত।

## ১৯. মসজিদুল ফাছ্হ

বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের পর এখানে জোহর ও আসরের নামায পড়েছিলেন। এ মসজিদটি এখন (২০০০ ইং) ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এ স্থানটি মাকবারাতুশ শুহাদা–এর উত্তর দিক দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে (যাওয়ার সময় ডান দিকে) অবস্থিত।

এর উত্তরে উহুদ পাহাড়ে কিছুটা উঁচুতে গুহার ন্যায় একটি ফাটল রয়েছে; বলা হয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে এখানে অবস্থান নিয়েছিলেন।

বি. দ্র. এসব মসজিদ যিয়ারতে গেলে সেখানে অন্তত দুই রাকআত নামায পড়ে নিবেন, শুধু ঘুরে আসবেন না।

মদীনা মুনাওওরায় যিয়ারত সম্পর্কিত স্থানসমূহের সিংহভাগ তথ্য নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত।

১. المساجد الأثرية في المدينة المنورة : محمد إلياس عبد الغني

২. الذر الثمين في معالم دار الرسول الأمين : غالي محمد الأمين الشنقيطي

## পর্দার আহকাম

* শরীআতে গায়র মাহরাম পুরুষ বা নারীর সাথে পর্দা করা ওয়াজিব।

* কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা পুরুষের জন্য হারাম। এমনিভাবে নারীর পক্ষেও কামভাব নিয়ে কোনো বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তা

মাফ; তবে সে দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করা যাবে না। নারীদের চেহারাও পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

* দাড়িবিহীন বালকের প্রতিও বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা হারাম।

* কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে না। তেমনি কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে না। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রেও অন্তর থেকে যথাসম্ভব শাহওয়াত দূর করার চেষ্টা করবে এবং এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ দেখা জায়েয হবে না। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত গোপন অঙ্গ (সতর), আর নারীর গোপন অঙ্গ (সতর) বলতে বোঝায় তার মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর।

* চলা-ফেরা ও কাজ-কর্মের সময় বা লেন-দেনের সময় প্রয়োজন হলে নারীর জন্য মুখমণ্ডল, হাতের তালু, আঙ্গুল ও পদযুগল খোলারও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে নারীর এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (معارف القرآن و بیان القرآن)

* যাদের সঙ্গে নারীকে পর্দা করতে হয় না অর্থাৎ, যাদের সামনে নারীগণ যেতে পারেন তাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

**নারীর মাহরাম**

১। নিজ স্বামী (যার নিকট স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম)।
২। পিতা (আপন হোক বা সৎ। দুধ পিতাও এর অন্তর্ভুক্ত)।
৩। দাদা (দাদার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)।
৪। নানা (নানার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)।
৫। চাচা (আপন হোক বা সৎ)।
৬। ভাই (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) তবে চাচাতো মামাতো খালাতো ফুফাতো ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। দুধ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা দেয়া যায়।
৭। ভ্রাতুষ্পুত্র (আপন ভাইয়ের পুত্র হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের)।
৮। ভাগিনা (আপন বোনের ছেলে হোক বা সৎ বোনের)।



৯। ছেলে (আপন হোক বা সৎ)।
১০। আপন শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও আপন নানা শ্বশুর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শ্বশুরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে।
১১। মামা (আপন হোক বা সৎ)।
১২। নাতী (আপন ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের হোক)।
১৩। জামাই (আপন মেয়ের জামাই)।

* নির্বোধ, ইন্দ্রিয় বিকল ধরনের লোক বা ঐসব বালক যারা বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝে না, তাদের সাথে পর্দা করা জরুরি নয়, তারাও পর্দার হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।

* পূর্বের পরিচ্ছেদ থেকে বোঝা গিয়েছে পুরুষ কোন্ কোন্ নারীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে অর্থাৎ, কোন্ কোন্ নারীর সঙ্গে পর্দার হুকুম নেই; তবে সহজে বোঝার জন্য তারও একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হল।

**পুরুষের মাহরাম**

১। মা (আপন হোক বা সৎ। দুধ মা-ও এর অন্তর্ভুক্ত)।
২। মেয়ে (আপন হোক বা সৎ অর্থাৎ, স্ত্রীর পূর্বের ঘরের মেয়ে হোক)।
৩। বোন (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) দুধবোনও এর অন্তর্ভুক্ত। মামাতো, খালাতো, ফুফাতো বোনদের সাথেও পর্দা করতে হবে।
৪। ফুফু (আপন হোক বা সৎ)।
৫। খালা (আপন হোক বা সৎ)।
৬। ভাতিজি (আপন হোক বা সৎ)।
৭। ভাগ্নি (আপন হোক বা সৎ)।
৮। শাশুড়ী (আপন শাশুড়ী বা দাদী শাশুড়ী বা নানী শাশুড়ী)।
৯। আপন দাদী।
১০। আপন নানী।
১১। পুত্র-বধু।
১২। নিজ স্ত্রী।
১৩। নাতিনী (ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের)।

* উল্লেখ্য, পুরুষ তার মাহরাম মহিলার শুধু মাথা, চেহারা, গর্দান, দুই বাহু ও পায়ের নলা দেখতে পারে, তাও যদি শাহওয়াত না থাকে। পেট পিঠ

দেখা জায়েয নয়। একজন নারী অপর নারীর এতটুকু অংশই দেখতে পারে, যতটুকু একজন পুরুষ অপর পুরুষের দেখতে পারে– তার বেশি নয়।

* যেখানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেখানে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শুনানো এবং পর্দার সাথে কথা-বার্তা বলা নিষেধ। যেখানে এরূপ আশংকা নেই সেখানে জায়েয কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষদের সঙ্গে কথা-বার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত। প্রয়োজনের মুহূর্তে বলতে হলেও নারীকে মিহি সুরে না বলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ফিতনার সম্ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য এটাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

* নারীদের জন্য বেগানা পুরুষকে অলংকারের আওয়াজ শোনানোও জায়েয নয়।

* সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্য খচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নিষিদ্ধ। (معارف القرآن نقلا عن الجصاص)

* যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের (অধীনস্থ) কোনো মহিলাকে বেগানা পুরুষের সাথে মেলা মেশা করতে দেয়, শক্তি সত্ত্বেও তাতে কোনো প্রকার বাধা না দেয় অর্থাৎ, শরীআতের পর্দা বিধান লংঘন করতে দেয়, তাকে দাইয়ূস বলা হয়। আর হাদীছে এসেছে দাইয়ূস ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

## খতনার আহকাম

* ছেলেদের খতনা, (মুসলমানী) করানো সুন্নাত। খতনা ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য, তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

* খতনা করানোর কোনো বয়স নির্ধারিত নেই। বালেগ হওয়ার পূর্বে যেকোনো বয়সে যেকোনো সময় করে নিবে। (ماثبت بالسنة)

* যদি বালেগ হওয়ার পূর্বে কারও খতনা না হয়ে থাকে বা কোনো অমুসলিম বালেগ হওয়ার পর মুসলমান হয় এবং পূর্বে তার খতনা না হয়ে থাকে, তাহলেও (বালেগ হওয়া সত্ত্বেও) খতনা করার হুকুম বলবৎ থাকবে, যদি তার মধ্যে খতনার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকে। (امداد الفتاوی ج/٤ وغیره)

* খতনা উপলক্ষে আড়ম্বর করা, দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে আনা এবং তাদেরও ছেলের জন্য কাপড়-চোপড় ও হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসা– এটা সুন্নাত পরিপন্থী। (ইসলামী ফিকাহ)



## গোঁপ, দাড়ির মাসায়েল

* পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং অন্তত এক মুষ্ঠি লম্বা রাখা ওয়াজিব। দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্ঠির চেয়ে কম রেখে ছাঁটা বা উপড়ানো হারাম। এক মুষ্ঠির চেয়ে লম্বা হলে তা ছেঁটে ফেলানো দোরস্ত আছে। এরূপ চতুর্দিক থেকে সমান করার জন্য কিছু কিছু ছেঁটে ফেলা দোরস্ত আছে। (ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں اور صفائی معاملات)

* দাড়ি এক মুষ্ঠির চেয়ে খুব বেশি লম্বা রাখা সুন্নাতের খেলাফ। (فتاوی رحیمیہ □□/٢)

* গোঁপ দুই দিক থেকে লম্বা করা জায়েয আছে, কিন্তু যেন ঠোঁটের উপর না পড়ে– এভাবে ছোট রাখা সুন্নাত।

* গোঁপ মুণ্ডানো জায়েয কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলেম বিদআত বলেছেন। অতএব না মুণ্ডানো ভাল। গোঁপ ছেঁটে এত ছোট করে রাখবে যেন মুণ্ডানোর ন্যায় হয়ে যায়, এরূপ করা উত্তম।

* মহিলার গোঁপ দাড়ি হলে মুণ্ডানো জায়েয বরং দাড়ি হলে মুণ্ডিয়ে ফেলা মোস্তাহাব। কোনোভাবে মূল থেকে তুলে ফেলতে পারলে আরও উত্তম। (فتاوی رحیمیہ □□/٢)

* ভাল দেখানোর জন্য পাকা দাড়ি উপড়ে ফেলা নাজায়েয।

* গালের উপরের পশম দাড়ি নয়। এরূপ পশম মুণ্ডন করে রেখার ন্যায় বানানো জায়েয, তবে খেলাফে আওলা। (فتاوی رشیدیہ)

* হলকূমের পশম কামানো চাই না, তবে হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) জায়েয বলেন।

* নিচের ঠোঁটের নিম্নের পশম (বাচ্চা দাড়ি) কামানোকে ফকীহগণ বিদআত বলেছেন, অতএব তা কামানো চাই না। (ছাফাইয়ে মোআমালাত)

* দাড়ির কলপ/খেযাব সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

## চুল ও শরীরের অন্যান্য পশমের মাসায়েল

* সমস্ত মাথায় কানের মধ্য পর্যন্ত বা কানের লতি পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা (অর্থাৎ, বাবরি রাখা) এবং হজ্জ ও উমরার সময় সমস্ত মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা সুন্নাত। সব স্থানে সমান করে ছেঁটে ফেলা জায়েয। বাবরি রাখলে তার যত্ন নেয়া কর্তব্য।

* মাথার কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশে চুল রাখা নাজায়েয। রোগ ব্যাধির কারণে হলেও জায়েয নয়। মুণ্ডাতে হলে সমস্ত মাথায় চুল মুণ্ডিয়ে ফেলবে। (فتاوی رشیدیہ)

* মাথায় টিকি রাখা বা কোনো দরগায় মানত মেনে জন্মচুল রাখা নাজায়েয। (صفائی معاملات)

* মহিলাদের ন্যায় পুরুষের চুল রেখে খোপা বাঁধা বা বেণী বাঁধা জায়েয নয়। (أيضا)

* মাথা না মুণ্ডিয়ে শুধু গর্দানের পশম মুণ্ডানো জায়েয, তবে উত্তম নয়। (فتاوی رشیدیہ)

* মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা হারাম। হাদীছ শরীফে এরূপ মহিলাদের প্রতি লা'নত (অভিশাপ) এসেছে।

* ভাল দেখানোর জন্য পাকা চুল উঠিয়ে ফেলা নাজায়েয। অবশ্য জেহাদের ময়দানে কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য এরূপ করা জায়েয আছে।

* দাড়িতে কলপ/খেযাব লাগানোর যা মাসআলা, চুলের কলপ/খেযাব লাগানোর মাসআলাও অনুরূপ। দেখুন ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

* নাভির নিচের পশম পুরুষের জন্য কামিয়ে ফেলা উত্তম। কোনো রকম লোম নাশকের দ্বারা উপড়ে ফেলাও জায়েয আছে। মেয়েদের জন্য উপড়ে ফেলাই সুন্নাতের মোয়াফেক।

* নাভির নিচের পশম কামানোর সময় নাভির দিক থেকে শুরু করা নিয়ম। অণ্ডকোষ, তার নিচে ও মলদ্বারে পশম থাকলে সবই কামিয়ে ফেলবে।

* নাকের মধ্যের পশম না উপড়িয়ে কাঁচির দ্বারা কাটা উত্তম।

* বগলের পশম উপড়ে ফেলাই উত্তম, তবে কামানোও জায়েয।

* কানের মধ্যে পশম থাকলে তাও কেটে ফেলবে।

* বুক ও পিঠের পশম কামানো জায়েয আছে তবে ভাল নয়।

* উপরে উল্লেখিত স্থানসমূহ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের পশম যেমন: পায়ের নলা, রান ও হাত ইত্যাদির পশম রাখা এবং কাটা উভয়ই দোরস্ত আছে।

* বগলের পশম, নাভির নিচের পশম, গোঁপ ইত্যাদি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা মোস্তাহাব। শুক্রবার জুমুআর নামাযের আগেই



এসব থেকে পাক সাফ হয়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম। দুই সপ্তাহে একবার করলেও জায়েয। একেবারে শেষ সীমা চল্লিশ দিন। এসব থেকে পাক সাফ না হওয়া অবস্থায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহ হবে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, যখন গোসল ফরয হয়, তখন চুল বা এসব পশম কাটা/ছাঁটা মাকরূহ।

* বিনা অপারগতায় অন্যের দ্বারা বগলের পশম সাফ করানো ভাল নয়।

* ভ্রু যদি বিশৃংখল থাকে তাও কিছু কিছু কেটে-ছেঁটে সমান করে দেয়া দুরস্ত আছে। তবে মহিলাগণ বর্তমানে যেভাবে ভ্রু তুলে একেবারে সরু করে রাখে, এটা আল্লাহ্‌র দেয়া গঠনে এক ধরনের বিকৃতি। এ থেকে বিরত থাকাই জরুরি।

* কাটা চুল মটির নিচে দাফন করে দেয়া উত্তম। কোনো ভাল জায়গায় ফেলে দেয়াও দুরস্ত আছে, কিন্তু নাপাক ও খারাপ স্থানে ফেলা চাই না।

* চুলের কলপ/খেযাব, চুলে তেল লাগানো, চিরুনি করা, মহিলাদের জন্য আলগা চুলের খোপা লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য দেখুন ৪৯৭-৪৯৯ পৃষ্ঠা।

## নখ কাটার মাসায়েল

* হাত পায়ের নখ কেটে ফেলা সুন্নাত। প্রতি সপ্তাহে একবার কাটা মোস্তাহাব। জুমুআর নামাযের পুর্বেই এ থেকে পাক সাফ হয়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম। অন্তত দুই সপ্তাহে একবার কাটলেও চলবে। চল্লিশ দিনের বেশি না কাটা অবস্থায় অতিবাহিত হলে গোনাহ হবে।

* দাঁত দিয়ে নখ কাটা মাকরূহ। এতে শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা আছে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, গোসল ফরয থাকা অবস্থায় নখ কাটা মাকরূহ।

* কেউ কেউ শামী গ্রন্থের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত তারতীবে নখ কাটাকে সুন্নাত বলেছেন– হাতের নখ কাটতে প্রথমে ডান হাতের শাহাদাৎ (তর্জনী) আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে, সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের নখ কাটবে। আর পায়ের নখ কাটতে প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত তারপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে শেষ করবে।

তবে উল্লেখ্য যে, দুর্‌রে মুখতারগ্র ন্থকার হাফেয ইব্‌নে হাজারের বরাত দিয়ে এবং স্বয়ং শামী গ্রন্থকারও আল্লামা সুয়ূতী ও ইব্‌নে দাক্বীকুল ঈদ–এর বরাত দিয়ে উপরোক্ত তারতীব সুন্নাত হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা ও রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যে কোনভাবে সম্ভব কেটে নিবে। তবে প্রথমে ডান হাতের তারপর বাম হাতের নখ কাটা সুন্নাত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। (২/[illegible] شامی)

* কাটা নখ মাটির নিচে দাফন করে দেয়া উত্তম। অন্তত কোনো ভাল জায়গায় ফেলে দেয়াও দুরস্ত আছে। নাপাক ও খারাপ জায়গায় ফেলা চাই না।

* নখে মেহেদী লাগানো সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

## বিশেষ কয়েকটি দিন, রাত ও বিশেষ কয়েকটি সময়ের আমলসমূহ

### জুমুআর দিনের বিশেষ কয়েকটি আমল

১. অন্য দিনের তুলনায় ফজরের সময় ঘুম থেকে আগে উঠা।
২. গোসল করা। (মেসওয়াকও করবে।)
৩. উত্তম ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা।
৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।
৫. ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসা।
৬. মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা।
৭. খুতবার সময় কোনোরূপ কাজ না করা বা কথা না বলা। (نسائي و ترمذي)
৮. আতর বা খুশবূ লাগানো। (بخاري – كتاب الجمعة)
৯. সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে।) এরূপ করলে এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তার জন্য তার থেকে কা'বা শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘ নূর প্রকাশ পাবে। (شعب الإيمان رقم ٢٤٤٤) অন্য এত রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তার জন্য এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে। (مشكاة عن الدعوات الكبير للبيهقي)
১০. জুমুআর দিন বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করা ও বেশি বেশি যিকির করা মোস্তাহাব। হাদীছ শরীফে জুমুআর দিন ও জুমুআর রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) হলে বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠের কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনিতেও যেকোনো সময় একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে দশটি রহমত দান করেন এবং ফেরেশতারা তার জন্য দশবার রহমতের দুআ করেন। (القول البديع)
১১. দুই খুতবার মাঝখানে হাত উঠানো ব্যতীত দিলে দিলে দুআ করা।
১২. সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে যিকির, তাসবীহ ও দুআয় লিপ্ত থাকা।
১৩. জুমুআর দিন চুল কাটা, নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের পশম সাফ করা। এ সম্পর্কে পূর্বে ৩৪৮ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।
১৪. জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য যত শীঘ্র মসজিদে যাবে তত বেশি ছওয়াব হবে। সর্বপ্রথম যে যাবে একটা উট কুরবানীর ছওয়াব পাবে। তারপরের জন একটা গাভী কুরবানীর, তারপরের জন দুম্বা কুরবানীর, তারপরের জন একটা মুরগি দানের এবং তারপরের জন একটা ডিম দানের ছওয়াব পাবে। (مسلم– كتاب الجمعة)
১৫. যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজর নামাযের পূর্বে তিনবার নিম্নোক্ত এস্তেগফারটি পাঠ করবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (কিতাবুল আযকার)

**اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَ تُوْبُ اِلَيْهِ.** (كتاب الأذكار)

### সকাল সন্ধ্যার বিশেষ কয়েকটি আমল

১। যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** (আউযু বিল্লাহিস সামীইল আলীমি মিনাশ শাইতানির রজীম) পড়ে (বিসমিল্লাহ পড়বে না) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকবে এবং ঐ দিন তার মৃত্যু হলে সে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করবে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত ঐ মর্তবা হাছিল হবে। (ترمذي – كتاب فضائل القرآن)

২। যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন (পুরস্কার ও ছওয়াব দিয়ে) তাকে অবশ্যই রাজী খুশী করে দিবেন। দুআটি এই–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْـنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا. (كتاب الأذكار)

অর্থ: আমি সন্তুষ্ট রব হিসাবে আল্লাহ্‌র প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং নবী ও রসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি। (কিতাবুল আযকার)

৩। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা (ফজর ও মাগিবের নামাযের পর কথা বলার পূর্বে) সাতবার পাঠ করবে اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ তাহলে ঐ দিন বা রাতে তার মৃত্যু হলে তার জন্য জাহান্নাম থেমে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। এ দুআটির অর্থ হল– হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (مشكاة نقلا عن أبي داؤد)

৪। হাদীছে ফজর ও মাগিবের নামাযসহ সব ফরয নামাযের পর জান্নাত চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সে হিসাবে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে সকাল সন্ধ্যায়ও এভাবে আটবার দুআ করা যায়–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত।

৫। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে, ঐ দিন ঐ রাতে তার কোনো আকস্মিক বিপদ-মুছীবত বা নোকছান ঘটবে না। দুআটি এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.(رواه الترمذي في أبواب الدعوات وقال : حديث حسن صحيح غريب)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (আমি সকাল/সন্ধা বেলায় পৌঁছলাম) যার নামের উপর থাকলে আসমান ও জমিনের কেউ ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (তিরমিযী)

৬। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলায় পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَ بِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.



অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার কুদরতেই আমি সকাল বেলায় প্রবেশ করলাম, তোমার কুদরতেই আমি সন্ধা বেলায় প্রবেশ করি। তোমার কুদরতেই আমি বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুবরণ করি। আর তোমার দিকেই পুনঃ উত্থান করতে হবে। (أبو داود – كتاب الأدب)

সন্ধ্যা বেলায় পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَ بِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

(أبو داود– كتاب الأدب)

অর্থ: পূর্বের দুআর মতই। (আবূ দাউদ)

৭। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার একটা গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হবে, দশটি নেকী লেখা হবে, দশটা পাপ মোচন হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে।

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (أبو داود – كتاب الأدب)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক– তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, আর তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (আবূ দাউদ)

৮। সকাল সন্ধ্যায় কেউ সায়্যিদুল এস্তেগফার পাঠ করলে আর ঐ দিন বা রাতে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতে যাবে। সাইয়্যেদুল এস্তেগফারটি এই-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. (بخاري – كتاب الدعوات)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর (অর্থাৎ, তোমার আদেশ- নিষেধের উপর) অটল রয়েছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে আমার প্রতি প্রদত্ত

তোমার নেয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করছি এবং আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া তো আর কেউ ক্ষমাদানকারী নেই। (বোখারী)

৯। যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে, আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে। (معارف اقرآن نقلا عن المظهري) সূরা ইয়াসীন পাঠের আরও বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে দশ খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যায়। (رواه الترمذي و قال : حديث غريب)

১০। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন।

১১। আরবী মাসের ২৯ তারিখ হলে সন্ধ্যায় পরবর্তী মাসের চাঁদ তালাশ করা কর্তব্য। কেননা আরবী মাসের হিসাব রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব। নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

(ترمذي – أبواب الدعوات)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই চাঁদকে আমার উপর বরকত, ঈমান, শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলাম তথা ধর্মীয় কার্যাবলীর সুযোগ হিসাবে উদিত করে রাখ। হে চাঁদ, আমার ও তোমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। (তিরমিযী)

১২। সন্ধ্যার সময় বাচ্চা ও শিশুদেরকে ঘরে নিয়ে যাবে– বাইরে রাখবে না। কেননা এ সময় দুষ্ট জিনেরা চলাফেরা করে।

১৩। সূর্য উদিত হলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لَنَا هٰذَا الْيَوْمَ وَأَقَالَنَا فِيْهِ عَثَرَاتِنَا. (ابن السني ص/١٢٩)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আজ আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং পাপের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি।

১৪। মাগরিবের আযান হওয়ার সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ.

(أبو داود)



অর্থ: হে আল্লাহ, এটা তোমার রাতের আগমন ও দিনের বিদায় গ্রহণের সময় এবং তোমার পক্ষ থেকে আহবানকারীদের আহবান ধ্বনিত হচ্ছে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (আবূ দাউদ)

## প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের বিশেষ কয়েকটি আমল

* প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর- اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (এভাবে তিনবার) পড়া সুন্নাত।

* প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়লে তার বহু ফযীলত রয়েছে। সুন্নাত শেষ করে এগুলো পড়লেও চলবে। ১০০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পড়ার পর নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে নিলে আরও উত্তম। (মুসলিম)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (مسلم كتاب الصلاة)

অর্থ: ৩৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যেসব দুআ (মুনাজাত) পড়তেন তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল।

(১) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি শান্তিময় এবং তোমার পক্ষ থেকে শান্তি প্রদত্ত হয়। তুমি মহান হে মহিমাময়, মহানুভব! (মুসলিম ও আবু দাউদ)

(২) اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. (أبو داود)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার যিকির করা, তোমার শোকর আদায় করা ও উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার জন্য।

(৩) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (بخاري)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কাপুরুষতা থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই হীন বয়সে উপনীত হওয়া থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই দুনিয়ার ফেতনা থেকে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে। (বোখারী)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (نسائي) (৪)

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কুফ্‌র থেকে, অভাব-অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ. (৫)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের কেউ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, করুণাময়। হে আল্লাহ, তুমি আমার দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ দূরীভূত করে দাও।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهٗ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ. (كتاب الأذكار) (৬)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি বানাও আমার জীবনের শেষ অংশকে শ্রেষ্ঠ অংশ, আমার শেষ আমলকে শ্রেষ্ঠ আমল এবং সেই দিনকে আমার শ্রেষ্ঠ দিন যেদিন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।

* নাছায়ী শরীফের হাদীছে আছে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল ও আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে। আয়াতুল কুরছী হল কুরআন শরীফের তৃতীয় পারার শুরুতে اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ থেকে শুরু করে وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ পর্যন্ত।

## আইয়্যামে বীযের আমল (রোযা)

'আইয়্যামে বীয' অর্থ উজ্জ্বল রাতের দিনগুলো। চান্দ্র মাসের ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলা হয়।

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখ, কেননা, সব নেকী দশ গুণ দেয়া হয়। সেমতে সারা বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব হবে। (বোখারী ও মুসলিম) অন্য এক হাদীছে আছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)কে বলেছিলেন, প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখতে চাইলে ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ দিন রাখবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী) অন্য



রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় আইয়্যামে বীয ব্যতীত অন্য যেকোনো তিন দিন নফল রোযা রাখলেও ঐ ফযীলত হাছিল হয়ে যাবে।

* নফল রোযার নিয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২৬৭ পৃষ্ঠা।

## আশূরা উপলক্ষে করণীয় আমলসমূহ

মুহাররম মাসের ১০ম তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। আশুরা উপলক্ষে সর্বমোট ৪টি আমল করার রয়েছে।

১। ১০ই মুহাররম তারিখে নফল রোযা রাখা মোস্তাহাব। এর দ্বারা পিছনের এক বৎসরের গোনাহ মাফ হয়। এই রোযা রাখলে ১০ তারিখের সঙ্গে ৯ তারিখ বা ১১ তারিখ মিলিয়ে মোট ২টি রোযা রাখবে। ৯ বা ১১ তারিখ বাদে শুধু ১০ই মুহাররমের রোযা (অর্থাৎ, শুধু ১টি রোযা রাখা) মাকরূহ তানযীহী। (فتاوى محمودية ٣/□□) আশুরার দিন কাযা রোযা রাখা দ্বারা আশুরার রোযার ফযীলত অর্জিত হবে না। (احسن الفتاوى ٤/□□)

২। আশুরায় পরিবার-পরিজনকে উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা করলে আল্লাহ তা'আলা সারা বৎসর উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা করে দিবেন বলে হাদীছে উল্লেখ এসেছে। হাদীছটি অনেকের মতে আমলযোগ্য (حسن لغيره) পর্যায়ের। আবার অনেকের মতে আমলযোগ্য পর্যায়ের নয়। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়, এটাকে রছমে পরিণত করাও ঠিক নয়। (ماثبت بالسنة واحسن الفتاوى وغيرها)

৩। আশুরার দিনে আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে এবং বানী ইসরাঈলকে তাঁর কুদরতে সমুদ্র পার হওয়ার তওফীক দিয়ে একটা বড় নিয়ামত দান করেছিলেন। প্রকারান্তরে এটা আমাদের জন্যও নিয়ামত। তাই এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা যায়। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা আরও বহু কিছু ঘটিয়েছেন, বহু কিছু পয়দা করেছেন বলে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন বা মাউযূ। (দেখুন ماثبت بالسنة)

৪। এই দিনে কারবালায় হযরত হুসাইন (রা.) মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন– এই দুঃখ ও মুছীবতের কথা স্মরণ হলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া যায়।

* উল্লেখ্য, এই আশুরার দিনে উপরোক্ত ৪টি আমল ব্যতীত আর যা কিছু করা হয়ে থাকে যেমন: খিচুড়ি বণ্টন, শরবত পান করানো, তাযিয়া

বের করা, বুক চাপড়ানো, হায় হোসেন বলে মাতম করা, শোক মিছিল করা ইত্যাদি- এগুলো ভিত্তিহীন- রছম ও বিদআত, এগুলো গোনাহের কাজ, এগুলো পরিত্যাজ্য।

## শবে বরাত-এর আমলসমূহ

শবে বরাত কথাটি ফার্সী। এর আরবী হল লাইলাতুল বারাআত। 'বরাত' শব্দের অর্থ মুক্তি এবং 'শব' বা লাইলাত শব্দের অর্থ রাত। অতএব 'শবে বরাত–এর অর্থ মুক্তির রাত। এই রাতে আল্লাহ তা'আলা অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানান এবং তাঁর নিকট চাইলে তিনি এসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, তাই এ রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। শাবান মাসের **১৫ই** রাত অর্থাৎ, **১৪ই** শাবান দিবাগত রাতই হল এই শবে বরাত। হাদীছ শরীফের আলোকে এবং ফেকাহ্র কিতাবে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী শবে বরাত উপলক্ষে ৫টি আমলের কথা প্রমাণিত হয়। যথা:–

১। **১৪ই** শাবান দিবাগত রাতে জাগরণ করে নফল ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা। এ রাতে যেকোনো নফল নামায পড়ুন, যেকোনো সূরা দিয়ে পড়তে পারেন- কোন নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে পড়া জরুরি নয়। যত রাকআত ইচ্ছা পড়তে পারেন। আরও মনে রাখবেন নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। একান্তই যদি ঘরে নামায পড়ার পরিবেশ না থাকে তাহলে মসজিদে পড়তে পারেন। বর্তমানে শবে বরাত ও শবে ক্বদর উপলক্ষে ইবাদত করার জন্য মসজিদে ভিড় করার একটা রছম হয়ে গিয়েছে– এর ভিত্তিতে কোন কোন মুফতী শবে বরাত ও শবে ক্বদরে ইবাদত করার জন্য মসজিদে একত্র হওয়াকে মাকরূহ ও বিদআত বলে ফতুয়া দিয়েছেন। (দেখুন ১/□□ فتاوى محمودية) তাই যথাসম্ভব ঘরেই ইবাদত করা উত্তম হবে।

২। এ রাতে বেশি বেশি দুআ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা সূর্যাস্তের পর থেকে সুব্হে সাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আসমানে এসে মানুষকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য, রিযিক চাওয়ার জন্য, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও বিভিন্ন মাকছূদ চাওয়ার জন্য আহ্বান করতে থাকেন। সহীহ ইবনে হিব্বান ও তাবারানীতে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীছে আছে, এ রাতে আল্লাহ তাআলা মুশরিক ও বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। তদুপরি আর এক হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী এই রাতে মানুষের সারা



বৎসরের হায়াত মওত ও রিযিক দৌলত ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে। অতএব এ রাতে আল্লাহ্র কাছে বেশি বেশি করে দুআ করা চাই।

৩। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, এই রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরস্থানে গিয়েছিলেন এবং মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের (ক্ষমার) দুআ করেছিলেন। তাই এই রাতে কবর যিয়ারতে যাওয়া যায়। তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরস্থানে একাকী গিয়েছিলেন- কাউকে সঙ্গে নিয় আড়ম্বর সহকারে যাননি। তাই এ রাতে দলবল নিয়ে সমারোহ না করে আড়ম্বরের সাথে না করে অনাড়ম্বরভাবে কবর যিয়ারতেও যাওয়া যায়।

৪। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন। এটা ঈছালে ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ রাতে মৃতদের জন্য দুআ করা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতেও ঈছালে ছওয়াব করার অবকাশ রয়েছে। যেমন: কিছু দান-খয়রাত করে বা কিছু নফল ইবাদত- বন্দেগী করে তার ছওয়াব মৃতদেরকে বখশে দেয়া। এরূপ করাও উত্তম হবে।

৫। পরের দিন অর্থাৎ, **১৫ই** শাবান নফল রোযা রাখা উত্তম।

* উপরোল্লিখিত ৫টি বিষয় ব্যতীত শবে বরাত উপলক্ষে আর বিশেষ কোন আমল কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। শবে বরাত উপলক্ষে হালুয়া রুটি তৈরি করা, মোমবাতি জ্বালানো, আতশবাজী ও পটকা ফোটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এগুলো রছম, বিদআত ও গোনাহের কাজ।

**বি. দ্র.** কিছু লোক বলে থাকে, শবে বরাত–এর ফযীলত ও আমল সম্বন্ধে কোনো সহীহ হাদীছ নেই। তাদের কথা ভুল। এ সম্পর্কিত হাদীছগুলোর বেশ কয়েকটি সহীহ/আমলযোগ্য পর্যায়ের। এ সম্পর্কিত তাহকীকসহ বিস্তারিত বর্ণনা আমার রচিত 'ফাযায়েলে যিন্দেগী' কিতাবে দেখা যেতে পারে। এছাড়া শবে বরাত-এর উপরোক্ত আমলসমূহ সম্পর্কিত হাদীছগুলো "মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ" গ্রন্থেও বরাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ কিতাবটিও দেখা যেতে পারে।

## শবে ক্বদর–এর ফযীলত ও করণীয়

'শবে কদর' কথাটি ফারসী। এর আরবী হল 'লাইলাতুল কদর'। শব ও লাইলাত শব্দের অর্থ রাত। আর কদর শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণেই একে শবে কদর বা লাইলাতুল

কদর বলা হয়। কিংবা কদর শব্দের অর্থ তাকদীর ও আদেশ। এ রাতে যেহেতু পরবর্তী এক বৎসরের হায়াত, মওত, রিযিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের তাকদীর লেখা হয় (অর্থাৎ, লওহে মাহফূজ থেকে তা নকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করা হয়।) তাই এ রাতকে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়।

* লাইলাতুল কদর–এর ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর)

* রমযান মাসের শেষ দশকের মধ্যে যেকোনো বেজোড় রাতে শবে কদর হতে পারে। যেমন: ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। ২৭শে রাতের কথা বিশেষভাবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

* শবে কদরে নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি যেকোনো ইবাদত করা যায়। কত রাকআত নফল বা কি কি সূরা দিয় পড়তে হবে নির্দিষ্ট নেই– যত রাকআত ইচ্ছা, যে সূরা দিয়ে ইচ্ছা পড়া যায়। শবে কদরে নামাযের বিশেষ কোনো নিয়ত নেই– ইশার পর সুব্হে সাদেক পর্যন্ত যে নফল পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলে, তাই নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়তে নামায পড়লে চলে।

* নফল নামায যেহেতু ঘরে পড়া উত্তম, তাই এ রাতেও ঘরে থেকে নফল নামায পড়লে উত্তম হবে। একান্তই ঘরে নামাযের পরিবেশ না থাকলে তিনি মসজিদে গিয়ে পড়বেন। তবে বর্তমানে শবে বরাত ও শবে কদরে ইবাদত করার জন্য মসজিদে ভিড় করার একটা রছম দাঁড় হয়ে গিয়েছে। এর ভিত্তিতে কোন কোন মুফতী শবে কদর ও শবে বরাতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে একত্র হওয়াকে মাকরূহ ও বিদআত বলে ফতুয়া দিয়েছেন। (দেখুন ১/□□ فتاوى محموديه) তাই যথাসম্ভব ঘরেই নফল ইবাদত করা উত্তম হবে।

* শবে কদরে বিশেষভাবে দুআ কবূল হয়ে থাকে, তাই এ রাতে বেশি বেশি দুআ করা চাই।

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)কে শবে কদরে বিশেষভাবে এই দুআ পড়তে শিক্ষা দেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ. (رواه الترمذي وأحمد)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।



## দুই ঈদের রাত

* হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে জাগরিত থেকে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, তাহলে যেদিন অন্যান্য দিল মরে যাবে সেদিন তার দিল মরবে না অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনের আতংকের কারণে অন্যান্য লোকের অন্তর ঘাবড়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, কিন্তু দুই ঈদের রাত্রে জাগরণকারীর অন্তর তখন ঠিক থাকবে- ঘাবড়াবে না। (رواه ابن ماجة. وإسناده ضعيف إلا أنه يقوي برواية الطبراني في الكبير والأوسط)

## ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের বিধান

* ৯ই যিলহজ্জের ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জের আসর নামায পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। জামাআতে নামায হোক বা একাকী সর্বাবস্থায় বলতে হবে। পুরুষ হোক বা নারী সকলকে বলতে হবে।

* তাকবীরে তাশরীক এই–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

* এই তাকবীর জোর আওয়াজে বলা ওয়াজিব। তবে মহিলাগণ আস্তে আস্তে বলবে।

* নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এই তাকবীর বলতে হবে। ইমাম বলতে ভুলে গেলে মুক্তাদীগণ সাথে সাথে বলবে– ইমামের বলার অপেক্ষা করবে না।

* কারও কারও মতে ঈদুল আযহার নামাযের পরও এই তাকবীর পড়ে নেয়া চাই। (رد المحتار ج/٣ في صلاة العيدين)

* তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা সুন্নাত নয়। তিনবার বলা সুন্নাতের মত অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া হয় না। (فتاوى رحيميه ৩/□□)

## ঈদের দিনগুলো

* ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন সর্বমোট এই ৫দিন যেকোনো প্রকারের রোযা রাখা হারাম।

* উপরোক্ত ৫দিন পানাহারের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত জাঁকজমক করার অবকাশ রয়েছে এবং তা শরীআতের কাম্য।

* ঈদুর ফিতরে ১৩টা জিনিস সুন্নাত।

১. ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা।

২. মেসওয়াক করা।

৩. গোসল করা।

৪. যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা।

৫. শরীআতসম্মতভাবে সাজ-সজ্জা করা।

৬. খুশবূ লাগানো।

৭. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্ট দ্রব্য খেয়ে যাওয়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে নিতেন।

৮. আগে ঈদগাহে যাওয়া।

৯. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতির (ফেতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে যাওয়া।

১০. ঈদগাহে যেয়ে ঈদের নামায পড়া। বিনা ওজরে মসজিদে না পড়া।

১১. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।

১২. যাওয়ার সময় এই তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যাওয়া–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

১৩. এক রাস্তায় যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন।

* ঈদুল আযহার দিনও উপরোক্ত বিষয়গুলো সুন্নাত। পার্থক্য হল (১) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। (২) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার সময় উপরোক্ত তাকবীর আস্তে আস্তে নয় বরং জোরে জোরে বলা সুন্নাত। (৩) ঈদুল ফিতরের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়া সুন্নাত। (৪) ঈদুল আযহায় ফিতরা-র বিধান নেই বরং এখানে নামাযের পর কুরবানী রয়েছে।

* যেখানে ঈদের নামায পড়া হবে সেখানে ঐ দিন অন্য কোনো নফল নামায পড়া মাকরূহ, চাই ঈদের নামাযের পূর্বে হোক বা পরে। আর ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরেও কোনো নফল নামায পড়া মাকরূহ। হ্যাঁ ঈদের নামাযের পর ঘরে নফল নামায পড়া যায়, তা মাকরূহ হবে না।



## ১লা এপ্রিলে এপ্রিল ফুল পালন করা

* এপ্রিল ফুল পালন করার মধ্যে যেহেতু মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয়, তাই তা হারাম ও গোনাহে কবীরা। কেননা ধোঁকা দেয়া ও মিথ্যা বলা হারাম– গোনাহে কবীরা। (١/□□ فتاوی رحیمیہ)

## শাওয়ালের ছয় রোযা

* শাওয়াল মাসে (১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দিন বাদে) ছয়টি নফল রোযা রাখলে এক বৎসর নফল রোযার ছওয়াব পাওয়া যায়। (মুসলিম) সাধারণ্যে এটাকে ছয় রোযা বলা হয়।

* ছয় রোযা একধারে রাখা যায় আবার মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গেও রাখা যায়। এটাই উত্তম। (الدر المختار)

* শাওয়াল মাসে কোনো কাযা রোযা রাখলে তার দ্বারা ছয় রোযার ফযীলত অর্জিত হবে না। (٤/□□ احسن الفتاوی)

## ৯ই যিলহজ্জের রোযা

* যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ (আরাফার দিন) রোযা রাখার অনেক ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা পিছনের এক বৎসর এবং সামনের এক বৎসর-এর গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম) তবে হজ্জের অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করলে এ রোযা রাখা মাকরূহ। (الفقه على المذاهب الأربعة، وامداد الفتاوى ج/٢ نقلا عن رد المحتار.)

* কেউ যদি যিলহজ্জ মাসের শুরু থেকে একাধারে নয়টি রোযা রাখে, তাহলে তা অনেক উত্তম। (١/□□ بہشتی زیور بحوالۂ عالمگیری)

## শবে মেরাজ

সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, রজব মাসের ২৭শে রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে গিয়েছিলেন। যদিও কোন্ মাসে এবং কোন্ তারিখে মেরাজ হয়েছিল তা নিয়ে বিজ্ঞ মুহাদ্দিছদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। যাহোক রজব মাসের ২৭ তারিখে মেরাজ মেনে নিলেও এরাতটাকে একটি বিশেষ বরকতময় রাত বলা যায় মাত্র, কিন্তু এ রাতে নফল ইবাদত করলে বিশেষ অতিরিক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে বা পরবর্তী দিন নফল রোযা রাখলে বিশেষ ফযীলত পাওয়া যাবে– এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত ও বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ নয়। (দেখুন ماثبت بالسنة) অতএব এ রাতকে উৎসবের রাত বা এ দিনের

রোযা রাখাকে বিশেষ ফযীলতের মনে করা যাবে না। কেউ যদি বিশেষ ছওয়াবের বিশ্বাস না রেখে এ রাতে ইবাদত করে বা পরের দিন রোযা রাখে, তার অবকাশ রয়েছে।

## ১২ই রবিউল আউয়াল

১২ই রবিউল আউয়াল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম দিবস হিসাবে পরিচিত। তাই এ দিনে কেউ কেউ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেন। আবার কেউ কেউ জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী করেন বা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এই দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্মবার্ষিকী পালন করেন। 'ঈদে মিলাদুন্নবী' অর্থ নবীর জন্ম উপলক্ষে খুশি বা নবীর জন্মদিবসের উৎসব। আর 'জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী' অর্থ নবীর জন্ম-উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মিছিল। ১২ই রবিউল আউয়ালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্মবার্ষিকী পালন এবং এসব উৎসব ও অনুষ্ঠান করা হবে কি না এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় সামনে রাখা যেতে পারে।

১। ১২ই রবিউল আউয়াল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম-তারিখ কি না বিষয়টি বিতর্কিত বরং অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেমের মতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম-তারিখ হল ৮ই রবিউল আউয়াল। অতএব মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম–এর মত অনুসারে ১২ই রবিউল আউয়াল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্মদিবসের উৎসব করা হলে তা হবে বাস্তবতা বিরোধী এবং অসঙ্গত।

২। ১২ই রবিউল আউয়াল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম-তারিখ কি না তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এ তারিখটি যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওফাতের তারিখ তা নিয়ে ঐ উৎসব পালনকারীদের কোন মতবিরোধ নেই। অতএব যে তারিখটি তাদের ধারণায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওফাতের নিশ্চিত তারিখ, সে তারিখ মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক বেদনাবহ স্মৃতি বিজড়িত তারিখ হতে পারে– উৎসবের নয়। তাহলে এদিনে উৎসব করাও অসঙ্গত হবে বৈকি?

৩। যদি মেনেও নেয়া হয় যে, ১২ই রবিউল আউয়াল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম-তারিখ, তবুও ইসলামে জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবস; জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোনো নীতি রাখা হয়নি, এগুলো মানুষের সৃষ্ট রছম। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও রসূল সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্মবার্ষিকী, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেননি। যদি তাঁরা পালন করতেন তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জন্ম-তারিখ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না।

৪। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সীরাত মোবারক নিয়ে আলোচনা করা এবং এরূপ আলোচনার মজলিস অত্যন্ত বরকতময়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি মহব্বত এবং যওক-শওক নিয়ে এরূপ আলোচনা করা ও তাতে শরীক হওয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রেমের এক অপরিহার্য দাবি। অতএব ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে এরূপ মজলিস না করে অন্য যেকোনো দিন ও যেকোনো মাসে করা হলে একদিকে যেমন রহমত ও বরকত লাভ করা যাবে, অপরদিকে অসঙ্গতি ও রছমের অনুসরণ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

৫। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সীরাত সারা বৎসর আলোচনার বিষয়, কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত সমুদয় আদর্শই তো রসূলের সীরাত। অতএব সারা বৎসরই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সীরাত নিয়ে আলোচনার মজলিস হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু রবিউল আউয়াল মাসেই এরূপ মজলিস মাহফিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু রবিউল আউয়াল মাসেই এরূপ মজলিস মাহফিল করা হয় অন্য মাসে করা হয় না– এটাও এক রছম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রছমও ভেঙ্গে দিয়ে সারা বৎসরের সবসময় সীরাত নিয়ে আলোচনার মোবারক মাহফিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

## ফাতেহা ইয়াযদহম

'ফাতেহা' বলতে বুঝানো হয় কোনো মৃত্যের জন্য দুআ করা, ঈছালে ছওয়াব করা। 'ইয়াযদহম' ফার্সী শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই রবিউস্‌সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রবিউস্ সানীর ১১ই তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতেহাখানী হয় তাকে বলা হয় ফাতেহা ইয়াযদহম।

পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোনো নিয়ম রাখা হয়নি। রসূল (সা.), সাহাবা ও তাবিয়ীনের যুগে তথা আদর্শ যুগে জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, উরস ইত্যাদি পালন করা হত না। এগুলো পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব ইসলামের

নামে এসব অনুষ্ঠান রছম ও বিদআত। তাই ফাতেহা ইয়াযদহম নামে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও উরস করা শরীআত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে তিনি অনেক উঁচু দরের ওলী ও বুযুর্গ ছিলেন, তাই এ নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যেকোনো দিন তাঁর জন্য দুআ করলে এবং জায়েয তরীকায় তাঁর জন্য ঈছালে ছওয়াব করলে তাঁর রূহানী ফয়েয ও বরকত লাভের ওছীলা হবে এবং তা ছওয়াবের কাজ হবে।

## আখেরী চাহার শোমবাহ

'আখেরী চাহার শোমবাহ' কথাটি ফার্সী। এর অর্থ শেষ বুধবার। সাধারণ পরিভাষায় আখেরী চাহার শোমবাহ বলে ছফর মাসের শেষ বুধবারকে বোঝানো হয়ে থাকে। বলা হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসের শুরু ভাগে ইন্তেকাল করেন সে অসুস্থতা থেকে ছফর মাসের শেষ বুধবারে অর্থাৎ, আখেরী চাহার শোমবায় কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন, তাই এ দিবসটিকে খুশির দিন হিসাবে উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথ্য সহীহ নয়। বরং সহীহ ও বিশুদ্ধ তথ্য হল এ বুধবারেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। কাজেই যেদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসুস্থতা বেড়ে যায় সেদিন ইয়াহুদী প্রমুখদের জন্য খুশির দিন হতে পারে, মুসলমানদের জন্য নয়। অতএব ছফর মাসের শেষ বুধবার অর্থাৎ, আখেরী চাহার শোমবাহ-কে খুশির দিন হিসাবে উদযাপন করা এবং এ হিসাবে ঐ দিন ছুটি পালন করা জায়েয হবে না। (فتاوى رحيمية □□/١)

## মসজিদের অর্থ কড়ি, মসজিদ নির্মাণের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের মাসায়েল

* হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয নয়। হালাল অর্থ দ্বারাই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। (فتاوى محمودية □□/١)

* অমুসলিমদের অর্থ মসজিদে গ্রহণ করা যায় দুইটা শর্তে। (১) তাদের ধর্মে যদি এরূপ কাজকে পূণ্যের মনে করা হয়ে থাকে। (২) অমুসলিমদের অর্থ গ্রহণ করলে যদি কোনো ফেতনা-ফাসাদের আশংকা না থাকে, যেমনঃ পরবর্তীতে আবার তারা ফেরত নেয়ার দাবি করতে পারে বা এর জন্য মুসলমানদের খোঁটা দিতে পারে– এরূপ আশংকা না থাকলে। (فتاوى محمودية □□/١)



* মসজিদের আকৃতি, ডিজাইন চিরাচরিত যেভাবে হয়ে আসছে সেভাবেই হওয়া জরুরি। এমন আকৃতি ও এমন ডিজাইনের মসজিদ নির্মাণ করা, যেটাকে সাধারণ লোক দূর থেকে দেখলে মসজিদ মনে করবে না, সেরূপ করা মাকরূহ ও গর্হিত। আর অমুসলিদের উপসনালয়ের আকৃতি ও ডিজাইনে মসজিদ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ আকৃতির মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া বা তাতে সংযোজন সাধন করে মসজিদের চিরাচরিত রূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেয়া ওয়াজিব। (جواهر الفقه □□/١)

* নাম শোহরতের উদ্দেশ্যে পাথরে খোদাই করে মসজিদ নির্মাণকারীর নাম লাগানো দুরস্ত নয়। তবে যদি এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, এটা দেখে নির্মাণকারীর কথা মানুষের স্মরণ হবে এবং তার জন্য দুআ করা হবে, তাহলে তা জায়েয। (فتاوى محمودية □□/١)

* মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো রুম থাকলে তাতে যাওয়ার জন্য পৃথক রাস্তা রাখতে হবে। মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা অনুচিত হবে। তবে এরূপ হয়ে গেলে ভিন্ন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। (فتاوى رحيمية □□/٦)

* মসজিদের ভিতরে কেবলার দিকের দেয়ালে নকশা ইত্যাদি করা মাকরূহ। ভিতরে অন্য দিকের দেয়ালে বা বাইরে করা যায়, যদি কেউ এই উদ্দেশ্যেই অর্থ দিয়ে থাকেন। সামনের দেয়ালেও নামাযের সময় মুসল্লীর নজরে আসে না– এ রকম উপরে করা যায়। (فتاوى محمودية □□/٦ واحسن الفتاوى □□/٦)

* মসজিদের ইনকামের জন্য মসজিদ কম্পাউন্ডে মেছ বা ভাড়ার বাসা তৈরি করা যায়, যদি তাতে মসজিদের ভাব-গাম্ভীর্য ও হৈ চৈ-এর কারণে মসজিদের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে।

* মসজিদের আয়-উপার্জনের স্বার্থে অতিরিক্ত স্থানে দোকান ঘর তেরি করে তা ভাড়া দেয়া জায়েয। তবে যে স্থানে একবার মসজিদ হয়েছে তা ভেঙ্গে সেখানে দোকান/ঘর তৈরি করা জায়েয নয়।

* বেতনভুক্ত মুদাররিছের জন্য মসজিদে (কুরআন/কিতাব-এর) তা'লীম দেয়া জায়েয নয়। তবে বাইরে কোনো জায়গা না থাকলে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে পড়ানো জায়েয। (১) মুদাররিছ বেতনের লোভের পরিবর্তে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন/ভাতা নেয়ার উপর ক্ষান্ত করবে। (২) উক্ত তা'লীম নামায, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি

ইবাদতের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। (৩) মসজিদের আদব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। (৪) অবুঝ বাচ্চাদের মসজিদে আনবে না। (احسن الفتاوى ٦/□□)

## মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত মাসায়েল

* ওয়াক্ফের জন্য রেজিস্ট্রেশন জরুরি নয়। (فتاوى محمودية ٦/□□)

* মসজিদের ব্যবস্থাপনার জন্য বেতন/ভাতার কথা ওয়াক্ফ নামায় উল্লেখ থাকলে এবং বিনা বেতন/ভাতায় শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করার মত কোনো লোক বা ট্রাষ্টি বোর্ড না থাকলে ব্যবস্থাপনাকারীদের জন্য বেতন/ভাতা নির্ধারণ করার অনুমতি রয়েছে। (فتاوى رحيمية ٦/□□)

* মুতাওয়াল্লী/মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ইমাম মুয়াজ্জিনদেরকে প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে বেতন/ভাতা প্রদান করা। এ দায়িত্বে ত্রুটি করলে খোদার নিকট তাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। (فتاوى رحيمية ٤/□□)

* ওয়াক্ফ সম্পত্তি বদল করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

* ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় করা জায়েয নয়। তবে সাময়িক প্রয়োজনে কোন আসবাব ক্রয় করে থাকলে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর তা বিক্রয় করা জায়েয। (فتاوى محمودية ٦/□□)

* মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রয়োজনে ভাড়া দেয়া বা জমি হলে তাতে চাষাবাদ করা জায়েয।

* এক ওয়াক্ফের সম্পত্তি অন্য ওয়াক্ফে দান করা জায়েয নয়। তবে ওয়াক্ফনামায় উল্লেখ থাকলে জায়েয।

* ওয়াক্ফনামায় উল্লেখ থাকলে বা ওয়াক্ফ/দানকারীর অনুমতি থাকলে এবং এখানে প্রয়োজন না থাকলে এক ওয়াক্ফের অর্থ অন্য ওয়াকফের ঋণ দেয়া যায়।

* ওয়াক্ফ সম্পত্তির অর্থ স্কুল কলেজ প্রভৃতি দুনিয়াবী শিক্ষায় ব্যয় করা জায়েয নয়। (فتاوى رحيمية ٢/□□)

* মসজিদের লোটা (বালতি ইত্যাদি) মসজিদের বাইরে ঘরে নিয়ে যাওয়া বা উযূ, ইস্তেন্জা, গোসল ব্যতীত ব্যক্তিগত অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়। (فتاوى محمودية ١٠/□□)

* মুতাওয়াল্লী বা কমিটি মসজিদের টাকা-পয়সা ইত্যাদি হক মাফ



করার অধিকার রাখে না।

* ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা খেয়ানত। তাই ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে অবৈধ হস্তক্ষেপকারী মুতাওয়াল্লীকে পদচ্যুত করে দেয়া ওয়াজিব। তবে স্পষ্টত সংশোধন হওয়ার পর আবার তাকে পূর্ব পদে বহাল করা যায়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

* ওয়াক্ফকারী/দানকারীর স্পষ্ট বর্ণনা বা অনুমতি ব্যতীত ওয়াক্ফ/দানকৃত সম্পদ থেকে মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করা বৈধ নয়।

* ই'তেকাফকারী ও এমন মুসাফির, যার কোনো ঠিকানা নেই তারা মসজিদে শয়ন ও পানাহার করতে পারে। জরূরত হলে অন্যদের জন্যও শয়ন এবং পানাহার করা জায়েয। তবে মুসাফির ও অন্যরা (নফল) ইতেকাফের নিয়ত করে নিবে। (فتاوى رحيمية □□ امداد الفتاوى ١/□□)

* মসজিদে কেরোসিন তেল বা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু জ্বালানো নিষেধ। এমনকি ম্যাচ জ্বালানোও নিষেধ। দুর্গন্ধযুক্ত মশার কয়েল জ্বালানোও মাকরূহ।

* স্বাভাবিক নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদের পাখা চালানো উচিত নয়।

* মসজিদের কুরআন শরীফ বিক্রি করা জায়েয নয়, আবার তিলাওয়াত বিহীন ফেলে রাখাও ঠিক নয়। এজন্য অতিরিক্ত কুরআন শরীফ মসজিদে রাখবে না। যদি দানকারীকে বলা হয় যে, এখানে কুরআন শরীফ দান করলে প্রয়োজনের অতিরিক্তগুলো বিক্রি করে দেয়া হবে। এরপরও সে দান করে তাহলে সেরূপ অতিরিক্তগুলো বিক্রি করে দেয়া জায়েয হবে। (خير الفتاوى ١/□□)

* মসজিদ অনাবাদ/বিরান হয়ে গেলেও কিয়ামত পর্যন্ত সে স্থান মসজিদের হুকুমে থাকবে এবং মসজিদের ন্যায় তার সম্মান ও আদব রক্ষা করা ওয়াজিব থাকবে।

**বি. দ্র.** মসজিদের অন্যান্য সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন **১৮১–১৮৫** পৃষ্ঠা।

## মাদ্রাসা সম্পর্কিত নীতিমালা ও মাসায়েল

* মাদ্রাসার গঠনতন্ত্র রচিত হয়ে থাকলে সে অনুযায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করা জরুরি। অন্যথায় অন্যান্য মাদ্রাসার প্রচলিত নিয়ম

অনুযায়ী মাদ্রাসা চালানো হবে। (امداد الفتاوى ٣/□□)

* মাদ্রাসা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মাসায়েল অনুযায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করতে হবে।

* মাদ্রাসার টাকা কর্জ দেয়া জায়েয নয়। মুহতামিম এরূপ করলে তিনি ফাসেক, তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব এবং ঐ টাকার দায়-দায়িত্ব তার। (احسن الفتاوى ٦/□□ فتاوى محمودية ١/□□)

* মাদ্রাসার টাকা/পয়সা নিজের জন্য কর্জ নেয়াও জায়েয নয়। (امداد الفتاوى ٢/□□)

* দানকারী/ওয়াক্‌ফকারীর স্পষ্ট বর্ণনা বা অনুমতি ব্যতীত মাদ্রাসার টাকা-পয়সা দ্বারা মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করানোর শরীআতে অনুমতি নেই। মাদ্রাসার জলসা প্রভৃতিতে আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও এই মাসআলা। আপ্যায়নের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এই নামে স্বতন্ত্রভাবে কালেকশন করে নেয়া যেতে পারে। (فتاوى رحيمية ٦/□□، والعلم والعلماء)

* মুসাফিরখানার ন্যায় মাদ্রাসার বস্তু, মাদ্রাসার গোসলখানা প্রভৃতি ব্যবহার করা বৈধ নয়। যারা দুই এক দিনের জন্য মেহমান হিসাবে আসেন তারা ব্যবহার করতে পারেন। (فتاوى رحيمية)

* মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে মাদ্রাসা বানানোর অনুমতি শরীআতে নেই, তবে ওয়াক্‌ফকারী/দানকারীর নিয়ত থাকলে এবং তার অনুমতি থাকলে বানানো যায়, কিংবা মসজিদের অর্থে ইমারত নির্মাণ করে মাদ্রাসার নিকট ভাড়া দেয়া যায়। (أيضا)

* মসজিদে অমুসলিমদের চাঁদা গ্রহণের যে শর্ত, মাদ্রাসায় অমুসলিমদের চাঁদা গ্রহণের বেলায়ও সে শর্ত। দেখুন ৩৬৫ পৃষ্ঠা। (العلم والعلماء)

* সরকার যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমরা সাহায্য করে কোনোভাবে মাদ্রাসায় হস্তক্ষেপ করব না, তাহলে মাদ্রাসার জন্য সরকারী সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয। (العلم والعلماء نقلا عن امداد الفتاوي جـ/٤)

* যাকাতের অর্থ দ্বারা ইমারত নির্মাণ করা বা মুদাররিছদের বেতন/ভাতা প্রদান করা জায়েয নয়। নিতান্ত ঠেকাবশত এ অর্থ দ্বারা বেতন/ভাতা দিতে হলে হীলা (حيلۂ تمليك) করে নিতে হবে।

* সাধারণত যে পদ্ধতিতে হীলা হয়ে থাকে যে, একজন গরীব ছাত্র বা কর্মচারীকে ডেকে বলা হয় যে, আমি তোমাকে কিছু যাকাতের টাকা প্রদান করছি, তুমি সেটা মাদ্রাসায় দান করে দিবে। সে বলে আচ্ছা। এরপর



তাকে যাকাতের টাকা দেয়া হয় এবং সে তা মাদ্রাসায় দান করে দেয়। হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, এতে হীলা সহীহ হয় না, কেননা এভাবে সে নিজেকে উক্ত টাকার মালিকই মনে করে না, সে উক্ত টাকা রেখে দেয়ার অধিকারই বোধ করে না বরং সে উক্ত টাকা ফেরত দিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে– নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে না। তাহলে তাকে উক্ত টাকার মালিক বলা যায় না। আর মালিক না হলে হীলায়ে তামলীক হবে কি ছাই! হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, কাউকে বলা হবে, তুমি কারও থেকে এত টাকা ঋণ নিয়ে মাদ্রাসায় দান কর, আমরা তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য তোমাকে (যাকাতের) অর্থ প্রদান করব। তার পর সে ঋণ করে মাদ্রাসায় দান করলে মাদ্রাসার যাকাতের অর্থ থেকে তাকে উক্ত পরিমাণ প্রদান করা হবে এবং তা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করবে। টাকা হাতে পেয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে না চাইলে তার থেকে জোর পূর্বকও ঋণদাতা নিয়ে নিতে পারবেন। (العلم والعلماء) এরূপ ঋণ দেয়ার জন্য স্বতন্ত্র কিছু টাকা রাখা যেতে পারে।

* ওয়াক্‌ফকারী/দানকারী নির্দিষ্টভাবে কোন মাদ্রাসার জন্য কুরআন/কিতাব ওয়াক্‌ফ/দান করে থাকলে তা স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

* এক মাদ্রাসার মাল-সামান অন্য মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

* মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম/কমিটির দায়িত্ব মুদাররিছদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে বেতন/ভাতা প্রদান করা। এ দায়িত্বে ত্রুটি করলে (অর্থাৎ, প্রয়োজন অনুপাতে বেতন/ভাতা প্রদান না করলে) খোদার নিকট তাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। (بضوء فتاوى رحيمية ٦/□□)

* মাদ্রাসার মুদাররিছ রমযান মাসে মাদ্রাসার কাজ (সবক পড়ানো বা অন্যান্য দায়িত্ব পালন) না করলেও রমযানে যে বন্ধ থাকে তাতে সে বেতন/ভাতা পাবে, যদি শাবান মাসেই সে চাকরিচ্যুত না হয়ে থাকে এবং শাওয়াল মাসে মাদ্রাসার কাজ করে। (امداد الفتاوى ٣/□□)

* অসুস্থতা এবং ছুটি কাটানোর দিনগুলোতে বেতন পাবে কি না– এ সম্পর্কে মাসআলা হল, যদি চাঁদাদাতাদের স্পষ্ট বিবরণ বা লক্ষণ থেকে এ ব্যাপারে সম্মতি বুঝা যায়, তাহলে চাঁদার অর্থ থেকে উক্ত দিনগুলোর বেতন দেয়া জায়েয। অন্যথায় জয়েয নয়। চাঁদা দাতাগণ যদি

মুহ্তামিমকে কিছু অধিকার দিয়ে থাকেন (স্পষ্টভাবে হোক বা হাবভাবে) এবং সে অধিকার বলে তিনি এরূপ মুহূর্তের বেতন/ভাতার ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করেন, তাহলে সেই শর্ত অনুযায়ী এরূপ মুহূর্তের বেতন/ভাতা গ্রহণ করা জায়েয। যদি স্পষ্ট সম্মতি না পাওয়া যায় কিংবা যদি শর্ত নিরূপিত না হয়ে থাকে কিন্তু মাদ্রাসার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ও সুবিদিত থাকে, তাহলে সে নিয়মাবলী অনুযায়ী কাজ হবে। আর যদি স্পষ্ট সম্মতি বা নিয়মাবলী রচিত ও সুবিদিত না থাকে তাহলে অন্যান্য মাদ্রাসার সুবিদিত নিয়মাবলীর অনুসরণ করা হবে। আর যদি এই আমদানী কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির থেকে হয়ে থাকে তাহলে তার হুকুম ভিন্ন।

(امداد الفتاوى □□/٣)

* মাদ্রাসার মুদাররিছ বিশেষ কর্মচারী (اجير خاص), অতএব চাকরিজীবিদের প্রসঙ্গে এবং শ্রমনীতি সম্পর্কে যেসব মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, মুদাররিছদের বেলায়ও সেগুলো প্রযোজ্য হবে। (দেখুন পৃষ্ঠা ৩৮৪ ও পৃষ্ঠা ৩৯৬)

## মসজিদ মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা কালেকশনের মাসায়েল

* কমিশনের ভিত্তিতে চাঁদা কালেকশন করা বা করানো জায়েয নয়।[১]

(احسن الفتاوى □□/٦- فتاوى محمودية □□/١ اور العلم و العلماء)

* লোকজনের সামনে নির্দিষ্ট করে সম্বোধনপূর্বক কারও নিকট চাঁদা চাওয়া হলে বাহ্যত সে চাপের মুখে বা লজ্জায় পড়ে দিয়ে থাকে, স্বেচ্ছায় খুশি মনে দেয় না। আর খুশি মনে না হলে কারও নিকট থেকে চাঁদা নেয়া জায়েয নয়। (احسن الفتاوى □□/٦) তদুপরি লজ্জায় ফেলে চাঁদা উসূল করা গোনাহ। (العلم و العلماء)

* চাঁদা চাওয়ার সহীহ তরীকা হল– নির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করা ব্যতীত সাধারণভাবে দান করার জন্য উৎসাহিত করা হবে; এতে যে দিবে তার থেকেই নেয়া হবে। (احسن الفتاوى □□/٦)

* হারাম মাল বা হারাম টাকা/পয়সা চাঁদায় গ্রহণ করা যাবে না।

১. সম্প্রতি কোন কোন মুফতী সাহেব বর্তমানে এই পদ্ধতির কালেকশনে পূর্ববর্তী মুফতিয়ানে কেরাম কথিত مفضي إلي المنازعة (ঝগড়া–বিবাদের সুত্র ঘটা) পাওয়া যায় না বিধায় বর্তমানে এই পদ্ধতিতে কালেকশনকে জায়েয বলে ফতুয়া দিচ্ছেন।



* চাঁদা উসূল করার একটা শর্ত হল– নিজেকে অপমানিত হতে হয় এমন পন্থায় চাঁদা উসূল করা যাবে না। অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেরূপ পন্থায় চাঁদা করা জায়েয নয়। (العلم و العلماء)

* চাঁদা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা জায়েয কিন্তু চাপ সৃষ্টি করা বা নাছোড় হয়ে চাওয়া জায়েয নয়। (العلم و العلماء)

* চাঁদা উসূলকারী যদি বুঝতে পারেন যে, তার চাপাচাপির কারণেই চাঁদা দেয়া হচ্ছে, তাহলে তার জন্য সে চাঁদা গ্রহণও জায়েয নয় এবং দাতার জন্যও দেয়া জায়েয নয়। (العلم و العلماء)

* ওয়াজ বয়ান ও কথার যাদুতে মানুষ যখন অনেকটা বেহুঁশের মত হয়ে চাঁদা প্রদান করে, সে মুহূর্তের চাঁদা গ্রহণও জায়েয নয় এবং দাতার জন্য দেয়া জায়েয নয়। দাতার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর যা দিবে তা গ্রহণ করবে। (العلم و العلماء)

* চাঁদা উসূলকারী চাঁদা প্রদানকারীর জন্য দুআ করে দিবে, তবে চাঁদা প্রদানকারী দুআর জন্য আবেদন করবে না। (العلم و العلماء)

* চাঁদা চাওয়ার ক্ষেত্রে এস্তেগনা তথা আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চাওয়া উচিত। (العلم و العلماء)

* মুতাওয়াল্লী/ব্যবস্থাপক কোনো দ্বীনী মাসলেহাতের ভিত্তিতে কারও চাঁদা গ্রহণ না-ও করতে পারেন। (احسن الفتاوى □□/٦)



## কবরস্থান সম্পর্কিত মাসায়েল

* কবরস্থানের শুষ্ক ঘাস কাটা জায়েয আছে। কাঁচা ও তাজা ঘাস কাটা মাকরূহ; তবে রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনে কাটা যায়।

* ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানের অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে তা কাউকে বিনামূল্যে দিয়ে দেয়া জায়েয নয় বরং তা বিক্রি করে কবরস্থানের উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতার কাজে লাগাতে হবে। এ কবরস্থানে প্রয়োজন না থাকলে পার্শ্ববর্তী অন্য কবরস্থানে লাগানো হবে।

* গাছ ব্যতীত শুধু জমি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করলে গাছের মালিক ওয়াক্ফদাতা। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াকফদাতার অনুমতি ব্যতীত ঐ গাছের ফল ভোগ করা বা তা থেকে মেসওয়াক বানানো কোনো কিছু জায়েয নয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াকফদাতাকে বাধ্য করা হবে সে যেন তার গাছ কেটে নিয়ে কবরস্থানকে ফারেগ করে দেয়। আর অন্য কেউ গাছ

লাগালে তার মালিক সে। আপনা আপনি যে গাছ জন্মায় তা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির। বিনা মূল্যে সেরূপ গাছের ফল খাওয়া বা তা থেকে মেসওয়াক বানানোও জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□ অবলম্বনে।)

* যে স্থানে কবর নেই সেখানে জুতো/স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে হাঁটতে কোনো অসুবিধা নেই। কবরের উপর দিয়ে জুতো/স্যান্ডেল পরে চলা দ্বারা কবরের বেহুরমতী (অমর্যাদা) হয়ে থাকে। তাই কবরের উপর দিয়ে জুতো/স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায় চলা থেকে বিরত থাকা চাই।

* পুরনো কবরস্থান যেখানে কবর দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, পুরনো কবরগুলোর নিশানাও মিটে গিয়েছে, সেখানে মসজিদ বানানো জায়েয। এমনিভাবে ব্যক্তি মালিকানার কবরস্থানেও যদি কবরের নিশানা মিটে গিয়ে থাকে, সেখানেও মালিকের অনুমতিক্রমে মসজিদ বানানো জায়েয। (احسن الفتاوى ٦/□□)

## ঈদগাহ সম্পর্কিত মাসায়েল

* ফতোয়া শামীর বর্ণনা অনুযায়ী ঈদগাহ মসজিদের ন্যায় হুকুম রাখে। ঈদগাহের আদব, এহতেরাম রক্ষা করা ওয়াজিব। (احسن الفتاوى ج/٦)

* ঈদগাহে খেলা-ধূলা করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

* ঈদগাহে স্কুল বানানো জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

* ঈদগাহের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মাদ্রাসা বানানো জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ٦/□□)

## মুতাওয়াল্লী, মুহ্‌তামিম এবং মসজিদ/মাদ্রাসা কমিটির গুণাবলী ও দায়িত্ব কর্তব্য

* মুতাওয়াল্লী/ব্যবস্থাপককে মুসলমান হতে হবে। কোনো অমুসলিমকে এ পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। (معارف القران)

* মসজিদ মাদ্রাসার মুহ্‌তামিমকে দ্বীনদার, আমানতদার, বিশ্বস্ত ও শরীআতের পাবন্দ হতে হবে। অন্যথায় তাকে মুতাওয়াল্লী বা মুহ্‌তামিম বানানো ঠিক নয়। (জীবন্ত মসজিদ ও فتاوى رحيمية ٢/□□)

* বে-নামাযী বা ফাসেক ফাজেরকে মুতাওয়াল্লী বানানো জায়েয নয়। (فتاوى محمودية ٢/□□)

* মুতাওয়াল্লীর মধ্যে প্রশাসনিক দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে



অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। (فتاوى محمودية ٢/□□)

* মুতাওয়াল্লীর জন্য আকেল (বুদ্ধিসম্পন্ন) ও বালেগ হওয়া শর্ত। পুরুষ হওয়া বা অন্ধ না হওয়া শর্ত নয়। (জীবন্ত মসজিদ)

* মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা শরীআতের আইনের সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ-শরীআতের বাইরে যথেচ্ছা ব্যবহার করার বা যথেচ্ছা খরচ করার অধিকার তার নেই। (জীবন্ত মসজিদ)

* মাদ্রাসার মুহতামিম আলেম হওয়া চাই। শুধু আলেম নয় আলেমে বা-আমল হওয়া চাই। আলেম না হলেও অন্তত আলেমে বা-আমলের সুহবতপ্রাপ্ত হওয়া চাই। (العلم و العلماء)

* মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার বংশে কোনো যোগ্য আলেম থাকলে সে-ই পরবর্তীতে মুহতামিম হওয়ার অধিক হকদার। (العلم و العلماء)

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নাজায়েয হস্তক্ষেপ করনেওয়ালা (মুতাওয়াল্লী, মুহতামিম ও কমিটি)-কে পদ থেকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব– না করা গোনাহ। (احسن الفتاوى ٦/□□)

**দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত**

# তৃতীয় অধ্যায়: মুয়ামালাত

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ اَلنَّارُ أَوْلٰى بِهِ الحديث

(رواه البيهقي في شعب الإيمان وأحمد في المسند)

অর্থাৎ, যার শরীরের মাংস হারামের দ্বারা উৎপন্ন, সে জান্নাতে যাবে না, জাহান্নামের আগুনই তার জন্য উপযুক্ত। (শুআবুল ঈমান ও মুসনাদে আহমদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

## তৃতীয় অধ্যায়

## মুআমালাত

(পারস্পরিক লেন-দেন, কায়-কায়বার ও আয়-উপার্জন সম্পর্কিত)

## অর্থনীতি

### সম্পদ উপার্জনের নীতিমালা

১. সম্পদ হালাল ও পবিত্র হতে হবে।

২. হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ, যেখানে জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার কোনো দিক স্পষ্ট নয়– এরূপ) পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. সম্পদ উপার্জনের কাজে লিপ্ত হয়ে কোনো ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নাত কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটতে যেন না পারে।

৪. সম্পদ উপার্জন করতে হবে সম্পদের মোহ বা ভোগ বিলাসিতার উদ্দেশ্যে নয় বরং নিজের দায়িত্ব পালন ও ছওয়াব অর্জনের কাজে ব্যয় করার নিয়তে। তাহলে এটা ইবাদত বলে গণ্য হবে।

### সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা



১. সম্পদের উপর শরীআত যেসব দায়িত্ব অর্পন করেছে, সম্পূর্ণ ইখলাসের সাথে তা আদায় করা। যেমন: যাকাত, ফেতরা, কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি।

২. নিজের এবং নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য হক আদায়ের কাজে ব্যয় করা।

৩. আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান, মুসাফির, এতীম-মিসকীন, বিধবা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের প্রয়োজন সাধ্যানুযায়ী পূরণ করা।

৪. অপব্যয় না করা অর্থাৎ, যেসব স্থানে শরীআত ব্যয় করতে নিষেধ করেছেসেখানে ব্যয় না করা। অপব্যয় করা হারাম।

৫. অমিতব্যয় না করা অর্থাৎ, বৈধ স্থানেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করা। বৈধ স্থানেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা শরীআতে নিষিদ্ধ।

৬. কার্পণ্য না করা অর্থাৎ, বৈধ স্থানে ও প্রয়োজনের স্থানে মোটেই ব্যয় না করা বা প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় না করা বরং কমী করা। এটাকে বুখ্‌ল বা কার্পণ্য বলা হয়। এটা নিন্দনীয়।

৭. ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমও নয় বেশিও নয় বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা জরুরি।

৮. দ্বীন ইসলামের হেফাজত এবং দাওয়াত, তাবলীগ ও ধর্ম প্রচারের কাজে আন্তরিকভাবে উদার মনে ব্যয় করা।

৯. নফল ও ছওয়াবের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে দেয়ার ক্ষেত্রে নীতি হল– যিনি এরকম মজবূত ঈমান ও মজবূত অন্তরের অধিকারী যে, সম্পদ একেবারে না থাকলেও তিনি হা-হুতাশ করবেন না বা হারাম পথে ধাবিত হবেন না, তার জন্য এভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে দেয়ার অনুমতি রয়েছে বরং তা উত্তম। আর যার ঈমান ও অন্তর এরকম মজবূত নয়, তার জন্য সম্পূর্ণ সম্পদ এভাবে ব্যয় করার অনুমতি নেই। কেননা, এভাবে পরে তার ঈমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

১০.সাধারণ অবস্থায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করা অনুচিত।

(الفرقان ও اسلام کا اقتصادی نظام থেকে গৃহীত)

### সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের মাসায়েল

১. জরুরি দায়িত্ব আদায় করার পর সাধারণ অবস্থায় নিজের এবং নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের জন্য কিছুটা সঞ্চয় রাখা উত্তম, যাতে পরে নিজেকে ও নিজের সন্তানাদিকে অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়।

(اسلام کا اقتصادی نظام وحیوۃ المسلمین)

২. সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা রাখা জায়েয নয়। কারণ, এতে সুদভিত্তিক কারবারের অন্যায়ে সহযোগিতা করা হয়। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলে বা অনন্যোপায় অবস্থায় সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে রাখার অনুমতি রয়েছে। (فتاوی رحیمیہ)

৩. ব্যাংকের সুদের টাকা ব্যাংকে ছেড়ে দিয়ে আসা অন্যায়। কেননা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এটাকে সঠিক খাতে এবং মাসআলা অনুযায়ী ব্যয় করবে না। বরং নিয়ম হল এ টাকা তুলে এনে গরীব মিসকীনদের মধ্যে (ছওয়াবের নিয়ত ছাড়া) বণ্টন করে দেয়া। (احسن الفتاوی)

৪. ব্যাংকের সুদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যায় না। (যেমনঃ রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, মুসাফিরখানা নির্মাণ ইত্যাদি) বরং গরীব-মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।

৫. বর্তমানে প্রচলিত 'বীমা' সুদ ও জুয়ার সমষ্টি বিধায় তা করানো জায়েয নয়। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলে ভিন্ন কথা। জীবন বীমা করানো হলে বীমার মূল অর্থ মালিক বা তার ওয়ারিছগণ ভোগ করবে। বাকিটা সুদের অর্থের ন্যায় সদকা করে দেয়া ওয়াজিব।

(فتاوی رحیمیہ □□/٦ و فتاوی محمودیہ □□/٣)

৬. সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে চোর, ডাকাত প্রভৃতির নিকট সম্পদের কথা অস্বীকার করা জায়েয, এতে মিথ্যার গোনাহ হবে না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলাই শ্রেয়।

৭. সম্পদ রক্ষার স্বার্থে কেউ নিহত হলে সে শাহাদাতের ছওয়াব লাভ করবে।

## ব্যবসা-বাণিজ্য করতে টাকা দেয়ার মাসায়েল

যদি কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য অন্যকে টাকা দেয় এবং যাকে টাকা দেয়া হল তার কোনো অর্থ উক্ত ব্যবসায় না লাগে বরং সে শুধু শ্রম দেয়, তাহলে এরূপ কারবারকে ইসলামী ফেকাহ্‌র পরিভাষায় 'মুযারাবাত' বলা হয়। আর যদি উক্ত ব্যবসায় তার অর্থ-কড়িও লাগে তাহলে তাকে 'শেরকাত' (কোম্পানি ব্যবসা) বলা হয়। নিম্নে মুযারাবাত-এর মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

* অর্থদাতা/মহাজন ও বেপারীর মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। অর্থাৎ, লাভের কত অংশ কে পাবে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মহাজনের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ, বাকিটা বেপারীর ইত্যাদি। যদি



এরূপ কথা হয় যে, মোটের উপর মহাজনকে এত টাকা দিতে হবে বা মাসিক এত টাকা দিতে হবে তাহলে নাজায়েয ও সুদ হয়ে যাবে।

* যদি এরূপ কথা হয় যে, যা লাভ হবে তা আমরা বিবেচনা মত বন্টন করে নিব, তাহলে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে।

* কারবার শুরু হওয়ার পর যে পর্যন্ত হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে কারবার ক্ষান্ত না করবে, সে পর্যন্ত যদি কোনো বারে লাভ কোনো বারে লোকসান হয়, তাহলে লোকসান লাভের উপর থেকে কাটা যাবে– বেপারীরর উপরও ফেলানো হবে না বা মহাজনের উপরও ফেলানো হবে না।

* হিসাব চুকিয়ে কারবার বন্ধ করার সময় যদি দেখা যায় মোট হিসাবে লাভও দাঁড়ায়নি লোসকসানও হয়নি– সমান সমান রয়েছে, তাহলে মহাজন আসল টাকা নিয়ে যাবে আর বেপারীর শ্রম বৃথা যাবে, সে তার শ্রমের পরিবর্তে মহাজনের নিকট কিছু দাবি করতে পারবে না।

* হিসাব চুকানোর সময় যদি দেখা যায় লাভ তো হয়ইনি বরং উল্টো লোকসান হয়েছে, তাহলে সেই লোকসান বেপারীর উপর ফেলানো যাবে না বরং সে লোকসান মহাজনের যাবে। বেপারীর পরিশ্রমই তো বৃথা গেল, সেই লোকসানই তার জন্য যথেষ্ট।

* যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, মূল টাকায় লোকসান গেলে বেপারীকেও হারাহারিমতে সে টাকার অংশ দিতে হবে বা কারবারে লাভ না হলে বা লোকসান গেলে মহাজনকে বেপারীর শ্রমের মজুরি দিতে হবে তাহলে এ উভয় রকম শর্ত করা ফাসেদ ও নাজায়েয।

* যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, মুনাফা থেকে একটা নির্দিষ্ট অংক যেকোনো এক জনের, বাকিটা অন্যের বা একটা নির্দিষ্ট অংক প্রথমে এক জনের জন্য পৃথক করে নিয়ে বাকিটা উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে, তাহলে মুযারাবাত ফাসেদ হয়ে যায়।

* অর্থদাতা কারবারের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ বা নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে দিতে পারে।

* কারবারের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকলে কত দিন পর পর হিসাব নিকাশ করে পরস্পরের মাঝে মুনাফা বণ্টন হবে তা স্থির করে নিতে হবে।

* বেপারী মহাজনের অনুমতি ব্যতীত অন্যের নিকট ব্যবসার জন্য মহাজনের টাকা দিতে পারবে না।

* ব্যবসা করতে গিয়ে মাল উঠানামা করানো, যাতায়াত, সফরে হলে

খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যয় মূলধন থেকে যাবে।

* মুযারাবাতের শর্তাবলী ও চুক্তি লিখিতভাবে নিজেদের কাছে রাখা উত্তম।

* মহাজন যেকোোন সময় বেপারীকে বরখাস্ত করার ও টাকা তুলে নেয়ার অধিকার রাখে। তবে বেপারীর নিকট সংবাদ পৌছার পূর্বে সে কোনো মাল ক্রয় করে থাকলে তা বিক্রয় না করা পর্যন্ত সে বরখাস্ত হবে না।

* মহাজন বা বেপারীর যেকোনো একজনের মৃত্যুতে মুযারাবাতের চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। ওয়ারিছদেরকে (চাইলে) আবার চুক্তির নবায়ন (Renew) করে নিতে হবে।

(বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফেকাহ: ৩য়, ছাফাইয়ে মো'আমালাত এবং هدایه ج/٣ থেকে গৃহীত।)

## কোম্পানি বা যৌথ কারবারের মাসায়েল

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তি ও সম্মতি সাপেক্ষে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথভাবে কোনো কারবার করতে চাইলে তার নীতিমালা ও মাসায়েল নিম্নরূপ।

১. যথারীতি যৌথ কারবারের চুক্তি অঙ্গীকার হওয়া চাই। লিখিত হওয়াই উত্তম। মৌখিক হলেও জায়েয হবে।

২. সকলের পুঁজি ও মুনাফা সমান হওয়া জরুরি নয় বরং কারও পুঁজি কম কারও বেশি এবং সে অনুপাতে মুনাফাও অল্প বা অধিক হতে পারে।

৩. মুনাফা বণ্টনের হার পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে হবে অর্থাৎ, কে কত অংশ হারে পাবে সে বর্ণনা থাকতে হবে।

৪. মুনাফার সম্পর্ক কেবল পুঁজির সাথে নয় বরং শ্রম, সাধনা, কৌশলগত যোগ্যতা, বুদ্ধির প্রখরতা প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে মুনাফার ক্ষেত্রে। তাই কারও মধ্যে এসব গুণাবলী অধিক থাকার কারণে তার পুঁজি কম হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুনাফার হার অধিক দেয়া যেতে পারে। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হতে হবে।

৫. প্রত্যেকের স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির মারফত কার্যে অংশ গ্রহণ আবশ্যকীয়। তবে কোনো কারণবশত অংশ গ্রহণে অসমর্থ হলেও মুনাফায় অংশীদার থাকবে, কেননা ক্ষতি হলে তাকেও তা বহন করতে হবে।

৬. কারবারের প্রারম্ভে যদি কোনো অংশীদার বলে যে, আমি কাজে অংশ



গ্রহণ করব না, তাহলে এ কারবার তার জন্য ফাসেদ হয়ে যাবে।

৭. যে বিষয়ের যৌথ কারবার চলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমান। এমনিভাবে যেকোনো অংশীদারের হাতে কারবারের ক্ষতি হলে সকলকেই তার দায়িত্ব বহন করতে হবে। অবশ্য কোনো অংশীদার তাকে কোনো দ্রব্য ক্রয় করতে বাধা দেয়া সত্ত্বেও যদি সে তা ক্রয় করে এবং ক্ষতি হয় তাহলে তার দায়িত্ব একা তাকেই বহন করতে হবে। এমনিভাবে কেউ কোনো দ্রব্য ক্রয় করতে গিয়ে অসম্ভব প্রকারের প্রতারিত হয়ে থাকলে সে দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে।

৮. কোনো শরীক স্বেচ্ছায় ক্ষতি করলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে সে দায়িত্ব তারই ঘাড়ে বর্তাবে।

৯. সকল অংশীদারের অনুমতি ছাড়া কোনো অংশীদার কাউকেও যৌথ মূলধন থেকে ঋণ প্রদান করতে পারবে না।

১০. লাভ-ক্ষতিতে সকল অংশীদারকে ভাগী ধরতে হবে, কোনো অংশীদার ক্ষতির ভাগ থেকে মুক্ত থাকার শর্ত আরোপ করলে বা কোনো অংশীদার ক্ষতির দায়িত্ব পুরোটা নিজে নিতে চাইলে এ যৌথ কারবার নাজায়েয হবে।

১১. নিজের ব্যক্তিগত মালামালের সাথে যৌথ কারবারের মালামালকে একত্র করে রাখা অথবা উভয় কারবার মিশ্রিত করে রাখা জায়েয নয়। তবে সকল অংশীদারের অনুমতি থাকলে জায়েয।

১২. সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতীত নতুন কোনো অংশীদারকে শরীক করা যাবে না।

১৩. যে যৌথ কারবারে কোন পুঁজি বিনিয়োগ করা হল, কোনো অংশীদার ঐ কাজে ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ করে পৃথক কারবার করলেও তা যৌথ কারবারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। যেমন: কতিপয় লোক যৌথভাবে একটা কাপড়ের দোকান দিল, এমতাবস্থায় এদের কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় পৃথক কোনো কাপড়ের দোকান দেয়ার অনুমতি পাবে না।

১৪. যদি কোনো অংশীদার বা অংশীদারগণ অপর কোন অংশীদার বা অংশীদারগণকে বলে যে, এ কারবার এ স্থানে করলে ভাল হবে; এমতাবস্থায় অন্য স্থানে কারবার করলে যদি ক্ষতি হয় তাহলে নিজেদের মতে যারা সেটা করবে ক্ষতির দায় তাদেরকেই বহন করতে

হবে। অবশ্য মুনাফা হলে চুক্তি অনুযায়ী সকলেই তার অংশ পাবে।

১৫.যদি কোনো কারণে যৌথ কারবার বাতিল হয়ে যায় অথবা কেউ নিজেই স্বেচ্ছায় চুক্তি বাতিল করে, তাহলে মুনাফা পুঁজি অনুপাতেই বণ্টিত হবে। যদিও কারবারের প্রারম্ভে মুনাফা বেশ-কম গ্রহণের শর্তও হয়ে থাকে কিন্তু ভঙ্গের সময় তা কার্যকরী হবে না।

১৬.অংশীদারদের কেউ ইন্তেকাল করলে চুক্তি এমনিতেই বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে চুক্তি নবায়ন (Renew) করতে পারবে। (ইসলামী ফেকাহ: ৩য় থেকে গৃহীত।)

## যৌথ ফার্মের মাসায়েল

একাধিক সমপেশার লোক কোন পুঁজি ছাড়াই শ্রম বিনিয়োগ ও তার মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে যে যৌথ ফার্ম গঠন করে, তাকে ফেকাহ্র পরিভাষায় 'শির্কাতে আমল' বা 'শির্কাতে সানায়ে' বলে। যেমন: কয়েকজন ঠিকাদার বা কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার বা কয়েকজন দর্জি বা কয়েকজন স্বর্ণকার একত্রে কাজ করার ও তার মুনাফা চুক্তির ভিত্তিতে বণ্টন করে নেয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এরূপ যৌথ কারবারের প্রয়োজনীয় কয়েকটি মাসআলা নিম্নরূপ।

১. এতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে অংশীদার বানানো যায়।

২. এ ধরনের যৌথ কারবারে সকলের কাজ সমান সমান হওয়া এবং মুনাফায় সকলের সমান অংশীদার হওয়া শর্ত নয় বরং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এতে বেশ-কমও হতে পারে।

৩. অংশীদারদের যে কেউ কোনো কাজ বা কাজের অর্ডার নিলে তার দায়-দায়িত্ব সকলের উপর এসে যাবে এবং কাজদাতা যেকোনো অংশীদার থেকে কাজ বুঝে নেয়ার অধিকার রাখবে।

৪. যেকোনো অংশীদার কাজের অর্ডারদাতা থেকে পুরো মজুরি চেয়ে নিতে পারবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদার আর কাজদাতা থেকে কিছু চাইতে পারবে না। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন এক জনের হাতে মজুরি পরিশোধ করতে বলা হয়ে থাকলে কাজদাতার পক্ষে অন্য কাউকে মজুরি দেয়া ঠিক হবে না।

৫. অংশীদারদের একজন কাজ করল অন্যজন করল না, তাহলে এতে কাজ-দাতার কিছু বলার থাকবে না। অবশ্য কাজ দেয়ার সময় কাজদাতার পক্ষ থেকে যদি নির্দিষ্ট কারও কাজে থাকার শর্ত আরোপিত



হয়ে থাকে, তাহলে সে অনুযায়ী কাজ হতে হবে।

৬. কোন অংশীদার অসুস্থতা বা এরূপ অনিবার্য কোন কারণবশত যদি কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলেও সে লাভ ও মজুরিতে অংশীদার থাকবে।

৭. কোনো কাজে ক্ষতি বা লোকসান হয়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারকে সে ক্ষতি বহন করতে হবে। যে যে হারে লাভের অংশ গ্রহণ করে থাকে, ক্ষতির অংশও সে হারে বহন করবে।

৮. বৃহদায়তনে এ কাজ পরিচালনার প্রয়োজনে কোন ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করতে হলে নিজেদের মধ্য থেকে করা যায় বা বাইরে থেকেও করা যায়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যের জন্য হয় নির্ধারিত বেতন থাকবে বা মুনাফার একটা হারাহারি অংশ থাকবে। একদিকে নির্ধারিত বেতন নিবে অপরদিকে মুনাফার একটা হারও পাবে তা হতে পারবে না।

৯. কাজ শুরুর পূর্বে চুক্তি অঙ্গীকার হওয়া চাই। লিখিত হোক বা মৌখিক। লিখিত হওয়াই উত্তম।

১০. মুনাফা বণ্টনের হার পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হওয়া চাই।

## মিল/ফ্যাক্টরির সাথে সম্পর্কিত মাসায়েল ও শ্রমনীতি

* মিল/ফ্যাক্টরির দু'টো পক্ষ থাকে (১) মালিক পক্ষ (২) শ্রমিক পক্ষ ও কর্মচারী পক্ষ। মালিকের জন্য শ্রমিকের কি করণীয় এবং শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য মালিকের কি করণীয় সে সম্পর্কে যথাক্রমে ৪৬১ ও ৪৬০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি মাসআলা এবং মিল/ফ্যাক্টরির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

* মালিক শ্রমিক মজুরদেরকে নিজের ভাইয়ের মত মনে করবে।

* তাদের মজুরির মান হবে নিয়োগকর্তার জীবনযাত্রার মানের সমকক্ষ; উভয়ের মাঝে যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য না হয়। এমনকি কৃপণতাবশত কোনো মালিক নিম্নমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে মজুরদেরকে সে মান গ্রহণের জন্য বাধ্য করার অধিকার তার নেই।

* তাদের দ্বারা এমন কঠোর কাজ করাবে না, যাতে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে বা সত্বর ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে যায়। কখনো এরূপ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের বাস্তব ও আর্থিক সহায়তা করতে হবে।

* মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একবার কর্মচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কাজ করা বা নেয়া অসম্ভব হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে (অর্থাৎ, ওজর বা বাধ্যবাধকতা না দেখা দিলে) সেই চুক্তি বাতিল করার অধিকার কোনো পক্ষের নেই।

* উপরে বর্ণিত প্রকৃত ওজর ছাড়া যখনই ইচ্ছা একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে মালিক মিল/ফ্যাক্টরি লক আউট করতে পারবে না বা শ্রমিকরা কাজ বন্ধ/ধর্মঘট করতে পারবে না।

* মাসিক বেতনের ভিত্তিতে বা দৈনিক ভিত্তিতে (Daily basis) বা কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে সবভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা যায়।

* শ্রমিককে মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ করে থাকলে কাজ না নেয়ার দিনের বা ছুটির দিনেরও মজুরি তাকে দিতে হবে।

* মালিক মজুরি পরিশোধ করার যে সময় নির্ধারণ করেছে সে সময়েই মজুরি প্রদান করা আবশ্যক। ঘটনাক্রমে কোনো দিন বা কোনো মাসে পিছিয়ে গেলে দোষ নেই, তবে এরূপ পিছানোয় অভ্যস্ত হওয়া অন্যায়।

* মালিক যদি অনুভব করে যে, কোন শ্রমিক ন্যাস্ত কাজের ক্ষতি করছে অথবা সে মনোযোগের সাথে কাজ করছে না, তাহলে তাকে কর্মচ্যুত করার অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু কর্মচ্যুত করার পূর্বে দুটো কথা জানা দরকার। (১) শ্রমিকদের দৈহিক অসুবিধার কারণে এরূপ হয়ে থাকলে তাদেরকে কোনোরূপ চার্জ করা যাবে না। (২) মজুরির স্বল্পতাই যদি তার অমনোযোগের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তার মজুরি প্রচুলিত মজুরির চেয়ে কম হয়ে থাকলে তাকে প্রচলিত মজুরির সমান মজুরি অবশ্যই দিতে হবে। এ দু'টোর কোনোটা কারণ না হলে মালিক তাকে কর্মচ্যুত বা অধিক কাজ করতে আইনত বাধ্য করতে পারবে।

* মালিক শ্রমিককে তাগিদ করতে পারবে কিন্তু গালাগালি বা মার-পিট করতে পারবে না।

* শ্রমিকের দ্বারা ওজরবশত অথবা ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায় তার ব্যবহারে বা চার্জে দেয়া মেশিন যন্ত্রাংশ বা কোনো আসবাবের ক্ষতি সাধন হলে মালিক তার থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় ক্ষতিসাধন করে, যেমনঃ মেশিন সোজা না চালিয়ে বিপরীত দিকে চালায় অথবা তার ঠাণ্ডা গরম তারতম্য না করে তা চালায় আর ক্ষতি হয় অথবা ম্যাচের কাঠি ধরাতে গিয়ে মেশিনে আগুন লেগে গেল কিংবা গ্লাস



বরতন বা এ জাতীয় আসবাবপত্র এমন স্থালে রাখল, যেখানে ছেলে মেয়ে বা বিড়াল পৌঁছতে পারে, ফলে তা ভেঙ্গে গেল, এরূপ হলে মালিক তার থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। ঘরের চাকর-নওকরের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

* মালিকের পরামর্শের বিপরীত কাজ করার ফলে ক্ষতি হলে সে জন্য শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

* মিল/ফ্যাক্টরির উৎপাদিত পণ্যের যে মান দেখে গ্রাহকরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, পরবর্তীতে সে মান কম করে দেয়া গ্রাহকদের প্রতারিত করার শামিল বিধায় তা পাপ ও অন্যায়।

* মালিক যদি কোন কাজের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করে যে, এ কাজ তুমি নিজেই করবে, তাহলে শ্রমিক সে কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে পারবে না। করালে যদি ক্ষতি হয় তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

* যে সংস্থার মালিক ব্যক্তি বিশেষ, সেক্ষেত্রে তিনি বা যে সংস্থার মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং সরকার বা জনগণ, সে ক্ষেত্রে তার নিয়োগকর্তা যদি অনুমোদন দান করে, তাহলে সে সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ছুটি বা অসুস্থতার বেতন/ভাতা দেয়া হবে।

* নিয়োগকর্তাদের পক্ষ থেকে যে টাকা পুরস্কার, অনুদান, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি স্বরূপ দেয়া হয় তাকে কখনো মজুরির মাঝে গণ্য করা যায় না।

* বেতন দেয়ার সময় নির্ধারিত থাকলে তার পূর্বে বেতন দাবি করার অধিকার লাভ হয় না। তবে মালিক ইচ্ছা করলে অগ্রিম দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাকি সময় বা বাকি দিনগুলোর কাজ করে দেয়া শ্রমিকের যিম্মাদারী হয়ে দাঁড়ায়। (ইসলামী ফিকাহঃ ৩য় খণ্ড থেকে গৃহীত।)

## পেশাজীবি শ্রমিক/ব্যবসায়ী শ্রমিকদের মাসায়েল

যেসব পেশাধারী লোক কিছু কলা-কৌশল জানে এবং বিশেষ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ হয়ে চাকরি করে না বরং তারা অনেকের কাজ করে দিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'আজীরে মুশতারাক' বা ব্যবসায়ী শ্রমিক। পেশাজীবি শ্রমিক। যেমনঃ ঘড়ির মেকার, কুলি, মুচি, রং মিস্ত্রি, কামার, স্বর্ণকার, দর্জি, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ কয়েকটি মাসআলা নিম্নরূপ।

* তাদের অবহেলার দরুন কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তাদেরকে সে জিনিসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবশ্য কেউ ক্ষতিপূরণ দাবি না করলে সেটা তার অনুগ্রহ।

* মজুরি পূর্বেই নির্ধারিত করতে হবে। নগদ না বাকি তা-ও পূর্বেই ফয়সালা করে নিতে হবে। কাজের ধরন ও বিবরণও পূর্বে স্পষ্ট হতে হবে।

* তারা কাজ শেষ করার পূর্বে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হয় না। তবে স্বেচ্ছায় কেউ পরিশোধ করলে তা ভিন্ন কথা। এজাতীয় পেশাজীবিরা বায়না/এডভান্স স্বরূপ কিছু যদি এই শর্তে গ্রহণ করে যে, কাজ না নিলে সে টাকা ফেরত দেয়া হবে না, তাহলে এরূপ করা জায়েয হবে না। এরূপ শর্ত ছাড়া এডভান্স নিতে পারে।

* তারা যদি কাজ ডেলিভারীর সময় নির্ধারিত করে দেয়, তাহলে অনুরূপ করা আবশ্যকীয় নয়। কেননা তারা আইনের জন্য দায়ী– সময়ের জন্য নয়। অবশ্য নৈতিক দৃষ্টিতে ওয়াদা ভঙ্গ করা অনুচিত। তবে সে যদি কোনো কিছু আর্জেন্ট দেয়ার কথা বলে কিছু অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করে, তাহলে সময়মত তা দেয়া আবশ্যকীয়।

* তারা পারিশ্রমিক পাওয়া পর্যন্ত তাদের দায়িত্বে দেয়া দ্রব্য আঁটক রাখতে পারে। যদি এরূপ আঁটক রাখা দ্রব্য আঁটক রাখার মেয়াদে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তারা সে জন্য দায়ী নয়। (ইসলামী ফেকাহ: ৩য়)

## ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ মাসায়েল

* অবৈধ বস্তু ক্রয় করা বা কোনোভাবে অবৈধ বস্তুর মালিক হয়ে গেলে এমন লোকের নিকট তা বিক্রয় করা যার জন্য তা অবৈধ, এটা জায়েয নয়।

* যেসব দ্রব্য বিক্রি করা হবে তা সামনে থাকতে হবে অথবা তার নমুনা (sample) সামনে থাকতে হবে। অদেখা দ্রব্য দেখার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার শর্তে ক্রয় করলেও তার অনুমতি রয়েছে।

* বিক্রিত দ্রব্যের সমস্ত অবস্থা (দোষ-ক্রটি থাকলে তাসহ) ক্রেতাকে খুলে বলতে হবে, অন্যথায় বিক্রয় শুদ্ধ হবে না এবং ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। দ্রব্যের দোষ না বলে ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করা হারাম।

* বিক্রেতা দ্রব্যের যে গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিল পরে তার বিপরীত প্রমাণিত হল, যেমনঃ বলেছিল রং পাকা বা অমুক কোম্পানির, অথচ তা মিথ্যা প্রমাণিত হল, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা সেটা ফেরত দেয়ার অধিকার রাখে।



* দাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। কেউ তা অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রাখলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

* ক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি বলে দু' তিন দিনের মধ্যে (তিন দিনের বেশি নয়) দ্রব্যটি গ্রহণ বা বর্জনের কথা জানাব অথবা ঘরে দেখিয়ে পরে বলব, তাহলে উক্ত মেয়াদের মধ্যে ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে যদি ক্রেতা দ্রব্যটি ব্যবহার করে না থাকে কিংবা যেসব দ্রব্য ব্যবহার করা ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না, সেগুলো ব্যবহারের ফলে দ্রব্যটির মাঝে কোনো দোষ- ক্রটি সৃষ্টি না হয়ে থাকে।

* বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিশেষ গুণাগুণ বর্ণনা করল, কিন্তু অন্ধকারের কারণে ক্রেতা ভাল করে তা দেখে নিতে পারল না। কিংবা কেবল বিক্রেতার বর্ণনার ভিত্তিতে সে ক্রয় করল, কিন্তু পরে নেয়ার পরে পরীক্ষা করে বিক্রেতার বর্ণনামত পেল না, তাহলে ক্রেতার সেটা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। নমুনা (sample) দেখে অর্ডার দেয়ার পর নমুনা মত না পেলেও তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। অবশ্য দ্রব্যটি ব্যবহার করলে বা অন্যের কাছে বিক্রি করলে পরে আর তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকে না।

* কোনো দ্রব্য না দেখে ক্রয় করে থাকলে দেখার পর তা রাখা বা না রাখার অধিকার থাকবে।

* যেসব বস্তুর নমুনা দেখে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায় না, সেরূপ দ্রব্যের নমুনা দেখে অর্ডার দিলে দ্রব্যটি পাওয়ার পর তা ক্রয় করা না করার অধিকার থাকবে। আর যে দ্রব্যের নমুনা দেখে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায় সে ক্ষেত্রে নমুনার অনুরূপ না পেলে উপরোক্ত অধিকার থাকবে, কিন্তু নমুনার অনুরূপ পেলে সে অধিকার থাকবে না।

* বিক্রেতা যদি দ্রব্যের সে পরিমাণ দাম নিয়ে থাকে, যা কোন স্বচ্ছ নির্দোষ দ্রব্যের বিনিময়ে নেয়া হয়ে থাকে, আর পরে তাতে কোনো দোষ প্রকাশ পায়, তাহলে ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। যদি ক্রেতা দোষ-ক্রটি সত্ত্বেও রাখতে চায় তাহলে তার দাম কম দেয়ার অধিকার থাকবে না। অবশ্য বিক্রেতা স্বেচ্ছায় কিছু কম নিলে তা তার ইচ্ছা। তবে দোকানদার পণ্যের দোষ-ক্রটি বলা সত্ত্বেও কেউ সে দ্রব্য ক্রয় করলে উক্ত দোষ-ক্রটির কারণে তার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না।

* ক্রেতার হাতে এসে কোনো ক্রটি হলে সে দ্রব্য ফেরত দেয়ার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়।

* ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার পর কিছু (ভালটা) রেখে বাকিটা (খারাপগুলো) ফেরত দেয়ার অধিকার নেই। রাখলে পুরোটা রাখতে হবে কিংবা পুরোটা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য বিক্রেতা সম্মত হলে সব রকমই করা যেতে পারে।

* যেসব দ্রব্য ভাঙ্গার পর (যেমন: ডিম) বা কাটার পর (যেমন: তরমুজ) তার ভাল-মন্দ বুঝা যায়, সেসব দ্রব্য ভাঙ্গা বা কাটার পর যদি সম্পূর্ণ ফেলে দেয়ার মত অবস্থা দেখা যায়, তাহলে পুরো দাম ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে। যদি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার উপযোগী থাকে (যেমন: তরমুজ বা কোনো তরকারী জন্তুকে খাওয়ানোর যোগ্য থাকে) তাহলে সেগুলো ফেরত না দিলে কিছু দাম কমানোর অধিকার থাকে।

* ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রথমে দাম পরিশোধ এবং পরে পণ্য হস্তান্তর হবে। ক্রেতা এরূপ দাবি করতে পারবে না যে, প্রথমে পণ্য দিন পরে দাম নিন। অবশ্য বিক্রেতা চাইলে প্রথমে পণ্য দিতে ও পরে দাম নিতে পারে।

* বিক্রেতা কোনো দ্রব্য বিক্রি করলে ক্রেতাকে তা এমনভাবে হস্তান্তর করতে হবে যাতে দ্রব্যটি তার আয়ত্তে নিতে কোনো প্রকার বেগ পেতে না হয়।

* বিক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় কোনো দ্রব্য অধিক পরিমাণে দিয়ে থাকে অথবা ক্রেতা মূল্য কিছু বেশি দিয়ে থাকে তাহলে কারবার চূড়ান্ত হওয়ার পর কাউকে তা ফেরত দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

* দাম পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার ক্রেতাকে বহন করতে হবে, যেমন: মানিঅর্ডার খরচ (এমনিভাবে পে অর্ডার ও পোস্টাল অর্ডার খরচ) ইত্যাদি।

* এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের লেখা পড়া সংক্রান্ত খরচ যেমন: জমির দলিল রেজিষ্ট্রি ব্যয় ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

* ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিতে যেসব খরচ হয়ে থাকে সেসব খরচ বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। যেমন: মাপ বা ওজন করার ব্যয়, সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকলে সেগুলো সংগ্রহের ব্যয় ইত্যাদি।

* ক্রেতার নিকট মালামাল পৌঁছানোর পরিবহন ব্যয়, ভিপি খরচ ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে, অবশ্য বিক্রেতা স্বেচ্ছায় বহন করলে তা হবে তার বদান্যতা। কিন্তু বিক্রেতাকেই তা বহন করতে হবে– এরূপ শর্ত আরোপ করলে বাণিজ্য ফাসেদ হয়ে যাবে।



* ভিপি যোগে মাল পাঠালে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

* কাউকে কোনো মাল তৈরি করার অর্ডার দিলে তার পূর্ণ বিবরণ, দাম দস্তুর, সরবরাহের স্থান, সরবরাহের দিন তারিখ, দাম পরিশোধের সময় ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি।

* যে কারবার ফাসেদ হয়ে যায় তা ভেঙ্গে দেয়া উচিত। অথবা অন্তত বিক্রেতা দাম ও ক্রেতা পণ্য ব্যবহার থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে আর তা কোনো দরিদ্র অভাবীকে দিয়ে দিবে।

* শরীআতে যেসব ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয় সেরূপ কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হলেও তা মলিককে ফেরত দেয়া জরুরি– কোনোভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করা বা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়।

* ফল আসার পূর্বে বা পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে আম কাঁঠাল প্রভৃতির বাগান বিক্রি করার যে প্রচলন রয়েছে তা জায়েয নয়।

* যে ব্যক্তি খালেছ হারাম উপায়ে কোনো মাল উপার্জন করেছে তার থেকে সেটা ক্রয় করা জায়েয নয়। (فتاوی محمودیہ ج/٤)

* টাকার বিনিময়ে সোনা/রূপা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। (احسن الفتاوی ج/٦)

(বেহেশতী জেওর ও ইসলামী ফেকাহ: ৩য় প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

**বি. দ্র.** ক্রেতার অধিকার ও বিক্রেতার অধিকার সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন ৪৬৩ ও ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

## বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল

* ধারে কারবার করতে বিক্রেতার সম্মতি আবশ্যক, তার সম্মতি ছাড়া দাম বাকি রাখা জায়েয নেই।

* বাকিতে কোনো বস্তু ক্রয় করলে মূল্য পরিশোধের দিন বা তারিখ নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।

* ক্রেতা কোনো একটি দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করল অথচ দাম পরিশোধের কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করল না– এমনিই দ্রব্য নিয়ে চলে গেল, তাহলে সে মেয়াদ এক মাস বলে ধরা হবে। এক মাস অতিবাহিত হলেও যদি মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে বিক্রেতা তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে। (اسلامی فقہ بحوالہ المجلۃ)

* হিসাব-নিকাশের সময় মূল্য নিয়ে মতবিরোধের আশংকা থাকলে মূল্য নির্ধারণের পরেই পণ্য নেয়া উচিত।

* ধারে বিক্রি করার পর বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেয়ার অধিকার থাকে না।

* বিক্রেতা যদি দাম পরিশোধের কিস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে তার পুরো দাম একত্রে দাবি করার অধিকার থাকবে না।

* বাকিতে বিক্রি করলে নগদের তুলনায় কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে।

* ধারের মেয়াদ বৃদ্ধি করার অধিকার বিক্রেতার, সে চাইলে মেয়াদ বৃদ্ধিও করতে পারে আবার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দাম দাবি করতে পারে এবং কঠোরতা সহকারেও দাম আদায় করার অধিকার তার রয়েছে।

* বাকিতে ক্রয় করলে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। বিনা অপারগতায় টালবাহানা করা জায়েয নয়।

(ইসলামী ফেকাহঃ ৩য় ও বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।)

### দাম এখন পণ্য পরে– এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল

যদি ক্রেতা থেকে দাম এখনই নেয়া হয় আর পণ্য পরে দেয়ার অঙ্গীকার হয়, এরূপ বিক্রয়কে বলে 'বাইয়ে সালাম'। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। যথাঃ–

১. যে পণ্যটি নেয়া হবে তার পূর্ণ বিবরণ জানা থাকতে হবে। এর জন্য কিছু নমুনা (sample) দেখে নেয়া উত্তম। যেসব পণ্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় তাতে বাইয়ে সালাম জায়েয নয়। যেমনঃ জন্তুর বেলায়।

২. দাম-দস্তুর চূড়ান্ত করে নিতে হবে।

৩. পণ্য হস্তান্তরের দিন সময় নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

৪. পণ্য যদি সহজে হস্তান্তরযোগ্য না হয় (যেমনঃ দশ বিশ মণ খাদ্যশস্য বা দু'চার গাইট কাপড় ইত্যাদি) তাহলে সে পণ্য কোন্ স্থান থেকে ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট থাকতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে বলতে পারে যে, অমুক স্থানে আমাদের এসব দ্রব্য পৌঁছে দিতে হবে।

৫. এরূপ কারবারের কথা-বার্তা চলাকালে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। যদি কথা-বার্তা চলে আজ আর টাকা দেয়া হবে পরের দিন, তাহলে বিক্রেতা গতকালের দাম আজ মেনে নিতে বাধ্য নয় বরং আজ নতুন করে কারবার চুক্তি করা বা অস্বীকার করার অধিকার থাকবে তার।



৬. যে মেয়াদের জন্য কারবার চুক্তি হল, সে মেয়াদের মধ্যে কখনও যদি পণ্যটি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়– মওজুদ না থাকে, তাহলে বিক্রেতা টাকা ফেরত দিতে পারবে। (ইসলামী ফেকাহঃ ৩য় থেকে গৃহীত।)

### আধুনিক কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে শরীআতের বিধান

* গ্রন্থস্বত্ব/প্রকাশনা-স্বত্ব বিক্রয় করা ও তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয়। (فتاوی رحیمیۃ □□/۲ و فقہی مقالات) তবে পূর্বেকার অনেক মুফতী এটাকে জায়েয বলতেন না।

* বিনা অনুমতিতে অন্য প্রকাশকের বই প্রকাশ করা জায়েয নয়। (فتاوی رحیمیۃ □□/۲)

* রক্ত বিক্রয় করা জায়েয নয়। তবে দুই অবস্থায় রক্ত দেয়া জায়েয। (১) যদি রক্ত দেয়া ব্যতীত রোগীর জীবনের আশংকা দেখা দেয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের দৃষ্টিতে রক্ত দেয়া ব্যতীত তার জীবন বাঁচানোর আর কোনো পথ না থাকে। (২) কিংবা অভিজ্ঞ ডাক্তারের দৃষ্টিতে রক্ত দেয়া ব্যতীত সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। এরূপ রোগীকে রক্ত দান করা জায়েয। রোগীর জন্যও এরূপ অবস্থায় রক্ত নেয়া জায়েয। প্রথম অবস্থায় তাকে বিনামূল্যে রক্ত দেয়ার মত কেউ না থাকলে তার জন্য রক্ত ক্রয় করাও জায়েয। তবে রক্ত বিক্রয় করা কারও জন্যই জায়েয নয়। (جواهر الفقه ج/٢)

* মানুষের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমনঃ চোখের কর্নিয়া, কিডনি ইত্যাদি) বিক্রয় করা জায়েয নয়। চক্ষু দান করা (জীবদ্দশায় হোক বা মরণোত্তর) জায়েয নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ জওয়াহেরুল ফেকাহ, ২য় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অন্যের চক্ষু ব্যবহার করাও জায়েয নয়। (جواہر الفقہ □□/۲ و فتاوی محمودیہ □□/٥)

* বোনাস ভাউচার বিক্রয় করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوی □□/٦)

* পেনশন বিক্রয় করা জায়েয নয়, তবে সরকারের কাছে বিক্রি করা জায়েয। (احسن الفتاوی □□/٦)

* গোবর বিক্রি করা জায়েয। (احسن الفتاوی □□/٦)

* পায়খানা বিক্রি করা জায়েয নয়, তবে মাটি হয়ে গেলে এবং মাটি প্রবল হয়ে গেলে বিক্রি করা জায়েয। (احسن الفتاوی □□/٦)

* কিস্তিতে (অধিক মূল্যে হলেও) ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, তবে পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ না করলে বিক্রিত দ্রব্য ফেরত গ্রহণ ও বিগত প্রদত্ত কিস্তির টাকা বাজেয়াপ্ত করার শর্ত আরোপ করা হলে সেরূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ। (احسن الفتاوی ج/٦)

* ক্রেতা ক্রয় করতে অস্বীকার করলে জমি ইত্যাদির বায়নার টাকা ফেরত দেয়া জরুরি। তবে বায়না করার পর বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রেতার ক্রয় করতে অস্বীকার করার অধিকার নেই। (احسن الفتاوی ج/٦)

* রেডিও, টেপরেকর্ডার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মাসআলা হল− যদি গান বাজনা ইত্যাদি গোনাহের কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে ক্রয় করা জায়েয নয় এবং এরূপ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করাও জায়েয নয়। অন্যথায় জায়েয। (احسن الفتاوی ج/٦)

* টেলিভিশন ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ তাহরীমী (যা হারামের কাছাকাছি)। (احسن الفتاوی ج/٦)

* মদ, গাজা, হেরোইন প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। আফিম যেহেতু ঔষুধে ব্যবহৃত হয় তাই বিক্রয় করা জায়েয, তবে যে এটা দ্বারা নেশা করবে বলে প্রবল ধারণা হয় তার নিকট বিক্রয় করা মাকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েয। (احسن الفتاوی ج/٦)

* ব্লাক করা আইনত অপরাধ। (فتاوی محمودیہ ٤/□□)

* বিড়ি সিগারেট বিক্রয় করা জায়েয, তবে বিড়ি সিগারেট সেবন যেহেতু মাকরূহ তাই এগুলো বিক্রি করা মাকরূহ কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। অতএব এ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

* ছেঁড়া ফাটা টাকা (নোট)-এর বদলায় ভাল টাকা (নোট) কম বেশি করে বদলানো দুরস্ত নয়। (فتاوی محمودیہ ج/٤)

* বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। (احسن الفتاوی ٦/□□)

* বিধর্মীদের বইপত্র, বাতিলপন্থীদের বইপত্র বিক্রয় করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوی ج/٦)

* এল, সি খুলে ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ থেকে যে মাল আমদানী করা হয় সেই মাল পৌঁছার পূর্বে যে ইনভয়েস ও বিল অফ লেডিং হস্তগত হয় তার ভিত্তিতে মাল পৌঁছার পূর্বেই মাল বিক্রয় করা জায়েয। (احسن الفتاوی ج/٦)

* খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় করা জায়েয নয়।



* সরকার স্মাগলিং বা চোরাইভাবে আমদানীকৃত মালামাল আঁটক পূর্বক সেগুলো নিলামে বিক্রয় করলে সেগুলো ক্রয় করা জায়েয নয়। কারণ সরকার সেগুলোর মালিক নয়। (احسن الفتاوی ج/٦)

* ডিপো হোল্ডারের পক্ষে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوی ج/٦)

* বর্তমানে প্রচলিত কৌটা ও প্যাকেটে বিভিন্ন মালের যে ওজন লেখা থাকে সেই ওজন ধরে নিয়ে ঐ মাল উক্ত ওজনের মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয। গ্রাহককে মেপে দেয়া জরুরি নয়। (احسن الفتاوی ج/٦)

* লটারির টিকিট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়।

* প্রাইজবন্ড ক্রয় করা জায়েয নয়।

* সুদভিত্তিক ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ফিক্সড ডিপোজিড, ডিপোজিট পেনশন স্কীম, এমনিভাবে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা বৈধ নয়, কারণ এগুলো সুদের হিসাবে পরিচালিত।

* আইনত নিষিদ্ধ না হলে ব্যাংকের বাইরে ডলার, পাউন্ড ইত্যাদি বেশি মূল্যে ক্রয় করা জায়েয, যদি তাতে মুসলমানদের ক্ষতি না হয়। (فتاوی محمودیہ ج/٤)

* বৈদেশিক মুদ্রা যেমন: ডলার, পাউন্ড ইত্যাদি সরকার নির্ধারিত মূল্যের বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। (فقہی مقالات)

* যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার প্রাথমিকভাবে ইস্যু (ঝঁনংপৎরনব) হয় তখন তা ক্রয় করা জায়েয এই শর্তে যে, সে কোম্পানির মূল কারবার হারাম হতে পারবে না। যেমন: ইন্সুরেন্স কোম্পানি বা সুদভিত্তিক ব্যাংক বা মদের ফ্যাক্টরি ইত্যাদি হতে পারবে না। (فقہی مقالات)

* স্টক মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও শেয়ার ব্যবসা চারটা শর্তে জায়েয। যথা:−

১. যে কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হবে সেটা মৌলিকভাবে হারাম কারবার করে না।

২. কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পত্তি (Fixd Assets) থাকতে হবে, যেমন: বিল্ডিং, ভূমি ইত্যাদি। যার সম্পূর্ণ পুঁজি এখনও তরল সম্পদে (Liquid Assets) রয়ে গেছে তার শেয়ার ফেস ভ্যাল্যু (Face Value) থেকে কম বা বেশিতে বিক্রি করা জায়েয নয়।

৩. কোম্পানি কোনো সুদী লেন-দেনের সাথে জড়িত থাকলে বাৎসরিক মিটিংয়ে সুদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, যদিও তার আওয়াজ (অগ্রাহ্য) Overrule হয়ে যায়।

৪. মুনাফা বন্টন হওয়ার সময় যতটুকু সুদী ডিপোজিট থেকে অর্জিত হবে ততটুকু সদকা করে দিতে হবে– তা ভোগ করতে পারবে না। মুনাফা (Dividend)–এর কত হার সুদী ডিপোজিট থেকে অর্জিত হয় তা কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্ট (Income Statment) থেকে জানা যায়।

* স্টক এক্সচেঞ্জে অনেক সময় শেয়ারের লেন-দেনের উদ্দেশ্যে নয় বরং পারস্পরিক ডিফারেন্স (Difference) দূর করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে শেয়ার ডেলিভারিও করা হয় না এবং সেটা উদ্দেশ্যও থাকে না বরং শুধু উদ্দেশ্য থাকে ডিফারেন্স দূর করা। এরূপ উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বনাম জুয়া খেলা সম্পূর্ণ হারাম। (فقہی مقالات)

* কারও নামে শেয়ার বরাদ্দ হওয়ার পর শেয়ার সার্টিফিকেট ডেলিভারি পাওয়ার পূর্বেও তা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (فقہی مقالات)

* ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। কারণ তা সুদভিত্তিক।

* বাণিজ্যিক নাম ও ট্রেডমার্ক বিক্রি করা জায়েয তিন শর্তে। যথা:

১. উক্ত নাম ও ট্রেডমার্ক সরকারী আইনে রেজিষ্টার্ড হতে হবে।

২. উক্ত নাম ও ট্রেডমার্ক ক্রয়কারীকে ঘোষণা দিতে হবে যে, এখন থেকে এই নাম ও ট্রেডমার্কে পূর্বের অমুক ব্যক্তি ও অমুক প্রতিষ্ঠান দ্রব্য তৈরি ও বাজারজাত করবে না বরং অন্যরা করবে।

৩. উক্ত নাম ও ট্রেডমার্ক ক্রয়কারী যথাসাধ্য পণ্যের সাবেক মান রক্ষা করার কিংবা আরও অধিক মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন করার চেষ্টা করবে। (فقہی مقالات)

* ইমপোর্ট এক্সপোর্ট লাইসেন্স ও যেকোনো বাণিজ্যিক লাইসেন্স বিক্রি করা জায়েয, যদি রাষ্ট্রীয় আইনে উক্ত লাইসেন্স হস্তান্তর করাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে। (فقہی مقالات)

* ইনডেটিং বিজনেস বা কমিশন এজেন্সি কারবার বৈধ। এটা দু' ধরনের হতে পারে।

১. এজেন্ট মূল কোম্পানি থেকে মাল ক্রয় করে বিক্রি করবে এবং কোম্পানি থেকে শতকরা পারসেনটিজ গ্রহণ করবে। এটা জায়েয এই



শর্তে যে, প্রথমে এজেন্টকে মাল হস্তগত করতে হবে তারপর ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজের গাড়ি, লরি, ট্রাক ইত্যাদিতে মাল বুঝিয়ে নেয়াও হস্তগত করার শামিল। হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। যেমন: ক্রেতা প্রস্তুত করে ক্রেতাকে কোম্পানির গোডাউনে নিয়ে যাওয়া হল আর ক্রেতা তার নিজস্ব গাড়িতে/বাহনে মাল বুঝে তুলে নিয়ে আসল। এ ক্ষেত্রে যেহেতু এজেন্ট মাল হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করল, তাই এটা জায়েয নয়। এল, সি খুলে বিদেশ থেকে মাল আনা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিদেশস্থ শাখা কর্তৃক মাল বুঝে গ্রহণ করা নিজের হস্তগত করার শামিল।

২. কখনও এরকম হয় যে, এজেন্ট শুধু ক্রেতাদেরকে উৎসাহিত ও প্রস্তুত করে এবং সেই ক্রেতাগণ সরাসরি মূল কোম্পানির সাথে ক্রয়ের চুক্তি করে। আর ক্রেতাদেরকে এই উৎসাহিত করার বিনিময়ে কোম্পানি এজেন্টকে শতকরা হারে কিছু বেনিফিট দিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিও বৈধ। (جدید فقہی مسائل ج/١ و احسن الفتاوی ج/٦)

* টিকিট কেটে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার যে পদ্ধতি বর্তমানে দেখা যায় তা বৈধ নয়। (أيضا)

## চাকরিজীবিদের বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা

* কোনো পদে লোক নিয়োগের জন্য ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৬০২ পৃষ্ঠা।

* অমুসলিম/কাফের সরকারের অধীনে চাকরি করার বিধান সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৬০৩ পৃষ্ঠা।

* যেসব প্রতিষ্ঠানে অবৈধ কাজকর্ম হয় সেখানে চাকরি করা বৈধ নয় এবং সেখান থেকে অর্জিত বেতন/ভাতাও হালাল নয়। যেমন: সিনেমা-বাইস্কোপ, পূর্ণ সুদভিত্তিক ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তবে ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যার হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহের কোনোই উপায় নেই অনন্যোপায় অবস্থায় বিকল্প হালাল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ব্যাংক বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা এবং সেখান থেকে বেতন/ভাতা গ্রহণ করা জায়েয হবে। (احسن الفتاوی ج/٧- فتاوی رحیمیۃ ج/٢- و جدید فقہی مسائل ج/١ وغیرہ)

* প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ (মূল ও বর্ধিত অংশসহ) গ্রহণ করা জায়েয। তবে চাকরিজীবি স্বেচ্ছায় যে অংশ কর্তিত করাবে, সে ক্ষেত্রে তাকওয়া হল তার উপর অর্জিত বর্ধিত অংশ ভোগ না করা।

* কোনো চাকরি গ্রহণের উদ্দেশে উলঙ্গ হয়ে মেডিকেল করানো বৈধ নয়। (فتاوى محموديه ج/٦)

* চাকরি ঠিক রাখার জন্য বা চাকরিতে কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্য ভ্যাসেকটমি/লাইগেশন করা নাজায়েয ও হারাম। (فتاوى محموديه ج/٦)

* চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যদি এই নিয়ম থাকে যে, চাকরি ছাড়তে হলে এক মাস বা এরকম কোনো নির্দিষ্ট সময় পূর্বে মৌখিক/লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে, তাহলে নিয়ম ভঙ্গ করলে চাকরিজীবির পাপ হবে, তবে প্রতিষ্ঠান এর জন্য চাকরিজীবি থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না কিংবা চাকরিজীবিকে উক্ত এক মাসের বেতন ফেরত দিতে হবে না। (احسن الفتاوى □□/٧)

* চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যদি শর্ত আরোপ করে যে, অন্তত এক বৎসর/বা নির্দিষ্ট এত সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে চাকরি ছাড়তে পারবে না, তাহলে শরীআতসম্মত ওজর ব্যতীত সে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে চাকরি ছাড়লে শক্ত গোনাহগার হবে, তবে যতদিন চাকরি করেছে, তার বেতন/ভাতা সে পাবে। (احسن الفتاوى □□/٧)

* নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিছক অযোগ্যতার কারণে কোনো চাকরিজীবিকে বরখাস্ত করা হলে অবশিষ্ট সময়ের বেতন/ভাতা সে পাবে না। (احسن الفتاوى ج/٧)

* চাকরিজীবি নির্দ্ধারিত ছুটির বাইরে যে কয়দিন ছুটি কাটাবে তার বেতন/ভাতা সে পাবে না। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছুটির দিন নির্দিষ্ট করা না থাকলে অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক রেওয়াজ কি তা দেখা হবে।

* এক বৎসর নির্ধারিত ছুটি না কাটালে বা কম কাটালে পরবর্তী বৎসর বিগত বৎসরের বকেয়া ছুটি ভোগ করার দাবি করতে পারবে না।
(احسن الفتاوى ج/٧)

* নির্ধারিত ছুটি ভোগ না করে সে ছুটির সময় ডিউটি পালন করার জন্য অতিরিক্ত বেতন/ভাতা দাবি করা যায় না। (أيضا)

* অফিস টাইমে ব্যক্তিগত কাজ করা এমনকি একটি ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লেখাও জায়েয নয়। তবে অফিসের কোনো কাজ না থাকলে ভিন্ন কথা। (امداد الفتاوى ج/٣)



* মাদ্রাসার মুদাররিছ (বা স্কুল কলেজের শিক্ষক) যে ঘণ্টায় তার ক্লাশ নেই তখন ব্যক্তিগত কাজ করতে পারে বা অন্যের কোনো কাজ করে দিতে পারে। (العلم و العلماء)

## চাকরি বা বসবাসের জন্য বিদেশ গমনের মাসায়েল

* নিজের দেশে এবং নিজের শহরে অন্যান্য লোকের ন্যায় জীবন জীবিকা চালানোর মত আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা থাকলে শুধুমাত্র জীবনের ষ্টান্ডার্ড বৃদ্ধির জন্য এবং বিলাসী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কোনো অমুসলিম দেশে গমন করা মাকরূহ।

* সমাজে সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য মুসলমানের উপর বড়ত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বা বিজাতীয় কৃষ্টি-সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো অমুসলিম দেশে বসতি গ্রহণ করা হারাম।

* নিজের দেশে থেকে ন্যুনতম জীবন জীবিকার ব্যবস্থাও করতে না পারলে যদি কোনো অমুসলিম দেশে কোনো বৈধ চাকরি পাওয়া যায় তাহলে সেখানে যাওয়া ও থাকা জায়েয দুইটি শর্তে: (১) সেখানে গেলে ঈমান-আমল রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে এতমীনান থাকতে হবে। (২) সেখানে প্রচলিত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

* কোনো অপরাধ ছাড়া নিজের দেশে জেল জরিমানা বা সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও অমুসলিম দেশে বসবাস করতে যাওয়া জায়েয উপরোক্ত দুইটি শর্তে।

* অমুসলিমদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে হলে অমুসলিমদের দেশে বসবাস করতে যাওয়া জায়েয বরং উত্তম। (فقهى مقالات)

## কয়েকটা আধুনিক পেশা সম্পর্কে শরীআতের বিধান

* উকালতির পেশা জায়েয, তবে শর্ত এই যে, সত্য মামলা গ্রহণ করবে অর্থাৎ, যে মক্কেল ন্যায়ের উপর রয়েছে তার মামলা পরিচালনা করবে। মিথ্যা মোকদ্দমা পরিচালনা করা জায়েয নয় এবং তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করাও হারাম। (امداد الفتاوى ج/٣)

* আইনজীবিদের জন্য আইনবিষয়ক পরামর্শ দিয়ে অর্থ গ্রহণের পেশা বৈধ। (جديد فقهى مسائل ج/١)

* ফটোগ্রাফারের পেশা বৈধ নয়, কারণ প্রাণীর ছবি তোলা জায়েয নয়। (جدید فقہی مسائل ج/۱)

* ওষুধ দেয়া ছাড়াও শুধু ব্যবস্থা বলে দিয়ে বা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে রোগী থেকে অর্থ গ্রহণের পেশা বৈধ। (جدید فقہی مسائل □□/۱)

* নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা, অভিনয় ইত্যাদির পেশা বৈধ নয়।

* টেলিভিশন ও গান বাদ্যের উপকরণ মেরামতের পেশা বৈধ নয়। রেডিও মেরামতের ব্যাপারে মাসআলা হল– যদি জানা থাকে রেডিও মালিক রেডিওকে খবর শোনার কাজে ব্যবহার করেন, গানবাদ্য শোনার কাজে ব্যবহার করেন না, তাহলে তার রেডিও মেরামত ও তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। (امداد الفتاوی □□/۳ و احسن الفتاوی ج/۷)

* ভিসিআর, ভিসিপি, ক্যামেরা প্রভৃতির মাসআলা টেলিভিশনের ন্যায়, আর মাইকের মাসআলা রেডিওর ন্যায় হওয়া যুক্তিসংগত। (লেখক)

* ঘড়ি ও চশমা মেরামতের পেশা বৈধ।

* সাংবাদিকতার পেশা বৈধ, তবে সাংবাদিক তথা পত্র-পত্রিকার কর্মকর্তাদেরকে নিম্নোক্ত নীতিমালা মেনে চলতে হবে, অন্যথায় পাপী হতে হবে।

১. শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত এমন কোনো ঘটনা ছাপা যাবে না যাতে কারও দোষ প্রকাশ পায়, কারও বিপদের কারণ ঘটে। কেননা কোনো কাফের সম্পর্কেও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা জায়েয নয়।

২. কোনো ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শুধু লোক মুখের রটনা বা কোনো পত্র পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়াকে যথেষ্ট মনে করবে না। তবে সে ঘটনায় যদি কারও কোনো দোষ-বদনাম না থাকে তাহলে এতটুকু প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা যায়।

৩. কারও কোনো দোষ-বদনাম বিষয়ক সংবাদ ছাপা জায়েয নয়, যদিও তা শরয়ী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়। বরং কারও কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হলে গোপনে সংশোধনের নিয়তে তাকে বলে দিতে হবে, সে সংবাদ প্রচার করে তাকে লাঞ্ছিত করা অন্যায়। তবে হ্যাঁ, কেউ মাজলূম হলে মাজলূমের দুরবস্থা তুলে ধরা এবং জালেমের বিরুদ্ধে বলা জায়েয এবং তা-ও এই নিয়তে যেন মাজলূমের সাহায্য হয়।

৪. মানুষকে উপদেশ প্রদান ও সতর্ক করার নিয়তে কোন দোষ-বদনামের কথা বলা যায়।



৫. পত্র-পত্রিকায় কারও নামে তার লেখা প্রতিবাদযোগ্য কোন বিষয় প্রকাশিত হলে, তার ব্যক্তির উপর আক্রমণ না করে শুধু বিষয়টার প্রতিবাদ বা জওয়াব দিয়ে দিতে হবে। কেননা কারও নামে কোনো লেখা শুধু প্রকাশিত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে এটা তার লেখা– এর প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়।

৬. যে সংবাদে কারও কোনো দোষ-বদনাম নেই বা যেটা কারও জন্য ক্ষতিকর নয় এরূপ বিষয় এই শর্তে ছাপা জায়েয যে, তা কোন মুসলমান ব্যক্তি বিশেষ বা মুসলমান জাতির স্বার্থ ও কল্যাণ বিরোধী হতে পারবে না।

৭. শরীআত বিরোধী বা বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা সম্বলিত কোনো লেখা প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে ছাপা হলেও সেই দিন এবং সেই সংখ্যাতেই তার প্রতিবাদ ও জওয়াব ছাপতে হবে। পরের কোনো সংখ্যার অপেক্ষা করা যাবে না এ জন্য যে, হতে পারে কেউ শুধু এ সংখ্যাটিই পড়বে, পরের সংখ্যা পড়বে না। তাহলে এ সংখ্যার লেখা তার গোমরাহীর কারণ হতে পারে। আর এর জন্য দায়ী হবে এই পত্রিকার কর্মকর্তাগণ।

৮. শরয়ী দলীলে যদি মুসলমানদের উপর কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার প্রমাণিত হয়, তাহলে সে সংবাদ এমনভাবে প্রচার করতে হবে যাতে সেই মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতার (বৈধ পদ্ধতিতে) আহ্বান থাকবে।

৯. পত্র-পত্রিকার সম্পাদক সর্বদা এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে পারদর্শী অথবা অন্তত উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নেয়ায় অভ্যস্ত এবং ধর্মের প্রতি অনুরক্ত।

১০. ধর্মের জন্য ক্ষতিকর বই-পত্র ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম ওষুধ বা যে কোনোভাবে শরীআতে নিষিদ্ধ কোন বিষয়ের বিজ্ঞাপন বা এশতেহার প্রকাশ করা যাবে না। (جواہر الفقہ ও গীবত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

* ইলেকট্রিক কাজের পেশা বৈধ। তবে সিনেমা, সুদভিত্তিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানি প্রভৃতি অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিকের কাজ করা বা যেকোনো স্থানে অবৈধ সংযোগ লাগিয়ে দেয়া বৈধ নয়।

## বাড়ী/গৃহ নির্মাণ সম্পর্কিত নীতিমালা ও মাসায়েল

* উত্তম প্রতিবেশী দেখে তার পাশে বাড়ী/গৃহ নির্মাণ করতে হবে। তাহলে সে বাড়ীতে বসবাস শান্তিদায়ক হবে।

* হারাম অর্থে বাড়ী/গৃহ বানাবে না। হারাম অর্থে নির্মিত বাড়ী/গৃহে বসবাস করা মাকরূহ তাহরীমী। (فتاوی رشیدیة)

* সুদভিত্তিক লোন নিয়ে বাড়ী/গৃহ নির্মাণ করা নাজায়েয, তাহলে সে বাড়ী/গৃহে বরকত হবে না। (فتاوی رحیمیة ج/۲)

* গৃহ নির্মাণের সময় নিয়ত রাখতে হবে যে, এতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যাবে এবং শীত গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা ও ইজ্জত আবরু ইত্যাদি হেফাহত করা যাবে।

* ঘর বা বিল্ডিংয়ের প্রতি তলা যতটুকু উঁচু হলে প্রয়োজন সম্পন্ন হয় তার চেয়ে বেশি উঁচু না করা সুন্নাত। (شرعة الإسلام)

* ঘর/বিল্ডিংয়ে কোনো প্রাণীর ছবি/মূর্তি বানানো নিষেধ।

* বাড়ী/গৃহে পেশাব-পায়খানা, গোসলখানা ও উযূখানা বানানো সুন্নাত। (مفاتیح الجنان)

* পেশাব-পায়খানার স্থান এমনভাবে বানাবে যেন বসতে গিয়ে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ না হয় এবং যেন বসে পেশাব করা যায়।

* বাথরুমে পেশাব-পায়খানার স্থান ও উযূ গোসলের স্থানের মধ্যে দেয়াল বা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে নিবে, যাতে উযূ গোসলের সময় সংশ্লিষ্ট দুআগুলো পড়া যায়। আলাদা না থাকলে উযূ গোসলের স্থানকেও পেশাব পায়খানার ঘরের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে এবং সেখানে দুআ-দুরূদ পড়া বা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা যাবে না।

* উযুর স্থান এমনভাবে বানাবে যেন উযুর জন্য উঁচুতে কেবলামুখী হয়ে বসে উযূ করা যায়।

* কোনো রূমের পশ্চিম দেয়ালে বেসিন লাগাবে না। কেননা বেসিনে কফ, থুথুও ফেলা হয়ে থাকে; তাই পশ্চিম দেয়ালে বেসিন লাগালে কেবলামুখী হয়ে কফ থুথু ফেলানো হবে, যা বে-আদবী। থুকদানী রাখার ব্যাপারেও এদিকে খেয়াল রাখবে। একান্তই যদি পশ্চিম দেয়ালে এগুলো থাকে তাহলে কফ থুথু ফেলার সময় মাথা নিচু করে নিবে, তাহলে বে-আদবী থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

* বাড়ি/গৃহে মেহমানখানা বা গেষ্টরুম রাখাও সুন্নাত।

* মেহমানখানা যথাসম্ভব এমনস্থানে বা এমন পাশে রাখবে, যেখানে গায়র মাহরাম পুরুষেরা ঘরের মহিলাদের স্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে না পায় বা মহিলাদের পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে।



* যথাসম্ভব গৃহ বা দেয়াল এমনভাবে বানানো, যাতে অহেতুক প্রতিবেশীর বাতাস বন্ধ হয়ে না যায়।

## ঘর/বাড়ি/ দোকান ইত্যাদি ভাড়া দেয়ার মাসায়েল

* কোনো মুসলমানদের পক্ষে অমুসলিম/কাফেরের নিকট বাড়ি/ঘর/অফিস/দোকান ভাড়া দেয়া মাকরূহ তানযীহী। (احسن الفتاوی ج/۷)

* কোনো অবৈধ কারবার চালানোর জন্য বাড়ি/ঘর ইত্যাদি ভাড়া দেয়া মাকরূহ তাহরীমী, যা হারামের নিকটবর্তী। যেমন: সুদভিত্তিক ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদির জন্য ভাড়া দেয়া। (احسن الفتاوی ج/۷)

* যাদের উপার্জন অবৈধ, তাদের নিকট বাড়ি ভাড়া দেয়া মাকরূহ। এরূপ অবস্থায় ভাড়াটে তার হারাম অর্থ থেকে যে ভাড়া পরিশোধ করবে, তা ব্যবহার করা বাড়ীর মালিকের জন্য জায়েয হবে না। এরূপ অর্থ ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব। (احسن الفتاوی ج/۷)

* ভাড়ার মেয়াদ একত্রে নির্ধারণ করা যায় বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সপ্তাহ বা মাস বা বৎসর এভাবেও নির্ধারণ করা যায়, উভয় পদ্ধতিই জায়েয।

* ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত থাকলে সেই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি করা জায়েয নয়; যদিও মালিক ইতিমধ্যে মেরামত ইত্যাদি কাজে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আর ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত না থাকলে প্রতি মাসের শুরুতে মালিক বর্ধিত ভাড়া প্রদান বা ঘর/বাসা/দোকান ইত্যাদি খালি করে দেয়ার জন্য দাবি জানাতে পারে এবং এই অতিরিক্ত ভাড়ায় গ্রহণ করার মত অন্য ভাড়াটে পাওয়া গেলে তখন মালিকের দাবিকৃত অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করা পুরাতন ভাড়াটের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সে এই অতিরিক্ত ভাড়া না দিতে পারলে ঘর/বাসা/দোকান ইত্যাদি খালি করে দিবে। (احسن الفتاوی ج/۷)

* ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত থাকলে সেই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ভাড়াটেকে বাসা/ঘর/দোকান খালি করে দেয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে না। (أيضا) তবে শরীআতসম্মত ওজর থাকলে তা পারবে। (هداية)

* ভাড়া দেয়া ঘর/দোকান ইত্যাদির সংস্কার ও মেরামত, পথের সুবিধা প্রদান এবং ভাড়াটিয়ার অন্যান্য অসুবিধাসমূহ দূর করা মালিকের কর্তব্য। (ইসলামী ফিকাহ: ৩য়)

* ভাড়ার চুক্তি হওয়ার পর কিছু অগ্রিম বা বায়না গ্রহণ করলে এবং পরে ভাড়াটিয়া ভাড়া নিতে না চাইলে গৃহীত অগ্রিম/বায়নার টাকা ফেরত দিতে হবে।

* পজেশন (Possession) ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। (الفقه الإسلامي وأدلته)

* ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ঘর/দোকান ইত্যাদির দখল বুঝে নেয়া মালিকের দায়িত্ব।

* মাসে মাসে বা পর্যায়ক্রমে ভাড়া থেকে কেটে দেয়া হবে এই শর্তে এডভান্স (Advance) গ্রহণ করা জায়েয। (৪/□□ عالمگیریہ)

## ঘর/বাড়ি/দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার মাসায়েল

* অবৈধ অর্থে নির্মিত ঘর/বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে বসবাস করা মাকরূহ তাহরীমী। (فتاوی رشیدیہ)

* মাসভিত্তিক ভাড়া নেয়ার পর মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি বাড়ী/ঘর ছেড়ে দেয় এমতাবস্থায় দেখতে হবে যদি শরীআতসম্মত ওজর ব্যতীত সে ছেড়ে দেয় তাহলে পূর্ণ মাসের ভাড়া তাকে দিতে হবে। আর যদি শরীআতসম্মত কোন নির্ভরযোগ্য ওজরবশত ছাড়ে, তাহলে ছাড়ার পূর্বে মালিকের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে নিবে এবং মালিক উক্ত ভাড়াটিয়া থেকে যে কয়দিন সে দখলে রেখেছে তার ভাড়াই নিতে পারবে– পুরো ভাড়া নিবে না। ভাড়ার মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকলে সেই নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে ঘর খালি করে দিলেও এই হুকুম। (امداد الفتاوی □□/٣ و احسن الفتاوی □□/٧)

* ভাড়াটিয়া নিজের পক্ষ থেকে ভাড়ার ঘর/দোকানে কোনো সংযোজন/নির্মাণ কাজ করলে মালিকের প্রাপ্য ভাড়া থেকে সেটা কেটে দিতে পারবে না। এরূপ হলে ঘর/দোকান ছেড়ে দেয়ার সময় তার সংযোজনকৃত অংশগুলো সে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেতে পারবে। আর মালিকের অনুমতিক্রমে এরূপ করলে ভাড়া থেকে কেটে নিতে পারবে।

* ভাড়াটিয়ার জন্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের কাছে ভাড়া দেয়া বা অন্যকে দখল দেয়া জায়েয নয়। (٢/□□ فتاوی رحیمیہ)

* বাড়ি/দোকান ইত্যাদির দখল মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়।

* ভাড়া নেয়া বাড়ী/দোকান নষ্ট করে ফেললে অথবা অত্যাধিক দুর্গন্ধময় ও ময়লাযুক্ত করে ফেললে মালিক উক্ত ভাড়াটিয়াকে তুলে দিতে পারবে। (ইসলামী ফেকাহ: ৩য়)

* বাড়ি/দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবহার না করলেও যতদিন দখলে রাখবে তত দিনের ভাড়া দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)



* ভাড়াটিয়া বা মালিকের কেউ মারা গেলে পূর্বের ভাড়া চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং ওয়ারিছদের নতুনভাবে কারবার চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। (هداية)

* বাসা ভাড়া নেয়ার পর যদি এমন কোনো অসুবিধা দেখতে পায় যাতে থাকার অসুবিধা, তাহলে সে চুক্তি বাতিল করতে পারে। (٣/□□ هداية)

## যানবাহনের ভাড়া/নেয়া সম্পর্কিত মাসায়েল

* কোন যানবাহন ভাড়া (রিজার্ভ) নিয়ে তার স্বাভাবিক ক্যাপাসিটির বাইরে লোক/মাল বোঝাই করা যাবে না। তবে মালিক যদি চায় বা সম্মত হয় তাহলে তার সে অধিকার আছে। (ইসলামী ফেকাহ: ৩য়)

* কোথাও যাতায়াতের জন্য রিক্স, মোটর বা অন্য কোনো যানবাহন ভাড়া নেয়ার পর মতের পরিবর্তন হলে রিক্স বা মোটর ফেরত দেয়া যায়। কিন্তু রিক্সর প্রচুর সময় ব্যয় করে থাকলে অথবা মোটরে কিছু পথ অতিক্রম করে থাকলে ঐ সময়ের মজুরি/জ্বালানীর দাম দিতে হবে।

* যে পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া করা হয়েছে অথবা টিকেট নেয়া হয়েছে যাত্রী তার চেয়ে বেশি গেলে তাকে আনুপাতিক হারে জরিমানা (অতিরিক্ত ভাড়া) দিতে হবে।

* যানবাহন কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়ার শর্তে ভাড়া নেয়ার পর পথে তা নষ্ট/অকেজো হয়ে পড়লে ওয়াদাকৃত স্থানে পৌঁছে দেয়া মালিকের দায়িত্ব। যদি যাত্রীদের বিলম্ব/অপেক্ষা করার অবকাশ না থাকে, তাহলে যে পরিমাণ পথ সে অতিক্রম করেছে তার ভাড়া পরিশোধ করে অন্য যানবাহনে যেতে পারবে। মালিক ভাড়া অগ্রিম নিয়ে থাকলে তার কর্তব্য বাকিটুকু ফেরত দেয়া। (ইসলামী ফেকাহ: ৩য়)

* কেউ মোটর, রিক্স বা কোন যানবাহন ভাড়া নিলে কি কাজের জন্য, কি মাল বহন করার জন্য এবং তা কত সময় বা কত দূরত্বের জন্য তা পরিষ্কারভাবে বলে নিতে হবে। যাতে পরে কোনো বিরোধ/সংঘর্ষ দেখা না দেয়। (প্রাগুক্ত)

* ভাড়াটিয়া শেষ পর্যন্ত ভাড়া না নিলে অথবা যানবাহন ব্যবহার না করলে গৃহীত অগ্রিম টাকা মালিকের হবে– এই শর্তে ভাড়ার অগ্রিম লেন-দেন জায়েয নয়। (প্রাগুক্ত)

* রেলগাড়ী, ট্রাক, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতিতে যে ধরনের ও যে পরিমাণ মালামাল বোঝাই করার অর্ডার নেয়া হয়েছে বা যার চুক্তি হয়েছে, তার

চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বোঝাই করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যাত্রীর সাথে যে পরিমাণ মাল নেয়ার সুযোগ কর্তৃপক্ষ দেয়, চুরি করে তার চেয়ে বেশি নেয়া জায়েয নয়। (প্রাগুক্ত)

* কারও মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়ার অর্ডার নিলে সেখানে পৌঁছে দেয়া এবং পৌঁছানো পর্যন্ত ভাঙ্গাচোরা ও নষ্ট হওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব যানবাহনওয়ালার উপর বর্তায়। আর কোন জীবজন্তু পাঠালে তার খাদ্য, মাছ পাঠালে তাতে বরফ দেয়া অথবা ডিম পাঠালে তা শীতল রাখার ব্যবস্থা করা মালিকের উপর বর্তাবে। মোটকথা, মালামালের নিরাপত্তার দায়িত্ব যানবাহন কর্তৃপক্ষের এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের। (প্রাগুক্ত)

* নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার জন্য কোনো যানবাহন রিজার্ভ করলে বা ট্রেনের সিট রিজার্ভ করলে উক্ত সময়ের মধ্যে বা সে দূরত্বের মধ্যে অন্য কাউকে চড়তে না দেয়ার অধিকার এসে যায়। (ইসলামী ফেকাহ: ৩য়)

## হক্কে শোফআর মাসায়েল

* কোন জমিতে শরীক বা তার পাশ-আলিয়া প্রতিবেশীকে বলা হয় "শফী"। যেমন: হামেদ যায়েদ-এর সাথে একই জমিতে শরীক বা তার পাশ আলিয়া প্রতিবেশী, তাহলে হামেদ হল যায়েদের 'শফী'। এমতাবস্থায় যায়েদ যদি ঐ জমি বিক্রি করতে চায় তাহলে হামেদ তা ক্রয় করতে চাইলে অন্য কেউ তা নিতে পারবে না। এই যে হামেদের দাবি, এই দাবিকে বলা হয় 'হক্কে শোফআ' (Pre-emption) বা অগ্রক্রয়াধিকার।

* শফী যদি 'হক্কে শোফআর' দাবি করতে চায় তাহলে তাকে এতটুকু করতে হবে যে, বিক্রয় সংবাদ শোনামাত্রই অবিলম্বে মুখ দিয়ে তাকে বলতে হবে যে, "আমি ঐ জমি ক্রয় করব।" যদি কিছুমাত্র দেরি করে বলে তাহলে তার দাবী অগ্রাহ্য হবে অর্থাৎ, 'হক্কে শোফআর' দাবি করা তার জন্য জায়েয হবে না। এমনকি কোন একটা চিঠির শুরুতে যদি জমি বিক্রয়ের কথা থাকে এবং সে চিঠিখানা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলে যে, 'আমি ঐ জমি ক্রয় করব বা নিব, তবুও তার দাবি অগ্রাহ্য হবে।

* শফী যদি বলে যে, আমাকে এত টাকা দাও আমি আমার 'হক্কে শোফআর' দাবি ছেড়ে দেই, তাহলে হক্কে শোফার দাবি তো সে আর করতে পারবেই না, অধিকন্তু টাকাও পাবে না; এভাবে টাকা নিলে তা রেশওয়াত (ঘুষ) বলে গণ্য হবে।



* আদালতের রায় হওয়ার পূর্বেই শফী মারা গেলে শফীর ওয়ারেছরা 'হক্কে শোফআর' দাবি করতে পারবে না। কিন্তু ক্রেতা মারা গেলে শফীর হক্ব বাতিল হয় না।

* শফী প্রথমে শুনল যে, জমি এত টাকায় (উদাহরণ স্বরূপ এক হাজার টাকায়) বিক্রি হয়েছে, এই শুনে সে চুপ করে থাকল, পরে শুনল যে, কমে বিক্রি হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ পাচঁশত টাকায় বিক্রি হয়েছে), তাহলে তার 'হক্কে শোফআ' বাতিল হয়নি।

* শফী প্রথমে শুনল যে, অমুকে জমিটি ক্রয় করেছে, সে সময় দাবি করল না, পরে জানতে পারল যে, অন্য লোক ক্রয় করেছে, তাহলে তার দাবি করার অধিকার থাকবে।

* শফী প্রথমে শুনল যে, অর্ধেক জমি বিক্রি হয়েছে। তখন শোফআর দাবি করল না, পরে জানতে পারল সমস্ত জমি বিক্রি হয়েছে, তাহলে সে শোফআর দাবি করতে পারবে।

(হক্কে শোফআ সম্পর্কিত যাবতীয় মাসায়েল 'ছাফাইয়ে মোআমালাত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## জমি বর্গা দেয়ার মাসায়েল

* জমি বর্গা বা ভাগা দেয়া জায়েয আছে, কিন্তু যখন কথা-বার্তা অর্থাৎ, ইজাব কবূল হয় তখনই নিম্নলিখিত শর্তগুলো পরিষ্কার হওয়া চাই।

১. কতদিন যাবৎ বর্গা করবে তা পরিষ্কার বলে দেয়া চাই।
২. বীজ কে দিবে তা পরিষ্কার হওয়া চাই।
৩. কোন্ ফসল করবে তা পরিষ্কার বলে দেয়া চাই।
৪. অংশ হিসাবে ভাগ করা চাই এবং সে অংশ প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া চাই; যেমন অর্ধা-অর্ধি বা তিন ভাগের এক ভাগ এবং দুই ভাগ ইত্যাদি।
৫. জমি খালি করে বর্গাতির হাতে দেয়া চাই।
৬. জমি এবং বীজ গৃহস্থের এবং গরু, লাঙ্গল ও মেহনত বর্গাতির বা শুধু জমিন গৃহস্থের অন্য সব বর্গাতির– এরূপ ঠিক হওয়া চাই।
৭. জমি কৃষির যোগ্য হওয়া চাই।
৮. জমির মালিক এবং বর্গাদার উভয়ের বালেগ ও স্বজ্ঞানী হওয়া চাই।

* শরীআত নির্ধারিত শর্তগুলো পালন না করে যদি কেউ জমি বর্গা দেয় তবে তা নাজায়েয হবে, এমতাবস্থায় সমস্ত ফসল বীজওয়ালা পাবে, অপর পক্ষ যদি জমিওয়ালা হয়, তাহলে সে দেশাচার অনুসারে জমির ভাড়া

পাবে এবং যদি বর্গাতি হয় তাহলে দেশাচার অনুসারে তার মেহনতের মজুরি পাবে; কিন্তু এই ভাড়া এবং মজুরি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অংশের মূল্য অপেক্ষা অধিক হতে পারবে না।

* জমি বর্গার কথা-বার্তা (অর্থাৎ, ইজাব-কবূল) ঠিক হয়ে যাওয়ার পর উভয় পক্ষের যে কেউ কোন একটা শর্ত অমান্য করতে চাইলে কাজী (বিচারক)-এর নিকট নালিশ করে তাঁর দ্বারা জোরপূর্বক মানানো হবে; কিন্তু কাজী বীজওয়ালাকে বাধ্য করতে পারবে না।

* জমি মালিক বা বর্গাতি-এর কেউ মারা গেলে জমি বর্গা ছুটে যায়।

* অনেকে আগে বলে না যে, পাট বুনাও, আমন বুনাও কি আউশ বুনাও, শেষে আপোষে ঝগড়া হয়; এ রকম করা চাই না, আগে সব কথা পরিষ্কার করে বলা চাই।

* অনেক জায়গায় ধান কে কাটবে, পাট কে উঠাবে বা খড়-পাটখড়ি কে নিবে তা নিয়ে বাদানুবাদ হয়; এ রকম হওয়া চাই না, আগেই কথা পরিষ্কার করে নেয়া চাই, যাতে পরে দুই কথা হতে না পারে বরং সাক্ষী করে লিখে রাখলে আরও ভাল হয়, যাতে সহজেই স্মরণ থাকতে পারে।

* অনেক জায়গায় ধান ধার্য করে জমি লাগানো হয়। যেমনঃ বলে যে, চাই ধান কর, চাই পাট কর, ফসল হোক বা না হোক, চাই এ জমির উৎপন্ন দ্রব্য হতে দাও, চাই অন্য কোথা থেকে দাও, এই জমিটাতে বা বিঘা প্রতি পাঁচ মণ ধান আমাকে দিতে হবে, এরূপ জায়েয আছে।

* আজকাল গভর্নমেন্টের আইনের বলে অনেকে জমি বর্গা নিয়ে বা জমায় নিয়ে বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে বা রেকর্ড হয়ে গেলে পরে আর মালিককে ফেরত দিতে চায় না। কিন্তু নিশ্চিত জেনে রাখা চাই মলিকের বিনা সম্মতিতে ঐ জমি রাখা কিছুতেই জায়েয নয়। যদি কেউ রাখে তবে একে তো তা রাখা হারাম, দ্বিতীয়ত ঐ জমি চাষাবাদ করা হারাম, তৃতীয়ত ঐ জমিতে যা কিছু ফসল হবে তা তার জন্য হারাম।

(জমি বর্গা দেয়া সম্পর্কিত যাবতীয় মাসায়েল ছাফাইয়ে মোআমালাত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## গরু, ছাগল, হাস, মুরগি রাখালী দেয়ার মাসায়েল

গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, ইত্যাদি জীবজন্তু রাখালী দেয়া এই শর্তে যে, এর যে বাচ্চা হবে তা আমরা আধা-আধি (বা চারআনা বা তিনআনা বা এরূপ কোন হারে) ভাগ করে নিব বা মুরগীর ডিম এভাবে ভাগ করে



নিব, এরূপ রাখালী বা ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। গ্রামাঞ্চলে এরূপ প্রচলিত থাকলেও তা জায়েয নয়। তবে নির্দিষ্ট সময় লালন-পালন করলে তার বিনিময়ে এত টাকা দেয়া হবে বা এত পারিশ্রমিক দেয়া হবে– এরূপ চুক্তি করা জায়েয।

## বন্ধকের মাসায়েল

(যদি কারও নিকট থেকে টাকা-পয়সা কর্জ নিয়ে বিশ্বাসের জন্য তার নিকট কোনো জিনিস রাখা হয় এই শর্তে যে, যখন কর্জ পরিশোধ করব তখন আমার জিনিস নিয়ে যাব– একে রেহেন বা বন্ধক বলে। এ সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ নিম্নরূপ।)

* কর্জ পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী জিনিস ফেরত নেয়ার বা দখলে নেয়ার অধিকার থাকে না।

* কোনো জিনিস বন্ধক রাখলে বন্ধকগ্রহীতা কোনোরূপে তা ব্যবহার করলে নাজায়েয হবে। মালিক অনুমতি দিলেও বন্ধকী জিনিস দ্বারা কোনো রূপেই লাভবান হওয়া জায়েয নয়। যেমনঃ বাগান বন্ধক রেখে তার ফল খাওয়া, জমি বন্ধক রেখে তার ফসল খাওয়া, ঘর বন্ধক রেখে তাতে বসবাস করা, অলংকার থালা-বাটি বন্ধক রেখে তা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

* গরু, ছাগল, বকরী, ঘোড়া ইত্যাদি বন্ধক রাখলে তার খোরাক ইত্যাদির খরচ মালিককে দিতে হবে। গাভী, বকরীর দুধ ও বাছুর সবই মালিক পাবে। দুধ খেয়ে থাকলে ঋণ পরিশোধ হওয়ার সময় দুধের মূল্য ফেরত দিতে হবে; অবশ্য কিছু খরচ হয়ে থাকলে সে খরচের টাকা কেটে রাখতে পারবে।

* বন্ধকী স্বত্ব বিক্রি করা জায়েয নয়। বন্ধকী জিনিস খোয়া গেলে এবং ঋণের চেয়ে তার মূল্য কম হলে বাকিটুকু পাওনাদার (অথবা বন্ধকী জিনিসের মালিক) থেকে নিয়ে নিতে পারবে এবং বন্ধকী জিনিসের মূল্য পরিমাণ ঋণ পরিশোধ ধরা হবে। আর বন্ধকী জিনিসের মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি হলে মালিক ঐ বেশি পরিমাণটুকু বন্ধকগ্রহীতার কাছে দাবি করতে পারবে না।

* তুমি কারও নিকট টাকা চাইলে, সে টাকা দিতে না পেরে কোনো জিনিস দিল যা অন্য কারও নিকট বন্ধক রেখে তুমি টাকা আনলে, পরে ঐ জিনিসের মূল মালিক টাকা দিয়ে বন্ধকগ্রহীতার নিকট থেকে তার মাল ছাড়িয়ে নিল, এমতাবস্থায় মূল মালিককে তুমি টাকা দিতে বাধ্য।

* বন্ধকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মালিক অর্থ পরিশোধ করে বন্ধকী জিনিস ফেরত না নিলে তা বিক্রি করে নিজের অর্থ আদায় করার অধিকার এসে যায়। ইসলামী বিচারক (কাজী) থাকলে তার নিকট মামলা দায়ের করে বিক্রির অনুমোদন নিয়ে নিবে।

(বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফিকাহ: ৩য় এবং ছাফাইয়ে মোআমালাত থেকে গৃহীত।)

## আরিয়াত বা কোনো বস্তু ধার দেয়া নেয়ার মাসায়েল

(বিনা ভাড়ায় ফেরত দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু দেয়া বা চেয়ে আনাকে 'আরিয়াত' বলে। যেমন: পাকানোর জন্য কারও ডেগ চেয়ে নেয়া হল কিংবা পড়ার জন্য কারও বই-পত্র আনা হল ইত্যাদি।)

* আরিয়াত যিনি আনবেন তিনিই ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্য পরিষ্কার ভাষায় মালিকের অনুমতি থাকলে অন্যকেও ব্যবহার করতে দেয়া যায় বা এমন লোককেও দেয়া যায় যার ব্যাপারে একীন থাকে যে, মালিক নিশ্চয় তার ব্যাপারে অনুমতি দিবে কিংবা বস্তুটা যদি এমন হয় যা সকলেই সমানভাবে ব্যবহার করে থাকে– কারও ব্যবহারে কোনো তারতম্য ঘটে না, তাহলেও অন্যদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া যায়। তবে মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিতে নিষেধ করে, তাহলে অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া কোনো অবস্থাতেই দুরস্ত হবে না।

* আরিয়াতদাতা (অর্থাৎ, বস্তুর মালিক) যদি উক্ত বস্তু ব্যবহারের জন্য বিশেষ কোন নিয়ম বা নির্দিষ্ট সময় বলে দিয়ে থাকে, তাহলে তার খেলাফ করা জায়েয নয়।

* আরিয়াতের বস্তু আমানতের মত, নিজের বস্তুর চেয়ে অধিক যত্ন ও হেফাজতের সাথে তা রাখা কর্তব্য। আরিয়াতের বস্তু পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন ও হেফাজত করা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রকারে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ নেয়া যায় না। তবে সতর্কতা অবলম্বন না করলে বা হেফাজতে গাফিলতী করে থাকলে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

* ফসল করে খাওয়ার জন্য কাউকে জমি আরিয়াত দিলে ফসল পাকার পূর্বে জমি ফেরত চাইতে পারবে না। চাইলেও জমি ফেরত পাবে না। অবশ্য ইচ্ছা করলে সেদিন থেকে (যেদিন থেকে সে ফেরত চেয়েছে) ফসল পাকা পর্যন্ত দেশ রেওয়াজ অনুসারে জমির ভাড়া নিতে পারে। কেউ কারও ক্ষতি করতে পারবে না।



* আরিয়াতের বস্তু ওয়াদামত ফেরত দেয়া কর্তব্য। অন্যথায় নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ছাফাইয়ে মোআমালাত ও বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।)

## আমানতের মাসায়েল

* টাকা-পয়সা বা মাল-সামান আমানত রাখলে আমানতদারের উপর তার পূর্ণ হেফাজত করা ওয়াজিব।

* কেউ টাকা-পয়সা আমানত রাখলে অবিকল সেই টাকা-পয়সাই পৃথকভাবে হেফাজত করে রাখা ওয়াজিব, নিজের টাকার সঙ্গে মিশানো এবং ঐ টাকা থেকে খরচ করা জায়েয নয়। এরূপ করতে হলে মালিক থেকে অনুমতি নিতে হবে।

* আমানতের মাল পূর্ণ হেফাজত করা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আর হেফাজতে ত্রুটি করার কারণে নষ্ট হলে বা চুরি হলে কিংবা খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

* কেউ কাপড়-চোপড়, হাড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, বই-পত্র অলংকার ইত্যাদি আমানত রাখলে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমানতদারের পক্ষে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। গাভী আমানত রাখলে তার দুধ খাওয়া বা বলদ আমানত রাখলে তার দ্বারা জমি চাষ করানো মালিকের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নয়।

* কেউ যদি বলে, ভাই! এই মালটা দেখুন আমি আসছি, আর আপনি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে, কিংবা চুপ থাকেন বা হাত দ্বারা সে বস্তুটা সামলে নেন, তাহলে আমানত রাখার হুকুম এসে যায়। যদি আমানত রাখতে অসুবিধা থাকে তাহলে এরূপ মুহূর্তে পরিষ্কারভাবে তাকে শুনিয়ে বলে দিতে হবে যে, না ভাই আমার ওজর আছে, আমি দেখতে/রাখতে পারব না।

* আমানতকারী যখনই তার মাল ফেরত চাইবে তখনই তার মাল তার নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব, বিনা ওজরে ফেরত দিতে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

* আমানতকারী নিজে না এসে অন্য কোনো লোককে মাল ফেরত নেয়ার জন্য পাঠালে তাকে নিজের দায়িত্বে দেয়া যায়। পরে যদি মালিক অস্বীকার করে যে, সে তাকে পাঠায়নি, তাহলে মালিক আপনার কাছ থেকে মাল আদায় করে নিতে পরবে। এরূপ মুহূর্তে একথাও বলা যায় যে, মালিক নিজে না আসলে আমি অন্য কারও কাছে দিব না।

* কেউ আমানত রাখলে সেটা লিখে রাখা আদব।

* যে অভাবী, তার জন্য কারও আমানত না রাখা উচিত। কেননা অভাব আমানতে খেয়ানতের বা অনিয়মের কারণ ঘটাতে পারে।

* আমানতদার নিজেই মালের হেফাজত করবে, নিজের কাছেই রাখবে কিংবা পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কাছে, মায়ের কাছে, মেয়ের কাছে বা এরূপ অন্য কারও কাছে যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাদের কাছে সে নিজের টাকা-পয়সা সচরাচর রাখে এদের কাছেও আমানতের মাল রাখতে পারবে। এ ব্যতীত অন্য কারও নিকট মালের মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখতে পারবে না। রাখলে খোয়া গেলে ভর্তুকি দিতে হবে। বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব যাদের কাছে সে নিজের মালামাল রেখে থাকে তাদের কাছেও মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখতে পারবে।

* মালিকের অনুমতি নিয়ে আমানতের মাল দ্বারা ব্যবসা করা যেতে পারে।

বি. দ্র. হেফাজতের সঙ্গে আমানত রেখে অন্যের উপকার করা অনেক ছওয়াবের কাজ। কিন্তু আমানতে খেয়ানত করলে কবীরা গোনাহ হবে। (বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফিকাহ: ৩য়, ছাফাইয়ে মোআমালাত ও آداب المعاشرت থেকে গৃহীত।)

## পড়ে পাওয়া জিনিসের মাসায়েল

* কোথাও পথে কোনো পড়ে পাওয়া টাকা/পয়সা বা জিনিস পেলে যদি আশংকা হয় যে, সে না উঠালে কোন দুষ্টলোক পেলে তা আত্মসাৎ করে ফেলবে এবং মালিককে দিবে না, তাহলে তা উঠানোও ওয়াজিব এবং মালিককে খুঁজে পৌঁছে দেয়াও ওয়াজিব।

* কোনো পড়ে পাওয়া টাকা/পয়সা বা বস্তু উঠানোর পর ঐ পরিমাণ টাকা/পয়সা বা বস্তুর জন্য মালিকের যতদিন বা যতক্ষণ তালাশ করার সম্ভাবনা থাকে ততদিন বা ততক্ষণ পর্যন্ত সাধ্য অনুসারে লোক সমাগমের স্থলে ঘোষণা দিতে থাকবে। মালিককে পাওয়া গেলে বা তার ওয়ারিশদেরকে পাওয়া গেলে এবং মালের পরিচয় বলতে পারলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিবে। আর না পাওয়া গেলে এবং পাওয়ার কোনো আশা না থাকলে ঐ টাকা/পয়সা বা বস্তু কোন গরীব-দুঃখীকে দান করে দিবে। তবে সে নিজে গরীব হলে নিজেও তা ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে। কিন্তু গরীবকে দেয়ার পর বা নিজের গরীব হওয়ার কারণে নিজেই ব্যবহার



করার পর যদি মালিক এসে দাবি করে তাহলে মালিক সেই টাকা/পয়সা বা বস্তুর মূল্য ফেরত নিতে পারবে। অবশ্য সে যদি দাবি পরিত্যাগ করে তাহলে খয়রাতের ছওয়াব সে-ই পাবে।

* পড়ে পাওয়া জিনিস উঠানোর পর মালিককে তালাশ করা কষ্টকর মনে করে আবার যেখানকার জিনিস সেখানে ফেলে আসা জায়েয হবে না; বরং উঠানোর পর মালিককে তালাশ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

* বাগানের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, তাল ইত্যাদি পড়ে থাকলে মালিকের বিনা অনুমতিতে তা উঠানো এবং খাওয়া হারাম। অবশ্য যদি একটা বরই বা বুট ছোলা ইত্যাদি এমন কোনো সামান্য জিনিস হয়, যা কেউ নিলে বা খেয়ে ফেললে মালিক মনে কোনো কষ্ট পায় না– এরূপ জিনিস উঠিয়ে নেয়া, খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয আছে।

* হাঁস মুরগি বা কোনো পালিত পাখী যদি কারও বাড়ীর মধ্যে এসে পড়ে এবং সে তা ধরে রাখে, তাহলে মালিককে তালাশ করে দিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

## ঋণ সম্পর্কিত আদব ও মাসায়েল

* যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

* এমন ব্যক্তির নিকট ঋণ চাওয়া ঠিক নয়, যার ব্যাপারে বুঝা যায় যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ভক্তি বা লজ্জা বা চাপ ইত্যাদির কারণে অস্বীকার করতে পারবে না। যার ব্যাপারে নিশ্চিত জানা আছে যে, অনিচ্ছা হলে স্বাধীনভাবে সে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না– এরূপ লোকের নিকট ঋণ চাওয়াতে দোষ নেই।

* ঋণ গ্রহণ করলে সেটা পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করে নিবে।

* ঋণ নিলে সেটা স্মরণ রাখার জন্য লিখে রাখবে।

* যতদ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে দেয়া প্রয়োজন, কেননা ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে তার রূহ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে– জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

* পাওনাদার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও চাওয়ার অধিকার রাখে।

* পাওনাদার শক্ত কিছু বললেও তা সহ্য করতে হবে।

* সাধ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা বা আজ-কাল বলে টালবাহানা করা জুলুম।

* ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি অস্বচ্ছল হলে তাকে সময় সুযোগ দেয়া উচিত- পেরেশান করা উচিত নয়। পারলে ঋণ পুরোটা বা তার কিয়দাংশ মাফ করে দিবে। তাহলে আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দিবেন।

* ঋণ গ্রহণকারী যদি ঋণ পরিশোধের ভার এমন কোনো লোকের উপর ন্যস্ত করতে চায় যার থেকে উসূল করা যাবে বলে আশা করা যায়, তাহলে সেটা মেনে নিবে। অহেতুক জিদ ধরা ঠিক নয়।

* খারাপ মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে না বরং ভালটার দ্বারা পরিশোধ করা উত্তম।

* পাওনাদার ঋণ বুঝে পাওয়ার সময় ঋণ গ্রহণকারীকে দুআ দিবে এবং তার শোকর আদায় করবে।

* ঋণ পরিশোধ করলে তা-ও লিখে রাখবে।

* বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে নিম্নের দুআটি পড়লে ইনশাআল্লাহ ঋণ আদায় হয়ে যাবে।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ, হারাম হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রুযী দ্বারা আমার অভাব পূরণ কর এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা কর। (رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب)

* সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করলে মামলা করে বা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে যেকোনোভাবে পাওনা উসূল করে নেয়া পাওনাদারের জন্য জায়েয। এরূপ অবস্থায় দেনাদারকে শক্ত কথা বলাও জায়েয। (بہشتی زیور و آداب المعاشرت থেকে গৃহীত।)

## বিয়ে-শাদি

### যাদের সাথে বিয়ে হারাম

১. নিজের সন্তানের সাথে। যেমনঃ ছেলে, পোতা, পরপোতা, নাতি, নাতির ছেলে ইত্যাদি যতই নিচের দিকে যাক না কেন।
২. বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা ইত্যাদি যতই উর্ধ্বে যাক না কেন।
৩. ভাই। (আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়)। মাতা ও পিতা উভয়ে ভিন্ন হলে সেরূপ ভাইয়ের সাথে বিয়ে জায়েয।
৪. ভাতিজা।



৫. ভাগিনা।
৬. মামা, অর্থাৎ, মায়ের আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই।
৭. চাচা, অর্থাৎ, পিতার উপরোক্ত তিন প্রকার ভাই।
৮. জামাই, অর্থাৎ, মেয়ের সাথে যার বিয়ের আক্‌দ হয়েছে। (চাই তার সাথে সহবাস হোক বা না হোক।)
৯. মায়ের স্বামী, অর্থাৎ, পিতার মৃত্যুর পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং তার সাথে সহবাস হয়।
১০. সতীনের পুত্র।
১১. আপন শ্বশুর, তার পিতা, তার দাদা, তার পরদাদা ইত্যাদি।
১২. বোনের স্বামীর সাথে, যে পর্যন্ত বোন তার বিয়েতে থাকে।
১৩. ফুফা এবং খালু, যে পর্যন্ত ফুফু ফুফার এবং খালা খালুর বিয়েতে থাকে।
১৪. নসবের দিক দিয়ে অর্থাৎ, জন্ম ও জাতিগত দিক দিয়ে যেসব আত্মীয় ও আপনজনের সাথে বিয়ে হারাম (যেমনঃ বাপ, দাদা, ছেলে, চাচা, মামা প্রমুখ।) দুধের দিক দিয়েও সেসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হারাম। (যেমনঃ দুধবাপ, দুধভাই, দুধপোতা প্রমুখ।)
১৫. অন্য কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষের সাথে।
১৬. কারও স্ত্রী থাকা অবস্থায় বা তালাকের পর ইদ্দতের সময় অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে হারাম।
১৭. কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে যেনা করলে ঐ নারীর মা ও মেয়ে (বা মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ, নিম্নদিকের যেকোনো মেয়ে)–এর সাথে ঐ পুরুষের বিয়ে দুরস্ত নয়।
১৮. কোনো নারী কামভাবসহ বদ নিয়তে অপর কোনো পুরুষের শরীর স্পর্শ করলেও উপরোক্ত হুকুম। তদ্রূপ কোনো পুরুষ কামভাবসহ বদ নিয়তে কোনো নারীকে স্পর্শ করলেও ঐ পুরুষের সন্তানগণ ঐ নারীর জন্য হারাম হয়ে যায়।
১৯. ভুলবশত কামভাবসহ কন্যা বা শাশুড়ীর গায়ে হাত দিলে স্ত্রী (অর্থাৎ, ঐ কন্যার মা) বা ঐ শাশুড়ীর মেয়ে চিরতরে হারাম হয়ে যায়। তাকে তালাক দিয়েই দিতে হবে।
২০. কোনো ছেলে কুমতলবে বিমাতার শরীরে হাত লাগালে বা বিমাতা কুমতলবে বিপুত্রের শরীরে হাত লাগালে ঐ নারী তার স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হয়ে যায়।

(বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।)

## যাদের সাথে বিয়ে জায়েয

যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষের সাথে বিয়ে জায়েয। অতএব যেসব পুরুষের সাথে বিয়ে জায়েয তাদের তালিকা বলে শেষ করার নয়। কিন্তু যাদের সাথে বিয়ে জায়েয তা সত্ত্বেও সমাজে অনেকে সেটাকে জায়েয মনে করে না বা খারাব মনে করে, এরূপ কয়েকজনের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. এরূপ ভাই যার মা ও বাপ উভয়ে ভিন্ন।
২. মার চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে জায়েয।
৩. বাপের চাচাত, মামাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে জায়েয।
৪. চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, খালু শ্বশুরের সাথে বিয়ে জায়েয।
৫. ননদের স্বামী, ভগ্নিপতি (যখন ভগ্নি তার বিয়েতে না থাকে) বিহাই অর্থাৎ, ভাইয়ের শ্যালক, ছেলের শ্বশুর, মেয়ের শ্বশুর প্রমুখের সাথে।
৬. ফুফার সাথে যখন ফুফু তার বিয়েতে না থাকে ও খালুর সাথে যখন খালা তার বিয়েতে না থাকে।
৭. পালকপুত্র, ধর্মছেলে, ধর্মবাপ, ধর্মভাইয়ের সাথে বিয়ে জায়েয।

## পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তরীকা

* সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করতে হবে।

* পাত্র/পাত্রীর জন্য বংশ, মুসলমান হওয়া ধর্মপরায়ণতা, সম্পদশালিতা ও পেশায় সমমানের পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের বিষয়টি শরীআতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদশালিতায় সমপর্যায়ের হওয়ার দ্বারা বোঝানো হয়েছে ধনবতী মহিলার জন্য একেবারে নিঃস্ব কাঙ্গাল পুরুষ সমমানের নয়; তবে মহরের নগদ অংশ প্রদানে এবং ভরণ-পোষণ প্রদানে সক্ষম হলে তাকে সমমানের ধরা হবে। উভয় পক্ষের সম্পদ একই পরিমাণে বা কাছাকাছি হতে হবে তা বোঝানো হয়নি।

* পাত্র/পাত্রীর ধর্মপরায়ণতার দিকটাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। হাদীছে এ ব্যাপারে স্পষ্টত তাগিদ এসেছে।

* পাত্র/পাত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা সংগত, পাত্রীর চেয়ে পাত্রের বয়স কিছু বেশি হওয়া উত্তম; তবে খুব বেশি-বেশ কম হওয়া সংগত নয়। (اصلاح الرسوم)



## বিয়ের পয়গাম/প্রস্তাব দেয়ার তরীকা

* বিয়ের পয়গাম বা প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত বাক্যটি বলে নিবে।

**اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.** (كتاب الأذكار)

অতঃপর বলবে, আমি অমুকের ব্যাপারে এই আগ্রহ নিয়ে এসেছি।

* কেউ কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকলে এবং উভয় পক্ষের সে প্রস্তাবে রেজামন্দীভাব দেখা গেলে সেটা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কারও পক্ষে সেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।

## পাত্রী দেখা প্রসঙ্গ

* বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখে নেয়া সুন্নাত। নিজে না দেখলে বা সম্ভব না হলে কোনো মাহিলাকে পাঠিয়েও দেখার ব্যবস্থা করা যায়।

* পাত্রীর চেহারা এবং হাত দেখার অনুমতি রয়েছে।

* যে পুরুষ যে নারীকে বিবাহ করতে চায় একমাত্র সে পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো গায়র মাহরাম পুরুষের পক্ষে উক্ত নারীকে দেখা বৈধ নয়। অতএব পাত্রের সঙ্গে তার অন্য বন্ধু-বান্ধব বা মুরব্বী কেউ আসলে সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের সম্মুখে যাওয়া থেকে পাত্রীর বিরত থাকা ওয়াজিব।

## পাত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকা উত্তম ও কাম্য

(১) পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কুফূ থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমতুল্যতাকে বলা হয় কুফূ। ৫টি বিষয়ে সমতুল্যতা দেখার রয়েছে। যথা:-। ১. উভয়ের বংশগতভাবে সমতুল্য হওয়া। ২. উভয়ের মুসলমান হওয়া। ৩. দ্বীনদারী তথা ধর্মীয় মান্যতার ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়া। ৪. ধন-সম্পদে সমতুল্য হওয়া। ৫. পেশাগতভাবে উভয় পরিবার একই ধরনের হওয়া। (كنزا الدقائق)

(২) পাত্রীর মধ্যে দ্বীনদারী থাকা। হাদীছে পাত্রীর মধ্যে দ্বীনদারির বিষয়টিকে প্রাধ্যান্য দিতে বলা হয়েছে।

(৩) সৌন্দর্য, বংশ উত্তম হওয়া এবং সম্পদ থাকা- দ্বীনদারির সঙ্গে সঙ্গে এগুলো থাকলে আরও উত্তম।

(৪) পাত্রীর মায়াবতী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া।

(৫) পাত্রীর মধ্যে স্বামীর আনুগত্য ও আমানতদারির গুণ থাকা।

(৬) পাত্রীর মধ্যে অধিক সন্তান প্রদানের গুণ থাকা ও প্রেমময়ী হওয়া।

## পাত্রের মধ্যে যেসব গুণ থাকা উত্তম ও কাম্য

(২) পাত্র দ্বীনদার কি না তা দেখতে হবে। পাত্রের ধর্মপরায়ণতার দিকটাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

(৩) পাত্রের বয়স পাত্রীর বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা দেখা। পাত্র-পাত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি নয় তবে সংগত। পাত্রীর চেয়ে পাত্রের বয়স কিছু বেশি হওয়া উত্তম; তবে খুব বেশি বেশ কম হওয়া সংগত নয়। (اصلاح الرسوم)

(৪) পাত্র বৈবাহিক জীবন পরিচালনার মত শারীরিকভাবে সক্ষম কি না তা দেখা।

(৫) পাত্র পরিবারের ব্যয়ভার বহনের মত সক্ষম কি না তা দেখা।

(৬) পাত্র স্ত্রীর প্রতি নরমদিল হবে কি না তা বিবেচনা করা।

## মহর সম্পর্কিত মাসায়েল

* মহর পরিশোধ করা ওয়াজিব। তাই নাম শোহরতের জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত মহর ধার্য করা অপছন্দনীয়।

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতেমার জন্য যে মহর ধার্য করেছিলেন, তাকে 'মহরে ফাতিমী' বলা হয়। বর্তমানের হিসাবে তার পরিমাণ কি এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা: (১) ১৩১৪১/৪ তোলা রূপার সমপরিমাণ। (২) ১৪৫– তোলা৩/৪ পরিমাণ রূপার সমপরিমাণ। (৩) ১৫০ তোলা রূপার সমপরিমাণ। সতর্কতা স্বরূপ ১৫০ তোলার মতটি গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত গ্রাম–এর ওজন হিসেবে ১৫০ তোলা = ১৭৪৯.৬০০ গ্রাম। খুচরা বাকিটুকু পূর্ণ করে দিয়ে ১৭৫০ গ্রাম ধরা চলে। (فتاوى رحيمية ٦/□□)

* মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দেরহাম (অর্থাৎ, প্রায় পৌণে তিন তোলা পরিমাণ রূপার সমপরিমাণ) বেশির কোনো সীমা নেই। তবে খুব বেশি মহর ধার্য করা ভাল নয়।

* বিয়ের সময় মহর ধার্য হলে এবং বাসর ঘর অতিবাহিত হলে ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর বাসর ঘর হওয়ার পূর্বে তালাক হলে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব হয়।



* বিয়ের সময় মহরের উল্লেখ না হলে 'মহরে মেছেল' বা খান্দানী মহর ওয়াজিব হয়। আর এরূপ ছুরতে বাসর ঘর হওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে গেলে সে মেয়েলোকটি মহর পাবে না– শুধু একজোড়া কাপড় পাবে। একজোড়া কাপড়ের অর্থ লম্বা হাতাওয়ালা একটা জামা, একটা উড়না বা ছোট চাদর বা একটা পায়জামা। অথবা একটা শাড়ী ও একটা বড় চাদর যার দ্বারা আপাদ মস্তক ঢাকা যায়।

* 'মহরে মেছেল' বা খান্দানী মহর বিবেচনার ক্ষেত্রে বাপ দাদার বংশের মেয়েদের যেমন: বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন প্রমুখের মহর দেখতে হবে এবং এই খান্দানী মহর নিরূপণের ক্ষেত্রে যুগের পরিবর্তনে, স্থানের পরিবর্তনে, রূপ, গুণ, বয়স, পাত্র, দ্বিতীয় এবং প্রথম বিবাহের তারতম্যে মহরের যে তারতম্য হয়ে থাকে তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

* স্বামী যদি মহরের নিয়তে (খোরাক, পোশাক ও বাসস্থান ব্যতিরেকে) কিছু টাকা বা অন্য কোনো মাল-জিনিস দেয়, তাহলে তা মহর থেকেই কাটা যাবে।

* স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বা লজ্জায় ফেলে বা অন্য কৌশলে ও অসুদপায়ে স্ত্রীর আন্তরিক ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তার দ্বারা মহর মাফ করিয়ে নেয়, তবে তাতে মহর মাফ হয়ে যায় না।

## ওলীর বর্ণনা

* ছেলে/মেয়েকে যে বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে তাকে 'ওলী' বলে। ওলীর জন্য আকেল বালেগ এবং মুসলমান হওয়া শর্ত।

* ছেলে/মেয়েদের সর্বপ্রথম ওলী তাদের পিতা, না থাকলে দাদা, তারপর পরদাদা। তাদের কেউ না থাকলে আপন ভাই, তারপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর আপন ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা, তারপর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা। ভাতিজারা কেউ না থাকলে ভাতিজার ছেলে, তারপর তাদের ছেলে (উপরোক্ত তারতীব অনুযায়ী)। তারপর আপন চাচা, তারপর সতাল চাচা, তারপর চাচাত ভাই, তারপর চাচাত ভাইয়ের ছেলে, তারপর চাচাত ভাইয়ের পোতা (উপরোক্ত তারতীব অনুযায়ী)। তারা কেউ না থাকলে পিতার চাচা, সে না থাকলে তার আওলাদ। তারা না থাকলে দাদার চাচা, তারপর তার ছেলে, তারপর তার পোতা ও পরপোতাগণ তারতীব অনুযায়ী ওলী হবে। এসব পুরুষ ওলীগণ না থাকলে মা ওলী হবে। তারপর দাদী, তারপর নানী, তারপর নানা, তারপর আপন বোন,

তারপর বৈমাত্রেয় বোন, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, তারপর ফুফু, তারপর মামা, তারপর চাচাত বোন।

* এক শ্রেণীর কয়েকজন ওলী থাকলে বড়জন অন্যদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কাজ করবে। বড়জনের অনুমতি নিয়ে অন্যরাও কাজ করতে পারে।

* মেয়ে বালেগা হলে তার বিনা অনুমতিতে কোনো ওলী বা অন্য কেউ তাকে বিয়ে দিতে পারে না। দিলে মেয়ের অনুমতির উপর সে বিয়ে মওকুফ থাকবে। অনুমতি না দিলে সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

* মেয়ে বালেগা হলে ওলীর বিনা অনুমতিতে সে সমান ঘরে বিয়ে বসতে পারে, কিন্তু সমান ঘরে বিয়ে না বসে নীচ ঘরে বিয়ে বসলে এবং ওলী তাতে মত না দিলে সে বিয়ে দুরস্ত হবে না।

## এযেন নেয়ার তরীকা ও মাসায়েল

* মেয়ে যদি ছেলেকে পূর্বে থেকে না চিনে তাহলে এযেন (অনুমতি/সম্মতি) নেয়ার সময় মেয়ের সামনে ছেলের নাম-ধাম, পরিচয় ও মহরের কথা তুলে ধরে বলতে হবে, 'আমি তোমাকে বিয়ে দিচ্ছি বা বিয়ে দিলাম বা বিয়ে দিয়েছি। তুমি রাজি আছ কি না?

* সাবালেগা অবিবাহিতা মেয়ের নিকট এযেন চাওয়ার পর সে (অসম্মতি সূচক কোনো ভাব প্রকাশ না করে সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ, গম্ভীর ভাব ধারণ করে) চুপ থাকলে বা মুচকি হেসে দিলে বা (মা বাপের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার মন-বেদনায়) চোখের পানি ছেড়ে দিলে তার এযেন আছে ধরা হবে। জবরদস্তী তার মুখ থেকে 'রাজি আছি' কথা বের করার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজনীয় ও অন্যায়।

* মেয়ে পূর্বে থেকে ছেলেকে না চিনলে এবং তার সামনে ছেলের নাম/ধাম, পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে না ধরলে তার চুপ থাকাকে এযেন বা সম্মতি ধরা যাবে না।

* শরীআত অনুসারে যে ওলীর হক অগ্রগণ্য, তিনি বা তার প্রেরিত লোক ব্যতীত অন্য কেউ এযেন আনতে গেলেও সে ক্ষেত্রে মেয়ের চুপ থাকাটা এযেন বলে গণ্য হবে না। বরং সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট অনুমতির শব্দ উল্লেখ করলেই এযেন ধরা যাবে।



* যদি মেয়ে বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে তার চুপ থাকাটা এযেন বলে গণ্য হবে না বরং মুখ দিয়ে স্পষ্ট কথা (যেমন: 'রাজি আছি') বলতে হবে।

* না বালেগা ছেলে/মেয়ের বিয়ে যদি বাপ দাদা করায় তাহলে সে বিয়ে দুরস্ত আছে এবং বালেগা হওয়ার পর তাদের সে বিয়ে ভঙ্গ করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। বাপ, দাদা ব্যতীত অন্য কেউ করালে যদি সমান ঘরে করায় এবং মহরও ঠিকমত হয় তাহলে বর্তমানে তাদের বিয়ে দুরস্ত হয়ে যাবে, তবে বালেগ হওয়ার সময় মুসলমান হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারবে। আর বাপ, দাদা ব্যতীত অন্যরা নীচ ঘরে বা অনেক কম মহরে বিয়ে দিলে সে বিয়ে দুরস্ত হবে না।

## বিয়ের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে কথা

* বিয়ে শাওয়াল মাসে এবং জুমুআর দিনে এবং মসজিদে সম্পন্ন করা উত্তম। এছাড়াও যেকোনো মাসে, যেকোনো দিনে, যেকোনো সময়ে বিয়ে হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। অমুক অমুক দিন বিয়ে করা ঠিক নয়– এ জাতীয় কথা কুসংস্কার এবং এগুলো হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারণা থেকে বিস্তার লাভ করেছে।

## আক্দ সম্পন্ন করা বা বিয়ে পড়ানোর তরীকা

* এ'লান বা ঘটা করে (অর্থাৎ, বিয়ের খবর প্রচার করে) বিয়ের আক্দ সম্পন্ন করা সুন্নাত। বিনা ওজরে এ'লান ছাড়া গোপনে বিবাহ পড়ানো সুন্নাতের খেলাফ। (فتاوی رحیمیۃ □□/٢)

* আক্দ করতে চাইলে পূর্বে মহর ধার্য না হয়ে থাকলে প্রথমে মহর ধার্য করবে। (সামর্থ অনুযায়ী) কম মহর ধার্য করার মধ্যেই বরকত নিহিত।

* উকীল পাত্রী থেকে অনুমতি/সম্মতি নিয়ে আসবে। পাত্রী নিজেও মজলিসে এসে সরাসরি প্রস্তাব/কবূল করতে পারে– সে ক্ষেত্রে উকীলের প্রয়োজন হয় না। উকীলের অনুমতি/সম্মতি আনার সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা জরুরি নয়। ইজাব কবূলের সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা জরুরি।

* গায়রে মাহরামকে উকীল বানানো ঠিক নয়।

* অতঃপর বিয়ের নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করবে। এই খুতবা পাঠ করা মোস্তাহাব। এই খুতবা ইজাব কবূলের পূর্বে হওয়া সুন্নাত।

(فتاوی محمودیہ □□/٨ و فتاوی رحیمیۃ □□/٦)

* এ খুতবা মৌলিকভাবে দাঁড়িয়ে পড়াই নিয়ম। বসেও পড়া জায়েয। (فتاوی رحیمیہ)

খুতবাটি এই–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَ مِنْ سَيِّـئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهٗ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا، ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾.

(كتاب الأذكار)

* এই খুতবার সঙ্গে নিম্নোক্ত বাক্যও যোগ করা উত্তম।

أُزَوِّجُكَ عَلٰى مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ.

(كتاب الأذكار)

* এ খুতবা চুপচাপ শ্রবণ করা ওয়াজিব। (احسن الفتاوی ৫/□□)

* খুতবা পাঠ করার পর দুজন সাক্ষীর সম্মুখে তাদেরকে শুনিয়ে উকীল (বা পাত্রী) পাত্রকে (বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধিকে) পাত্রীর পরিচয় প্রদানপূর্বক বিয়ের প্রস্তাব পেশ করবে এবং পাত্র (বা তার প্রতিনিধি তার পক্ষ হয়ে) আমি কবূল করলাম বা আমি গ্রহণ করলাম বা ইত্যকার কোনো বাক্য বলে সে প্রস্তাব গ্রহণ করবে। ব্যস, বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল।



* অতঃপর নব দম্পতির উদ্দেশ্যে উপস্থিতরা বা পরবর্তীতে যে জানবে সে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

* বিয়ের আক্‌দ সম্পন্ন হওয়ার পর খেজুর ছিটিয়ে দেয়া বা বণ্টন করা সুন্নাতে যায়েদা। হযরত থানবী (রহ.) বর্তমান যুগে ছিটানো নয় বরং বণ্টন করাই সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, খেজুর ছিটানো সম্পর্কিত হাদীস কারও কারও মতে যয়ীফ, তদুপরি বর্তমান যুগে খেজুর ছিটানো ও তা আহরণকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তাই ছিটানোর পদ্ধতি পরিত্যাগ করা সঙ্গত। (اصلاح الرسوم)

* টেলিফোনে বিয়ে জায়েয। এর সুরত এই হতে পারে যে, ছেলে বা মেয়ে টেলিফোনে একজনকে উকীল নিযুক্ত করবে যে, আপনি এত মহরের বিনিময়ে অমুক মেয়ের সাথে/অমুক ছেলের সাথে আমার বিয়ে সম্পন্ন করে দিন। অতঃপর উক্ত উকীল বিয়ের মজলিসে ছেলের পক্ষ থেকে/মেয়ের পক্ষ থেকে কবূল করবে। (فتاوی دار العلوم و رحیمیہ)

## বিয়ের মজলিসের কয়েকটা রছম ও কুপ্রথা

* বিয়ের গেটে টাকা ধরা নাজায়েয। (فتاوی محمودیہ ৩/□□)

* বিয়ের আক্‌দ সম্পন্ন হওয়ার পর বর দাঁড়িয়ে হাজিরীনে মজলিসকে যে সালাম দিয়ে থাকে, এটা রছম, এটা পরিত্যাজ্য। (فتاوی محمودیہ ৩/□□)

* বিয়ের পর বর গুরুজনদের সাথে যে মুসাহাফা করে থাকে এটা ভিত্তিহীন ও বিদআত। (فتاوی محمودیہ ৩/□□)

* বিয়ের পর বধূর মুখ দেখানো রছম ও (পর পুরুষকে দেখানো) না জায়েয। (فتاوی محمودیہ ৩/□□)

## বাসর রাতের কতিপয় বিধান

* নববধূ মেহেদি ব্যবহার করবে, অলংকার এবং উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হবে।

* পুরুষ বাসর ঘরে প্রবেশ করত নববধুকেসহ দুই রাকআত (শুকরানা) নামায পড়বে। (شرعة الإسلام) এটাকে সুন্নাত মনে করে নয় বরং শুধু শোকর স্বরূপ করবে।

অতঃপর স্ত্রীর কপালের উপরিস্থিত চুল ধরে বিসমিল্লাহ বলে এই দুআ পাঠ করা সুন্নাত–

**اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ.** (امداد الفتاوى ج/٢)

* সহবাস সংক্রান্ত বিধানের জন্য দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা নং ৫০৮।

## ওলীমা বিষয়ক সুন্নাত ও নিয়মসমূহ

* বাসর ঘর হওয়ার পর (তিন দিনের মধ্যে বা আক্‌দের সময়) আপন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব-মিসকীনদেরকে ওলীমা অর্থাৎ, বৌ-ভাত খাওয়ানো সুন্নাত। কেউ কেউ বাসর হওয়ার পর এবং আক্‌দের সময় উভয় সময়েই এরূপ আপ্যায়ন উত্তম বলেছেন।

* ওলীমায় অতিরিক্ত ব্যয় করা কিংবা খুব উঁচু মানের খানার ব্যবস্থা করা জরুরি নয় বরং প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী খরচ করাই সুন্নাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

* যে ওলীমায় শুধু ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়াত করা হয় এবং দ্বীনদার ও গরীব-মিসকীনদের দাওয়াত করা হয় না, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা হল সর্বনিকৃষ্ট ওলীমা। অতএব ওলীমায় দ্বীনদার ও গরীব-মিসকীনদেরও দাওয়াত করা উচিত।

* আমাদের দেশে যে বরযাত্রী যাওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে এবং কনের পরিবারের পক্ষ থেকে ভোজের ব্যবস্থা করার নিয়ম চালু হয়েছে, এভাবে সমাজে বিবাহের উপযুক্ত কন্যার পিতাদেরকে কন্যাদায়গ্রস্ত বানিয়ে তোলা হয়েছে। এটা শরীআতসম্মত অনুষ্ঠান নয়– এটা রছম, অতএব তা পরিত্যাজ্য।

## তালাক

### তালাক দেয়ার মাসায়েল

* নিতান্ত অপারগতা ছাড়া তালাক দেয়া জুলুম ও অন্যায়।

* নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া মহাপাপ।

* কোন কল্যাণ ও প্রয়োজনে তালাক দেয়া মোবাহ বা জায়েয।

* স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য কষ্টদায়ক হয় বা স্ত্রী নামায সম্পূর্ণ পরিত্যাগ-কারিণী হয় বা স্বামীর অবাধ্য হয়, তাহলে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া



মোস্তাহাব বা উত্তম। বোঝানো সত্ত্বেও যে স্ত্রী অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তাকেও তালাক দিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। (٥/[illegible] احسن الفتاوى)

* স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর হক আদায় করতে অক্ষমতা দেখা দিলে তালাক দেয়া ওয়াজিব। তবে স্ত্রী তার হক মাফ করে দিলে ওয়াজিব থাকে না।

* নিজের কানে শোনা যায়– এতটুকু শব্দে তালাক দিলেই তালাক হয়ে যায়, স্ত্রীর বা অন্য কারও শোনা যাওয়া জরুরি নয়।

* হাসি-ঠাট্টা করে বা রাগের মুহূর্তে বা নেশা পান করে মাতাল অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়।

* তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামী ব্যতীত অন্য কারও নেই। অবশ্য স্বামী কাউকে (স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে) তালাক দেয়ার ক্ষমতা দিলে সে তালাক দিতে পারে।

* হায়েয নেফাসের অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। তবে হায়েয নেফাসের অবস্থায় তালাক দেয়া গোনাহ।

* একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা। তবে একসঙ্গে তিন তালাক দিলেও তিন তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ম মাফিক অন্য স্বামীর ঘর হয়ে ঘুরে না আসলে আর তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখার বা বিয়ে করার উপায় থাকবে না।

* কারও চাপ, জোর-জবরদস্তী বা হুমকির মুখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে।

**বি. দ্র.** তালাকের বিভিন্ন শব্দ এবং তালাকের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তালাকের শব্দ ও প্রকারের পার্থক্যের ভিত্তিতে হুকুমেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই তালাক সম্পর্কিত কোনো ঘটনা ঘটলে মুফতীদের থেকে সমাধান জেনে নিতে হবে।

### তালাক দেয়ার তরীকা

তালাক দেয়ার তিনটা তরীকা বা পন্থা রয়েছে। যথা– (১) অতি উত্তম, (২) উত্তম এবং (৩) বিদআত ও হারাম। এই তিনটা তরীকা সম্বন্ধে বিবরণ নিম্নরূপ।

১। তালাক দেয়ার অতি উত্তম তরীকা হল– স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পাক হবে তখন (অর্থাৎ, তহুর বা পাকীর সময়ে) এক তালাক দিবে এবং

শর্ত এই যে, এ তহুরের মধ্যে তার সাথে সহবাস হতে পারবে না। এর পরবর্তী হায়েয থেকে তার ইদ্দত শুরু হবে এবং তিন হায়েয অতিবাহিত হলে তার ইদ্দত শেষ হবে। এই ইদ্দতের মধ্যে আর কোনো তালাক দিবে না। ইদ্দত শেষ হলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

২। তালাক দেয়ার উত্তম তরীকা হল– স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হলে তহুরের মধ্যে এক তালাক দিবে। তারপর হায়েয গিয়ে দ্বিতীয় তহুর এলে তাতে আর এক তালাক দিবে। তারপর তৃতীয় তহুরে আর এক তালাক দিবে। এভাবে তিন তহুরে তিন তালাক দিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না।

৩। তালাকের বিদআত ও হারাম তরীকা হল– উপরোক্ত তরীকাদ্বয়ের বিপরীত নিয়মে তালাক দেয়া। যেমন: একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া বা হায়েযের সময় তালাক দেয়া বা যে তহুরে সহবাস হয়েছে সেই তহুরে তালাক দেয়া। এসব অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়, তবে গোনাহ হয়। অতএব তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

## ইদ্দতের মাসায়েল

(স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে যে সময়ের জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক বাড়ীতে থাকতে হয়, অন্যত্র যেতে পারে না বা অন্য কোথাও বিয়ে বসতে পারে না, তাকে "ইদ্দত" বলে। ইদ্দতের মাসায়েল নিম্নরূপ।)

* স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে তালাকের তারিখের পর পূর্ণ তিন হায়েয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর পক্ষে অন্য কোথাও বিয়ে বসা হারাম।

* উক্ত ইদ্দতের সময়ে তাকে স্বামীর বাড়ীতেই নির্জন বাসস্থানে থাকতে হবে।

* উক্ত স্ত্রী বয়স কম হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে হায়েয না আসলে তিন হায়েযের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস উপরোক্ত নিয়মে ইদ্দত পালন করতে হবে।

* গর্ভাবস্থায় তালাক হলে সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, চাই যত তাড়াতাড়ি প্রসব হোক কেন।

* হায়েযের অবস্থায় তালাক হলে সে হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাবে না। সে হায়েয বাদ দিয়ে পরবর্তী পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে।



* যদি কোন স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস বা নির্জনবাস হওয়ার পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হয় না।

* তালাকে বায়েন হলে ইদ্দত পালন করার সময় (পূর্ব) স্বামী থেকে সতর্কতার সাথে পূর্ণ মাত্রায় পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। তবে স্বামী কর্তৃক অবৈধভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে সেখান থেকে সরে অন্যত্র গিয়ে ইদ্দত পালন করাই সমীচীন হবে।

* কোনো বিয়ে যদি অবৈধ হয় এবং সহবাসও হয়, তাহলে ঐ পুরুষ যখন তাকে পরিত্যাগ করবে তখন থেকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

* যে স্ত্রীর স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত হল চার মাস দশ দিন আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

* স্বামীর মৃত্যু হলে মৃত্যুকালে স্ত্রী যে বাড়ীতে ছিল ইদ্দত পালন করার সময় রাতদিন সে বাড়ীতেই থাকতে হবে। অবশ্য গরীব হলে এবং বাইরে গিয়ে কাজকর্ম ব্যতিরেকে খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু রাতের বেলায় সে বাড়ীতেই থাকতে হবে। বাড়ীতে নিজেদের একাধিক ঘর বা একাধিক কামরা থাকলে যেকোনো ঘর বা যেকোনো কামরায় থাকতে পারবে। নির্দিষ্ট একটা স্থানেই আবদ্ধ থাকা জরুরি নয়। বাড়ির বারান্দা বা উঠানেও বের হতে পারবে।

* স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখে হলে চাঁদের হিসাবে চার মাস দশ দিন ধরা হবে। আর চাঁদের প্রথম তারিখ ছাড়া অন্য যেকোনো তারিখে মৃত্যু হলে ৩০ দিনের চার মাস এবং তারপর ১০ দিন অর্থাৎ, ১৩০ দিন ইদ্দত পালন করবে। স্ত্রী ঋতুবতী বা গর্ভবতী না হলে যদি তাকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে চাঁদের ১ম তারিখে তালাক হলে চাঁদের হিসাবে তিন মাস আর অন্য তারিখে তালাক হলে ৩০ দিনের তিন মাস অর্থাৎ, ৯০ দিন ইদ্দত ধরা হবে।

* স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেতে দেরি হলে সংবাদ পাওয়ার পূর্বে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে সেটাও ইদ্দতের ভিতর অতিবাহিত হয়েছে ধরা হবে। আর ইদ্দতের পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পেলে আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না– তার ইদ্দত ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে ধরা হবে।

* স্বামীর মৃত্যু হলে বা তালাকে বায়েন হলে স্ত্রীকে শোক পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫৩৫ পৃষ্ঠা।

## ওয়াক্‌ফ/সদকায়ে জারিয়ার মাসায়েল

* জায়গা-জমি, বাড়ি, বাগান ইত্যাদি আল্লাহ্‌র নামে এই মর্মে ওয়াক্‌ফ করা যে, এতে মসজিদ/মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হবে কিংবা এতে গরীব দুঃখীরা, ইসলামের সেবকরা থাকবে কিংবা এর আয় থেকে তারা ভোগ করবে– এরূপ করাকে 'সদকায়ে জারিয়া' বলে। অন্যান্য সব ইবাদত বন্দেগীর ছওয়াব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব যতদিন ঐ সম্পত্তি থাকবে এবং যতদিন গরীব-দুঃখীর উপকার ও ইসলামের খেদমত হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত দাতার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হতে থাকবে।

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে যেন কোনোরূপ খেয়ানত না হয় বা বে-জায়গায় খরচ না হয় সেজন্য একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা দরকার, যদিও মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা ছাড়াও ওয়াক্‌ফ করা সহীহ। মুতাওয়াল্লীর গুণাবলী ও যোগ্যতা সম্পর্কে ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

* ওয়াক্‌ফকারী যদি নিজের জীবিত থাকা পর্যন্ত নিজেই মুতাওয়াল্লী থাকতে চায় তাও জায়েয আছে।

* ওয়াক্‌ফকারী যদি এই শর্ত করে যে, যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমি নিজেই করব এবং এর আয়ের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক বা আমার প্রয়োজন পরিমাণ আমি রাখব (অবশিষ্ট অমুক অমুক দ্বীনী কাজে ব্যয় হবে) তবে এরূপ ওয়াক্‌ফ করা এবং শর্ত অনুযায়ী আয়ের অংশ গ্রহণ করাও দুরস্ত আছে।

* ওয়াক্‌ফকারী যদি শর্ত করে যে, এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় থেকে এত অংশ বা এত টাকা আগে আমার আওলাদ পাবে, (বাকি যা কিছু থাকবে তা অমুক অমুক দ্বীনী কাজে ব্যয় হবে) তবে তাও দুরস্ত আছে। আওলাদকে উক্ত পরিমাণই দেয়া হবে।

* মাদ্রাসা মসজিদে টাকা-পয়সা বা মাল-আসবাব দান করা এবং তালিবে ইলমদের সাহায্য সহযোগিতা করাও সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

**বি. দ্র.** ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অন্য মাসায়েল ৩৬৭–৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

## ওছিয়াত

* নিজের মাল বা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক ওছিয়াত করা যাবে না। এক তৃতীয়াংশের অধিকের জন্য ওছিয়াত করলেও তার ওছিয়াত এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, ওছিয়াত সম্পূর্ণ হোক বা না হোক।



* নিজের ওয়ারিছ (যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অংশ পাবে)-এর জন্য ওছিয়াত করা যায় না। অবশ্য যদি অন্য ওয়ারিছরা এতে সম্মত থাকে তাহলে উক্ত ওয়ারিছ ওছিয়াত দ্বারা অংশ পেতে পারে অথবা যদি উক্ত ওয়ারিছ হকদার হওয়ার সত্ত্বেও অন্য কোনো কারণে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও সে ওছিয়াত অনুযায়ী অংশ পাবে, যেমনঃ দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় পিতা ইন্তেকাল করলে নাতি দাদার সম্পত্তি থেকে অংশ পায় না কিন্তু দাদা ওছিয়াত করে গেলে তখন উক্ত নাতি ওছিয়াত অনুযায়ী অংশ পাবে।

* কোনো মাকরূহ বা হারাম কাজের জন্য ওছিয়াত করে গেলে তা পূরণ করা হবে না।

* ওয়াছিয়াতকারীর মৃত্যুর পর কাফন-দাফনের ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ থেকে ওছিয়াত পূর্ণ করা হবে। দাফন-কাফনের ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট না থাকলে ওছিয়াত পূরা করা হবে না।

* কেউ কোনো দ্রব্য বা শস্য সদকা করার ওছিয়াত করলে সে দ্রব্যের দামও সদকা করা যায়।

* কাউকে নিজের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেয়ার ওছিয়াত করলে সে ওছিয়াত জায়েয আছে, কিন্তু যদি একটা মাত্র বাড়ি রেখে যায় তাহলে সে ওছিয়াত এক তৃতীয়াংশের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ, তাকে উক্ত বাড়ীর এক তৃতীয়াংশের মধ্যে থাকতে দেয়া হবে, বাকি অংশ ওয়ারিছদের জন্য।

* যতদিন কোন লোক জীবিত থাকবে, তার নিজের ওছিয়াত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও বাকি থাকবে।

* যদি কেউ ওছিয়াত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার জানাযা পড়াবে বা আমাকে অমুক স্থানে দাফন করবে, তাহলে এসব ওছিয়াত পূরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে অন্য কোন শরীআতসম্মত বাধা না থাকলে পূরণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

* কারও অনাদায়ী যাকাত, অনাদায়ী হজ্জ থাকলে তা আদায় করার বা নামায রোযা অনাদায়ী থাকলে তার ফেদিয়া আদায় করার ওছিয়াত করে যাওয়া ওয়াজিব। এরূপ ওছিয়াত করে গেলে তার দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর যে পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের

মধ্য থেকে তা আদায় করা হবে। যদি এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তা আদায় না হয় তাহলে তা আদায় করা না করা ওয়ারিছদের ইচ্ছাধীন থাকবে। 'নামাযের ফেদিয়া', 'রোযার ফেদিয়া', 'বদলী হজ্জ' ইত্যাদি পরিচ্ছেদে এসব সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

## মীরাছ বা উত্তরাধিকার বণ্টনের মাসায়েল

(মীরাছে কার কি অংশ সে সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থে আলোচনা করব না, উত্তরাধিকারীদের প্রকার ও সংখ্যার কম-বেশি হওয়াতে তার মধ্যে পার্থক্যও হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট প্রত্যেকে তাদের অবস্থা জানিয়ে সমাধান জেনে নিতে পারবেন। এখানে মীরাছ বণ্টনের পূর্বে কি কি করণীয় সে সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা হবে।)

* মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তিন প্রকারের খরচ সমাধা করার পূর্বে মীরাছ বা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা যায় না। উক্ত তিন প্রকার খরচ সমাধা করার পর কিছু উদ্বৃত্ত না থাকলে ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারীগণ কিছুই পাবে না– থাকলে পাবে। সে খরচ তিনটি হল– (১) মৃতের দাফন- কাফন, (২) মৃতের ঋণ, (৩) মৃতের ওছিয়াত। ওছিয়াত সম্পর্কে পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। দাফন-কাফন ও ঋণ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হল।

* মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে যায়, তন্মধ্য থেকে সর্বপ্রথমে তার দাফন-কাফনের খরচ বহন করা হবে। অবশ্য যদি অন্য কেউ ছওয়াবের নিয়তে বা মহব্বতে দাফন-কাফনের খরচ বহন করতে চায় তাহলে তা নির্ভর করবে ওয়ারিছদের মর্জির উপর; তারা ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। স্ত্রীর দাফন-কাফনের খরচ সর্ব প্রথম স্বামীর উপর বর্তায়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বহন করতে হবে। যে মৃত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি রেখে যায়নি তার দাফন-কাফনের খরচ সেসব লোকেরা বহন করবে যারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি থাকলে তার ওয়ারিছ হতো। যে যে অনুপাতে মীরাছ পেতো সে অনুপাতেই সে এ খরচ বহন করবে। আর যে লাওয়ারিছ অর্থাৎ, যার কোনো ওয়ারিছ বা আত্মীয়-স্বজন না থাকে, তার দাফন-কাফনের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। ইসলামী সরকার না থাকলে সেই লাওয়ারিছ মৃত ব্যক্তির মহল্লা বা লোকালয়ের লোকদের উপর তার দাফন-কাফনের খরচ বহন করা ওয়াজিব।



* দাফন-কাফনের পর এবং মীরাছ বণ্টনের পূর্বে দ্বিতীয় জরুরি খরচ হল মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা (যদি ঋণ থাকে)। ঋণ দুই ধরনের। যথা: (এক) সুস্থ অবস্থার ঋণ। অর্থাৎ, সুস্থাবস্থায় যদি কারও থেকে নগদ টাকা ঋণ নিয়ে থাকে বা সুস্থ্য অবস্থায় কারও থেকে কিছু ক্রয় করে থাকে এবং তার দাম বাকি থাকে বা সুস্থ্য অবস্থায় সে তার এসব ঋণের কথা প্রকাশ করে থাকে বা অন্যরা এমনিতেই সে বিষয়ে অবগত ছিল। স্ত্রীর অনাদায়ী মহরও এই প্রকার ঋণের অন্তর্ভুক্ত। (দুই) এমন ঋণ যা সে অন্তিম রোগ (মারাদুল মাওত)–এর সময় স্বীকার করেছিল যা অন্য কারও জানা ছিল না বা কোনো সাক্ষীও ছিল না। অন্তিম রোগ বা মারাদুল মওত বলতে বোঝায় যে রোগে তার ইন্তিকাল হয়।

উক্ত উভয় প্রকার ঋণের হুকুম-আহকাম নিম্নরূপ।

১. যদি মৃতের দায়িত্বে এক প্রকার বা উভয় প্রকারের ঋণ থাকে তাহলে দাফন-কাফন সম্পন্ন করার পর উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধ করা হবে। তার পরে মীরাছ বন্টন করা হবে।

২. পরিত্যক্ত সম্পত্তির চেয়ে ঋণের পরিমাণ অধিক হলে দেখতে হবে– যদি সে ঋণ এক প্রকার এবং প্রাপক এক ব্যক্তি হয় তাহলে কাফন-দাফনের পর যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকবে তা তাকে দিয়ে দেয়া হবে। বাকিটুকু প্রাপক মাফ করে দিবে। সে মাফ করতে না চাইলেও তার সে অধিকার রয়েছে তবে আইনত ওয়ারিছদের উপর তা পরিশোধের যিম্মাদারী নেই। অবশ্য তারা অবস্থাসম্পন্ন হয়ে থাকলে বাকী ঋণটুকুও পরিশোধ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। আর যদি প্রাপক একাধিক ব্যক্তি হয় তাহলে তারা সবাই কাফন- দাফনের পর উদ্বৃত্তটুকু নিজেদের মধ্যে ঋণের অনুপাতে বণ্টন করে নিবে।

৩. যদি মৃত ব্যক্তির উভয় প্রকারের ঋণ থাকে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি (দাফন-কাফনের ব্যয় বহন করার পর) সেসব ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট না হয় তাহলে প্রথমে পরিশোধ করতে হবে প্রথম প্রকারের ঋণ। তারপর অবশিষ্ট থাকলে দ্বিতীয় প্রকারের পাওনাদাররা তাদের ঋণের অনুপাতে যা থাকে তা বণ্টন করে নিবে। অর্থাৎ, তারা সে অনুপাতেই অংশ পাবে। আর প্রথম প্রকারের ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে তারা ওয়ারিছদেরকে আইনত বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য

নৈতিক দায়িত্ব ভেবে ওয়ারিছগণ নিজেদের অর্থ থেকে দিয়ে দিলে ভিন্ন কথা, এর জন্য ওয়ারিছগণ ছওয়াবও লাভ করবে।

* মীরাছের আইন অনুযায়ী যেসব আপনজন অংশ পায় না, তারা যদি মীরাছ বণ্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে বিশেষত তাদের মধ্যে যারা এতীম, মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত হয়, তাদেরকে অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় কিছু দিয়ে তাদেরকে খুশি করা উত্তম। এটা অংশীদারদের আইনগত দায়িত্ব নয় বরং নৈতিক দায়িত্ব। এটাও এক প্রকার সদকা ও নেক কাজ।

## মামলা-মোকদ্দমা, সাক্ষ্য ও বিচার সংক্রান্ত মাসায়েল

* মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা করে অর্জিত সম্পদ নিজের হয়ে যায় না– তা ভোগ করা নাজায়েয ও হারাম।

* যখন কোনো ব্যাপারে কাউকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন সে বিষয় সম্পর্কে তার বিশুদ্ধভাবে জানা থাকলে সে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না। শরীআতসম্মত ওজর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ। পক্ষান্তরে সাক্ষীকে বারবার ডেকে বা সে যাতায়াতের ব্যবস্থা বা যাতায়াত– খরচ চাইলে তা না দিয়ে কিংবা অন্য কোনোভাবে তাকে বিব্রত করাও গোনাহ।

* কোনো নারীকে বিচারক নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর মতে যে ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য জায়েয শুধু সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য নারীকে বিচারক নিয়োগ করা যায়।

* বিচারকের জন্য বাদী/বিবাদী থেকে বা অধীনস্থ আমলাদের থেকে কোনো হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণ করা বৈধ নয়। সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বে বাদী/বিবাদীর দাওয়াত গ্রহণ থেকেও বিচারককে বিরত থাকতে হবে।

* বিচারকের জন্য মাতা-পিতা বা সন্তানের পক্ষে কোন রায় দেয়ার অনুমতি নেই, কেননা এতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে। তবে তাদের বিপক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে রায় দিতে পারবে।

* বিচারকের জন্য বিনা ওজরে কোনো মামলার রায় প্রদানে বিলম্ব করা জায়েয নয়।



* বিবাদী উপস্থিত থাকলে তার বক্তব্য শোনা কর্তব্য। তার বক্তব্য না শুনে রায় প্রদান করা বৈধ নয়।

* বাদী বিবাদী কোনো পক্ষের বক্তব্য শ্রবণে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করা বৈধ নয়। উভয় পক্ষের বক্তব্যই সমান আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করা দায়িত্ব।

* রাগের অবস্থায় বিচার করা ও রায় প্রদান করা নিষিদ্ধ। হাদীছে এ সম্বন্ধে স্পষ্টত নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

(الأحكام السلطانية ও معارف القرآن প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

**তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত**

# চতুর্থ অধ্যায়: মাআশারাত

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ. (مسلم)

সত্যিকার মুসলমান সেই, যার জবান ও হাত দ্বারা
কোনো মুসলমান কষ্ট পায় না। (মুসলিম)

بسم الله الرحمن الرحيم

## চতুর্থ অধ্যায়

## মুআশারাত

নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত যেমন ফরয, তেমনিভাবে মু'আশারাত তথা পারস্পরিক আচার-আচরণ ও সমাজ সামাজিকতা দুরস্ত করা এবং আদব- কায়দা ও শিষ্টাচার রক্ষা করাও ফরয। (اسلامی تہذیب)

## মানবাধিকার

## মাতা-পিতার জন্য সন্তানের করণীয়
## তথা
## মাতা-পিতার অধিকার

১. যদি মাতা-পিতার প্রয়োজন হয় এবং সন্তান তাঁদের ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ দেয়া সন্তানের উপর ওয়াজিব। এমনকি পিতা-মাতা কাফের হলেও তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব।

২. প্রয়োজন হলে মাতা-পিতার খেদমত করা দায়িত্ব। খেদমত নিজে করতে পারলে করবে নতুবা খেদমতের জন্য লোকের ব্যবস্থা করা দায়িত্ব। উল্লেখ্য, খেদমতের ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।



৩. মাতা-পিতা ডাকলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া এবং হাজির হওয়া। এমনকি মাতা-পিতা যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে বা অসুবিধার ভয়ে সহযোগিতার জন্য ডাকেন আর অন্য কেউ তাদের সহযোগিতা করার মত না থাকে, তাহলে ফরয নামাযে থাকলেও তা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। তবে জরুরত ছাড়া যদি ডাকেন তাহলে ফরয নামায ছাড়া জায়েয হবে না। আর নফল বা সুন্নাত নামাযে থাকা অবস্থায় বিনা জরুরতে মাতা-পিতা ডাকলে তখনকার মাসআলা হল– যদি সে নামাযে আছে একথা না জেনে ডেকে থাকেন, তাহলে নামায ছেড়ে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। আর যদি নামাযে আছে একথা জেনেও বিনা জরুরতে ডাকেন, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে নামায ছাড়বে না। দাদা-দাদী, নানা-নানীর ক্ষেত্রেও মাসআলা অনুরূপ।

৪. পিতা-মাতার হুকুম মান্য করা ওয়াজিব, যদি কোন পাপের বিষয়ে হুকুম না হয়। কেননা, পাপের বিষয়ে হুকুম হলে তা মান্য করা নিষেধ। মোস্তাহাব পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য সফর করতে হলে তাদের অনুমতি প্রয়োজন। তবে ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া পরিমাণ ইল্‌ম হাছিল করার জন্য সফর করাটা তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয়। এ সম্পর্কে এ কিতাবের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. পিতা-মাতার সঙ্গে সম্প্রীতি ও ভক্তির সাথে নম্রভাবে কথা বলা আদব। রূঢ়ভাবে ও ধমকের স্বরে কথা বলা নিষেধ।

৬. কথায়, কাজে ও আচার-আচরণে পিতা-মাতার আদব-সম্মান রক্ষা করা। এ জন্যই তাঁদের নাম ধরে ডাকা নিষেধ, চলার সময় তাঁদের পশ্চাতে চলা উচিত, তাঁদের সামনে নিম্ন স্বরে কথা বলা উচিত, তাঁদের দিকে তেজ দৃষ্টিতে তাকানো অনুচিত। উল্লেখ্য যে, সম্মানের ক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. কোনোভাবে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া হারাম। পিতা-মাতা অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলেও তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না। এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া নিষেধ, এ জন্যই তাঁদের মৃত্যুর পর চিৎকার করে কাঁদা নিষেধ। কারণ তাতে তাঁদের রূহের কষ্ট হয়।

৮. নিজের জন্য যখনই দুআ করা হবে, তখনই পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য, তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের জন্য এবং তাঁদের মুশকিল

আহ্বান ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দুআ করা কর্তব্য। তাঁদের মৃত্যুর পরও আজীবন তাঁদের জন্য এরূপ দুআ করতে হবে। জনৈক তাবিঈ বলেছেন, যে প্রতিদিন অন্তত পাঁচ বার পিতা-মাতার জন্য দুআ করল, সে পিতা-মাতার হক (অর্থাৎ, দুনিয়াবী হক) আদায় করল। পিতা-মাতার জন্য দুআ করার বিশেষ বাক্যও আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তা হল- رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا এ দুআর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করা হয়। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতা অমুসলমান হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ রহমতের দুআ এই নিয়তে জায়েয হবে যে, তারা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দুআ করা জায়েয নয়।

৯. পিতা-মাতার খাতিরে পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনের সাথে এবং পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মানের ব্যবহার করা এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের উপকার ও সাহায্য করা কর্তব্য।

১০. পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা এবং তাঁদের জায়েয ওছিয়াত পালন করাও তাঁদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

বি. দ্র. দুধমাতার সঙ্গেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাঁর আদব তাজীম রক্ষা এবং যথাসাধ্য তাঁর ভরণ-পোষণ করতে হবে। আর বিমাতা নিজের আপন মাতা না হলেও যেহেতু সে পিতার প্রিয়জনের মধ্যে একজন, তাই তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং যথাসাধ্য তার জানে মালে খেদমত করতে হবে।

(تعليم ও معارف القرآن، حقوق العباد، تنبيه الغافلين، احسن الفتاوى ج/١ مفاتيح الجنان الدين প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয়
## তথা
## সন্তানের অধিকার

১. সুসন্তানের জন্য একজন সুন্দর মায়ের ব্যবস্থা করা: অর্থাৎ, শরীফ ও নেককার নারীকে বিবাহ করা, তাহলে তার গর্ভে সু-সন্তানের আশা করা যায়। কেননা সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থাতেই মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা ও স্বভাব-চরিত্রের প্রভাব সন্তানের উপর পড়া শুরু হয় এবং মাতৃকোলে লালন-পালন অবস্থাতেও এই প্রভাব পড়তে থাকে।



২. সন্তানের জীবন রক্ষা করা: ইসলাম জাহেলী যুগের সন্তান হত্যা করার রছমকে তাই হারাম করেছে। সন্তানের জীবন রক্ষার সম্ভাব্য সবব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। সন্তানের উপর থেকে যেন বালা-মুসীবত দূর হয়ে যায়– এ উদ্দেশ্যে সন্তানের আকীকা করাকে সুন্নাত করা হয়েছে।

৩. সন্তানকে লালন-পালন করাও মাতা-পিতার দায়িত্ব। এজন্য মায়ের উপর দুধপান করানোকে ওয়াজিব করা হয়েছে। মায়ের বর্তমানে বা তাঁর অপারগতার অবস্থায় দুধমায়ের মাধ্যমে সন্তানকে দুধ পান করানো হলে তার ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের পিতার উপর ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, দুধমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুচরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলাকে নির্বাচন করা কর্তব্য। কারণ, বাচ্চার চরিত্রে দুধের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। এমনিভাবে সন্তানের লালন-পালন হালাল সম্পদ দ্বারা হওয়া চাই, নতুবা সন্তান বড় হওয়ার পর তার মধ্যে হালাল-হারাম–এর পার্থক্য করার প্রবৃত্তি থাকবে না।

৪. সন্তানকে আদর-সোহাগের সাথে লালন-পালন করা কর্তব্য। কেননা আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

৫. সন্তানের ভাল নাম রাখা মাতা-পিতার দায়িত্ব এবং এটা সন্তানের অধিকার। এর দ্বারা বরকত হাছিল হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৭১ পৃষ্ঠা।

৬. সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা: সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই এ শিক্ষা প্রদান শুরু হবে। তাই সন্তান –ছেলে হোক বা মেয়ে হোক– ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শব্দগুলোর একটি সুপ্রভাব তার মধ্যে পড়বে। সন্তানকে সর্বপ্রথম যে কথাটি শেখানো উত্তম তা হল "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু"। সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দেয়া কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। সন্তানদের দুনিয়াবী হকের মধ্যে রয়েছে– তাদেরকে সাঁতার কাটা, জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো বৈধ পেশা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া।

৭. সন্তানকে আদব, আমল ও সুচরিত্র শিক্ষা দেয়া। দুধের শিশু অবস্থা থেকেই তার আদব ও চরিত্র শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। তাই ইসলামী

নীতিতে বলা হয়েছে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জাগ্রত থাকা অবস্থায়ও তার সামনে পিতা-মাতা যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকবে, নতুবা ঐ সন্তানের মধ্যে নির্লজ্জতার স্বভাব জন্ম নিতে পারে। সন্তানের সাত বৎসর বয়স হলে তাকে নামাযের নির্দেশ প্রদান এবং দশ বৎসর হলে মারপিট ও শাসনপূর্বক তার দ্বারা নামায পড়ানো– এগুলো সন্তানকে আমল শিক্ষা দেয়ার অংশ বিশেষ। সন্তানকে লালন-পালন, সুশিক্ষা প্রদান এবং আদব, আমল ও সূচরিত্র শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে ৫৭৩–৫৭৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

৮. সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করা: সন্তানদেরকে ধন-সম্পদ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ভাল। তবে কোন সন্তান তালিবে ইল্‌ম হলে সে যেহেতু দ্বীনের কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন জীবিকা উপার্জনে স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে থাকবে, তাই তাকে কিছু বেশি দান করে গেলে কোনো অন্যায় হবে না। এমনিভাবে কোন সন্তান রোগের কারণে বা স্বাস্থ্যগত কারণে উপার্জন করতে অপারগ হলেও তাকে কিছু বেশি দেয়া যায়।

৯. বিয়ের উপযুক্ত হলে বিয়ে দেয়া। তবে বিয়ের খরচ বহন করা পিতা/মাতার দায়িত্ব নয়। (احسن الفتاوی ٥/□□)

১০. কন্যা বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা হলে পুনঃবিবাহ পর্যন্ত তাকে নিজেদের কাছে রাখা এবং তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

(مفاتیح الجنان، احسن الفتاوی ج/٥، حقوق العباد، تربیت اولاد، تنبیه الغافلین এবং 'মাতা পিতা ও সন্তানের হক' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## উস্তাদের জন্য ছাত্রের করণীয়
## তথা
## উস্তাদের হক

১. উস্তাদের আদব রক্ষা করা: কথা-বার্তা, শব্দ প্রয়োগ, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আদব রক্ষা করতে হবে। যেমন: উস্তাদের আগে বেড়ে কথা না বলা, উস্তাদের সামনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে কথা না বলা, তাঁদের দিকে পিছন দিয়ে না বসা, এক সঙ্গে চলার সময় তাঁদের সামনে না চলা, তাঁদের সামনে বেশি না হাসা, বৃথা কথা না বলা ইত্যাদি।



২. উস্তাদের প্রতি ভক্তি রাখা: উস্তাদের সাথে ভক্তি সহকারে কথা বলা, ভক্তি সহকারে তাঁদের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং হাবভাবে ভক্তি প্রকাশ করা কর্তব্য।

৩. উস্তাদকে আজমত ও শ্রদ্ধা করা: পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেশ্রদ্ধা ও আজমতের সাথে তাঁদের সামনে হাজির হওয়া কর্তব্য।

৪. উস্তাদের সামনে তাওয়াজু' ও বিনয়ের সাথে থাকা: কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ সবকিছুতেই বিনয় থাকতে হবে। দুনিয়ার সব ক্ষেত্রেই খোশামোদ তোষামোদ নিন্দনীয়; একমাত্র উস্তাদের বেলায় তা প্রশংসনীয়।

৫. উস্তাদের খেদমত করা: এই খেদমতের মধ্যে উস্তাদ অভাবী এবং ছাত্র স্বচ্ছল হলে উস্তাদের বৈষয়িক সহযোগিতা করা এবং তাঁদেরকে হাদিয়া- তোহফা প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত।

৬. উস্তাদের হক অনেকটা পিতার মত। বস্তুত উস্তাদ হলেন রূহানী পিতা, তাই পিতার ন্যায় উস্তাদের হকও তাঁর মৃত্যুর পরও বহাল থাকে। এ জন্যই উস্তাদের মৃত্যুর পরও সর্বদা তাঁর জন্য দুআ করা কর্তব্য। উস্তাদের নিকটাত্মীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁদের খেদমত করা, এমনিভাবে উস্তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং প্রয়োজনে তাঁদের খেদমত করা কর্তব্য।

৭. উস্তাদের খেদমতে লিপ্ত হলে আদব হল তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে না যাওয়া। (অনুমতি প্রকাশ্যে হোক বা লক্ষণ থেকে বুঝা যাক।)

৮. কোনো কারণে উস্তাদ অসন্তুষ্ট হলে বা উস্তাদের মেজাযের পরিপন্থী কোনো কথা বলে ফেললে সাথে সাথে নিজের ত্রুটির জন্য ওজরখাহী করা এবং উস্তাদকে সন্তুষ্ট করা জরুরি।

৯. ছাত্রের কোনো অসংগত প্রশ্ন বা অসংগত আচরণের কারণে উস্তাদ রাগ করলে, বকুনি দিলে বা মারধর করলে ছাত্রের কর্তব্য সেটা সহ্য করা। এমনকি অন্যায়ভাবে কিছু বললেও তাঁর নিন্দা-শেকায়েত না করা এবং মন খারাপ না করা উচিত।

১০. ছাত্রের কর্তব্য মনোযোগের সাথে উস্তাদের বক্তব্য ও ভাষণ শ্রবণ করা, অন্যমনস্ক না হওয়া এবং উস্তাদের কথা ভাল করে ইয়াদ/মুখস্থ করা।

১১. উস্তাদ কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করলে তা মান্য করা উচিত এবং কখনো তাঁকে অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা না করা উচিত। কোনো

বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন করাও নিষেধ। নিজের মেধার গৌরব প্রদর্শনের জন্য প্রশ্ন করা বা অস্পষ্ট কিংবা অর্থহীন প্রশ্ন করাও উচিত নয়।

১২. উস্তাদের কোনো বক্তব্য বোধগম্য না হলে সে জন্য উস্তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না বরং বুঝতে না পারাকে নিজের বোধশক্তির ত্রুটি মনে করবে।

১৩. উস্তাদের মতের বিপরীত অন্য কারও মত তাঁর সামনে বয়ান করবে না।

১৪. পাঠ দানের সময় সম্পূর্ণ নীরব থাকা উচিত। এদিক-সেদিক তাকানো, কথা-বার্তা বলা বা হাসি-তামাশায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

১৫.নিজের কোনো ত্রুটি হলে উস্তাদের সামনে অকপটে তা স্বীকার করে নেয়া কর্তব্য। অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হওয়া উচিত।

১৬.উস্তাদের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সে জন্য উস্তাদের প্রতি ভক্তি হারিয়ে না বসা বরং তার এমন কোন সুব্যাখ্যা বের করা, যাতে উস্তাদ রক্ষা পান। অবশ্য স্পষ্টতই উস্তাদ থেকে কোনো অন্যায় সংঘটিত হলে তার সমর্থন না করা চাই।

১৭. মাঝেমধ্যে চিঠিপত্র যোগাযোগ ও হাদিয়া-তোহফা দ্বারা তাঁদের মন খুশি করতে থাকা কর্তব্য। সারাজীবন এটা করতে থাকবে। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেলেই উস্তাদের হক বন্ধ হয়ে যায় না।

১৮.নিজের দ্বারা উস্তাদের আসবাবপত্রের ক্ষতি সাধন হলে আদবের সাথে সেটা জানিয়ে দেয়া জরুরি। গোপন রেখে উস্তাদকে কষ্ট দেয়া অনুচিত।

১৯.উস্তাদ রোগাক্রান্ত হলে অথবা দুর্বল হয়ে পড়লে কিংবা অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকলে সবক পাঠ বন্ধ রাখা।

২০.শাগরিদকে উস্তাদের খেদমতে হাজির হয়ে ইল্ম শিক্ষা করতে হবে। শাগরিদের নিকট পড়াবার জন্য আসার কষ্ট উস্তাদকে না দেয়াই আদব।

২১.উস্তাদ যা পড়াবেন পূর্বাহ্নে তা মুতালা করা (পড়ে আসা)-ও উস্তাদের হকের অন্তর্ভুক্ত। এতে করে তাকে বোঝানোর জন্য উস্তাদকে অতিরিক্ত বেগ পেতে হবে না বা বাড়তি কোনো প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পেরেশানী উস্তাদকে সইতে হবে না।

২২.উস্তাদ কোনো ছাত্রের জন্য কোন বিশেষ বিষয় বা বিশেষ কিতাব/বই পড়া ক্ষতিকর মনে করে নিষেধ করলে ছাত্রের পক্ষে তা থেকে বিরত থাকা উচিত।



বিশেষ দ্রষ্টব্য: যাদের থেকে দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা হয় তারাও শিক্ষক বলে গণ্য। এমনকি যাদের প্রণীত দ্বীনী কিতাবপত্র দ্বারা কেউ উপকৃত হয়, এ নিয়ম অনুযায়ী তাঁরাও তার উস্তাদ এবং সে তাঁদের ছাত্র বা শাগরিদ বলে গণ্য। উস্তাদের ন্যায় তাঁদেরও হক রয়েছে, তবে কিছুটা হকের মধ্যে কমী-বেশি তো থাকবেই, যা সহজে বোধগম্য। (اصلاح انقلاب امت، آداب المعاشرات، فروع الايمان এবং أدب الدنيا والدين প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## ছাত্রের জন্য উস্তাদের করণীয়
## তথা
## ছাত্রের হক

১. ছাত্রদের সাথে কল্যাণকর, কোমল, সহজ, স্নেহপূর্ণ ও ভাল আচার-আচরণ করা কর্তব্য।

২. ভুল না পড়ানো। ভুল পড়ানো, ভুল ব্যাখ্যা দেয়া অথবা ভুল মাসআলা বলাসম্পূর্ণ হারাম। নিজের মূর্খতা গোপন করার জন্য এরূপ না করা উচিত।

৩. কোনো বিষয় না জানা থাকলে বলবে, আমার জানা নেই। নিজের পক্ষ থেকে আন্দাজে কিছু না বলা উচিত।

৪. ছাত্রদের রুচি, যোগ্যতা এবং মেজাযের প্রতি লক্ষ রেখে কথা বলা।

৫. ছাত্রদের মেধাগত ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখে তাদের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপন করা কর্তব্য। বক্তব্যের ভাষা, অলংকার প্রয়োগ ও সবকের পরিমাণ নির্ধারণ এ নীতি অনুসারেই হতে হবে; নতুবা বিষয় তাদের বোধগম্য হবে না কিংবা মেধা স্থবির হয়ে পড়বে, আর এভাবে তারা লেখা পড়ায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

৬. ছাত্রদের দেহমনে সজীবতা ও অনুপ্রেরণা বহাল রাখার জন্য বৈধ পন্থায় তাদেরকে কিছু সময় আনন্দ-ফুর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের পানাহার ও আরাম-বিশ্রামের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৭. ছাত্রদেরকে শুধু কিতাবী ইল্ম (পুঁথিগত বিদ্যা) শিক্ষা দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাদের আমল-আখলাকের প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে।

৮. উস্তাদের বক্তব্য যেন ছাত্ররা শুনতে পায়– এতটুকু উচ্চস্বরে ভাষণ দেয়া (বা আওয়াজ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা) উস্তাদের কর্তব্য এবং এটা ছাত্রদের হক।

৯. এক বারে ছাত্ররা বুঝতে বা উপলব্ধি করতে না পারলে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ভাষণ দিয়ে, ব্যাখ্যা করে পড়ানো উস্তাদের কর্তব্য এবং ছাত্রদের হক।

১০.মাঝেমধ্যে ছাত্রদের পরীক্ষা নেয়া এবং ছাত্রদের জ্ঞানের উন্নতি ও বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

১১.কোনো বিষয় বা কোন বিশেষ কিতাব কোনো ছাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হলে তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা।

১২.ছাত্রদের ফলপ্রসু ইল্‌ম দানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করা।

১৩.রাগান্বিত অবস্থায় কোনো কথা বলায় ছাত্রের উপকার হবে বুঝতে পারলে সেভাবেই বলা।

১৪.কোন এক ব্যাপারে রাগ করলে অন্য ব্যাপারে সে রাগের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা উচিত নয়। এমনিভাবে একজনের উপর রাগ হলে সকলের উপর সে রাগ ঝাড়াও ঠিক নয়।

১৫.ছাত্রের কোনো প্রশ্নের জওয়াবে প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয় থাকলে তার যথাসম্ভব জওয়াব দেয়া এবং জওয়াবের সাথে আনুষঙ্গিক কোনো জরুরি বিষয় থাকলে তা-ও বলে দেয়া।

১৬.অযোগ্য, বদমেজাযী বা স্নেহশীল নয়– এমন ব্যক্তির উস্তাদ হওয়া বা এমন ব্যক্তিকে উস্তাদ বানানো উচিত নয়। এরূপ করলে ছাত্রদের হক নষ্ট হবে।

১৭.উস্তাদের নিজের মধ্যে আদব ও আমল আখলাক থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাঁর আদব ও আমল-আখলাকের প্রভাব ছাত্রের উপর পড়বে।

১৮.ছাত্রকে পড়ানোর পূর্বে উস্তাদের ভালভাবে পড়ে যাওয়া উচিত।

১৯.ছাত্রদের মেধা ও স্মৃতি বর্ধনের কোনো কৌশল ও পন্থা জানা থাকলে তাদেরকে তা অবহিত করা উচিত।

২০.উস্তাদ বড় এবং ছাত্র তার ছোট; অতএব ছোটদের প্রতি বড়দের যা যা করণীয় উস্তাদকে ছাত্রের জন্য সেগুলো করতে হবে (দ্রষ্টব্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা)।

(اصلاح انقلاب امت، آداب المعاشرت প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## স্বামীর জন্য স্ত্রীর করণীয়
## তথা
## স্বামীর অধিকারসমূহ

১. স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের পরে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারই সবচেয়ে বেশি। তবে স্ত্রী



কোনো পাপ কাজে স্বামীর আনুগত্য করবে না। যেমন– নামায না পড়া, যাকাত না দেয়া, পর্দায় না থাকা বা পিছনের রাস্তায় যৌন সংগম করতে দেয়া ইত্যাদির ব্যাপারে স্বামী হুকুম দিলে তা মান্য করা হারাম হবে। সেসব ব্যাপারে (নম্রভাবে এবং কৌশলে ও হেকমতের সাথে) স্বামীর বিরোধিতা করা ফরয। এমনিভাবে স্বামী যেকোনো ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা লংঘনের ব্যাপারে তথা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী করার ব্যাপারে হুকুম দিলে বা বললে তার বিরোধিতা করতে হবে। আর কোনো মোস্তাহাব ও নফল কাজের ব্যাপারে না করার হুকুম দিলে সে ব্যাপারে স্বামীর কথা মেনে চলা ওয়াজিব। স্ত্রী এমন কোনো মোবাহ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না যাতে স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে ত্রুটি হয়। স্বামীর যে হুকুম না মানলে স্বামীর কষ্ট হবে– এরূপ হুকুম মানতে হবে (যদি সেটা পাপের হুকুম না হয়)। স্বামী কাছে থাকা অবস্থায় নফল নামায ও নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত করবে না, তবে স্বামী সফরে বা বাইরে থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত করায়ও ক্ষতি নেই।

২. স্বামীর নিকট তাঁর সাধ্যের বাইরে কোনো খাদ্য-খাবার বা পোশাক-পরিচ্ছদের আবদার করবে না। বরং স্বামীর সাধ্য সামর্থ থাকলেও নিজের থেকে কোনো কিছুর ফরমায়েশ না করাই উত্তম। স্বামী নিজের থেকেই তার খাহেশ জিজ্ঞাসা করে সে মোতাবেক ব্যবস্থা করবে– এটাই সুন্দর পন্থা।

৩. স্বামী অপছন্দ করে– এরূপ কোনো পুরুষ বা নারীকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে আসতে দিবে না, নিজের নিকট আনবে না এবং নিজের কাছে রাখবে না।

৪. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ি বা ঘর থেকে বের হবে না।

৫. স্বামীর টাকা-পয়সা ও মাল-সামান হেফাজত ও সংরক্ষণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর টাকা-পয়সা ও মাল-সামান থেকে কাউকে (মা-বাপ, ভাই বোন হলেও) কোনো কিছু দিবে না। এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার টাকা-পয়সা থেকে ঘরের আসবাবপত্রও ক্রয় করতে পারবে না। স্বামীর টাকা-পয়সা থেকে গোপনে কিছু কিছু নিজে সঞ্চয় করা এবং নিজেকেই সেটার মালিক মনে করা এবং সেভাবে সে অর্থ অন্যত্র পাচার করা বা ব্যবহার করাও জায়েয নয়। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যও এরূপ করতে পারবে না, করতে চাইলে

তার জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। এমনিভাবে স্বামীর স্পষ্ট অনুমতি বা অনুমতি দেয়ার প্রবল ধারণা না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর মাল-দৌলত থেকে কাউকে চাঁদা প্রদান বা দান-খয়রাতও করতে পারবে না। অবশ্য দুই চার পয়সা যা ফকীরকে দেয়া হয় বা এরূপ যৎসামান্য বিষয় –যে ব্যাপারে স্বামীর অনুমতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা– সেরূপ বিষয় ভিন্ন কথা, সেটা অনুমতি ছাড়াও জায়েয। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও স্বামীর সঙ্গেহ পরামর্শ করে নেয়া প্রয়োজন এবং সেটাই উত্তম।

৬. স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য আহবান করলে স্ত্রীর পক্ষে তাতে সাড়া দেয়া কর্তব্য, ফরয। অবশ্য শরীআতসম্মত ওজর থাকলে ভিন্ন কথা; যেমনঃ হায়েয নেফাসের অবস্থা থাকলে।

৭. স্বামী অস্বচ্ছল, দরিদ্র বা কুৎসিত হলে তাঁকে তুচ্ছ না জানা।

৮. স্বামীর মধ্যে শরীআতের খেলাফ কোন কিছু দেখলে আদবের সাথে তাঁকে সংশোধনের চেষ্টা করা এবং স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা চালানো স্ত্রীর কর্তব্য। এর জন্য প্রথমে স্ত্রীকে শরীআতের অনুগত ও দ্বীনদার হতে হবে, তাহলে তার প্রচেষ্টা বেশী সফল হবে।

৯. স্বামীর নাম ধরে না ডাকা। এটা বে-আদবী। তবে প্রয়োজনের সময় স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা যায়।

১০. কারও সম্মুখে স্বামীর সমালোচনা না করা।

১১. স্বামীর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও কথা কাটাকাটি না করা। সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করা।

১২. স্বামীর উদ্দেশ্যে সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে থাকা কর্তব্য, হাসি-খুশি থাকা কর্তব্য। এটা স্বামীর অধিকার।

১৩. স্বামীর মেজায ও মানসিক অবস্থা বুঝে চলা জরুরি।

১৪. স্বামী সফর থেকে এলে বা বাইরে থেকে কর্মক্লান্ত হয়ে এলে তার তাৎক্ষণিক যত্ন নেয়া, সুবিধা-অসুবিধা দেখা ও খোঁজ-খবর নেয়া জরুরি। শুধু সফর থেকে ফিরলেই নয় সর্বদাই স্বামীর স্বাস্থ্য-শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা ও যত্ন দেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব।

১৫. স্বামীর ঘরের রান্না বান্না করা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি আইনগতভাবে স্ত্রীর দায়িত্ব নয়, তবে এটা তার নৈতিক কর্তব্য। অবশ্য স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে এর জন্য স্ত্রী চাকর-নওকর চেয়ে নেয়ার অধিকার রাখে। স্ত্রী চাকর- নওকরের কাজ তত্ত্বাবধান করবে এবং নিজেও তাদের সাথে



কাজ করবে। এমনিভাবে স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন বা শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করাও স্ত্রীর আইনগত দায়িত্ব নয়, তবে নৈতিক কর্তব্য। প্রয়োজনে এর জন্য স্বামী নিজে না পারলে চাকর-নওকর নিয়োগ করবে। অবশ্য স্বামী যদি অস্বচ্ছল হয় এবং নিজেও ঘরের বা মা-বাপ আপনজনের এসব খেদমত আঞ্জাম দিতে না পারে আর অনন্যোপায় অবস্থায় স্ত্রীকে এসব কাজের জন্য হুকুম দেয়, এমতাবস্থায় স্বামীর সে হুকুম না মানলে স্বামীর কষ্ট হবে বিধায় তখন স্ত্রীর পক্ষে সে হুকুম মান্য করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঘরের কাজ করার মধ্যে স্ত্রীর সম্মান নিহিত রয়েছে, অসম্মান নয় এবং এর জন্য স্ত্রী ছওয়াবও লাভ করবে– স্ত্রী এসব কথা মনে রাখলেই এভাবে চলা তার জন্য সহজ লাগবে।

১৬.স্বামীর না-শুকরি করবে না। যেমনঃ কোন এক সময় তাঁর আনীত কোনো দ্রব্য অপছন্দ হলে এরূপ বলবে না যে, কোনো দিন তুমি একটা পছন্দসই জিনিস দিলে না ... ইত্যাদি।

১৭.স্বামীর আদব-এহ্তেরাম ও সম্মান রক্ষা করে চলা। চড়া গলায় ঝাঁঝালো স্বরে স্বামীর সাথে কথা না বলা, তাঁকে শক্ত কথা না বলা। স্বামী কখনও স্ত্রীর হাত পা দাবিয়ে দিতে গেলে স্ত্রী সেটা করতে দিবে না। ভেবে দেখুন তো পিতা-মাতা বা যাদের সাথে আদব রক্ষা করে চলতে হয় তারা এরূপ করতে চাইলে তখন কিরূপ করা হয়। অবশ্য অনন্যোপায় অবস্থার কথা ভিন্ন। মোটকথা, কথা-বার্তায়, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে সর্বদা স্বামীর আদব রক্ষা করে চলা কর্তব্য। ভালবাসা ও আদব উভয়টার সমন্বয় করে চলা কর্তব্য।

১৮.সন্তানাদি লালন-পালন করা। এটা স্ত্রীর দায়িত্ব। সন্তানকে দুধ পান করানো স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। (معارف القرآن)

১৯.সতীত্ব রক্ষা করাঃ স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর সম্পদ, অতএব সতীত্ব রক্ষা না করলে সতীত্বহীনতার অপরাধ তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে স্বামীর অধিকার লংঘনের অপরাধ।

(بہشتی زیور ও تحفۂ زوجین، مفاتیح الجنان থেকে গৃহীত।)

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** দাম্পত্য জীবনকে শান্তিময় ও সুখময় করে তুলতে হলে শুধু নিজের অধিকারই দেখলে হয় না। নিজের দায়িত্বও দেখতে হয়। অতএব স্বামী যদি শুধু তার অধিকার দেখে দায়িত্ব (অর্থাৎ, স্ত্রীর জন্য তা যা করণীয় তা) না দেখে, সে ব্যাপারে যত্নবান না হল, তাহলে সুখ শান্তি আসবে না।

## স্ত্রীর জন্য স্বামীর করণীয়
## তথা
## স্ত্রীর অধিকারসমূহ

১. হালাল মাল দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। পোষণ বা পোশাকের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদান করা বা প্রতি ঈদে কিংবা বিবাহ-শাদী ইত্যাদি উপলক্ষে থাকা সত্ত্বেও নতুন পোশাক দেয়া স্বামীর কর্তব্য নয়। দিলে তার অনুগ্রহ। স্বামীর স্বচ্ছলতা যেরূপ সেই মানের ভরণ-পোষণ দেয়া কর্তব্য। স্ত্রীর হাত খরচের জন্যও পৃথকভাবে কিছু দেয়া উচিত, যাতে সে তার ছোটখাট এমনসব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে যেগুলো সব সময় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবে অবাধ্য হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার থাকে না।

২. স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অবশ্য স্বচ্ছলতা না থাকলে তখন স্ত্রীকেই রান্না-বান্না (নিজের জন্য এবং স্বামীর সন্তানাদির জন্যও) ইত্যাদি কাজ করতে হবে, এটা তখন তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি স্ত্রী অসুস্থ্যতার কারণে বা আমীর-উমরা প্রভৃতি বড় ঘরের কন্যা হওয়ার কারণে নিজে করতে সক্ষম না হয়, তহলে স্বামীর দায়িত্ব প্রস্তুত খাবার ক্রয় করে আনা বা অন্য কোনো স্থান থেকে এনে দেয়া বা অন্য কারও মাধ্যমে পাকানোর ব্যবস্থা করা।

৩. স্ত্রীর বসবাসের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক ঘর বা অন্তত পৃথক রূম পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রী যদি পৃথক থাকার কথা বলে এবং স্বামীর মাতা- পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে একই ঘরে থাকতে খুশি খুশি রাজী না থাকে, তাহলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অন্তত একটা পৃথক কামরা তাকে দিতে হবে, যেখানে সে তার মাল-আসবাব তালাবদ্ধ রেখে হেফাজত করতে পারে বেং স্বাধীনভাবে একান্তে স্বামীর সঙ্গে মনোরঞ্জন করতে পারে। উল্লেখ্য, শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা স্ত্রীর উপর আইনত ওয়াজিব নয়, করলে তার ছওয়াব আছে। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তার স্বামীর; সে নিজে করতে না পারলে লোক দ্বারা করাবে। তাও না পারলে এবং একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় স্ত্রীর মাধ্যমে করাতে চাইলে তখন স্ত্রীর সেটা করার দায়িত্ব এসে যায়। নতুবা স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রী আন্তরিকভাবে না চাইলেও জবরদস্তী



তাকে স্বামীর মাতা-পিতার অধীন করে রাখা, জোর-জবরদস্তী মাতা-পিতার সঙ্গে একান্নভুক্ত রাখা এবং জোর-জবরদস্তী তার দ্বারা মাতা-পিতার খেদমত করানো উচিত নয়। এটা স্ত্রীর প্রতি জুলুম। (اصلاح انقلاب امت) তবে স্ত্রীরও মনে রাখা উচিত যে, একান্ত ঠেকা অবস্থা না হলে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই-বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়াও উচিত নয়। (تحفۂ زوجین)

৪. স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

৫. স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা না রাখা। (আবার একেবারে অসতর্কও না থাকা উচিত।)

৬. হায়েয নেফাস প্রভৃতির বিধান ও দ্বীনী মাসায়েল শিক্ষা করে স্ত্রীকে তা শিক্ষা দেয়া, নামায রোযা প্রভৃতি ইবাদত করা ও দ্বীনের উপর চলার জন্য স্ত্রীকে তাগিদ দেয়া এবং বিদআত, রছম প্রভৃতি শরীআতবিরুদ্ধ কাজ থেকে তাকে বাধা দেয়া স্বামীর কর্তব্য।

৭. প্রয়োজন অনুপাতে স্ত্রীর সাথে সংগম করা। প্রতি চার মাস অন্তত একবার স্ত্রীর সাথে যৌন সংগম করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

৮. স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল না করা। (অর্থাৎ, যৌন সংগমকালে যোনির বাইরে বীর্যপাত না করা।)

৯. স্ত্রীর মাতা-পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাকে দেখা সাক্ষাত করতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা। তবে যাতায়াতের ভাড়া দেয়া স্বামীর আইনত কর্তব্য নয়, দিলে সেটা তার অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। মাতা-পিতার সঙ্গে সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইলেও দিবে এবং অন্য মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে বৎসরে একবার। তবে মাতা-পিতা যদি কন্যার কাছে আসতে পারার মত হয় কিংবা মাতা-পিতা বা কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মধ্যে বেপর্দা হওয়ার বা অন্য কোনো রকম ফেতনার আশংকা থাকে তাহলে এরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে যেতে বাধা দিতে পারে (امداد الفتاوی ۲/□□) এরূপ ক্ষেত্রে মাতা-পিতা ও আপনজন এসে তাকে দেখে যাবে। তাতেও কোনো অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে স্ত্রীর কাছে আসতে না দেয়ার অধিকার রয়েছে স্বামীর। সেরূপ ক্ষেত্রে তারা দূর থেকে দেখে ও কথা বলে যেতে পারে। (প্রাগুক্ত)

১০. স্ত্রীর সঙ্গে কৃত যৌন সংগম প্রভৃতি গুপ্ত বিষয় অন্যত্র প্রকাশ না করা। এটাও স্ত্রীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

১১.পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে যে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সংশোধনমূলক কিছুটা প্রহার করার অনুমতি স্বামীকে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও স্বামী সীমালংঘন করতে পারবে না। অর্থাৎ, প্রকাশ্য স্থানে দাগ পড়ে যাবে–এমনভাবে স্ত্রীকে মারতে পারবে না বা প্রচণ্ডভাবেও মারপিট করতে পারবে না। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৫৭ পৃষ্ঠা।

১২.বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেয়া। স্ত্রীর যেনা, মিথ্যা, বাতিল মতবাদে বিশ্বাস, ফাসেকী প্রভৃতি কারণে তালাক দেয়া হলে স্বামীর অন্যায় হয় না। পক্ষান্তরে অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত স্ত্রীরও স্বামীর কাছ থেকে তালাক চেয়ে নেয়া অন্যায়।

১৩.স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্তত কিছুক্ষণ নির্জনে তাকে সময় দেয়া, তার সঙ্গে হাসি-ফুর্তি করা স্বামীর কর্তব্য। যাতে স্ত্রীও মনোরঞ্জন করতে পারে, মনের কথা বলতে পারে, সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাতে পারে এবং একাকিত্বের কষ্ট লাঘব করতে পারে। এরূপ সময় দিতে না পারলে তার সমমনা কোনো নারীকে তার নিকট আসা-যাওয়া বা রাখার ব্যবস্থা করবে। মোটকথা, ঘরে পর্দার মধ্যে থেকেও যেন স্ত্রী তার মনের খোরাক পায় তার জন্য শরীআতের গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪.রাত্রে স্ত্রীর নিকট শয়ন করাও স্ত্রীর অধিকার।

১৫.স্ত্রীদের নায-নখ্‌রা এবং মান-অভিমান করারও অধিকার রয়েছে।

১৬.স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যতক্ষণ সীমালংঘনের পর্যায়ে না যায় এবং তার পক্ষ থেকে কষ্ট পেলে ছবর করা এবং নীরব থাকা। তবে এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ, প্রয়োজনবোধে স্ত্রীকে মোনাছেব মত তম্বীহ করতে হবে।

১৭.স্ত্রীর সঙ্গে কথা-বার্তা বলা এবং তাকে খুশি রাখাও স্বামীর কর্তব্য এবং এটাও স্ত্রীর অধিকার।

১৮.মহর স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর উপর মহর প্রদান করা ফরয। স্বামী মহর প্রদান করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মহর আদায় করা হবে।

১৯.স্ত্রীর প্রতি অবিচার না করা। পুরুষ তার কর্তৃত্বসুলভ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনোভাবেই স্ত্রীর প্রতি জুলুম-অবিচার করতে পারবে না।



২০.একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাত্রি যাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে মনের টান কারও প্রতি কম বেশি থাকলে সেটার জন্য স্বামী দায়ী নয়, কেননা সেটা তার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়।

(تحفۂ زوجین، احسن الفتاوی وامداد الفتاوی থেকে গৃহীত।)

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনকে শান্তিময় ও সুখময় করে তুলতে হলে শুধু নিজের অধিকারই দেখলে হয় না। নিজের দায়িত্বও দেখতে হয়। অতএব স্ত্রী যদি শুধু তার অধিকার দেখে দায়িত্ব (অর্থাৎ, স্বামীর জন্য তার যা করণীয় তা) না দেখে, সে ব্যাপারে যত্নবান না হয়, তাহলে সুখ শান্তি আসবে না।

## পীর মুরশিদ বা শায়খে তরীকতের সাথে মুরীদের করণীয়
## তথা
## পীরের হক

১. পীর বা শায়খে তরীকত এক প্রকার উস্তাদ, কাজেই উস্তাদের যেসব হক পীর মুরশিদেরও সেসব হক। এ ছাড়া পীর-মুরশিদ বা শায়খে তরীকতের অন্য যেসব হক রয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

২. অন্তরে এই একীন রাখা যে, এই মুরশিদ থেকেই আমার মকছূদ হাছিল হবে, অন্যদিকে মন দিলে ফয়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এই মনে করবে যে, যাকিছু ফয়েয বরকত হাছিল হয় সবই পীরের ফয়েয বরকতে হয়। (এরূপ একীন না থাকলে, মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলে ফায়দা কম হয়।)

৩. পীরের সব কথা (যদি শরীআত-বিরুদ্ধ না হয়) ভক্তি সহকারে পালন করা।

৪. পীরের অনুমতি না নিয়ে তাঁর কাজের অনুসরণ না করা। কারণ তাঁর মর্তবা বড়, তিনি যা করেন মুরীদের হয়তো তা সাজে না।

৫. পীর যা কিছু দুরূদ, ওযীফা বা যিকির বাতাবেন তা-ই পড়া, অন্য কোনো ওজীফা নিজে শুরু করে থাকলে বা অন্য কেউ বলে থাকলে তা ছেড়ে দেয়া। ছেড়ে দিতেও পীরের নিকট বলে নিবে।

৬. পীরের সামনে থাকাকালে সম্পূর্ণ মনোযোগ তাঁর দিকে রাখবে। এমনকি ফরয সুন্নাত ব্যতীত নফল নামায বা কোনো ওজীফাও তাঁর এজাযত না নিয়ে তাঁর সামনে থেকে পড়বে না। পড়লে আড়ালে গিয়ে পড়বে।

৭. মুরীদ এমন স্থানে দাঁড়াবে না, যাতে তার ছায়া পীর মুরশিদের ছায়ার উপর বা তাঁর শরীরের উপর পড়তে পারে। এটা ফরয ওয়াজিব বিষয় নয়, উচ্চস্তরের আদবের বিষয়।

৮. তাঁর মুসল্লার উপর পা রাখবে না।

৯. তাঁর লোটা, বদনা, রেকাবী ইত্যাদি ব্যবহার করবে না।

১০.পীরের সামনে পানাহার বা উযূ গোসল করবে না। অবশ্য যদি তিনি হুকুম করেন তাহলে হুকুম পালন করবে।

১১.পীরের সাক্ষাতে কারও সাথে কথা বলবে না। এমনকি কারও দিকে মুখও ফিরাবে না।

১২.পীর সাহেব উপস্থিত না থাকলেও তাঁর বসার জায়গার দিকে পা লম্বা করবে না এবং

১৩.থুথু ফেলবে না।

১৪.পীর সাহেবের কোনো কথা বা কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবে না, কেননা হতে পারে তিনি সেটা এল্‌হাম দ্বারা বলছেন বা করছেন। অবশ্য শরীআতের স্পষ্ট বিধানের বরখেলাফ হলে তা মান্য করা যাবে না এবং হক্কানী পীর সেরকম কিছু বলতে বা করতেও পারেন না।

১৫.পীরের কারামত দেখার ইচ্ছা করবে না।

১৬.(বিশেষ কিছু) স্বপ্নে দেখলে পীরের নিকট জানাবে।

১৭.বিনা জরুরতে এবং বিনা অনুমতিতে তাঁর ছোহবত ছেড়ে অন্যত্র যাবে না।

১৮.নিজের পীরের কথা অন্যের কাছে তখনই বলবে যখন বুঝবে যে, সে কথার মর্ম উপলব্ধি করবে এবং কদর করবে।

১৯.নিজের কথা বাহ্যত সহীহ হলেও পীরের কথা রদ করবে না এই ভেবে যে, আমার বুঝ ভুলও হতে পারে।

২০.নিজের অন্তরের ভাল-মন্দ সব অবস্থা পীরকে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা জেনে নিবে। তিনি কাশ্‌ফের দ্বারা জেনে নিবেন– এই ভরসায় বসে থাকবে না। পীর ব্যতীত অন্য কাউকে যিকির-আযকারের অবস্থা এবং হালত সম্পর্কে বলবে না, তাহলে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।

(فروع الایمان ও بصائر حکیم الامت থেকে গৃহীত।)

(**বি. দ্র.** কামেল পীর না হলে তার কাছে বায়আত হওয়া অত্যন্ত ক্ষতি ও গোমরাহীর কারণ। তাই কামেল পীরের আলামত সম্পর্কে দেখুন ৬১৯ পৃষ্ঠা)



## উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও বুযুর্গদের সাথে করণীয়

১. উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আগে বেড়ে কোনো কথা না বলা আদব। অবশ্য যদি তাঁরা কাউকে কোন কথার উত্তর দিতে বলেন তাহলে ভিন্ন কথা।

২. তাঁদের আগে বেড়ে কোনো কাজ না করা। যেমন: খাওয়ার মজলিস হলে তাঁদের আগে খাওয়া শুরু না করা, চলার সময় তাঁদের সম্মুখে না চলা, অবশ্য যদি তাঁরা কাউকে আগে করতে বা চলতে নির্দেশ দেন তাহলে ভিন্ন কথা। উল্লেখ্য, একজনের বয়স বেশি আর একজনের ইল্‌ম তথা দ্বীনী জ্ঞান বেশি– এ দুজনের মধ্যে যার ইল্‌ম (দ্বীনী জ্ঞান) বেশি তিনি আদব-সম্মানে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

৩. তাঁদের সামনে তাঁদের চেয়ে জোর আওয়াজে কথা না বলাই আদব।

৪. তাঁদের নাম ধরে গোঁয়ার–এর ন্যায় তাঁদেরকে না ডাকাই আদব।

৫. তাঁদের দরজায় কড়া নেড়ে, নক করে বা চিৎকার করে তাঁদেরকে ডেকে ঘরের বাইরে না আনা আদব। বরং প্রয়োজনে তাঁদের নিকট গেলে আদব হল দরজার বাইরে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকা, যতক্ষণ না তাঁরা নিজেরাই বাইরে আসেন। তবে অনন্যোপায় অবস্থা হলে ভিন্ন কথা।

৬. অন্তরে তাঁদের প্রতি আজমত ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করা কর্তব্য। এতে কৃলবে নূর পয়দা হয়, ঈমানে দৃঢ়তা পয়দা হয় এবং দ্বীনের উপর মজবূতী সৃষ্টি হয়।

৭. কোন বুযুর্গ ও হক্কানী আলেমকে নিজের মুরব্বী ও মুসলেহ (এছলাহ ও সংশোধনকারী) বানিয়ে নেয়া এবং তাঁর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করা জরুরি।

৮. বুযুর্গদের সামনে কোনোভাবেই কোনো বিষয়ে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না করা উচিত। এটা বে-আদবী।

৯. উলামা ও বুযুর্গদের সমালোচনা, তাঁদের অবমাননা ও তাঁদের নিন্দা-বদনাম পরিহার করা কর্তব্য।

১০.কাউকে উলামা ও বুযুর্গদের নিন্দা-বদনাম বা অবমাননা করতে শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই নম্রভাবে তাকে বাধা দেয়া জরুরি। বাধা দেয়ার একটা ভাষা এরূপ হতে পারে যে, ভাই এটা বর্জন করুন, এতে আমরা অন্তরে কষ্ট পাই।

১১.মাসআলা-মাসায়েল বা কোনো ফতুয়া জিজ্ঞাসা করার সময় আদব-তাজীম সহকারে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। সাধারণ মানুষের পক্ষে মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার সময় মাসআলার দলীল চাওয়া অনুচিত। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্র হলে ভিন্ন কথা।

(معارف القرآن ও اصلاح انقلاب امت، آداب المعاشرت থেকে গৃহীত।)

## সাধারণ মানুষের জন্য উলামা ও মাশায়েখের করণীয়

১. মাদ্রাসায় পাঠদানের ক্ষেত্রে ইল্‌মে দ্বীনের জরুরি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া।

২. সমসাময়িক যুগে মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা তারা যেসব প্রয়োজন পূরণের কঠোর তাগিদ অনুভব করে, ওয়াজ-নছীহতের মাধ্যমে সেসব ব্যাপারে তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ধারণা দিতে হবে। (ওয়াজ-নছীহত সম্পর্কিত নীতিমালার জন্য দেখুন ৪৭৭ পৃষ্ঠা।)

৩. মৌখিকভাবে অথবা লিখিত আকারে ফতুয়া জিজ্ঞাসাকারীদেরকে জওয়াব প্রদান করা।

৪. আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে মানুষকে বিশেষভাবে মুরীদদেরকে সার্বিক বিষয়ে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা দান করা।

## ছোটদের প্রতি বড়দের করণীয়

১. ছোটদেরকে স্নেহ করা।

২. খুব বেশি নাজুক-মেজায না হওয়া উচিত এবং কথায় কথায় ছোটদেরকে ধমক-ধামক ও তিরস্কার না করা উচিৎ। ছোটদের ভুল-ত্রুটি কিছুটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেও দেখা উচিৎ। প্রাথমিক পর্যায়ে দু' একবার নম্রভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর তাতে কাজ না হলে তখন কঠোরতা গ্রহণ করলে তাতে ক্ষতি নেই।

৩. যার সম্পর্কে লক্ষণ দেখে বুঝা যায় যে, সে নির্দেশ মান্য করবে না, তাকে নির্দেশ দিয়ে সরাসরি বে-আদব প্রমাণিত না করাই ভাল। অবশ্য শরীআতের কোনো ওয়াজিব ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে ভিন্ন কথা।

৪. বিনা নির্দেশে কেউ খেদমত করতে উদ্বুদ্ধ হলেও তার সাধ্য এবং আরামের প্রতি লক্ষ রাখা চাই। তার সাধ্যের বাইরে তার থেকে হাদিয়া নেয়া ঠিক নয়। তার আরাম, নিদ্রা প্রভৃতির রেয়ায়েত করা চাই। দাওয়াত করলে সাধ্যাতীত আপ্যায়ন করতে বাধা দেয়া উচিত।



৫. কখনও ছোটদের প্রতি অতিরিক্ত রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ বা শাসন করলে পরবর্তীতে তাদের মন খুশি করে দেয়া দরকার। কিয়ামতের দিন সকলেই তো সমান হবে; কী জানা আছে তখন কে ছোট আর কে বড় হয়! কাজেই নিজের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়ে থাকলে খোলাখুলি ওজরখাহী করে নেয়া ভাল।

৬. কোনো ছোটকে এতটা নৈকট্য প্রদান করবে না বা এতটা প্রশ্রয় দিবে না কিংবা তার সুপারিশ ও তার কথায় এতটা আমল দিবে না, যাতে সে মাথায় চড়ে যায় কিংবা অন্যরা তাকেই বড়দের থেকে স্বার্থ বা কাজ হাছিলের মাধ্যম মনে করে বসে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়।

৭. ছোটদেরও বড়দেরকে হক কথা বলার অধিকার রয়েছে। কাজেই ছোটদের কেউ কোন ন্যায় কথা বললে তাকে খারাপ মনে করার অবকাশ নেই। অবশ্য আদব রক্ষা করে না বললে তার জন্য স্বতন্ত্র তম্বীহ করা যেতে পারে।

৮. ছোটদের তুচ্ছ না জানা। কেননা ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যা তার (বড়র) মধ্যে নেই।

৯. অনিয়ম বা নীতিহীন কোনো কিছু ছোটদের সাথেও করবে না।

১০.ছোটদের বে-আদবীর কারণে সরাসরি তাদের সাথে কথা বলতে খুব বেশি ক্রোধ এসে যেতে থাকলে অন্য কারও মাধ্যমে তাদেরকে যা বলার বলে দিবে।

১১.ছোট যদি অধীনস্থ হয় তাহলে তাকে শরীআত মোতাবেক গড়ে তোলা এবং চালানো বড়দের দায়িত্ব।

(آداب المعاشرت প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## ইমামের জন্য মুসল্লী/মুক্তাতাদীগণের করণীয়

১. মুসল্লী ও মুক্তাদীগণ ইমামের আদব ও সম্মান রক্ষা করবে। তাই আদব হল ইমাম নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে মুসল্লীগণও সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম যে কাতার বরাবর পৌঁছবেন সে কাতারের লোকজন দাঁড়িয়ে যাবে।

২. ইমামের মধ্যে শরীআতসম্মত দোষ না দেখা দিলে তার পিছনে নামায পড়তে নারাজি দেখাবে না।

৩. কখনও নির্দ্ধারিত সময়ে ইমাম উপস্থিত হতে না পারলে তাঁর জন্য চার পাঁচ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এর কারণে কোনো উচ্চবাচ্য বা

ইমামের নিন্দা সমালোচনা করবে না, এটাকে তাঁর মানবিক ওজর বলে গণ্য করবে।

৪. ইমাম উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর সম্মতি ব্যতীত অন্য কাউকে ইমাম বানাবে না।

৫. নামায বা কেরাতে ইমামের কোনো ভুল হয়ে গেলে তার কারণে ইমামের প্রতি ভক্তি নষ্ট করা অনুচিত। কেননা, মানুষের পক্ষে নামাযে ভুল-চুক হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

৬. ইমাম উলামা ও মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত, এ হিসাবেও তাঁর জন্য অন্যদের কিছু করণীয় রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উলামা মাশায়েখ ও বুযুর্গদের জন্য যা করনীয়, ইমামের জন্যও তা করণীয়। দেখুন ৪৫৪ পৃষ্ঠা।

(فتاوى دار العلوم □□/٢□، احسن الفتاوى □□/٣ প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## মুসল্লী/মুক্তাদীদের জন্য ইমামের করণীয়

১. ইমাম সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা না করে নামায শুরু করবেন না, যেহেতু তিনি মুক্তাদীদের জন্য সুপারিশকারী। অতএব সর্বাগ্রে তাকে পরিষ্কার হতে হবে।

২. সালাম ফিরানোর পর ইমাম যখন দুআ করবেন, তখন শুধু নিজের জন্য নয় বরং সকলের জন্য দুআ করবেন; অন্যথায় তাদের প্রতি খেয়ানত হয়ে যাবে।

৩. নির্ধারিত সময়ে নামায পড়ানো ইমামের দায়িত্ব। তবে মানবিক জরুরত বশত মাঝে মধ্যে দুই চার মিনিট বিলম্ব হলে তা অন্যায় নয়।

৪. জামাআতের নির্ধারিত সময় হয়ে যাওয়ার পর কারও আগমনের অপেক্ষায় এতখানি বিলম্ব করা যাবে না, যাতে উপস্থিত মুসল্লীদের কষ্ট হয়। তবে এমন কোন লোক যদি হয় যার জন্য অপেক্ষা না করলে উৎপাত ও ফ্যাসাদ ঘটবে, তাহলে ভিন্ন কথা।

৫. ইমাম মুসল্লীদের সন্তুষ্টি ব্যতীত নামায এতখানি লম্বা করবেন না, যাতে তাদের কষ্ট হয়। এ জন্যই মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ রাখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে তিনি সুন্নাত পরিমাণ কেরাতের চেয়ে কেরাত লম্বা করবেন না। আবার সুন্নাত পরিমাণের চেয়ে কম পড়াও মাকরূহ। ইমাম রুকূ সাজদায় তাসবীহ এভাবে পড়বেন যেন মুক্তাদীগণ এতমীনানের সাথে তিনবার পড়তে পারেন। এজন্যই কারও কারও মতে ইমামের জন্য উত্তম হল রুকূ সাজদার তাসবীহ পাঁচবার পড়া।



৬. মুসল্লীদের সন্তুষ্টি ব্যতীত অস্বাভাবিকভাবে নামায পড়ানো থেকে অনুপস্থিত থাকবেন না।

৭. ইমামের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শরীআতসম্মত কোনো দোষ থাকার কারণে তার পিছনে নামায পড়তে মুসল্লীগণ অসম্মত হলে তাঁর পক্ষে তাদের ইমামত করা মাকরূহ। এরূপ অবস্থায় তিনি তাদের ইমামত করবেন না। শরীয়তসম্পর্কিত কারণ ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো পছন্দ-অপছন্দ থাকার অভিযোগ ধর্তব্যে আনা হবে না।

(تنبيه الغافلين ও فتاوى دار العلوم □□/٣، احسن الفتاوى □□/٣ থকে গৃহীত।)

**বি. দ্র.** ইমাম একজন আলেম ও মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তার উপর আরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। তার জন্য দেখুন ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

## আত্মীয়-স্বজনের সাথে করণীয়
## তথা
## আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

* আনুগত্য, খেদমত, সদ্ব্যবহার এবং আদব তাজীমের ক্ষেত্রে দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর হক পিতা-মাতার তুল্য। চাচা এবং ফুফুর হক পিতার তুল্য। ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই পিতৃতুল্য। হাদীছের বর্ণনা ও ইংঙ্গিত অনুসারে এরূপই প্রমাণিত হয়। এছাড়া ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নী প্রমুখ আত্মীয়-স্বজন, যাদের সাথে জন্মগতভাবেই আত্মীয়তা হয় সাধারণভাবে তাদের সকলের হক বা অধিকার নিম্নরূপ।

১. তাদেরকে ভালবাসা।

২. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৩. তাদের মধ্যে কারও ভরণ-পোষণের কষ্ট থাকলে সঙ্গতি অনুসারে তাদের আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করা।

৪. মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা।

৫. তাদের দ্বারা কোনো কষ্ট পেলে তা সহ্য করা।

৬. তাদের সাথে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক ছেদন না করা।

৭. সালাম, কালাম ও হাদিয়া আদান-প্রদান অব্যাহত রাখা। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো আমল করাকে বলা হয় 'ছেলায়ে-রেহ্মী' অর্থাৎ, আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। এই ছেলায়ে-রেহ্মী ওয়াজিব।

* শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা, ভগ্নীপতি, জামাই, পুত্রবধূ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান প্রমুখ যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের

কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হকও সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতীম-মিসকীনের চেয়ে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। অনেক আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গেও ছেলায়ে-রেহ্‌মী তথা আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীরই হুকুম এক পর্যায়ের।

(تعليم الدين، حقوق العباد، مفاتيح الجنان এবং মা-বাপ ও সন্তানের হক গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত।)

## প্রতিবেশীর সাথে করণীয় (প্রতিবেশীর অধিকার)

হাদীছে প্রতিবেশীর বহু অধিকার বর্ণিত হয়েছে। এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী বাড়ীর চতুর্দিক চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত। তাছাড়া শহরে বা গ্রামে বাড়ীর পার্শ্ববর্তীগণ যেমন প্রতিবেশী, তেমনি বাড়ী থেকে যার সঙ্গে একত্রে সফরে যাওয়া হয় বা বিদেশে গিয়ে একসঙ্গে সফর করা হয় এসব সফর-সঙ্গী এবং মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বা যে কোনো কর্মস্থলে একসঙ্গে যারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থাকে তারাও প্রতিবেশী, হোক সাময়িক প্রতিবেশী তবুও ততক্ষণের জন্য প্রতিবেশীর নির্দ্ধারিত অধিকার তাদের প্রাপ্য। বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ নিম্নরূপ।

১. সাহায্য সহযোগিতা চাইলে তা করা।
২. ঋণ চাইলে তা প্রদান করা।
৩. অসুস্থ হলে শুশ্রুষা করা।
৪. অভাবী হলে আর্থিকভাবে তার উপকার করা।
৫. কোনোরূপ কষ্ট পেলে (যেমন: গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি বা ছেলে-মেয়ে দ্বারা কোনো কিছু নষ্ট বা কোনো কিছুর ক্ষতি হলে) ছবর করা।
৬. প্রতিবেশীর বিবি, সন্তানাদি ও জীব-জন্তুর হেফাজত করা।
৭. প্রতিবেশীর খুশির বিষয়ে খুশি প্রকাশ করা।
৮. প্রতিবেশীর কোনো দুঃখের বিষয় হলে সমবেদনা প্রকাশ করা।
৯. বিশেষ কোন রান্না-বান্না বা ফল-ফ্রুটের ব্যবস্থা হলে প্রতিবেশীকেও তা থেকে কিছু হাদিয়া দেয়া। সম্ভব না হলে গোপনে সেগুলো বাড়ির মধ্যে ঢুকানো এবং নিজের সন্তানেরা যেন তা নিয়ে বাইরে না আসে, যাতে প্রতিবেশীর সন্তানাদি তা দেখে মনক্ষুণ্ন না হয়।
১০. মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশ নেয়া।



১১. প্রতিবেশীর সাথে সমঝোতা ব্যতীত উঁচু দেয়াল বা ইমারত বানিয়ে প্রতিবেশীর বাতাস বন্ধ করে না দেয়া।
১২. প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত প্রতিবেশীর বাড়ির আশ-পাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলে প্রতিবেশীকে দুর্গন্ধের কষ্ট না দেয়া।

(حقوق العباد ও فتح الملهم ج/١ থেকে গৃহীত।)

## সাধারণ মুসলমানের অধিকার

১. কোনো মুসলমান পীড়িত হলে তার শুশ্রুষা করা। এ প্রসংগে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫২৮ পৃষ্ঠা।
২. কোনো মুসলমানের মৃত্যু হলে তার দাফন-কাফনে শরীক হওয়া।
৩. মহব্বত করে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা (যদি দাওয়াত গ্রহণে অন্য কোনো বাধা না থাকে)। কোনো মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেয়া কর্তব্য।
৪. কোন মুসলামন হাদিয়া-তোহফা দিলে তা গ্রহণ করে তার মনস্তুষ্টি করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৯১ পৃষ্ঠা।)
৫. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জওয়াব দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৮২ পৃষ্ঠা।)
৬. কোনো মুসলমানকে দেখলে সালাম দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৬৭-৪৬৯ পৃষ্ঠা।)
৭. কোনো মুসলমান কোনো কাজে আঁটকে গেলে সকলে মিলে তার কাজ উদ্ধার করে দেয়া।
৮. মুসলমানদের বিবি এবং সন্তানাদির জীবন ও সম্মান রক্ষা করা।
৯. কোনো মুসলমান যদি কোনো বিষয়ে ন্যায্য কছম খেয়ে বসে, তাহলে তা পূর্ণ করা ও রক্ষা করার জন্য সকলে চেষ্টা করা।
১০. মজলূম মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং জালেমকে বাধা দেয়া।
১১. মুসলমানদেরকে ভালবাসা।
১২. নিজের জন্য যা ভালবাসা হয় প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে অনুরূপ কামনা করা এবং তদ্রূপ ব্যবহার করা।
১৩. কোনো কারণে কোনো মুসলমানের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তিন দিনের বেশি তা টিকিয়ে না রাখা বরং আপোষ-মীমাংসা করে ফেলা।
১৪. দুইজন মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তা মিটিয়ে দেয়া সকলের উপর ওয়াজিব।

১৫.কোনো মুসলমান কোনো সুপারিশ করলে যথাসম্ভব তা গ্রহণ করা এবং কোনো আশা করে এলে যথাসম্ভব তাকে নিরাশ বা বঞ্চিত না করা।

## অমুসলমানের হক বা অধিকার

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের অনুসারী না হলেও তারাও মানুষ এবং মানুষ হিসাবে তাদের কিছু হক বা অধিকার রয়েছে। যেমনঃ–

১. অন্যায়ভাবে কারও জানে কষ্ট না দেয়া।
২. কারও সম্পদের ক্ষতি না করা।
৩. অন্যায়ভাবে কারও মন্দ না বলা, গালি-গালাজ না করা।
৪. সমালোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা।
৫. তাদের জীবন বিপন্ন হতে দেখলে তা থেকে রক্ষা করা।
৬. অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদে সহযোগিতা করা।
৭. শরীআতের আইন অনুসারে কেউ শাস্তির উপযুক্ত হলে ন্যায্য বিচার করা।

## দুঃস্থ মানুষের জন্য করণীয়
## তথা
## দুঃস্থদের অধিকার

এতীম, মিসকীন, বিধবা, অন্ধ, পঙ্গু, আতুর, চিররোগা, ভিক্ষুক, মুসাফির প্রভৃতি দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়ী মানুষেরও অনেক অধিকার রয়েছে এবং তাদের জন্যও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। যেমনঃ–

১. তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।
২. টাকা-পয়সা বা খাদ্য পোশাক দিয়ে তাদের সাহায্য করা। তবে এমনভাবে সাহায্য করা ঠিক নয়, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায়। কেননা, ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্যই যার নিকট এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, তার পক্ষে খোরাকীর জন্য হাত পাতা জায়েয নয় এবং জেনে-শুনে এরূপ ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ। এমনিভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও সওয়াল করা হারাম। (احسن الفتاوى ۴/[illegible]) এ ছাড়া যে ব্যক্তি উপার্জন করে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার জন্য হাত পাতা নিষেধ এবং এরূপ হাত পাতা ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ।
৩. তারা কাজ করতে অক্ষম হলে তাদের কাজ করে দেয়া।
৪. কথা দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাদের সাথে ভাল কথা বলা।



৫. যথাসাধ্য তাদের আকাংখা ও আবদার রক্ষা করা।
৬. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, নম্র ব্যবহার করা এবং রূঢ় ব্যবহার না করা।

**বি. দ্র.** সরকারেরও দায়িত্ব দুঃস্থ মানুষের ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

## শ্রমিকের প্রতি মালিকের করণীয়
## তথা
## শ্রমিকের অধিকার

১. **শ্রমিকের যুক্তি সংগত মজুরী নির্ধারণ করাঃ** এই মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদীদের যে নীতি– অর্থাৎ, চাহিদা বেশি হলে মজুরি বেশি হবে কিন্তু চাহিদার তুলনায় শ্রমিক বেশি পাওয়া গেলে মজুরি কমে যাবে, কিংবা সমাজতন্ত্রের যে নীতি– অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই দক্ষতা অনুযায়ী তার থেকে কাজ নেয়া হবে কিন্তু মজুরি দেয়ার সময় শুধু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে তাকে মজুরি দেয়া হবে, তার দক্ষতার মূল্যায়ন করা হবে না– এর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইসলামী নীতিতে এমন মজুরি দিতে হবে, যা দ্বারা পরিবেশ, চাহিদা ও জীবন যাত্রার স্বাভাবিক মান অনুযায়ী শ্রমিকের প্রয়োজন পূর্ণ হয়, সেই সাথে সাথে শ্রমিকের দক্ষতার মূল্যায়নও করতে হবে।
২. **দ্রুত মজুরি পরিশোধ করাঃ** ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। তবে অগ্রিম বা অন্য কোনো রকম শর্ত থাকলে সে শর্তানুসারেই কাজ হবে।
৩. **কাজের সময় নির্ধারিত থাকতে হবেঃ** মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা শ্রমিকদের দ্বারা খেয়াল খুশিমত কাজ করিয়ে নিতে পারবে না।
৪. **কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবেঃ** যে কাজের জন্য কোন শ্রমিককে নিয়োগ করা হবে, তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে না। করতে হলে তার সম্মতি পূর্বশর্ত।
৫. অধিকতর সুবিধার জন্য অন্য স্থানে চলে যাওয়ার অধিকার থাকবে শ্রমিকের এবং শ্রম সম্পর্কীয় চুক্তি বিশেষ অসুবিধার কারণে সে বাতিল করতে পারবে।
৬. শ্রমিককে এমন স্থানে রাখা যাবে না, যাতে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। মালিককে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৭. শ্রমিকের শিক্ষা-দীক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। তবে এর দায়িত্ব মালিকের নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা সাধারণত অবৈতনিক এবং রাষ্ট্রই তার সকল ব্যয়ভার বহন করবে।

৮. ক্ষতির বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে চাপানো যাবে না। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় উৎপাদনের ঘাটতির কারণে সে শ্রমিকের সম্মতি ব্যতীত তার মজুরিতে কোনো প্রকার কমতি করা যাবে না।

৯. শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা থাকতে হবে। কোনো কারণে তার চাকরি চলে গেলে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে কি না তা দেখে ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ইসলাম প্রশাসকদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার রাখে।

১০.ইসলামী সরকার বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ নিঃসহায় প্রভৃতি দুঃস্থ শ্রেণীর লোকদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। এভাবে ইসলামে শ্রমিকদের বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

(حقوق العباد ইসলামী ফিকাহ ও ইসলামে শ্রমিকের অধিকার গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত।)

## মালিকের জন্য শ্রমিকের করণীয়
## তথা
## মালিকের অধিকার

১. শ্রমিক নির্ধারিত পূর্ণ সময় আমানতদারীর সাথে শ্রমে নিয়োগ করবে। অন্যথায় যতটুকু সময় সে ফাঁকি দিবে সেই পরিমাণ মজুরি গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না।

২. দক্ষতার সাথে কাজ আঞ্জাম দিবে।

৩. কাজের এবং উৎপাদনের পরিবেশ বজায় রাখবে।

৪. ধর্মঘট করবে না।

৫. মালিক বা নিয়োগকারী মারাত্মক অসুবিধায় পড়লে সে শ্রমিকের সঙ্গে কৃত চুক্তি বা অঙ্গীকার বাতিল করতে পারে; এটা শ্রমিককে মেনে নিতে হবে। অবশ্য সেটা ন্যায় ভিত্তিক হচ্ছে কি না তা বিচারের জন্য প্রয়োজন বোধে শ্রমিক আইন ও প্রশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

(حقوق العباد ইসলামী ফিকাহ ও ইসলামে শ্রমিকের অধিকার গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত।)



## পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর হক বা অধিকার

১. অযথা কোনো পশু-পাখিকে কষ্ট দেয়া অন্যায়। যেমন− বাসা থেকে শাবকদের ধরে নিয়ে এসে তাদের মা-বাপকে কষ্ট দেয়া। এটা নিষ্ঠুরতার শামিল।

২. যেসব পশু-পাখি দ্বারা মানুষের কোনো কাজ হয় না, তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখে তাদের জন্মগত স্বাধীনতাকে নষ্ট করা বৈধ নয়।

৩. যেসব পশু-পাখি খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদেরকে শুধু মনের আনন্দের জন্য বা হাতের নিশানা ঠিক করার জন্য বধ করা নিষেধ।

৪. গৃহপালিত পশু-পাখীদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে রাখা কর্তব্য−পানাহার ও থাকায় কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

৫. যেসব পশুর দ্বারা কাজ নেয়া হয়, তাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ তাদের দ্বারা না নেয়া।

৬. নিষ্ঠুরভাবে জীব-জন্তুকে প্রহার না করা। জীব-জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নয় বরং আল্লাহ্‌র মাখলূক হিসাবে তাদের প্রতিও ভালবাসা থাকা চাই।

৭. যেসব জীব-জন্তু খাওয়ার জন্য জবেহ করা হয় বা মানুষের কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে বধ করে ফেলা হয়, তাদেরকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা কাজ সম্পন্ন করা উচিত। ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা কষ্ট দেয়া নিষেধ।

৮. জীব-জন্তুকেও গালি-গালাজ করা নিষেধ।

৯. নাপাক খাদ্য-খাবার জীব-জন্তুকে খাওয়ানো নিষেধ। (نفع المفتي والسائل)

## চাকর-নওকরদের সাথে করণীয়

১. নিজেরা যা খাবে চাকর-নওকরকে অনুরূপ খাওয়াবে।

২. নিজেরা যা পরিধান করবে চাকর-নওকরকে সেরূপ পোশাক দিবে।

৩. তাদের দ্বারা সাধ্যাতীত কাজ নিবে না।

৪. কোন কাজ তাদের কষ্টসাধ্য হলে ঐ কাজে তাদের সহায়তা করবে।

৫. তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে অর্থাৎ, কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবে না।

৬. তারা রোগাক্রান্ত হলে বা কোনো কষ্টে পড়লে তাদেরকে সমবেদনা জানাবে।

৭. তাদেরকে দ্বীন ও শরীআত মোতাবেক চালাতে হবে। কেননা অধীনস্থকে দ্বীনের উপর চালানো কর্তব্য।

বি. দ্র. শ্রমিকদের অধিকার অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোর অনেকটা চাকর নওকরদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

## ব্যবসায়ী/বিক্রেতার করণীয় তথা ক্রেতার অধিকার

১. মাপ, ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যায় ইনসাফ রক্ষা করা অর্থাৎ, যতটুকু ক্রেতার প্রাপ্য অন্তত ততটুকু অবশ্যই দিয়ে দেয়া– তার চেয়ে কম না দেয়া বরং তার চেয়ে একটু বেশি দিয়ে দেয়া উত্তম।
২. প্রতারণা না করা; যেমন: ভেজাল ও নকল মালকে আসল বলে, নিম্নমানের মালকে উন্নতমানের বলে কিংবা ভাল মালের সঙ্গে খারাপটাকে মিশ্রিত করে দিয়ে বা যেকোনোভাবে যেকোনো রকমে ক্রেতাকে প্রতারিত না করা।
৩. দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি থাকলে ক্রেতাকে সে সম্পর্কে অবহিত করা। ক্রেতাকে বুঝতে না দিয়ে মাল চালিয়ে না দেয়া। যেমন: অন্ধকারে খারাপ মাল বিক্রি করা হল বা ছেঁড়া-ফাটা ও ত্রুটিপূর্ণ অংশ ভাঁজের মধ্যে বা তলে রেখে চালিয়ে দেয়া হল ইত্যাদি। এগুলো প্রতারণার শামিল এবং অন্যায়।
৪. দ্রব্যের অতিরঞ্জিত বা অবাস্তব প্রশংসা না করা।
৫. প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত না করা। অবশ্য কারও গুদামজাত করণের ফলে যদি শহরে/দেশে দ্রব্যমূল্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে, তার গুদামজাত করণ দেশে/শহরে দুর্ভিক্ষের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার গুদামজাত করণে কোন পাপ হবে না।
৬. অঙ্গীকার রক্ষা করা।
৭. বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য না নেয়া, যদিও ক্রেতা সম্মত হলে যে কোনো মূল্যে তার নিকট দ্রব্য বিক্রি করা যায়। কিন্তু ক্রেতা অজ্ঞ বা সে ঠেকায় পড়েছে, যেকোনো মূল্যে সে নিতে বাধ্য– এরূপ অবস্থায় বিক্রেতার নৈতিক কর্তব্য হল স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত না নেয়া।

## ক্রেতার করণীয় তথা ব্যবসায়ী/বিক্রেতার অধিকার

১. ত্রুটিপূর্ণ বা অচল মুদ্রা না দেয়া। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, একটা অচল টাকা চালানো চল্লিশ টাকা চুরি করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ।
২. দ্রব্য পাওয়ার পর নগদে ক্রয় হয়ে থাকলে সাথে সাথে বা বাকিতে ক্রয় করে থাকলে নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করা। কোনোরূপ টাল-বাহানা বা গড়িমসি না করা।
৩. বাকিতে ক্রয় করলে মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারিত করা জরুরি।



৪. দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা নিয়ে বা দ্রব্যের অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিক্রেতার সঙ্গে অহেতুক কথা বাড়াবাড়ি না করা।
৫. ঠেকা ও অনন্যোপায় অবস্থায় পেয়ে কোন ব্যবসায়ী/বিক্রেতাকে তার দ্রব্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে কম না দেয়া। নৈতিকভাবে এটা অন্যায়।
৬. মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর তার চেয়ে কম না দেয়া।

## আদব, শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

## সাক্ষাত ও মুলাকাতের সুন্নাত এবং আদবসমূহ

### সাক্ষাৎ প্রার্থীর করণীয়

* কারও নিকট সাক্ষাতের জন্য এমন সময় যাবে না, যখন গেলে তার ঘুম, ওজীফা কিংবা বিশেষ কোন কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

* কারও কাছে পূর্বে ইত্তে'লা (Information) দেয়া ব্যতীত নাস্তা বা খাওয়ার ওয়াক্তে যাবে না। গেলে খেয়ে যাবে এবং গিয়েই সে খেয়ে এসেছে– একথা জানিয়ে দিবে। এ সম্পর্কে "মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ" শীর্ষক পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা নং ৪৮৯ দেখুন।

* অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি চাওয়ার তরীকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫১০ পৃষ্ঠা।

* অনুমতি না হলে বা বিশেষ কোন কাজে তিনি লিপ্ত রয়েছেন, ফলে এ মুহূর্তে সাক্ষাৎ প্রদান করতে গেলে তার কষ্ট বা ক্ষতি হবে– এরূপ অবস্থা হলে চলে আসা বাঞ্ছনীয় কিংবা এমন স্থানে বসে তার অপেক্ষা করতে থাকবে যেন তিনি জানতে না পারেন। অতঃপর স্বাধীনভাবে যখন তিনি কাজ থেকে ফারেগ হবেন, তখন সাক্ষাৎ, প্রার্থনা করবে। এমন স্থানে অপেক্ষায় থাকবে না যেন তিনি বুঝতে পারেন এবং ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাৎ প্রদান করতে না পেরে বা সময় দিতে না পেরে লজ্জিত হন।

* দেখা হওয়ার পর সালাম দিবে। (সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৬৭–৪৬৯ পৃষ্ঠা।) আর মুসাফাহা ও মুআনাকার জন্য অগ্রসর হওয়া অপর পক্ষের কাজ, সে স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হলে বা কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকলে মুসাফাহা মুআনাকা করতে গিয়ে তাকে বিব্রত করবে না বা তার ব্যাঘাত ঘটাবে না। (مسائل و آداب ملاقات)

* যদি তার সঙ্গে পরিচয় অনেক পুরাতন হয় কিংবা এত হালকা পরিচয় হয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে নিজের পরিচয়

বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? ... ইত্যাদি।

* দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার এত কথা শোনার সময় হবে কি না তা জেনে নিতে হবে। তার ইচ্ছার বাইরে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে বা দীর্ঘ কথা বলে তাকে বিব্রত করবে না।

* মুরব্বী ও গুরুজনদের নিকট সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে যদি তাদের সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারিত থাকে তাহলে সেই নির্ধারিত সময়ে যাবে। অন্য সময়ে যাবে না। যেতে হলে অনুমতি নিয়ে যাবে।

* সাক্ষাৎ হওয়ার পর মজলিসের সুন্নাত, আদব ও কথা বলার সুন্নাত, আদব–এর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। এর জন্য দেখুন ৪৭৩–৪৭৭ পৃষ্ঠা।

### যার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা হয় তার কর্তব্য

* কোন বিশেষ ওজর বা একান্ত অসুবিধা না থাকলে সাক্ষাৎ প্রদান করতে গড়িমসি না করা।

* বিশেষ সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে পরিপাটি হয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ প্রদান করা উত্তম। (شرعة الإسلام)

* সাক্ষাৎপ্রার্থীর জন্য বসা বা স্থান গ্রহণের জায়গা করে দিবে বা মজলিসে স্থান না থাকলে অন্তত একটু নড়ে চড়ে বসে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে, এতে সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রীত হবে। অন্যথায় সে মনে করবে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে।

* সাক্ষাৎপ্রার্থী অপরিচিত হলে তার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে তার দ্বিধা সংকোচকে দূর করবে।

### টেলিফোন/মোবাইলে কথা বলার সুন্নাত ও আদবসমূহ

সাক্ষাৎ মুলাকাতের সুন্নাত ও আদবসমূহে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, কারও সাথে টেলিফোন বা মোবাইলে যোগাযোগ ও কথা-বার্তার ক্ষেত্রেও সেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ–

১. এমন সময় কারও কাছে টেলিফোন/মোবাইল করবে না যখন তার ঘুম, ওজীফা কিংবা বিশেষ কোন কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

২. টেলিফোন/মোবাইল করার সময় নির্ধারিত থাকলে তখনই করবে।

৩. টেলিফোন/ মোবাইল রিসিভ করার পর প্রথমেই সালাম দিতে হবে। সালাম যেকোনো কথা বলার পূর্বেই হওয়া নিয়ম।

৪. তার সাথে পরিচয় না থাকলে কিংবা আওয়াজে সে টের না পেলে বা অনেক পুরাতন বা এত হালকা পরিচয় যে, তার ভুলে যাওয়ার



সম্ভাবনা– এরূপ ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? দেখেন তো চিনতে পারেন কি না. ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫. দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার এত কথা শোনার সময় আছে কি না জেনে নিতে হবে। তার সম্মতির বাইরে দীর্ঘ কথা বলে তাকে বিব্রত করবে না।

৬. কথা বলার সময় কথা বলার সুন্নাত ও আদবসমূহের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৭৫ পৃষ্ঠা।)

### মোবাইল সেট সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

* জেনেশুনে ছিনতাইকৃত বা চোরাই সেট ক্রয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় পাপ কাজে সহযোগিতার জন্য দায়ী হতে হবে।

* মোবাইল ফোনের স্কিনে কোনো মানুষ বা প্রাণীর ছবি সেভ করা থেকে বিরত থাকবে।

* মোবাইল ফোনের রিংটোনে কোনো গান-বাদ্য সেট করবে না, তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে গান-বাদ্য শোনা হয়ে যাবে, এর জন্য অবশ্যই পাপ হবে।

* মোবাইল ফোনের রিংটোনে কালিমা, আল্লাহর নাম বা কুরআনের তিলাওয়াত সেট করবে না, তাহলে বাথরুম বা নাপাক স্থানে এগুলো উচ্চারিত হতে পারে, যা নিষিদ্ধ।

* ওয়েলকাম টিউনে গান-বাদ্য লোড করা থেকে বিরত থাকা চাই। এরূপ করলে অন্যকে গান-বাদ্য শোনানোর পাপ হবে।

* ওয়েলকাম টিউনে কালিমা বা কুরআন তিলাওয়াত ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, কল রিসিভ করার সময় এমন স্থানে কালিমা বা আয়াত থেমে যেতে পারে যাতে অর্থের বিকৃতি ঘটবে। এর জন্য ডাউনলোডকারী দায়ী হবে।

* মসজিদে থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোন বন্ধ বা সাইলেন্ট রাখতে হবে। যাতে নামাযে ব্যাঘাত ঘটানোর কারণ হতে না পারে। ভাইব্রেশন করে রাখবে না, তাতে অন্য নামাযীর বা অন্তত নিজের নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হবে।

* মোবাইল ফোনের অন/অফ টোন সর্বদা সাইলেন্ট রাখা চাই, যাতে মসজিদে গিয়ে বা অন্য কোথাও বন্ধ করতে হলেও বাদ্য বেজে না ওঠে।

* ভুলবশত নামাযের সময় মোবাইল ফোন খোলা থাকলে এবং নামাযের মধ্যে রিং বেজে উঠলে এক হাত পকেটে প্রবেশ করিয়ে এক হাত

দিয়েই রিং বন্ধ করে দিতে হবে। মোবাইল ফোন কে করেছে তা দেখবে না বা দুই হাত ব্যবহার করা যাবে না। দুই হাত ব্যবহার করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

## সালামের সুন্নাত ও আদবসমূহ

### সালাম প্রদান সংক্রান্ত

* আগে সালাম দিবে। এটাই উত্তম, কেননা যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে যে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে।

* পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন সকলকেই সালাম করবে।

* সওয়ারী ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে, চলনেওয়ালা বসা বা দাঁড়ানো ব্যক্তিকে, আগন্তুক অবস্থানকারীকে, কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যকদেরকে এবং কম বয়সী অধিক বয়সীকে আগে সালাম করা উত্তম। জামাআতের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে।

* সালামের সময় হাত দিয়ে ইশারা করবে না বা হাত কপালে ঠেকাবে না কিংবা মাথা ঝুঁকাবে না। তবে দূরবর্তী লোককে সালাম করলে –যার পর্যন্ত আওয়াজ না পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে, সেরূপ ক্ষেত্রে– শুধু বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইশারা করা যে পারে। (اسلامی تہذیب)

* পিতা-মাতা বা গুরুজন ও বড়কে সালাম করার সময় আওয়াজ এবং ভাব-ভঙ্গির মধ্যে আদব ও সম্মান ফুটে ওঠা উচিৎ। এমনিভাবে ছোট ও স্নেহভাজনকে সালামের ক্ষেত্রে স্নেহ ব্যক্ত হওয়া সংগত। (اسلامی تہذیب)

* অমুসলিমকে সালাম করবে না। তবে বিশেষ স্বার্থে বা তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষার প্রয়োজনে একান্ত কিছু বলে যদি তাকে অভিবাদন জানাতেই হয়, তাহলে 'গুডমর্নিং', 'গুডইভিনিং' বা 'শুভ-সকাল' 'শুভ সন্ধা' ইত্যাদি কিছু বলে অভিবাদন করা যায়। (كتاب الاذكار)

* কোন মজলিসে মুসলিম অমুসলিম উভয় প্রকারের লোক থাকলে মুসলমানদের নিয়তে সালাম দিবে কিংবা নিম্নরূপ বাক্যেও সালাম দেয়া যায়।

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى.

অর্থ: যারা হেদায়েত তথা ইসলামের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি সালাম।

* নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ (মাকরূহ) এরূপ ব্যক্তিদেরকে সালাম প্রদানকারী সালামের উত্তর পাওয়ার হকদার হয় না।



ক. কোন পাপ কাজে রত ব্যক্তিকে; যেমনঃ জুয়া বা দাবা খেলায় রত ব্যক্তিকে।
খ. পেশাব-পায়খানায় রত লোককে।
গ. পানাহারে রত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ, তার মুখে খাদ্য/পানীয় থাকা অবস্থায়)।
ঘ. ইবাদত যেমনঃ নামায, তিলাওয়াত, আযান ও ইকামত প্রদানে এবং দ্বীনী কিতাব আলোচনায় রত ব্যক্তি বা যিকির ওজীফায় রতদেরকে।
ঙ. কোন মজলিসে বিশেষ কথা-বার্তা বলার মুহূর্তে কথা-বার্তায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও সালাম করা উচিত নয়।
চ. গায়র মাহরাম নারী-পুরুষের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে ফেতনার আশংকা থাকে সেখানে সালাম আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। (كتاب الأذكار)

* কোনো খালি ঘরে প্রবেশ করলে সেখানেও সালাম দিবে। তবে নিম্নোক্ত বাক্যে السلام عليكم يا أهل البيت[১] অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ[২]

* ছাত্রদেরকে কুরআন বা দ্বীনী কিতাব তা'লীম দানে রত উস্তাদকে কেউ সালাম করলে তিনি জওয়াব দেয়া না দেয়া উভয়টার অবকাশ রাখেন। (شامى)

### সালামের জওয়াব প্রদান সংক্রান্ত

* সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। জামাআতের মধ্য থেকে একজন জওয়াব দিলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

* সালামের জওয়াব শুনিয়ে দেয়া জরুরি। (যদি সালামদাতা নিকটে থাকেন) আর যদি সালামদাতা দূরে থাকেন, তাহলে মুখে জওয়াব দেয়ার সাথে সাথে ইশারা দ্বারাও তাকে অবহিত করবে, বিনা প্রয়োজনে ইশারা করবে না, মাথা ঝুঁকাবে না।

* সালামদাতা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলাইকুম) বললে তার জওয়াবে "ওয়া লাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলা উত্তম। বরং "ওয়া বারাকাতুহ" বৃদ্ধি করে দিলে আরও উত্তম। আর সালামদাতা ওয়া রহমাতুল্লাহ্ সহ সালাম দিলে তার জওয়াবে ওয়া বারাকাতুহু বৃদ্ধি করে দেয়া উত্তম।

* আওয়াজ ও ভাব-ভঙ্গির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

* কেউ অন্য কারও সালাম পৌঁছালে তার জওয়াবে বলবে,

১. অর্থ: হে গৃহবাসী, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
২. অর্থ: সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর।

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ অথবা وَعَلَيْكُمْ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

* চিঠি-পত্রের সালাম ও তার জওয়াব প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৭২ পৃষ্ঠা।

* কোনো অমুসলিম আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে তার জওয়াবে শুধু বলবে, "ওয়া আলাইকুম" অথবা শুধু ইশারা করে দিলেও যথেষ্ট।

* একই সঙ্গে দুই জন একে অপরকে সালাম দিলে প্রত্যেককেই আবার জওয়াব দিতে হবে। তবে আগে পরে হলে আগেরটা সালাম এবং পরেরটা জওয়াব বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় কাউকেই আর জওয়াব দিতে হবে না। (رد المحتار، كتاب الأذكار، معارف القرآن، اسلامی تہذیب، شرعة الإسلام গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত।)

## মুসাফাহার সুন্নাত ও আদবসমূহ

* মুসাফাহা করা সুন্নাত। সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করতে হয়। বিদায়ের সময়ও মুসাফাহা হতে পারে।

* উভয় হাত যোগে মুসাফাহা করা সুন্নাত। (البخاري : كتاب الاستيذان– باب المصافحة وباب الأخذ باليدين) অনন্যোপায় অবস্থায় ব্যতীত এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ এবং তাকাব্বুর তথা অহংকারের আলামত।

* মুক্ত হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত অর্থাৎ, মুসাফাহার সময় হাতের মাঝে কাপড় প্রভৃতির অন্তরায় থাকতে পারবে না।

* মুসাফাহার মধ্যে হাদিয়ার টাকা হাতে গুঁজে দেয়া পছন্দনীয় নয়।

* মুসাফাহার পর নিজের হাতে চুমু দেয়া বা নিজের হাত বুকের উপর ফিরানো সুন্নাতের খেলাফ ও বিদআত।

* কারও সঙ্গে এমন সময় মুসাফাহার জন্য হাত বাড়াবে না, যখন তার কোনো ব্যস্ততা বা লিপ্ততার কারণে মুসাফাহার জন্য হাত অবসর করতে সে বিব্রতবোধ করতে পারে।

* কোনো মজলিসে যেয়ে সকলের সঙ্গে একাধারে মুসাফাহা করতে গিয়ে মজলিসের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটানো অনুচিত। এরূপ ক্ষেত্রে একজনের সাথে বা যার উদ্দেশ্যে সে গিয়েছে তার সাথে মুসাফাহা করার উপরই ক্ষান্ত করবে।

* মুসাফাহা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া অনুচিত; কেননা মুসাফাহা করা সুন্নাত আর কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম। সুন্নাত আদায় করতে যেয়ে হারাম করার অনুমতি নেই।



* মুসাফাহা হল সালামের পরিপূরক, অতএব যেসব লিপ্ততার সময় সালাম থেকে বিরত থাকার নিয়ম, মুসাফাহার ক্ষেত্রেও সে নিয়ম প্রযোজ্য। (ماخوذ از اسلامی تہذیب، تعلیم الدین، جواہر الفقہ و از آداب المعاشرت نقلا عن البحر والفتاوى الهندية الشامى)

## মুআনাকার মাসায়েল

* বড়দের প্রতি আজমত এবং ছোটদের প্রতি শফকত ও মহব্বতের সাথে মুআনাকা অর্থাৎ, গলাগলি বা কোলাকুলি করা যেতে পারে, এটা জায়েয বরং সুন্নাত।

* সাধারণভাবে তিন ক্ষেত্রে মুআনাকা করা জায়েয নয় (১) যেখানে নিজের মধ্যে শাহওয়াত থাকে কিংবা নিজের মধ্যে বা অপর পক্ষের মধ্যে শাহওয়াত এসে যাওয়ার আশংকা থাকে (তবে বিবির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা)। (২) মুআনাকা করতে গেলে যদি কাউকে কষ্ট দেয়া হয়। (৩) ঈদের দিন মুআনাকা করা। এটা বিদআত।

* মুআনাকাকারী উভয়ে প্রথমে ডান গলা মিলাবে।

* মুআনাকা শুধু এক দিকেই (প্রথমে প্রত্যেকের ডান গলায় একবারই) যথেষ্ট, তিনবার করা জরুরি নয়। (فتاوی محمودیہ □□/٥)

* মুআনাকা করার দুআ এই– اَللّٰهُمَّ زِدْ مَحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার মহব্বত বৃদ্ধি কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাতিরে।

(ماخوذ از جواہر الفقہ □□/١ تعلیم الدین و عالمگیریۃ و غیرها)

## কারও আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া (কেয়াম করা)

কারও আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া তিন ধরনের। যথা:–

১. **সম্মানার্থে দাঁড়ানো:** কোন বুযুর্গ বা সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয। তবে তাঁর বসে পড়ার পর সকলে বসে পড়বে। তিনি বসে পড়বেন আর সকলে দাঁড়িয়ে থাকবে– হাদীছে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব সেরূপ করা নিষিদ্ধ ও হারাম।

২. **স্নেহার্থে দাঁড়ানো:** কোন স্নেহভাজন ও অন্তরঙ্গ কেউ আগমন করলে তার ভালবাসায় বা স্নেহে দাঁড়িয়ে যাওয়াও জায়েয।

৩. **আত্মরক্ষার্থে দাঁড়ানো:** আগমনকারী ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তার আগমনে না দাঁড়ালে সে রুষ্ঠ বা মনঃক্ষুণ্ন হবে বা

আগমনকারী তার উপরস্থ, ফলে এভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন না করলে উক্ত অধীনস্থের ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে অথবা তার সম্মানার্থে দাঁড়ালে সে প্রীত হয়ে হেদায়েত গ্রহণ করতে পারে– এরূপ আশা থাকলে এসব ক্ষেত্রেও দাঁড়ানো জায়েয তবে এরূপ ক্ষেত্রেও তার বসে পড়ার পর অন্যরাও বসে পড়বে।

**বি. দ্র.** হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াজু, বিনয় ও লৌকিকতা মুক্ত থাকার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সাহাবীদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। অতএব নফ্স-প্রীতির এই যুগে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর এই আদর্শ অনুসরণে তার উদ্দেশে অন্যদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করাই নিরাপদ ও পছন্দনীয় পন্থা।

(اسلامی تہذیب-এর আলোকে ও تعلیم الدین، امداد الفتاوی □□/٤- احسن الفتاوی □□/١)

## মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছী এবং হাত, কপালে চুমু দেয়া প্রসঙ্গে কদম বুছী

* কারও পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া মাকরূহ। আর যদি পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া না হয় বরং শুধু চেহারার উপর মর্দন করা হয় তাহলে কোন মুত্তাকী পরহেযগার ও বরকতময় ব্যক্তির পা ছুয়ে এরূপ করার অনুমতি রয়েছে, যদি এরূপ করনেওয়ালা ব্যক্তি সুন্নাতের পাবন্দ এবং সহীহ আকীদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্যথায় এরূপ করা জায়েয হবে না। (امداد الفتاوی □□/٤)

* কদম-বূছী মাঝে মধ্যে ঘটনাক্রমে জায়েয স্থানে করা যেতে পারে, তবে এটাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়। (جواہر الفقہ □□/١)

* শ্বশুর-শাশুড়ী বা গুরুজনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম না করলে বে-আদবী হয়– এটা মনগড়া ধারণা। সালাম করলে শুধু মুখে করবে।

* আজমত সম্মানের ভিত্তিতে সরাসরি মুখ দিয়ে বুযুর্গ ও আলেম ব্যক্তির পায়ে চুমু দেয়ার অবকাশও রয়েছে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাথা ঝুঁকানো জায়েয নয় এবং এটা নিয়ম বানানোর মত বিষয়ও নয়। (তাই রছম প্রীতির এই যুগে এ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।) তাছাড়া এরূপ চুমু গ্রহণে তাকাব্বুর (অহংকার) প্রকাশ পায় বিধায় ফোকাহায়ে কেরাম আলেম ও বুযুর্গদেরকে এরূপ চুমু (কদম-বূছী) অর্জন করার জন্য পা বাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। (جواہر الفقہ □□/١)



## হাতে চুমু দেয়া

* কোন আলেমের হাতে তাঁর ইল্‌মের খাতিরে কিংবা কোন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর হাতে তার ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে যদি চুমু দেয়া হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। এ ছাড়া অন্য কারও হাতে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সাক্ষাতের সময় যে চুমু খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, শরীআতে তার অনুমতি নেই। (عين الهداية نقلا عن الغياثية والعالمغيرية) তবে কারও পক্ষেই এরূপ খাহেশ রাখা পছন্দনীয় নয় যে, অন্য কেউ তার হাতে চুমু দিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করুক। (احسن الفتاوی □□/١)

* কদম-বূছীর ন্যায় হাতে চুমু দেয়াকেও নিয়ম বানানো ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে ঘটনাক্রমে করা যেতে পারে। (جواہر الفقہ □□/١)

## চেহারা, কপালে ও মাথায় চুমু দেয়া

* কোন আলেম, বুযুর্গ ও পরহেযগার ব্যক্তিকে সম্মান ও আজমত স্বরূপ তাঁর চেহারা, কপাল ও মাথায় চুমু দেয়া জায়েয আর খাহেশাত বা প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ করা হলে তা জায়েয নয়।

(عين الهداية نقلا عن القاضيخان والعالمغيرية)

* সাক্ষাৎ বা বিদায়ের সময় যদি কেউ কারও গালে বা মুখে চুমু খায় বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে অপরকে যে চুমু দেয় তা সর্বাবস্থায় জায়েয।

## চিঠি-পত্রের সুন্নাত ও আদবসমূহ

* চিঠি-পত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয়ের নাম/পরিচয় উল্লেখ থাকা সুন্নাত। (مرقاة ج/٨)

* বিসমিল্লাহ দিয়ে চিঠি-পত্র শুরু করা সুন্নাত।

* চিঠি-পত্রে আসসালামু আলাইকুম ... না লিখে শুধু যদি লেখা হয় "সালাম মাসনূন" কিংবা "সালাম বাদ" তাহলে তা শরীআতসম্মত সালাম বলে গণ্য হবে না এবং তার জওয়াব দেয়াও ওয়াজিব হবে না। (اسلامی تہذیب)

* পত্রের সালামেরও জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। এই জওয়াব পত্রের মাধ্যমে লিখিতভাবেও হতে পারে কিংবা মুখেও হতে পারে। জবাবী পত্রে "ওয়াআলাইকুমুস সালাম ... লিখলেও জওয়াব হবে, আবার আসসালামু আলাইকুম ... লিখলেও জওয়াব হয়ে যাবে। (شامی و اسلامی تہذیب)

* বিসমিল্লাহ, সালাম ও ভূমিকার পর أما بعد লেখা অর্থাৎ, পর সংবাদ বা অতঃপর কথা হল– এ জাতীয় কোন শব্দ লেখা মোস্তাহাব। (مرقاة ج/٨)

* প্রেরক তার পূর্ণ ঠিকানা লিখবে, কেননা প্রাপক তার ঠিকানা ভুলে যেতে পারে বা ঠিকানা লেখা কাগজ খুঁজতে তার পেরেশানী হতে পারে।

* নিজের প্রয়োজনে পত্রের উত্তর পাওয়ার দরকার থাকলে ফেরত খাম পাঠিয়ে দেয়া আদব। অনেক সময় খামের মূল্যের জন্য নয় বরং খাম যোগাড়েই পেরেশানী হয়।

* পত্রের ভাষা প্রাপকের জানা ভাষায় হওয়া চাই।

* পত্রের লেখা পরিষ্কার অক্ষরে হওয়া চাই। অন্যথায় প্রাপকের পাঠ উদ্ধার করতে গিয়ে কষ্ট হবে এবং এ কষ্ট দেয়ার জন্য পত্র লেখকই দায়ী হবে।

* পত্রের সম্বোধনগুলোর মধ্যে ভারসাম্য থাকা চাই।

* বিয়ারিং পত্র লেখা অনুচিত।

* মুরব্বীদের নিকট একনলেজমেন্ট পত্র প্রেরণ করা বে-আদবী, এতে তার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করা হয় এই মর্মে যে, তিনি হয়ত এই প্রমাণ না থাকলে ভবিষ্যতে পত্র-প্রাপ্তির বিষয় অস্বীকার করতে পারেন।

* কারও আঁটকানো পত্র প্রাপক ব্যতীত বা তার অনুমতি ব্যতীত অন্যের জন্য দেখা জায়েয নয়, যদি তাতে প্রেরক/প্রাপকের গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার বা প্রেরক কিংবা প্রাপকের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে কিংবা অহেতুকই পত্র খুলে দেখা হয়। এরূপ কারণ না থাকলে সেখানে দেখা অনুমতি আছে; যেমনঃ পিতা-মাতা, উস্তাদ, মুরব্বীগণ অনেক সময় ছেলে/মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী বা অধীনস্থের নেগরানীর জন্য করতে পারেন।

## মজলিসের সুন্নাত ও আদবসমূহ

* কোন পাপের মজলিস হলে সেখানে যাবে না। অনন্যোপায় অবস্থায় গেলে কিংবা যাওয়ার পর জানলে বা যাওয়ার পর পাপ কাজ শুরু হলে চলে আসবে। সম্ভব না হলে মনে মনে যিকির আযকারে লিপ্ত হবে– উক্ত পাপ কাজে বা কথায় মনোযোগ দিবে না। এ নিয়ম ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন পাপ কথা বা কাজ খাস ঐ মজলিসে হয়। আর যদি পাপ কাজ খাস ঐ মজলিসে না হয়– দূরে হয়, তবুও অনুসরণীয় ব্যক্তির পক্ষে সেখান থেকে চলে আসা উত্তম।

* উত্তম পোশাক পরিধান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে মজলিসে গমন করা উত্তম।



* মজলিসে পৌঁছে সালাম করবে, যদি মজলিসের লোকেরা দ্বীনী তা'লীম ও যিকির তিলাওয়াতে লিপ্ত না থাকেন কিংবা এমন কথা ও কাজে লিপ্ত না থাকেন যে সময় সালাম দিলে ব্যাঘাত ঘটবে।

* বয়স, ইল্‌ম, ও বুযুর্গীতে অগ্রসরদেরকে মজলিসে সামনে বসতে দেয়া সুন্নাত। বয়স এবং ইল্‌ম– এ দু'য়ের মধ্যে ইল্‌ম অধিক মর্যাদার হকদার। অতএব আলেম নন– এরূপ বয়সী লোকের চেয়ে কম বয়সী অথচ আলেম– তাকেই মজলিসে বসা, পথ চলা, কথা বলা সবক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

* বয়স ও ইল্‌মে কম– এরূপ লোকেরা মজলিসে বয়স বা ইল্‌মে বড়দের চেয়ে আগে বেড়ে কথা বলবে না।

* মজলিসে পৌঁছে যেখানেই স্থান হয় সেখানেই বসে যাওয়া। লোকদেরকে ঠেলে মধ্যে বা সামনে গিয়ে বসা কিংবা অপরকে তার স্থান থেকে সরিয়ে সেখানে বসা মাকরূহ। অবশ্য মজলিসের লোকেরা যদি তাকে এরূপ আগে বাড়িয়ে দেয় তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

* অনুমতি ব্যতীত দু'জন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের মাঝখানে না বসা। কেননা তাদের মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা বা কোন গোপন কথা থাকতে পারে।

* যখন মজলিসে কোন ব্যক্তি আগমন করে এবং তার বসার স্থান সংকুলান না হয়, তখন সেখানে বসা লোকদের উচিত একটু চেপে বসে জায়গা প্রশস্ত করে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য স্থান করে দেয়া।

* আগন্তুক ব্যক্তি প্রকৃত সম্মানার্হ্য ব্যক্তি হলে তার সম্মানার্থে কিংবা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে না দাঁড়ালে কোনো ক্ষতি হওয়ার বা হাজত পূর্ণ না হওয়ার আশংকা থাকে এরূপ প্রয়োজনে দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। আগন্তুক স্নেহভাজন ব্যক্তি হলেও স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো যায়।

* কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে এবং পুনরায় তার উক্ত স্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে তার স্থানে অন্য কেউ বসবে না।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের মজলিস হলে সকলে খুব মিলে-মিশে বসবে।

* মজলিস কেবলামুখী হওয়া উত্তম।

* কোন মজলিসে তিনজন লোক থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দু'জনে একান্তে কোনো কথা বলবে না, কেননা এতে তৃতীয়জন এই ভেবে মনে ব্যথা পেতে পারে যে, তাকে তাদের কথা শোনার অযোগ্য ভাবা হচ্ছে।

* মজলিসে কারও দিকে পা বাড়িয়ে বসা বে-আদবী।

* কোনো মোবারক মাহফিলে যাওয়ার জন্য গোসল করে নেয়া উত্তম।

* মশওয়ারার মজলিস হলে প্রথমে এই দুআ পড়ে নিবে–

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ أُمُوْرِنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

অর্থ: হে আল্লাহ্, আমাদের জন্য সঠিক বিষয়টি আমাদের অন্তরে উদিত করে দাও এবং নফ্সের ধোঁকা থেকে ও কুকর্ম থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

* মজলিস শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নিলে উক্ত মজলিসে সংঘটিত পাপ-ত্রুটির কাফ্ফারা হয়ে যায়।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ.

(ماخوذ از آداب المعاشرت، اسلامی تہذیب، تعلیم الدین وغیرہ)

## কথা বলার সুন্নাত, আদব ও নিয়ম-কানূন

* কথা কম বলা উত্তম।

* যা বলবে সত্য বলা ওয়াজিব, মিথ্যা বলা হারাম।[১]

* সাধারণভাবে আস্তে কথা বলাই উত্তম। তবে বড় মজলিসের প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুপাতে জোরে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে বলা ভাল নয়।

* নিজের চেয়ে অধিক বয়স এবং অধিক ইল্মসম্পন্ন লোকদেরকে কথা বলতে অগ্রাধিকার দেয়া আদব।

১. সর্বমোট চার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয এবং এক ক্ষেত্রে ওয়াজিব। যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয তা হল- (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে। (২) দু'জন বিবদমান লোকের মধ্যে ঝগড়া, শত্রুতা ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। (৩) স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। (৪) নিজের প্রকৃত হক উদ্ধারের জন্য কিংবা নিজের অথবা অপরের বড় ধরনের ক্ষতি ঠেকানোর জন্যও মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। এ নীতির অধীনেই চোর ডাকাতের কাছে নিজের টাকা-পয়সা ও মালের কথা অস্বীকার করা যায়, অন্য ভাইয়ের গুপ্ত ভেদ কেউ জানতে চাইলে তা অস্বীকার করা যায়। আর যে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব তা হল- সত্য বললে খুব মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং মিথ্যা বলা দ্বারা সে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ হলে সেরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই কোন ক্ষেত্রে সত্য বলা দ্বারা অন্যায়ভাবে নিজের বা অন্যের জীবন হানির সম্ভাবনা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হলে তা করা ওয়াজিব। (مجمع الفتاوی)



* আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে মূর্খদের ভঙ্গিতে কথা না বলা উচিত।

* বানাওটি (লৌকিকতা) করে কথা না বলা।

* কথার মধ্যে ছন্দ সৃষ্টির কসরৎ করা অন্যায়।

* তাহকীক-তদন্ত ব্যতীত কথা বলা অন্যায়। যেকোনো কথা শুনেই তাহ্কীক-তদন্ত ব্যতীত তা বর্ণনা করা মিথ্যার শামিল। তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কিছু জানলে তা তাহ্কীক ছাড়াই বলা যায়।

* ঝগড়া এবং তর্ক সৃষ্টিকারী কথা বলা অন্যায়।

* মিথ্যা কছম না খাওয়া উচিত। মিথ্যা কছম করা কবীরা গোনাহ।

* সত্য হলেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর কছম করা নিষেধ। যেমন: পিতা-মাতার কছম, কারও জীবনের কছম, কা'বার কছম ইত্যাদি।

* গীবত করা নিষেধ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার দেখুন ৬০৬ পৃষ্ঠা।

* চোগলখুরী করা নিষেধ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬০৭ পৃষ্ঠা।

* নিজের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো খবর বা প্রতিশ্রুতিমূলক কথা বললে "ইনশাআল্লাহ" বলবে।

* বড় লোদেরকে সম্মানজনক সম্বোধন পূর্বক কথা বলা আদব।

* বড়দের আদব রক্ষা করে কথা বলা আদব।

* কথার ভাষা হিসাবে আরবী ভাষাকে পছন্দ করবে।

* গালি-গালাজ করা হারাম।

* অশ্লীল কথা বলা নিষেধ। এটা গোনাহে কবীরা।

* আল্লাহ্র কোনো সৃষ্টিকে লা'নত করা (অভিশাপ দেয়া) পাপ।

* কাউকে লা'নত করে ফেললে তার জন্য কল্যাণের দুআ সম্বলিত নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَهٗ قُرْبَةً وَّرَحْمَةً. (شرعة الإسلام)

অর্থ: হে আল্লাহ, এটাকে তুমি তার জন্য নৈকট্য ও রহমতের ওছীলা বানাও।

* কারও উপর অপবাদ লাগানো নিষেধ। এটা মহাপাপ।

* কাউকে কাফের, ফাসেক, মালউন, আল্লাহ্র দুশমন, বেঈমান ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা নিষেধ।

* নিজের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অভিজ্ঞতার কথা বলবে না, এতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* আত্মপ্রশংসা না করা। এটা গোনাহ।

* কোনো ফাসেক বা পাপীর প্রশংসা না করা। এটা গোনাহ।

* যার মধ্যে অহংকার দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে– এরূপ ব্যক্তির সম্মুখে তার প্রশংসা না করা।

* অতিরিক্ত ঠাট্টা-মজাক না করা। এতে প্রভাব, লজ্জা-শরম ও পরহেজগারী হ্রাস পায়।

* যে শব্দ বা যে ভাষা বাতিলপন্থীরা খারাপ উদ্দেশ্যে এবং খারাপ অর্থে ব্যবহার করে থাকে সেটা পরিহার করা কর্তব্য।

* যে শব্দটা ভাল-মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এরূপ শব্দকে ভাল অর্থেও ব্যবহার না করা উচিত।

* চিন্তা করে কথা বলবে।

* কথা এত সংক্ষেপ করবে না যাতে বক্তব্য অস্পষ্ট থাকে, আবার এত দীর্ঘও করবে না যাতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়।

* চাটুকারিতামূলক কথা বলবে না।

* কোনো প্রয়োজনের কথা কারও নিকট পূর্বে বলে থাকলে আবার সেটা পুনরাবৃত্তি করার ক্ষেত্রে পূর্ণ কথা বলবে। শুধু ইংগিত করাই যথেষ্ট নয়। কারণ হতে পারে তিনি পূর্বের কথা ভুলে গিয়ে থাকবেন এবং এখন পূর্ণ কথা না হওয়ায় বিভ্রান্তির শিকার হবেন।

* কারও বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই তার কথা কেটে মাঝখানে কথা না বলা আদব। দু'জনে কথা বলতে থাকলে তাদের সম্মতি ব্যতীত তাদের কথায় ফোঁড়ন কাটবে না।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ রেখে কথা বলা; যে কথা তাদের বুঝে আসার মত নয়– এরূপ কথা না বলা।

* নিজের কথায় ভুল হলে সেটা স্বীকার করে নেয়া, অপব্যাখ্যায় না যাওয়া।

## আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত, তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্তসমূহ

* আমল বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত প্রদান এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নিবে অর্থাৎ, এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহ্র হুকুম আহকাম চালু করার, আল্লাহ্র দ্বীন যিন্দা করার এবং ছওয়াব হাছিল করার নিয়তে করবে।



* আল্লাহ্র কথা এবং হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* শ্রোতাদেরকে তাদের কাজ থেকে এবং কথা-বার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে।

* আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহ্র হাম্‌দ ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে। তবে ওয়াজের মজলিসে সকলের সম্মিলিতভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা রছমে পরিণত হয়েছে, তাই এটা পরিত্যজ্য।

* যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।

* হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরুরি।

* নরমীর সাথে কলা বলা কঠোরতা পরিহার করা। মোস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় হলে সর্বদাই নরমীর সাথে বলা, আর ওয়াজিব ও ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে প্রথমে নরমীর সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে।

* অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নছীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নছীহতের আছর কম হবে।

* এত ঘন ঘন বা এত দীর্ঘ সময় ওয়াজ-নছীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ রেখে কথা বলা জরুরি।

* তারগীব (উৎসাহমূলক কথা), তারহীব (ভয় ও সতর্কতামূলক কথা, ফাযায়েল ও আহকাম সববিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা। এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের বিষয়ের সাথে ইসলামের মু'আমালাত, মুআ'শারাত এবং আখলাক- চরিত্র সম্পর্কেও বয়ান রাখা জরুরি।

* শ্রোতাদের মন-মেজায লক্ষ রেখে কথা বলা জরুরি।

* যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি।

* দাওয়াত ও নছীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করা নবীগণের সুন্নাত।

* শ্রোতাদের খায়ের খাহীর জয্বা নিয়ে দাওয়াত দিবে ও বয়ান করবে।

* পরকালমুখী করে বয়ান করা অর্থাৎ, মুখ্যত আল্লাহ্‌র হুকুম ও দ্বীন মানা না মানার পরকালীন লাভ-ক্ষতিকে তুলে ধরেই বয়ান করা। কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌণভাবে উল্লেখ করা যায়।

* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।

* পর্যায়ক্রমে জরুরি হুকুম-আহকামের চাপ দেয়া, যাতে একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে না যায়।

* দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করে কথা বলা। যেমন: বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করব না? আমরা এই পাপ পরিত্যাগ করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না? আপনারা এই পাপ পরিহার করুন ইত্যাদি।

* দায়ী (দাওয়াত দানকারী) নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখবে। এমন কোনো কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। অন্যায়ভাবে তার উপর কোন অপবাদ আরোপিত হলে সমাজের সামনে সে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে।

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে নছীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে।

(اصلاح انقلاب امت، معارف القرآن، شرعۃ الاسلام، مفاتیح الجنان و دینی دعوت کے قرآنی اصول প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## কথা শ্রবণ করার আদব তরীকা

* কথা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। কোনো কথা বোধগম্য না হলে জিজ্ঞাসা করার পরিবেশ থাকলে বক্তার নিকট জিজ্ঞাসা করে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

* দ্বীনী কথা-বার্তা আমলের এবং হেদায়েতের নিয়তে শুনতে হবে।

* কেউ আড়াল থেকে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। শুধু নীরবে তার আহ্বানে চলে আসা যথেষ্ট নয়।



* কেউ কোনো কাজের কথা বললে হ্যাঁ বা না স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে, যেন বক্তা নিশ্চিন্ত হতে পারে। ডাকে সাড়া না দিয়ে শুধু নীরবে কাজ সম্পন্ন করে দেয়াই যথেষ্ট নয়।

* উস্তাদের কথা বুঝে না আসলে (উস্তাদের ত্রুটি নয় বরং) নিজের বোধ ক্ষমতা বা মনোযোগের ত্রুটি আছে মনে করতে হবে।

* উস্তাদের কথা, এমনিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ কোন কথা বললে কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে সরে যাওয়া বে-আদবী।

* উস্তাদের দোষ-ত্রুটি কাউকে বলতে শুনলে যথাসম্ভব সেটা প্রতিহত করবে। আর সম্ভব না হলে সেখান থেকে সরে যাবে।

* গান-বাদ্য, পর নারীর আওয়াজ বা পর পুরুষের আওয়াজ ইত্যাদি অবৈধ শব্দ কানে এলে সে দিকে মনোযোগ না দেয়া।

* কোন মজলিসে কথা চলতে থাকলে সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে– অন্য কারও সাথে কথা বলা বে-তমীজী।

* মুরব্বী বা উস্তাদ কোন কথা বলার পর বুঝে এসেছে কি না জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্টভাবে হ্যাঁ বা না বলা উচিৎ, নীরব থাকা ঠিক নয়; এতে উস্তাদ বা মুরব্বীর পেরেশানী হয়। মুরব্বীদের কথার জওয়াব না দেয়া বে-আদবী।

* ওয়াজ-নছীহতের কথা হলে কথা শোনার পূর্বেই ওয়াজকারী ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ মাযহাবের লোক কি না তা কোন হক্কানী আলেম থেকে জেনে নিয়ে তারপর তার ওয়াজ শোনা উচিৎ। এই সতর্কতা অবলম্বনের পরও কোন ওয়ায়েজের কোনো কথা অস্পষ্ট বা সন্দেহমূলক মনে হলে কোন বিজ্ঞ হক্কানী আলেম থেকে সে সম্পর্কে ভালভাবে জেনে না নিয়ে তাতে আস্থা স্থাপন করা বা তার উপর আমল করা ঠিক হবে না।

(مفاتیح الجنان، صلاح انقلاب امت، آداب المعاشرت প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয়

তর্ক-বিতর্ক দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা:– (এক) পারস্পরিক কথা-বার্তার সময় ঘটনাক্রমে লেগে যাওয়া তর্ক-বিতর্ক। (দুই) দ্বীনী দাওয়াতের কাজে যে বাহাছ মোবাহাছা বা তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে। উভয় প্রকার তর্ক-বিতর্কের সময় যে নিয়ম-নীতি মেনে চলা আবশ্যক তা হল–

১. কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করা।

২. রাগ হয়ে কোনো কটু কথা না বলা।

৩. এমন যুক্তি প্রমাণ পেশ করা, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়।

৪. বহুল প্রচলিত, প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ব্যাখ্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেয়া, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হটকারিতার পথ পরিহার করে।

৫. প্রতিপক্ষ হক কথা মানে না, বা বুঝে না, কিংবা বুঝতে চায় না– এরূপ হলে নিজেই চুপ হয়ে যাওয়া নিয়ম।

৬. ভুলের সমর্থনের জন্য দলীল-প্রমাণ পেশ না করা।

৭. নিজের কথার মধ্যে কোনো ভুল বুঝে আসলে তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করে নেয়া উচিত। ভুল স্বীকার না করা গুরুতর অপরাধ।

(ماخوذ از معارف القرآن وتعليم الدين)

## হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা সম্পর্কে বিধি-বিধান

* শরীআতের সীমানা লংঘন করে হাসি-ঠাট্টা বা রসিকতা করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়, গাম্ভীর্য হ্রাস পায়, আল্লাহ্‌র যিকির ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে গাফলত পয়দা হয় এবং লজ্জা-শরম ও পরহেযগারী কমে যায়।

* কোন শোকাতুর বা বিপদগ্রস্তের দিল খোশ করার জন্য হাসি-ফুর্তির কথা বলা জায়েয বরং উত্তম। এমনিভাবে দ্বীনের কাজ ও ইবাদতের জন্য মনকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে এবং মনবিক অবসাদ দূর করার জন্য হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা করা হলে তাও উত্তম।

* হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

ক. যেন মিথ্যা না হয়।

খ. যেন কারও মনে বা ইজ্জতে আঘাত না লাগে।

গ. যেন অতিরিক্ত না হয়।

ঘ. যেন সারাক্ষণ এতে লেগে থাকা না হয়। এ শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তখনই সে হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা শরীআতের সীমানা লংঘন করেছে বলে আখ্যায়িত হবে।

## প্রশংসা বিষয়ক বিধি-বিধান

* কারও সম্মুখে তার প্রশংসা করা নিষেধ। এতে তার মধ্যে অহংকার বা আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে কেউ যদি অহংকার বা আত্মম্ভরিতার শিকার হবে না বলে বুঝা যায়, তাহলে তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গুণাগুণের স্বীকৃতি স্বরূপ তার কিছুটা প্রশংসা তার সম্মুখেও করে দেয়া যেতে পারে।



* কারও প্রশংসা করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যথা:–

১. গুণ যতটুকু তার থেকে বাড়িয়ে বলা যাবে না। অর্থাৎ, প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা যাবে না।

২. যে বিষয় নিশ্চিত করে জানা নেই তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। যেমনঃ এরূপ বলা যাবে না, অমুক নিশ্চিত আল্লাহ্‌র অলী। কারণ, কে আল্লাহ্‌র অলী তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। তবে হ্যাঁ, এভাবে বলা যাবে, আমার জানা মতে তিনি আল্লাহ্‌র অলী, বা আমি তাকে আল্লাহ্‌র অলী মনে করি, ইত্যাদি।

৩. প্রকৃত প্রস্তাবে সে যেমন, মুখে তার অন্যরকম বলা যাবে না। তাহলে মিথ্যা ও প্রতারণা হবে।

* কোন ফাসেক বে-দ্বীনের প্রশংসা করা নিষেধ। তবে প্রকৃত যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়া ভিন্ন কথা।

* আত্মপ্রশংসা তথা নিজের প্রশংসা নিজে করা নিষেধ। এটা গোনাহে কবীরা।

## হাঁচি সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ[১] (আলহামদু লিল্লাহ) পড়ে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করবে।

* যে উক্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শুনবে তার জন্য يَرْحَمُكَ اللّٰهُ[২] (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলে জওয়াব দেয়া সুন্নাত। এবং হাঁচিদাতা এর জওয়াবে বলবে,

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত করেন এবং তোমাদের অবস্থাকে সংশোধন করে দেন।

* যখন শ্রোতা ব্যস্ততার মধ্যে বা কোনো লিপ্ততার মধ্যে থাকবে, তখন হাঁচিদাতার জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আস্তে বলা উত্তম, যাতে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে জওয়াব দিতে গিয়ে শ্রোতার ব্যাঘাত না ঘটে।

১. অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

২. অর্থ: আল্লাহ তোমাকে রহমত দান করুন।

* হাঁচি দেয়ার সময় আদব হল হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখা, যাতে শব্দ কম হয় এবং মুখ ও নাকের ময়লা কারও গায়ে ছুটে গিয়ে না লাগে।

* বার বার হাঁচি দিলে বার বার يَرْحَمُكَ اللهُ বলার দরকার নেই, বুঝতে হবে তার সর্দি হয়েছে বা হবে।

## হাই সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হাই আসলে যথাসাধ্য তা ঠেকাতে চেষ্টা করবে। যদি একান্তই না পারা যায় তাহলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিবে।

* হাই আসলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকার নিয়ম হল– বাম হাতের পিঠ মুখের সঙ্গে আর পেট অপর দিকে থাকবে। নামাযে এবং নামাযের বাইরে সবস্থানেই একই হুকুম, তবে নামাযে হাত বাঁধা অবস্থায় থাকলে ডান হাতের পিঠ মুখের দিকে আর পেট বাইরের দিকে রেখে মুখ ঢাকবে।

* হাই আসলে হা হা করে জোরে শব্দ করবে না।

* হাই আসলে পড়বে- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

## পান করার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. বসে পান করা সুন্নাত।

২. ডান হাতে পান করা সুন্নাত।

৩. পাত্রের ভাঙ্গা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান না করা আদব।

৪. তিন শ্বাসে পান করা সুন্নাত।

৫. পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ছাড়া এবং ফুঁক না দেয়া। (তিরমিযী)

৬. শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা সুন্নাত।

৭. অন্য মুসলমান ভাইয়ের বিশেষভাবে পরহেযগার ও বুযুর্গদের পান করার পর থেকে যাওয়া অবশিষ্ট পানি বরকত মনে করে পান করা।

৮. পানি পান শেষে এই দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا. (شرعة الإسلام)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি এটাকে বানিয়েছেন সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং এটাকে বানাননি লবণাক্ত ও বিস্বাদ।



৯. দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. (رواه الترمذی و قال : حديث حسن)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এটা আরও বেশি করে দাও। (তিরমিযী)

১০. যমযমের পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা মোস্তাহাব। এ পানি দাঁড়িয়ে বসে উভয়ভাবে পান করা যায়। (١/□□ شامی)

১১. যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. (المستدرك)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাই উপকারী ইল্‌ম প্রচুর রিযিক এবং সব রোগ-ব্যাধি থেকে শেফা। (মুস্তাদরকে হাকিম)

১২. পান করার পর অন্যকে দিতে হলে আদব হল ডান পাশের জনকে অগ্রাধিকার দেয়া। তার অনুমতি সাপেক্ষে বাম পাশের জনকেও দেয়া যায়।

১৩. যে পাত্রের ভিতর দেখা যায় না বা যে পাত্র থেকে এক সঙ্গে অনেক পানি পড়ার সম্ভাবনা– এরূপ পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান না করা আদব।

১৪. যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষে পান করবেন।

## খাওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. খাওয়ার পূর্বে জুতো খুলে নেয়া আদব।

২. উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত।

৩. কুলি করা সুন্নাত, যদি প্রয়োজন হয়। (اسلامی تہذیب)

৪. খানা সামনে আসলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (كتاب الأذكار)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে আমাদেরকে বরকত দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

৫. বিনয়ের সাথে, বিনয়ের ভঙ্গিতে বসা আদব। এক হাদীছ থেকে জানা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান পায়ের হাঁটু গেড়ে

অন্য পায়ের পেট মাটিতে রেখে (খাড়া করে) বসতেন। (مرقاة ج/٨) অন্য এক হাদীছে উভয় হাঁটু খাড়া রেখে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসার কথা বর্ণিত হয়েছে। (تكملة فتح الملهم ٤/[illegible]) উপরোল্লেখিত দু'টি পদ্ধতি ছাড়াও উলামায়ে কেরাম খাওয়ার সময় বসার আদবের মধ্যে আরও দুই প্রকার বসার কথা উল্লেখ করেছেন।

ক. উভয় হাঁটু গেড়ে এবং উভয় কদমের পিঠ মাটিতে রেখে বসা।

খ. ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা। (تكمله ج/٤) এই সবগুলো বর্ণনার সারকথা হল বিনয়ের ভঙ্গিতে বসা। আসন গেড়ে বসা বেশি খাওয়ার নিয়তে বা তাকাব্বুরের জন্য হলে মাকরূহ, অন্যথায় জায়েয।

৬. সামনের দিকে ঝুঁকে নত হয়ে বসা।

৭. দস্তরখান বিছানো সুন্নাত।

৮. জমিনের উপর বসা[১] এবং বসার বরাবর খাদ্যের বরতন রাখা।

৯. হেলান দিয়ে না খাওয়া (এমনকি হাতে ভর করেও না)।

১০. খাওয়ার শুরুতে بِسْمِ اللهِ وَ بَرَكَةِ اللهِ[২] (বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ) পড়া সুন্নাত এবং এটি জোরে পড়া মোস্তাহাব, যাতে অন্যরাও শুনতে পারে। (تكملة ج/٤) শুরুতে পড়তে ভুলে গেলে এবং খাওয়ার মাঝে স্মরণ হলে পড়বে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ[৩] (বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু)। (ترمذي)

১১. ডান হাতে খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে বাম হাতের সহযোগিতা নেয়া যায়।

১২. নিজের শরীরের ইছলাহ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের নিয়তে খেতে হবে।

১৩. তিন আঙ্গুলের (বৃদ্ধ, তর্জনী ও মধ্যমা) দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে তিনের অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. বর্তমান যুগে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন ঘটায় এতে تشبه بالكفار বা বিধর্মীদের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণের বিষয়টা আর অবশিষ্ট থাকেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চেয়ার-টেবিলে খাওয়া নিষিদ্ধ না হলেও যেহেতু চেয়ার টেবিলে খাওয়াতে অনেকগুলো সুন্নাত ও আদব বর্জিত হয়, অতএব তা পরিত্যাজ্য।

২. দুআটি এভাবেই মুস্তাদরকে হাকিম ও শুআবুল ঈমান কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রসিদ্ধ আছে এরূপ– بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ এর অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র বরকতের উপর খাওয়া শুরু করছি।

৩. অর্থাৎ, আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিলাম।



১৪. এক পদের খানা হলে নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া, অন্যের সম্মুখ থেকে না নেয়া।

১৫. প্রথমেই খানা দিয়েই আরম্ভ করবে। কেউ কেউ নেমক (লবণ) দ্বারা খানা শুরু এবং শেষ করাকে সুন্নাত বলেছেন, কিন্তু যে হাদীছের ভিত্তিতে তা বলা হয়েছে সে হাদীছটি মাওযূ' বা ভিত্তিহীন। (امداد الفتاوى ج/٤)

১৬. প্রথমে পাত্রের মাঝখান থেকে খানা নিবে না বরং পাশ থেকে নিতে থাকবে, কেননা মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।

১৭. খেজুর বা এ জাতীয় খাদ্য যেমন: বিস্কুট, মিষ্টান্ন একটা একটা করে খাওয়া, একসঙ্গে একাধিক সংখ্যক করে না খাওয়া।

১৮. এক লোকমা গলাধকরণ করার পূর্বে আরেক লোকমা না উঠানো। এতে লোভ প্রকাশ পায়।

১৯. খুব গরম খাবার না খাওয়া।

২০. গরম খাদ্য/পানীয় ফুঁক দিয়ে ঠাণ্ডা না করা। (مفاتيح الجنان نقلا عن العوارف)

২১. খাদ্যদ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিষ্কার করে) খাওয়া সুন্নাত।

২২. খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি না লাগানো উচিত। উল্লেখ্য, রান্নার দোষ বলা খাদ্যদ্রব্যের দোষ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৩. খাওয়ার সময় এমন সব কথা বা আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যাতে অন্যের মনে ভয় বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। (شرح شرعة الإسلام)

২৪. খাওয়ার মাঝে অন্য কোনো কাজ না করাই খাওয়ার আদব।

২৫. পেটে কিছু ক্ষুধা থাকা অবস্থায়ই খানা শেষ করা উত্তম।

২৬. খাবারের বর্তন, পেয়ালা ইত্যাদি ছাফ করে খাওয়া এবং আঙ্গুলসমূহ ভাল করে চেটে খাওয়া সুন্নাত। আঙ্গুল চাটার সুন্নাত তারতীব হল– প্রথমে মধ্যমা, তারপর তর্জনী, তারপর বৃদ্ধা। আর খাওয়ার মধ্যে পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহৃত হলে তারপর অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠা। (تكملة ج/٤ نقلا عن مجمع الزوائد ج/٣)

২৭. খানা শেষ হলে এই দুআ পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ. (السنن الأربعة)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৮. দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে সকলে উঠে যাবে না। এটাই আদব।

২৯. দস্তরখানা উঠানোর দুআ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا. (رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থ: আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অশেষ, পবিত্র ও বরকতময়। হে আমার প্রভু! এই খাবারকে অপ্রচুর মনে করে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে বা এর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলাম না। (তিরমিযী)

৩০. খাওয়ার শেষে উভয় হাত কব্‌জিসহ ধৌত করা সুন্নাত। সাবান, বেশন ইত্যাদি ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার করাতেও ক্ষতি নেই। (الذخيرة)

৩১. খাওয়ার শেষে কুলি করা সুন্নাত।

৩২. দাঁতে খেলাল করা সুন্নাত।

৩৩. নবী (সা.) খাওয়ার শেষে হাত এবং মাথায় ভিজা হাত বুলিয়ে নিতেন। রুমাল ইত্যাদি দ্বারা হাত মুছে নেয়াতেও দোষ নেই। (خزانة المفتيين)

৩৪. খাওয়া শেষে সামান্য কিছু তিলাওয়াত ও যিকির করবে। (كتاب الأذكار)

৩৫. খাওয়ার শেষে সাথে সাথে ঘুমালে অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। (كتاب الأذكار)

## পাত্র ও বরতনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

* সোনা ও রূপার পাত্র/বরতন ব্যবহার করা হারাম। 'শামী' গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি সোনা রূপার পাত্র থেকে সরাসরি খাওয়া হয় বা ব্যবহার করা হয়, তাহলে হারাম। যদি সোনা রূপার পাত্র থেকে খাদ্য-খাবার বা তেল ইত্যাদি হাতে বা অন্য কিছুতে ঢেলে বা তুলে নিয়ে পরে তা ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। (দ্র. رد المحتار : كتاب الحظر والإباحة)

* তামা ও পিতলের পাত্র/বরতন ব্যবহার করা মাকরূহ। তবে নিকেল করা থাকলে মাকরূহ নয়। (امداد الفتاوى ٤/□□)

* সোনা, রূপা, তামা ও পিতল ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর পাত্র/বরতন ব্যবহার করা জায়েয। (امداد الفتاوى ٤/□□)



* সোনা রুপার পানি লাগানো পাত্র/বরতন ব্যবহার করা বৈধ। (هداية ج/٤)

* রুপা দ্বারা জড়োয়া করা বা সোনা রূপা দ্বারা জোড়ানো ও বাঁধানো পাত্র/বরতন ইত্যাদি ব্যবহার করা ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর মতে বৈধ, যদি ব্যবহারের সময় সোনা রূপায় স্পর্শ না লাগে। (هداية ج/٤)

* পাত্রের ভাঙ্গা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করবে না।

* পাত্র/বরতন ঢেকে রাখা সুন্নাত, বিশেষভাবে ঘুমানোর পূর্বে।

* বড় পাত্র –যা থেকে এক সাথে অনেক পানি পড়ার সম্ভাবনা বা যার ভেতর দেখা যায় না এমন পাত্র– হলে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করবে না বরং তার থেকে অন্য পাত্রে ঢেলে পান করবে।

## মজলিসে খানার সুন্নাত ও আদবসমূহ

* পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত খানার আমলসমূহ ছাড়াও মজলিসে খাওয়া হলে অতিরিক্ত আরও কয়েকটি আমল রয়েছে। যথা:

* প্রথমে ছোটদেরকে হাত ধোয়ানো তারপর গুরুজনদেরকে হাত ধোয়ানো আদব, যাতে গুরুজনদেরকে ছোটদের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। (مفاتيح الجنان نقلا عن الظهيرية)

* খানা পরিবেশনকারী তার ডান দিক থেকে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে খানা পরিবেশন করবে।

* ইল্‌ম, আমল, পরহেযগারী ও বয়সে যারা বড়, তাদের দ্বারা প্রথমে খাওয়া আরম্ভ হওয়া আদব।

* কারও লোকমার দিকে নজর না করা আদব।

* যেখান থেকে খানা বণ্টন করা হয় সেখানে নজর না করা আদব। এতে লোভ প্রকাশ পায়।

* নিজের খাওয়া শেষ হলেও উঠে না যাওয়া বরং হাত নাড়া-চাড়া করতে থাকা, যেন অন্য সাথীরা লজ্জায় তৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই খানা শেষ করে না বসে।

* অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এক সাথে খেলে এই দুআ পড়া সুন্নাত–

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ. (رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আরম্ভ করলাম।

## মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ

* কেউ নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিলে তা কবূল করবে। এটা সুন্নাত। তবে দাওয়াতদাতার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ সম্পদ হারাম উপায়ে অর্জিত হলে তার দাওয়াত কবূল করা উচিত নয়।

* সুন্নাতের অনুসরণ ও মুসলমানদের মন খুশি করার নিয়তে দাওয়াত কবূল করতে হবে।

* একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি দাওয়াত দিলে যার ঘর অধিক নিকটে তার দাওয়াত কবূল করা সুন্নাত। (گلزارسنت)

* দাওয়াত বা পূর্ব এত্তে'লা (Infotmation) ছাড়াই খাওয়ার সময় কারও নিকট মেহমান হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। একান্তই এরূপ সময় যেতে হলে বাইরে থেকে খেয়ে যাবে, যাতে অসময়ে মেজবানকে খানা পাকানোর/খানার ব্যবস্থা করার বিড়ম্বনা পোহাতে না হয়। কিংবা তাদের খাবার মেহমানকে দিয়ে তাদেরকে অভুক্ত থাকতে না হয়। আর বাইরে থেকে খেয়ে গেলে যেয়েই মেজবানকে তা অবহিত করা আদব। অন্যথায় মেহমানের খানার প্রয়োজন ভেবে মেজবান খাবারের ব্যবস্থা করবে তারপরে দেখা যাবে মেহমানের প্রয়োজন নেই। এতে করে খাবার নষ্ট হবে কিংবা অন্তত মেজবান বিব্রতবোধ করবেই। (آداب المعاشرت) তবে বিশেষ কারও ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, পূর্ব এত্তে'লা ছাড়া মেহমান হলেও তিনি কোনোরূপ বিব্রতবোধ করবেন না, তাহলে তার ব্যাপারটা ভিন্ন।

* দাওয়াত দেয়া হয়নি– এমন কাউকে মেহমান সঙ্গে আনবে না। আনলে মেজবানের অনুমতি গ্রহণ করবে। তবে মেজবানের কোনোই আপত্তি থাকবে না– এমন বুঝতে পারলে অনুমতির প্রয়োজন নেই।

* মেহমান মেজবান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বসবে এবং থাকবে।

* মেহমান মেজবানের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত কাউকে ডেকে খানায় শরীক করবে না বা কাউকে খানা থেকে কিছু প্রদান করবে না।

* মেহমান খাওয়ার মজলিসে এমন কিছু আবদার করবে না, যা যোগাড় করা মেজবানের জন্য মুশকিল হতে পারে।

* খাওয়ার ব্যাপারে মেহমানের কোনো বাছ-বিচার থাকলে কিংবা বিশেষ কোন অভ্যাস বা রুটিন থাকলে পূর্বেই তা মেজবানকে অবহিত করা উচিত। দস্তরখানে এসে এরূপ কিছু উত্থাপন করে মেজবানকে বিব্রত করা উচিৎ নয়। (اسلامی تہذیب)



* কোন বিশেষ অসুবিধা না থাকলে মেজবান কর্তৃক উপস্থিত সবরকম খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে তাকে খুশি করা উচিত।

* মেহমান মেজবানের নিকট এত বেশি সময় বা এত বেশি দিন অবস্থান করবে না, যাতে মেজবানের কষ্ট, ক্ষতি বা বিরক্তি হতে পারে। এরূপ করা নিষিদ্ধ।

* কারও নিকট দাওয়াত খেলে খানা শেষে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ. (رواه مسلم في كتاب الأشربة)

অর্থ: হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

* বিদায় গ্রহণের সময় মেজবান থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নেয়া আদব।

* মেজবানের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় মেহমান পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. (رواه مسلم كتاب الأشربة)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর।

## মেজবানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ

* মেহমানকে সাদর অভ্যর্থনার সাথে, সম্মানের সাথে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে।

* প্রত্যেক মেহমানকে তার মর্যাদা অনুসারে গ্রহণ করবে এবং সে হিসাবে তার খাতের-যত্ন করবে। সকলকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়। (اسلامی تہذیب)

* খাওয়ার সময় হয়ে গেলে যথাশীঘ্র মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করা আদব। (شرح شرعة الإسلام)

* মেজবান মেহমানের সঙ্গে এমন কাউকে খানায় একত্রে বসাবে না, যার মন-মানসিকতা, রুচি ও মেজায ভিন্ন হওয়ার কারণে মেহমানের খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (اسلامی تہذیب -এর আলোকে)

* মেজবান অতিরিক্ত খাওয়ানোর জন্য মেহমানকে পীড়াপীড়ি করবে না।

* সম্ভব হলে মেহমানের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে সে অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত করবে। (اسلامی تہذیب)

* সাধ্য এবং প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য অন্তত একদিন আড়ম্বরের সাথে খাবারের আয়োজন করা সুন্নাত।

* বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছানো সুন্নাত। (তা'লীমুদ্দীন)

## হাদিয়া প্রদান করার আদব-তরীকা

* হাদিয়া শুধু মাত্র কোন মুসলমানের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং মহব্বত থেকে হতে হবে, অন্য কোনো প্রকার দুনিয়াবী বা উখরাবী (পরকালীন) উদ্দেশ্য থাকবে না।

* হাদিয়া পেশ করার পূর্বে বা পরক্ষণে নিজের কোনো মতলবের কথা না বলা আদব। কারণ নিজের কোনো মতলবের কথা বললে হাদিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।

* হাদিয়া গোপনে প্রদান করা আদব।

* নগদ অর্থ হাদিয়া দিলে মুসাফাহার সময় দেয়া ঠিক নয়।

* নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কিছু হাদিয়া দিলে এমন বস্তু বা এত পরিমাণ দেয়া ঠিক নয়, যা তার পক্ষে গন্তব্যস্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে। এরূপ করতে হলে তার গন্তব্য স্থানে সেটা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

* নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু হাদিয়া দিলে যাকে দেয়া হবে তার আগ্রহ কিসের প্রতি তা জেনে সেটা দেয়া উত্তম।

* মোনাছাবাত ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর হাদিয়া দিবে, অন্যথায় গ্রহণকারীর পক্ষে সংকোচ শরমের কারণ হতে পারে।

* বুযুর্গদের কাছে যেতে হলে হাদিয়া নিয়েই যেতে হবে– এরূপ বাধ্যবাধকতার পিছনে না পড়া চাই। (آداب المعاشرت)

## হাদিয়া গ্রহণ করার নিয়ম-পদ্ধতি

* হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নাত। এই সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে হাদিয়া গ্রহণ করবে।

* যার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তার হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর নির্দিষ্টভাবে যদি জানা থাকে যে, হারাম মাল থেকেই হাদিয়া দেয়া হচ্ছে তাহলেও গ্রহণ করা জায়েয নয়।

* হাদিয়া গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রদানকারীর সামনেই সেটা অন্যকে প্রদান করবে না। তাহলে হাদিয়া প্রদানকারীর অন্তরে আঘাত লাগবে।



* যে বস্তু হাদিয়া প্রদান করা হল তার মূল্য জিজ্ঞাসা করবে না। এতে বস্তুর মূল্য কম হলে হাদিয়া প্রদানকারী তার হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে করা হতে পারে ভেবে সংকোচ বোধ করতে পারে।

* হাদিয়ার বদলা প্রদান করবে। অন্তত তার জন্য তৎক্ষণাৎ মুখে দুআ করে দিবে। এই বাক্যে দুআ করা যায়– بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ[১] অথবা جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا[২]

* যার মধ্যে হাদিয়ার বদলা পাওয়ার আগ্রহ আছে বুঝা যায়– এরূপ ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করবে না। যেমন: প্রচলিত বিবাহ-শাদীতে উপঢৌকনের বেলায় এরূপ বুঝা যায়। (ماخوذ از آداب المعاشرت و فتاوی رشیدیہ)

## পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ

### পোশাকের কাট-ছাঁট বিষয়ক

* জামা পায়জামা নেছফে ছাক্ব অর্থাৎ, পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত। টাখনু গিরার উপর পর্যন্ত জায়েয। (مرقاة ج/٨ وجمع الفوائد)

* গোল জামা অধিক সতর রক্ষার সহায়ক বিধায় তা-ই উত্তম।

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জামার হাতা হাতের কবজি পর্যন্ত ছিল। (ترمذی) অতএব জামা, শেরওয়ানী ইত্যাদির হাতা কবজি পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত।

* পুরুষের জন্য মহিলাদের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা, তদ্রূপ মহিলাদের জন্য পুরুষের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (امداد الفتاوی [illegible]/٤)

* মহিলাদের জন্য শাড়ি পরিধান করা জায়েয। (فتاوی دار العلوم)

* প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা নাজায়েয, ছবি যে কোনোভাবেই তৈরী হোক না কেন। (فتاوی محمودیہ [illegible]/٥)

* এত টাইট-ফিট পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে শরীরের গোপন অঙ্গ ফুটে ওঠে। (احسن الفتاوی)

* পাগড়ীর পরিমাণের ব্যাপারে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিশেষ নির্দেশ দিয়ে যাননি। প্রত্যেকেই তার অভ্যাস অনুসারে পরিমাণ বেছে নিতে পারেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–

১. অর্থ: আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন।
২. অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন।

এর বার হাত ও সাত হাত দুই রকমের পাগড়ী ছিল বলে জানা যায়। (فتاوی دار العلوم □□/٤)

* কোট, প্যান্ট, শার্ট বর্তমান যুগে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের কর্মজীবি ও শ্রমজীবি মানুষের পোশাকে পরিণত হওয়ায় এগুলো ব্যবহার করা না জায়েয হবে না। যেমন: হযরত থানবী (রহ.) তার যুগে বলেছেন, লন্ডনে কোট, প্যান্ট ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে না, কেননা সেখানে এগুলোর ব্যাপক প্রচলন ঘটায় এখন আর এরকম মনে হয় না যে, এগুলো বিশেষ কোন ভিন্ন ধর্মের লোকদের পোশাক। আর تشبہ বা ভিন্ন জাতির অনুকরণই তো এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার ভিত্তি। অতএব ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে অবশিষ্ট না থাকলে তা নিষিদ্ধও থাকবে না। (فقہ حنفی کے اصول وضوابط) তবে এগুলো নেককার পরহেযগার লোকদের পোশাক নয় বিধায় এগুলো ব্যবহার করা অনুত্তম হবে নিঃসন্দেহে।

* বিজাতীয় লেবাস-পোশাক বর্জনীয়।

## পোশাকের রং বিষয়ক

* সাদা রংয়ের কাপড় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি পছন্দ করতেন। তাই সাদা রংয়ের পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক।

* হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল এবং সবুজ রংয়ের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন, তাই সর্বদা শুধু সাদাই নয় বরং নিষিদ্ধ রংগুলো ব্যতীত অন্যান্য রংয়ের কাপড়ও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা মোস্তাহাব। (مفاتيح الجنان نقلا عن شرح النقاية)

* পুরুষের জন্য কুসুম-লাল, হলুদ, জাফরান এবং গোলাব রং নিষিদ্ধ আর নিরেট লাল অনুত্তম। (فتاوی رشیدیہ و تعلیم الدین) মহিলাদের জন্য সব রং–এর পোশাক জায়েয।

* পাগড়ী কাল রংয়ের হওয়া মোস্তাহাব।

(حاشیۂ فتاوی دار العلوم ج/٣ نقلا عن الدر المختار)

## পোশাকের সুতা ও বুনন বিষয়ক

* পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে যে কাপড়ের দৈর্ঘের সুতা রেশম কিন্তু প্রস্থের সুতা রেশম নয়– সেটা ব্যবহার করা বৈধ। আর মহিলাদের জন্য সব ধরনের রেশমের কাপড় বৈধ। (هداية ج/٤)



* যে কাপড়ে শরীর দেখা যায় এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা না করারই হুকুম রাখে।

* হারাম উপায়ে অর্জিত পোশাক বা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা পোশাক পরিধান করা হারাম। (الفقه على المذاهب الأربعة)

## উচ্চমান ও নিম্নমানের পোশাক বিষয়ক

* অহংকার প্রদর্শন বা বিলাসিতার নিয়তে উচ্চমানের পোশাক পরিধান করা শরীআতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

* তাওয়াযু' বা বিনয়ের উদ্দেশ্যে নিম্নমানের পোশাক, পুরাতন পোশাক কিংবা ছেঁড়া-ফাটা ও তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করা উত্তম। তবে এরূপ পোশাক দেখে লোকে দরবেশ বা আত্মভোলা বলবে কিংবা বিনয়ী ও দুনিয়াত্যাগী মনে করবে– এরূপ রিয়া বা লোক দেখানোর নিয়ত থাকলে সেটাও এক প্রকার অহংকার বিধায় তা নিন্দনীয়।

* আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর এবং শোকর আদায়ের নিয়তে উত্তম পোশাক পরিধান করা প্রশংসনীয়।

* কাপড় যেমন মানেরই হোক তা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা শরীআতের কাম্য।

## পোশাক পরিধানের তরীকা বিষয়ক

* সতর ঢাকা, শারীরিক দোষ-ত্রুটি ঢাকা ও সৌন্দর্য লাভের নিয়তে পোশাক পরিধান করবে। অহংকারের উদ্দেশ্যে পোশাক পরা হারাম।

* কামিজ, জামা, কোর্তা, ছদরিয়া ইত্যাদি পরিধান করতে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ঢুকানো সুন্নাত। এমনিভাবে পায়জামা পরিধান করতে প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ঢুকানো সুন্নাত এবং খোলোর সময় এর বিপরীত বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত। মোজা, জুতো, স্যান্ডেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এরূপ তরীকা সুন্নাত।

* একই সময়ে জামা ও পায়জামা উভয়টি পরিধান করতে হলে আগে জামা পরে পায়জামা পরিধান করা উত্তম। (فقه الحديث)

* পাগড়ীর নিচে টুপি পরা সুন্নাত। টুপি ব্যতীত শুধু পাগড়ী পরিধান করা সুন্নাতের পরিপন্থী। নামাযের সময় মাথার মাঝখান খোলা রাখা মাকরূহ। (فقه الحديث)

* পাগড়ী গোল করে বাঁধা অথবা শামলা (বর্ধিত অংশ) ছেড়ে বাঁধা উভয় রকমই সুন্নাত। শামলা ডানে বা পেছনের দিকে অথবা একই সঙ্গে উভয় দিকে ছেড়ে দেয়া যায়। বাম দিকে শামলা ছাড়ার প্রমাণ নেই বিধায় উলামায়ে কেরাম সেটাকে বিদআত বলেছেন। শামলা এক বিঘত, এক হাত বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ রাখা যায়। (فتاوی دار العلوم □□/٤ وگلزارسنت)

* পায়জামা বসে পরিধান করা ভাল, অন্যথায় স্বাস্থ্যগত অসুবিধা হতে পারে। (تطهير الجنان) লুঙ্গি মাথার উপর দিক থেকে এবং পাগড়ী দাঁড়িয়ে পরিধান করবে।

* পুরুষের জন্য লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুব্বা, আবা ইত্যাদি অহংকারবশত টাখনু গিরার নিচে ঝুলিয়ে পরা কবীরা গোনাহ। অহংকারবশত না হলেও এরূপ পরা ঠিক নয়। কারণ এতে অহংকারবশত যারা করে তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। মহিলাদের জন্য পুরো পা ঢেকে মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরা উত্তম।

* নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَاأُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ.

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং তার দ্বারা জীবনকে সৌন্দর্য মন্ডিত করি। (رواه الترمذي وقال : حسن غريب)

* পুরাতন কাপড় পরিধান করার দুআ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَاقُوَّةٍ.

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করালেন এবং এটা আমার চেষ্টা ও শক্তি ছাড়া নছীবে রাখলেন। (আবূ দাউদ)

* কাপড় ও (জুতো/স্যান্ডেল) খোলার সময় পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ. (ابن السني رقم ٢٧٣)

উল্লেখ্য যে, কাপড় খোলার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার দরুন শয়তান লজ্জাস্থানের দিকে নজর দিতে পারে না।

* কাপড় খোলার পর আদব হল সেটাকে গুছিয়ে রাখা।

* নতুন কাপড় পরিবর্তন করলে পুরাতন কাপড় গরীব-মিসকীনকে



দিয়ে দেয়া উত্তম।

## জুতো/স্যান্ডেল সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* পুরুষের জন্য মহিলাদের স্টাইলের জুতো/স্যান্ডেল বা মহিলাদের জন্য পুরুষের স্টাইলের জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (امداد الفتاوی □□/٤)

* জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরে বাম পায়ে পরিধান করা এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পায়েরটা পরে ডান পায়েরটা খোলা সুন্নাত।

* নতুন জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করে এই দুআ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ. (رواه في كتاب الأذكار وقال : حديث صحيح)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কামনা করি এটার কল্যাণ এবং এর সদুদ্দেশ্য। আর তোমার নিকট পানাহ চাই এটার অনিষ্ট ও অসদুদ্দেশ্য থেকে।

* জুতো/স্যান্ডেল খোলার সময় পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآإِلٰهَ إِلَّا هُوَ. (كتاب الأذكار عن ابن السني)

* জুতো/স্যান্ডেল সম্ভব হলে একাধিক রাখা ভাল। (تعليم الدين)

* জুতো পায়ে দেয়ার সময় হাত লাগানোর দরকার হলে বসে পায়ে দিবে। (فروع الإيمان نقلا عن أبي داود)

* কোনো মজলিসে বা মসজিদে যে স্থানে কেউ জুতো/স্যান্ডেল রেখেছে সেখান থেকে তার জুতো/স্যান্ডেল সরিয়ে সেখানে নিজের জুতো/স্যান্ডেল রাখবে না, এটা অন্যায়, কেননা সেখানে তার জুতো/স্যান্ডেল না পেয়ে সে পেরেশান হবে। অতএব নিজের জুতো/স্যান্ডেল যেখানে খালি আছে সেখানে বা ভিন্ন স্থানে রাখুন।

* জুতো/স্যান্ডেল এমনভাবে রাখুন যেন তা উক্ত স্থানকে নাপাক বা গান্ধা ময়লাযুক্ত করে না ফেলে। প্রয়োজনে জুতোর অতিরিক্ত আলগা ময়লা বাইরে ঝেড়ে ফেলুন বা জুতো/সান্ডেল অন্য কোন থলি বা প্যাকেটের মধ্যে রাখুন।

* জুতো/স্যান্ডেল একখানা পায়ে দিয়ে হাঁটা নিষেধ।

* মাঝে মধ্যে খালি পায়ে চলতে অসুবিধা নেই, তবে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় জুতো/স্যান্ডেল বা মোজা

পরিধান করে চলতেন। (فتاوی رشیدیہ)

## আয়না-চিরুনির বিধি-বিধান

* আয়না দেখা জায়েয।

* আয়না দিনে রাতে যে কোন সময় দেখা যায়। রাতে আয়না দেখা ঠিক নয়– এরূপ একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। (امداد الفتاوی □□/٤)

* চুল পরিপাটি করার জন্য চিরুনি করা সুন্নাত। তবে খুব বেশি এর ধান্ধায় না পড়া উচিত।

* চুল আঁচড়ানোর সময় প্রথমে ডান দিক তারপর বাম দিক আঁচড়ানো সুন্নাত।

* চিরুনি করার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে আয়না দেখার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ. (كتاب الإذكار عن ابن السني)

অর্থঃ হে আল্লাহ, তুমি যেমন আমার চেহারাকে সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

* একই চিরুনি দিয়ে একাধিক ব্যক্তির চুল আঁচড়ানোতে কোনো অসুবিধা নেই।

তেল, প্রসাধনী ও সাজ-গোছের বিধি-বিধান

* হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় তেল ব্যবহার করতেন, তাই তেল ব্যবহার করা সুন্নাত।

* তেল ব্যবহার করার ইচ্ছা করলে বাম হাতের তালুতে তেল নিয়ে প্রথমে ভ্রুর উপর, তারপর চোখে তারপর মাথায় লাগানো সুন্নাত। (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں)

* মাথায় তেল লাগাতে মুখমণ্ডলের দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। (أيضا)

* ক্রিম, স্নো, পাউডার ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই, যদি এগুলোতে কোনো নাপাক বস্তু মিশ্রিত না থাকে। (آپ کے مسائل اور انکا حل ج/٢)

* নেল পালিশ (নখ পালিশ) প্রভৃতি যা ব্যবহার করলে একটা শক্ত আবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার নিচে পানি পৌঁছে না– এরূপ বস্তু সহকারে উযূ গোসল সহীহ হয় না। আর উযূ গোসল সহীহ না হলে নামাযও সহীহ হয় না এবং প্রত্যেক উযূর সময় নেল পালিশ দূর করাও মুশকিল, তাই নেল



পালিশ থেকে বিরত থাকাই জরুরি। (أيضا)

* নেল পালিশ ব্যতীত অন্যান্য যেসব মেকআপ দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা গঠনে কোনো বিকৃতি ঘটে না, তা ব্যবহার করা জায়েয। (أيضا)

* মহিলাগণ চুলের আলগা খোপা বা আলগা চুল ব্যবহার করতে পারেন, যদি সেটা কৃত্রিম চুলের হয়। আর যদি সেটা মানুষের চুল হয় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

* শরীরে সুচ ইত্যাদির সাহায্যে স্থায়ী নকশা বা চিত্র অংকন করা (tattoo/উলকি) হারাম। (تعليم الدين)

## সুরমা, আতর ও সেন্ট ব্যবহারের বিধি-বিধান

* পুরুষ মহিলা সবার জন্য সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত।

* সুরমা বিশেষভাবে রাতের বেলায় শোয়ার পূর্বে লাগানো উত্তম।

* প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

* আতর ব্যবহার করা সুন্নাত। তবে যে আতরের খুশবু বাইরে ছড়ায়– এরূপ আতর ব্যবহার করে মহিলাগণ বাইরে যাবে না।

* সেন্ট এর মধ্যে স্পিরিট ব্যবহার করা হয়, এই স্পিরিট খেজুর, কিশমিশ বা আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হলে সেরূপ স্পিরিট নাপাক, অতএব সেরূপ স্পিরিটযুক্ত সেন্টও নাপাক হবে এবং তা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। তবে আহ্‌ছানুল ফাতাওয়া ২য় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদন্ত করে জানা গেছে বর্তমান যুগের স্পিরিটে এবং এ্যালকোহলে (শরাবে) খেজুর, আঙ্গুর ব্যবহার করা হয় না। (احسن الفتاوی □□/٢) অতএব বর্তমানে স্পিরিট নাপাক নয়, ফলে সেন্ট ব্যবাহারেও কোনো দোষ থাকছে না। কিন্তু সন্দেহের ক্ষেত্রে বিরত থাকাই শ্রেয়।

* মাঝে মাঝে আতর লাগানো ভাল। বিশেষভাবে জুমুআর দিন, ঈদের দিন প্রভৃতি সময়।

## অলংকারের বিধি-বিধান

* মহিলাদের জন্য কাঁচ বা যেকোনো ধাতুর চুড়ি পরিধান করা জায়েয। (فتاوی رشیدیہ)

* মহিলাদের কান ফুটানো জায়েয। নাক ফুটানো অধিকাংশের মতে জায়েয, কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। (أيضا)

* মহিলাদের জন্য সোনা, রুপা, পিতল, তামা ইত্যাদি সবরকম ধাতুর সবরকম অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। তবে বিধর্মীদের অনুকরণ যেন

না হয়। (أيضا)

* যেসব অলংকারে বাজনা হয়, সেগুলো গায়র মাহরাম পুরুষের সামনে পরা জায়েয নয়। (أيضا)

* পুরুষের জন্য সোনার আংটি বা সোনার অন্য যেকোনো অলংকার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ, এক সিকি পরিমাণ (৩.৩৮০ গ্রাম) রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। এর অধিক ওজনের রূপার আংটিও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অন্যান্য ধাতুর আংটি যেমনঃ তামার আংটি, অষ্ট ধাতুর আংটি ইত্যাদি পুরুষের জন্য নাজায়েয। সোনা রূপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর আংটি মহিলাদের জন্য জায়েয তবে মাকরূহ। (فتاوى رحيمية ٦/□□)

* লোহা, পিতল, তামা, কাঁশা, পাথর ইত্যাদি ধাতুর আংটি ব্যবহার করা পুরুষের জন্য জায়েয নয় অর্থাৎ, যখন আংটির হলকা বা বৃত্তটা এসব ধাতু দ্বারা তৈরী হবে। আর বৃত্তটা যদি সিকি পরিমাণ রূপার মধ্যে হয় আর নাগীনা বা মণিটা এসব ধাতুর হয় তাহলে তা জায়েয। (الهداية ج/٤)

## মেহেদী ও খেযাব (কলপ) সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* নারীদের জন্য হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগানো মোস্তাহাব। কেউ কেউ পায়ে মেহেদী লাগানোকে খারাপ মনে করেন এই যুক্তিতে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িতে মেহেদী লাগাতেন, অতএব তা পায়ে লাগানো বে-আদবী– এ যুক্তি ঠিক নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িতে তেল লাগাতেন, তাই বলে কি পায়ে তেল লাগানো বে-আদবী হবে?

* অন্তত হাত, পা ও নখে মেহেদী লাগালেও চলবে।

* পুরুষদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নিষেধ। তবে চিকিৎসা হিসাবে লাগানো জায়েয আছে।

* পুরুষের জন্য দাড়ি ও চুলে খেযাব লাগানো মোস্তাহাব। কাল ব্যতীত যেকোনো রংয়ের খেযাব (কলপ) লাগানো যায়, তবে মেহেদী দিয়ে লাল রংয়ের খেযাব করা সুন্নাত। চুলের কাল রংয়ের সাথে মিলে যায় এমন কাল রংয়ের কলপ লাগানো মাকরূহ, কারণ এতে মানুষকে নিজের বয়স সম্পর্কে ধোঁকা দেয়া হয়। তবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির জন্য এরূপ করা প্রশংসনীয়। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)–এর মতে স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যেও কাল রংয়ের কলপ লাগানো যায়।



(رد المحتار ج/٦، فقه الحديث، جواهر الفقه □□/٢ و تعليم الدين)

## ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নীতিমালা

* কোনো অমুসলিমের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলা জায়েয নয়।

* সব মুসলমানের সঙ্গে দ্বীনী বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে হবে।

* কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে খালেস আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হলে তাকে জানিয়ে দিবে যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি, ভালবাসি, তাহলে তারও তোমার সঙ্গে মহব্বত সৃষ্টি হবে।

* ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। কাউকে ভালবেসে তার কাছে নিজেকে এতখানি উন্মুক্ত করে দেয়া ঠিক নয়, তার কাছে নিজের গোপনীয়তা এতখানি ফাঁস করে দেয়া ঠিক নয়, যাতে কোনো দিন সে শত্রু হয়ে গেলে ক্ষতি করতে সক্ষম হয়।

* মহব্বত (ভালবাসা) ও শাহওয়াত (কাম রিপুর তাড়না) এক কথা নয়। বেগানা নারী ও দাড়িবিহীন বালকের প্রতি যে আকর্ষণকে মহব্বত বলে মনে হয়, তা প্রায়শই প্রকৃতপক্ষে মহব্বত নয় বরং শাহওয়াত থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এরূপ আকর্ষণ পাপ পথে ধাবিত করে থাকে বিধায় তা পাপ ও গর্হিত।

* ভালবাসার বুনিয়াদ হতে হবে দ্বীনদারী ও পরহেযগারী। অতএব যে যত বেশি দ্বীনদার ও পরহেযগার, তার সঙ্গেই ততবেশি ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। দোস্তী মহব্বত করার আগে তার আমল-আখলাক দেখে নিতে হবে।

* স্বার্থের জন্য মহব্বত করা ভাল নয়, মহব্বত করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে।

## অমুসলিমদের সাথে কোন্ ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে

* মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক চার ধরনের হতে পারে। এর মধ্যে অমুসলিম তথা কাফেরদের সাথে শর্ত সাপেক্ষে তিন ধরনের সম্পর্ক রাখা যায়। এক ধরনের সম্পর্ক কোনো অবস্থাতেই রাখা যায় না। যথা:

১. **বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক:** এ পর্যায়ের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হবে। কোনো কাফেরের সাথে কোনো মুসলমানের বন্ধুত্ব বা আন্তরিকতার সম্পর্ক হতে পারে না।

২. **সহানুভূতি ও সমবেদনার সম্পর্ক:** এ পর্যায়ের সম্পর্ক অমুসলিমদের সাথেও থাকবে। অমুসলিমদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করা,

সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাদের উপকার করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। তবে যুদ্ধরত অমুসলিমদের সাথে এ পর্যায়ের সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়।

৩. **সৌজন্য ও আতিথেয়তার সম্পর্ক:** ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে অথবা আত্মরক্ষার স্বার্থে অমুসলিমদের সাথেও এ পর্যায়ের সম্পর্ক রাখা যাবে। অর্থাৎ, যদি অমুসলিমদেরকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা, তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা, তাদেরকে হেদায়াত করা বা এ ধরনের কোন ধর্মীয় উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও সৌহার্দমূলক আচরণ করা হয় এবং তাদের আতিথেয়তা করা হয় তবে তা জায়েয, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তাদের সাথে এরূপ সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়।

৪. **লেন-দেনের সম্পর্ক:** অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অমুসলমানদের সাথে জায়েয, তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয় তাহলে জায়েয নয়। এ কারণে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এরূপ মুহূর্তে তাদের সাথে শুধু মাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি রয়েছে।

(ماخوذ از معرف القرآن و بيان القرآن)

## অমুসলিমদের সাথে একত্রে পানাহার এবং তাদের হাতের তৈরী ও তাদের রান্না করা খাদ্য-খাবারের মাসায়েল

* অমুসলিমদের জবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয নয়। অমুসলিমদের তৈরী ও রান্না করা খাদ্য-খাবার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি ক্রয় করা এবং খাওয়া জায়েয, যদি বাহ্যিকভাবে তাতে কোনো নাপাক বস্তুর মিশ্রণ বুঝা না যায়। তবে মুসলমান ভাইয়ের উপকারের উদ্দেশ্যে মুসলমানের দোকান থেকে ক্রয় করলে উত্তম হবে। (امداد الفتاوی ٣/[illegible])

* অমুসলিমদের সাথে একত্রে বসে বা তাদের বরতনে খাওয়া মাকরূহ, তবে ঠেকাবশত হলে জায়েয। আর যদি জানা থাকে যে, তাদের বরতন নাপাক তাহলে জায়েয নয়। (فتاوی محمودیہ ٥/[illegible])

## সুপারিশ সম্পর্কে নীতিমালা

কারও কার্যোদ্ধার করে দেয়ার জন্য যে সুপারিশ করা হয়, তার মধ্যে



এক প্রকার সুপারিশ হল বৈধ ও ভাল সুপারিশ। এরূপ সুপারিশ করলে ছওয়াব লাভ হয়। যে কার্য উদ্ধারের জন্য সুপারিশ করা হবে উক্ত কার্য যে করবে সে যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে, সুপারিশকারী ব্যক্তিও সে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে; চাই তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হোক বা না হোক। আর এক প্রকার সুপারিশ হল অবৈধ ও মন্দ সুপারিশ। এরূপ সুপারিশ করলে পাপ হয়। যে অবৈধ কাজের জন্য সুপারিশ করা হবে সে কাজ করলে যে পাপ হবে অবৈধ সুপারিশেও সে পরিমাণ পাপ হবে।

### বৈধ ও ভাল সুপারিশের জন্য শর্ত হল:

১. যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তার দাবি সত্য ও বৈধ হতে হবে।

২. যার নিকট সুপারিশ করা হবে, সুপারিশকারী তার উপর নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে চাপ ও জবরদস্তী প্রয়োগ করতে পারবে না। সারকথা- বৈধ বিষয়ের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করা হল ভাল সুপারিশ।

### সুপারিশ মন্দ এবং অবৈধ হয়ে যায় নিম্নোক্ত কারণে:

১. কোনো অবৈধ এবং অসত্য দাবি আদায়ের জন্য সুপারিশ করলে।

২. সুপারিশের পন্থা অবৈধ হলে। সুপারিশকারী ব্যক্তি যদি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদবলের ভিত্তিতে যার নিকট সুপারিশ করা হবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে এরূপ পন্থায় সুপারিশ করা হল অবৈধ পন্থায় সুপারিশ। এভাবে কার্যোদ্ধার করা হারাম।

(ماخوذ از آداب المعاشرت و معرف القرآن)

## শোয়া এবং ঘুমের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ

১. ইশার নামাযের পর গল্প-গুজব বা দুনিয়াবী কাজ-কর্ম কিংবা দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত না হয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়া সুন্নাত। এ সুন্নাত পালন করলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা সহজ হয় কিংবা অন্তত ফজরের নামাযের জন্য সহজেই ঘুম ভাঙ্গে। ইশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা মাকরূহ। দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় কথা বা দ্বীনী কথা বলা যায়।

২. ঘুমানোর পূর্বে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থেকে ফারেগ হয়ে নেয়া উত্তম।

৩. ঘুমানোর পূর্বে চেরাগ/বাতি ও আগুন নিভিয়ে দেয়া সুন্নাত। বিশেষ

প্রয়োজন না হলে ডিম লাইটও জ্বালিয়ে ঘুমানো ঠিক নয়। (گلزار سنت)

৪. ঘুমানোর পূর্বে খাদ্য-খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে দেয়া সুন্নাত। ঢাকার জন্য কোনো পাত্র না পেলে অন্তত একটা লাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখবে।

৫. মেসওয়াক করে ঘুমানো সুন্নাত।

৬. উযূ অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত।

৭. উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

৮. পূর্ব থেকেই বিছানো রয়েছে (যাতে ধুলা-বালি থাকার সম্ভাবনা) এমন বিছানা হলে তিনবার সে বিছানা ঝেড়ে নেয়া সুন্নাত।

৯. শোয়ার আগে কাপড় পাল্টানো সুন্নাত। (زاد المعاد)

১০.খুব বেশি নরম বিছানায় না ঘুমানো উত্তম।

১১.দরজার চৌকাঠের উপর কিংবা যে ছাদে রেলিং বা ঘেরা নেই তাতে শোয়া নিষেধ।

১২.সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদা (২১ পারা দ্র.) তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১৩.সূরা মূল্‌ক তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১৪.আয়াতুল কুরছী পাঠ করা সুন্নাত।

১৫.সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করা সুন্নাত।

১৬.তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বা ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া সুন্নাত।

১৭.কালিমায়ে তইয়্যেবা পড়া সুন্নাত।

১৮.দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।

১৯.তিনকুল (সূরা এখলাস, ফালাক ও নাছ) পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে বুলানো। এভাবে তিনবার করা সুন্নাত।

২০.সূরা কাফিরূন পড়া সুন্নাত। (أبو داود والترمذي)

২১.তিনবার এস্তেগফার পড়া এবং গোনাহ থেকে তওবা করা।

২২.ঘূমানোর পূর্বে ওছিয়াতের প্রয়োজন থাকলে তা করা।

২৩.মুর্দার মাথা কবরে যে দিকে রাখা হয় সে দিকে মাথা রেখে শোয়া (যেমন: আমাদের দেশের জন্য উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয়া) সুন্নাত।

২৪.প্রথমে অন্তত কিছুক্ষণ ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে ডান কাতে শোয়া সুন্নাত। (ابو داود)



২৫.ডান হাত গালের নিচে রেখে এই দুআ পড়বে–

**اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.** (رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থ: হে আল্লাহ, যেদিন তোমার বান্দাদেরকে তুমি পুনরুত্থিত করবে, সেদিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।

২৬. এই দুআ পড়ে শোয়া সুন্নাত–

**اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى.** (صحيح البخاري– كتاب الدعوات)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমারই নামে বাঁচি ও মরি। (বোখারী)

অথবা

**اَللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.** (بخاري ومسلم)

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ রাখলাম এবং তোমার কুদরতে আবার তা উঠাব। আর এ অবস্থায় যদি আমার আত্মাকে ধরে রাখ (অর্থাৎ, মৃত্যু ঘটাও), তাহলে আত্মার মাগফেরাত কর। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, জীবিত রাখ), তাহলে তার তত্ত্বাবধান করো যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের ক্ষেত্রে তুমি তার তত্ত্বাবধান করে থাক।

২৭.সর্বশেষে এই দুআ পড়বে। তাহলে ঐ ঘুমে মৃত্যু হলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

**اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ.** (متفق عليه)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার আত্মাকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার বিষয় তোমার উপর ন্যাস্ত করলাম, আমার মনোযোগ তোমার প্রতি নিবদ্ধ করলাম এবং তোমার প্রতি আগ্রহ ও তোমার ভয় সহকারে আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে রাখলাম, তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়ের স্থান নেই, কোনো পরিত্রাণ লাভের জায়গা নেই। আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছ; আর তোমার নবীর প্রতি, যাকে তুমি

রসূলরূপে প্রেরণ করেছ।

২৮. উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ। (تعليم الدين)

২৯.এক পা খাড়া করে তার উপর অপর পা রেখে চিত হয়ে এমনভাবে শয়ন করবে না, যাতে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সতর না খুললে ক্ষতি নেই। (تعليم الدين)

৩০. যিকির করতে করতে ঘুমানো উত্তম।

৩১. শোয়ার পর ঘুম না আসলে পড়বে–

**اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ.** (رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب)

অর্থ: আল্লাহ্‌র সমস্ত কালামের ওছীলা দিয়ে আমি তাঁর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তাঁর বান্দাদের অনিষ্টকারিতা, শয়তানদের উস্কানী এবং আমার কাছে তাদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী)

অথবা পড়বে–

**اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ، وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ، اَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ، لَاتَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، اَهْدِئْ لَيْلِيْ وَأَنِمْ عَيْنِيْ.** (تنبيه الغافلين)

অর্থ: হে আল্লাহ! নক্ষত্র দূরে চলে গিয়েছে, চোখগুলো আরাম লাভ করেছে, আর তুমি চিরঞ্জীব, স্ব-প্রতিষ্ঠ ও সবকিছু সংরক্ষণকারী, তোমাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। হে চিরঞ্জীব, হে আত্মপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী! এই রাতে আমাকে আরাম দাও, আমার চোখে ঘুম দাও।

৩২.ঘুম থেকে উঠে হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় হালকাভাবে মর্দন করবে, যাতে ঘুমের প্রভাব কেটে যায়।

৩৩. ঘুম থেকে উঠে তিনবার আল হামদু লিল্লাহ বলা সুন্নাত।

৩৪. ঘুম থেকে উঠে তিনবার কালিমায়ে তইয়্যেবা পড়া সুন্নাত।

৩৫. ঘুম থেকে উঠে এই দুআ পড়া সুন্নাত–

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.** (صحيح البخاري)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (অর্থাৎ, নিদ্রা) দানের পর আবার জীবিত (অর্থাৎ, জাগ্রত) করেছেন এবং তাঁর কাছেই



আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (বোখারী)

* তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে এই দুআ পড়বে–

**اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَآؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.** (متفق عليه)

তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহও পাঠ করবে।

**اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ، رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.** (بخاري في كتاب التفسير)

৩৬.ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করা সুন্নাত।

৩৭.ঘুম থেকে উঠে উযূ করা উত্তম।

৩৮.ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো নিষেধ। তবে একান্ত অসুবিধাবশত ঘুমাতে হলে ইশার নামাযের জন্য জাগ্রত করার লোক নির্ধারিত করে

বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়ে ঘুমানো যেতে পারে।

৩৯.আসরের পরও ঘুমাবে না। (شرعة الإسلام)

৪০.সুযোগ হলে দুপুরে খাওয়ার পর কায়লূলাহ করা অর্থাৎ, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা সুন্নাত, ঘুম আসুক বা না আসুক।

৪১.এক কাপড়ের (এক কাঁথা বা এক লেপের) নিচে দুই জন পুরুষ বা দুই জন মেয়ে লোক শয়ন করা বড়ই খারাপ এবং লজ্জার কথা। (تعليم الدين)

## স্বপ্ন বিষয়ক বিধি-নিষেধসমূহ

* পছন্দমত খাব (স্বপ্ন) দেখলে এবং তা বর্ণনা করতে চাইলে মহব্বত রাখে– এমন লোকের নিকট বা কোন আলেমের নিকট বর্ণনা করা সুন্নাত।

* দিনের শুরুভাগে দুনিয়ার ঝামেলায় মশগুল হওয়ার পূর্বে রাতের স্বপ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারলে উত্তম। (مفاتيح الجنان نقلا عن شرح المصابيح)

* কোনো দুঃস্বপ্ন অর্থাৎ, অপছন্দনীয় বা ভয়-ভীতির খাব দেখলে ৫টা আমল করবে, তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

১. স্বপ্ন দেখে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলবে।

২. তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম ওয়া শাররি হাযিহির রুইয়া) পড়বে। এর অর্থ হল– বিতাড়িত শয়তান থেকে এবং এই স্বপ্নের অপকারিতা থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই।

৩. পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোবে।

৪. এই স্বপ্নের অপকারিতা থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرُّؤْيَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এই স্বপ্ন এবং এর অন্তর্নিহিত যা কিছু রয়েছে তার মঙ্গল কামনা করি। আর এই স্বপ্ন ও তার মধ্যকার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

৫. এরূপ দুঃস্বপ্ন কারও নিকট বর্ণনা করবে না।

* কেউ স্বপ্ন বর্ণনা করলে ব্যাখ্যা ভাল মনে হলে তা-ই বলবে, নতুবা শ্রবণকারী ও ব্যাখ্যাদাতা উভয়েই বলবে, خَيْرًا رَأَيْتَ وَخَيْرًا يَّكُوْنُ অর্থাৎ,



ভাল দেখেছেন, ভালই হবে। (كتاب الأذكار)

## সহবাসের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ

১. সংগম শুরু করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নেয়া; অর্থাৎ, এই নিয়ত করা যে, এই হালাল পন্থায় যৌন চাহিদা পূর্ণ করা দ্বারা হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তৃপ্তি লাভ হবে এবং তার দ্বারা কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া যাবে, ছওয়াব হাছেল হবে এবং সন্তান লাভ হবে।

২. কোনো শিশু বা পশুর সামনে সংগমে রত না হওয়া।

৩. পর্দা-ঘেরা স্থানে সংগম করা।

৪. সংগম শুরু করার পূর্বে শৃঙ্গার (চুম্বন, স্তন-মর্দন ইত্যাদি) করবে।

৫. বীর্য, যৌনাঙ্গের রস ইত্যাদি মোছার জন্য এক টুকরা কাপড় রাখা।

৬. বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করা।

৭. শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া। উভয়টিকে একত্রে এভাবে বলা–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا. (متفق عليه)

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। (বোখারী ও মুসলিম)

৮. সংগম অবস্থায় বেশি কথা না বলা। (شرعة الإسلام)

৯. সংগম অবস্থায় স্ত্রী-যোনীর দিকে নজর না দেয়া। (شرح النقاية) তবে হযরত ইবনে ওমর (রা.) সংগম অবস্থায় স্ত্রী-যোনীর দিকে দৃষ্টি দেয়া উত্তেজনা বৃদ্ধির সহায়ক বিধায় এটাকে উত্তম বলতেন।

১০. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বীর্যপাতের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا. (مصنف ابن أبي شيبة رقم ٣٠٣٥٣)

অর্থ: হে আল্লাহ, যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার মধ্যে শয়তানের কোনো অংশ (তথা প্রভাব) রেখ না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

১১. বীর্যের প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি না দেয়া।

১২.বীর্যপাতের পরই স্বামীর নেমে না যাওয়া বরং স্ত্রীর উপর অপেক্ষা করা, যেন স্ত্রীও তার খাহেশ পূর্ণ মাত্রায় মিটিয়ে নিতে পারে। (مجمع الزوائد)

১৩. সংগম শেষে পেশাব করে নেয়া জরুরি। (شرعة الإسلام)

১৪.সংগমের পর সাথে সাথে গোসল করে নেয়া উত্তম। অন্তত উযূ করে নেয়া।

১৫.স্বপ্নদোষের পর সংগম করতে হলে পেশাব করে নিবে এবং যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিবে।

১৬.এক সংগমের পর পুনর্বার সংগমে লিপ্ত হতে চাইলে যৌনাঙ্গ এবং হাত ধুয়ে নিতে হবে।

১৭. সংগমের পর অন্তত কিছুক্ষণ ঘুমানো উত্তম।

১৮. জুমুআর দিন সংগম করা মোস্তাহাব।

১৯.সংগমের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করা নিষেধ। এটা একদিকে নির্লজ্জতা, অন্যদিকে স্বামী/স্ত্রীর হক নষ্ট করা।

## হায়েয নেফাস অবস্থায় সংগম ইত্যাদির বিধি-নিষেধ

* হায়েয নেফাস অবস্থায় যৌন সংগম থেকে বিরত থাকা ফরয এবং যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়া হারাম।

* হায়েয অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে একত্রে শয়ন ও একত্রে পানাহার অব্যাহত রাখা সুন্নাত। (এতে মাজূসী বা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।)

* হায়েয অবস্থায় স্ত্রী পুরাতন আকর্ষণহীন কাপড়-চোপড় পরিহিতা থাকবে, যাতে তাকে দেখলে স্বামীর উত্তেজনা হ্রাস পায়, বৃদ্ধি না ঘটে।

* হায়েয নেফাস অবস্থায় নামায পড়বে না।

* নামাযের সময়ে উযূ করে নামাযের স্থানে নামায আদায় পরিমাণ সময় বসে থেকে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকবে, যেন ইবাদতের অভ্যাস বজায় থাকে। এটা মোস্তাহাব। (سراجية)

* হায়েয অবস্থায় মহিলা প্রতি নামাযের ওয়াক্তে সত্তর বার এস্তেগফার পাঠ করবে।[১]

## জানাবাত (বে-গোসল) অবস্থার বিশেষ বিধি-নিষেধসমূহ

* জানাবাত অবস্থায় নখ, কাটা বা নাভির নিচের হাজামত (ক্ষৌরকার্য) বানানো মাকরূহ। (عالمگیری)

* জানাবাত অবস্থায় মসজিদে গমন করা, কাবা শরীফ তওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বা তিলাওয়াত করা এবং নামায পড়া নিষেধ। তবে দুআ হিসাবে কোন আয়াত পড়তে পারে।

১. এতে এক হাজার রাকআত নামাযের ছওয়াব হবে, সত্তরটা গোনাহ মাফ হবে



এবং দরজা বুলন্দ হবে ইত্যাদি। (تاتار خانیہ)

* জানাবাত অবস্থায় কালিমা, দুরূদ শরীফ, যিকির, এস্তেগফার বা কোন ওজীফা পাঠ করতে নিষেধ নেই।

* জানাবাত অবস্থায় কুলি করা ব্যতীত পানি পান করা মাকরূহ তানযীহী।

* জানাবাত অবস্থায় হাত ধোয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করা মাকরূহ তানযীহী। (احسن الفتاوی ২/□□)

## ঘরে প্রবেশের ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরবাসীর অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। এমনকি পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পুত্র-কন্যার ঘর হলেও অনুমতি গ্রহণ করা জরুরি। একমাত্র যে ঘরে শুধুমাত্র প্রবেশকারীর স্ত্রী বা স্বামী থাকে সেখানে উক্ত প্রবেশকারীর জন্য অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, তবে সেখানেও কাশি দিয়ে, জুতোর শব্দ করে বা যে কোনোভাবে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব ও উত্তম। আবার স্ত্রীর সাথে অন্য কেউ রয়েছে বলে নিশ্চিত জানা থাকলে বা তার প্রবল ধারণা হলেও অনুমতি নেয়া জরুরি।

* দোকান-পাট, কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত, হোটেল, পার্ক ইত্যাদি যেসব স্থানে গণমানুষের প্রবেশ করার সাধারণ অনুমতি থাকে, সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে যেসব অফিস দপ্তর প্রাইভেট, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদেরকে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

*** অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত তরীকা হল:** দরজার বাইরে থেকে সালাম দিবে কিংবা সালাম দিয়ে বলবে আসতে পারি? ভিতর থেকে সাড়া না পেলে আবার সালাম দিবে। এভাবে তিনবার করবে। তারপরও যদি ভিতর থেকে কোনো সাড়া না আসে, তাহলে যেখান থেকে চলে আসবে। উল্লেখ্য, এই সালামকে বলা হয় 'সালামে ইস্তিযান' বা অনুমতি গ্রহণের সালাম। এই সালামের উত্তর ওয়ালাইকুমুস সালাম ... নয় বরং এর উত্তর হল প্রবেশের অনুমতি দেয়া বা না দেয়া। প্রবেশের অনুমতি দিলে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সময় স্বাভাবিক সালাম জওয়াব আদান-প্রদান করতে হবে।

* অনুমতি চাওয়ার জন্য দরজায় করাঘাত করা, কড়া নাড়ানো কিংবা বর্তমানে প্রচলিত কলিং বেল বাজানো, ভিজিটিং কার্ড বা আইডেন্টিটি কার্ড প্রেরণ পূর্বক অনুমতি চাওয়া– এগুলো দ্বারাও অনুমতি চাওয়ার হুকুম

আদায় হয়ে যাবে।

* অনুমতি চেয়ে এমন স্থানে দাঁড়াবে, যাতে গায়র মাহরাম কেউ দরজা/ জানালা খুললে বা পর্দা সরালে নজরে না পড়ে কিংবা কোনোভাবে গোপন কিছু নজরে না আসে।

* ভিতর থেকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কে? তাহলে এরূপ বলবে না যে, "আমি" বরং পরিষ্কার নিজের নাম বলবে, আমি অমুক। প্রয়োজনে নিজের পরিচয়ও বলবে।

২. 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরে প্রবেশ করা সুন্নাত।

৩. ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে।

৪. প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

**اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا.** (أبو داؤد– كتاب الأدب)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি গৃহে প্রবেশ করতে এবং বের হতে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে গৃহ থেকে বের হই। আর আল্লাহ্র উপরই আমি ভরসা রাখি।

৫. ঘরবাসীকে সালাম দিবে।

৬. ঘরে কোনো লোক না থাকলে এই বলে সালাম দিবে–

**اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ.**

অর্থ: হে গৃহবাসী, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (মাআরেফুল কুরআন)

৭. কেউ ঘুমন্ত এবং কেউ জাগ্রত থাকলে জাগ্রতদেরকে এমনভাবে সালাম দিবে যেন ঘুমন্তদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

৮. ঘরের দরজা বন্ধ করতে হলে বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করবে।

৯. তারপর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে। আয়াতুল কুরছী হল কুরআন শরীফের তৃতীয় পারার শুরুতে **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اَلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** থেকে শুরু করে **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ** পর্যন্ত।

(معرف القرآن ও مسائل و آداب بلاقات، شرعة الإسلام প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. বিসমিল্লাহ বলে দরজা খুলবে।



২. নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

**بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.**

(أبو داود –كتاب الأدب)

অর্থ: আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। শক্তি সামর্থ কেবল আল্লাহ্র কাছ থেকেই আসে।

৩. উলামায়ে কেরাম সাধারণভাবে বাম পা দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার কথা লিখেছেন। তবে নেক কাজের উদ্দেশ্যে বের হলে ডান পা দিয়ে বের হওয়াই উত্তম বলে মনে হয়।

৪. সব রকম ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে মুক্তি চাওয়া বিষয়ক নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

**اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ أَنْ اَضِلَّ أَوْ اُضَلَّ أَوْ اَزِلَّ أَوْ اُزَلَّ أَوْ اَظْلِمَ أَوْ اُظْلَمَ أَوْ اَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.** (ابو داؤد –كتاب الأدب)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি নিজে বা অন্য কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়া, নিজে বা অন্য কর্তৃক বিচ্যুত হওয়া, জালেম হওয়া বা মাজলূম হওয়া, নাদানী করা বা নাদানীর শিকার হওয়া (এই সবকিছু) থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

৫. বের হয়ে আয়াতুল কুরছী পড়বে। (شرعة الإسلام)

* মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলে আরও বিশেষ কয়েকটি আমল রয়েছে। তার জন্য দেখুন ১৮০ পৃষ্ঠা।

## চলার সুন্নাত ও আদবসমূহ

* বড় রাস্তা হলে ডান দিক দিয়ে চলবে।

* দৃষ্টি নত করে চলবে।

* কিছুটা সম্মুখপানে ঝুঁকে চলবে। নবী কারীম (সা.) এরূপ চলতেন।

* হাত পা ছুড়ে ছুড়ে অহংকারের সাথে চলবে না।

* রাস্তা অতিক্রম করার সময় যথাসম্ভব দ্রুত চলবে।

* নারীদের জন্য রাস্তার কিনারা ছেড়ে দিবে।

* প্রয়োজনে চলার পথে কোথাও থামতে এবং অবস্থান করতে হলে এমন জায়গায় অবস্থান করবে, যাতে অন্যদের চলা-ফেরা ইত্যাদির ব্যাঘাত না ঘটে।

* পথে কষ্টদায়ক কিছু পেলে তা সরিয়ে দিবে।

* মুসলমানদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের সালামের উত্তর দিবে।

* প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বারণ) করবে।

* কোনো অন্ধকে দেখলে প্রয়োজনে (ডান হাত দিয়ে তার বাম হাত ধরে) তাকে যতটুকু সে চায় এগিয়ে দিবে।

* পথ হারাকে পথের সন্ধান বলে দিবে। তবে কোনো কাফেরকে তাদের উপাসনালয়ের সন্ধান বলে দিবে না।

* নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেও তার জন্য লোকদেরকে পথ থেকে ধাক্কা দেয়া বা সরানো ঠিক হবে না। নবী কারীম (সা.)–এর জন্য এরূপ করা হত না।

* বৃদ্ধ লোকদের জন্য চলার সময় লাঠি নেয়া সুন্নাত।

* উপর দিকে উঠার সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত।

* নিচের দিকে নামার সময় বাম পা আগে বাড়ানো এবং 'সুবহানাল্লাহ' বলা সুন্নাত।

* সমতল স্থান দিয়ে চলার সময় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সুন্নাত।

* ইয়াহুদী নাছারাদেরকে দেখলে তাদের জন্য পথ সংকুচিত করে দিবে– প্রশস্ত করে দিবে না; যাতে তাদের সম্মান প্রকাশ না পায়।

* যাদের বয়স এবং ইল্‌ম বেশি, তাঁদেরকে সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া আদব। উল্লেখ্য, বয়স এবং ইল্‌ম– এ দু'টোর মধ্যে ইল্‌ম অধিক মর্যাদার হকদার, অতএব অধিক বয়সী ব্যক্তি অধিক ইল্‌মের অধিকারীকে (যদিও তার বয়স কম হয়) সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দিবেন।

## যানবাহনের সুন্নাত, আদব ও আমলসমূহ

* বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে আরোহণ করা সুন্নাত।

* প্রথমে ডান পা যানবাহনে রাখা সুন্নাত। 'বিসমিল্লাহ' বলতে বলতে পা রাখবে।

* ভালভাবে আসন গ্রহণের পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে।

* তারপর (যানবাহন চলতে শুরু করলে) নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত।

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. (ترمذي)



অর্থঃ পবিত্র ঐ আল্লাহ, যিনি একে আমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, অথচ একে আমরা নিজেদের আয়ত্বাধীন করতে পারতাম না। আর নিশ্চয় আমরা আপন প্রভুর কাছে ফিরে যাব। (তিরমিযী)

* তারপর তিনবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলবে।

* তারপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে।

* তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (ترمذي)

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, আমি তো আমার নিজের উপর অবিচার করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ছাড়া আর কেউ পাপরাশি ক্ষমা করার নেই। (তিরমিযী)

বি. দ্র. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআটি পড়ে মুচকি হেসেছিলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার এরূপ দুআ করায় খুশি হয়ে বলেন, আমার বান্দা জানে, আমি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। উল্লেখ্য, দুআটির মধ্যে এই বলা হয়েছে যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করার নেই।

* নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে চড়লে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. (كتاب الأذكار عن ابن السني)

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামেই এর চলা ও থামা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (কিতাবুল আযকার)

* গাড়ীর মালিককে গাড়ীর সামনে এবং সওয়ারীর মালিককে সওয়ারীর সামনে বসতে দিবে, এটা তার হক। অবশ্য মালিক কাউকে সামনে বসার অনুরোধ করলে তিনি সামনে বসতে পারেন।

## সফরে যাওয়ার সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়াকে অধিক পছন্দ করতেন। সোমবার সফর করাও সুন্নাত। (مفاتيح الجنان نقلا عن المصابيح) এ ছাড়া যেকোনো দিন সফর করা যায়। ইসলামে

অমুক অমুক দিন বা অমুক অমুক সময় যাত্রা নাস্তি (যাত্রা করা খারাপ)– এরূপ কোনো ধারণা নেই।

* সফরের ইচ্ছা হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

**اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَجُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ.** (رواه أحمد والبزار برجال ثقات)

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যেই আমি (শত্রুর উপর) আক্রমণ করি, তোমার সাহায্যেই তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করি এবং তোমার সাহায্যেই সফর করি। (মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে বায্যার)

* যথাসম্ভব একাধিক ব্যক্তি সফরে যাওয়া উত্তম; একাকী সফরে না যাওয়া উচিত। কমপক্ষে তিনজনে সফর করার প্রতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহিত করেছেন (بخاري) চারজন হওয়া খুবই ভাল। (أبو داود)

* তিনজনের (বা আরও অধিক হলে তাদের) মধ্যে একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। (أبو داود)

* সফরে কুকুর এবং ঘণ্টা সাথে রাখা নিষেধ। (مسلم)

* রওয়ানা হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

**اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْٓءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.**

(مسلم –كتاب الحج)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই সফরে তোমার কাছে আমি নেকী ও পরহেযগারীর প্রার্থনা করি এবং ঐসব কাজের তাওফীক চাই যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ, আমার এই সফর সহজ কর এবং ভ্রমণ পথের দূরত্ব কমিয়ে দাও (অর্থাৎ, সহজে অতিক্রম করিয়ে দাও)। হে আল্লাহ, তুমিই আমার সফরের সাথী এবং আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। হে আল্লাহ, সফরের যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই এবং পানাহ চাই এই সফরের সমস্ত কুদৃশ্য থেকে, ঘরে প্রত্যাবর্তন করে মাল ও পরিবারের দুরবস্থা দর্শন থেকে। আর তোমার কাছে পানাহ চাই গঠিত হওয়ার পর ভাঙ্গন থেকে এবং মাজলূমের বদ-দুআ থেকে। (মুসলিম)



* সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় দুই বা চার রাকআত নফল নামায পড়ে নেয়া উত্তম। (شرعة الإسلام)

* রওয়ানা হওয়ার সময় এই বলে পরিবার থেকে বিদায় নেয়া সুন্নাত–

**اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا يَضِيْعُ وَدَآئِعُهٗ.** (شرعة الإسلام و كتاب الأذكار)

অর্থ: তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে আমানত রেখে গেলাম, যার আমানত নষ্ট হয় না। (শিরআতুল ইসলাম ও কিতাবুল আযকার)

* বিদায় দানকারীগণ বলবে,

**اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.** (رواه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب)

অর্থ: তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতদারী এবং তোমাদের কাজের ফলাফল আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম। (তিরমিযী)

* বিদায় দেয়ার সময় অনেকে "খোদা হাফেজ" বলে বিদায় দেন, এ ব্যাপারে মাসআলা হল– যদি সালামের স্থলে খোদা হাফেজ বলা হয়, তাহলে এতে শরীআতের বিকৃতি ঘটানো হয়, কেননা শরীআত বিদায়ের সময় সালাম ও উপরোক্ত দুআর তালীম দিয়েছে। আর যদি সালাম এবং উক্ত দুআর সাথে অতিরিক্ত এই "খোদা হাফেজ" কথাটা বলা হয়, তাহলে তাতে শরীআতের একটি আমলের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটানো হয়। অতএব এসবের প্রেক্ষিতে খোদা হাফেজ বলা জায়েয নয়। আর যদি দুআ হিসাবে এ কথাটি মাঝে মধ্যে বলা হয় এবং কখনও অন্য বাক্যও দুআ হিসাবে বলা হয়, তাহলে নাজায়েয হওয়ার কথা নয়, তবে বর্তমানে খোদা হাফেজ বলাটা একটা রছম ও নিয়মে পরিণত হয়েছে বিধায় এটা পরিত্যাগ করা উচিত। (بضوء احسن الفتاوى □□/١)

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং পথ চলার সময় সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ করবে। এমনিভাবে সওয়ারীতে আরোহণের সময় সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ করবে।

* কোন মঞ্জিল বা স্টেশনে নামলে পড়বে,

**اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.** (مسلم و ترمذى)

অর্থ: আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাণীসমূহের ওছীলা দিয়ে আমি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ঠ থেকে পানাহ কামনা করছি। (মুসলিম ও তিরমিযী)

* যে শহর বা গ্রামে যাবে, যখন দূর থেকে ঐ শহর বা গ্রাম নজরে পড়বে তখন এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. (رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم ٢٠٣٥ وقال : صحيح لإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص : صحيح.)

অর্থ: আল্লাহ, যিনি সপ্ত আকাশ ও তার ছায়াতলে যা কিছু রয়েছে তার প্রভু, সপ্ত জমিন ও তার অভ্যন্তরস্থ সবকিছুর প্রভু, শয়তানের এবং তারা যাদেরকে গোমরাহ করে তাদের প্রভু, বাতাসের এবং যা কিছু বাতাস উড়িয়ে নেয় তার প্রভু– সেই আল্লাহ্র কাছে আমরা এই গ্রাম/শহরের যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি। আর এখানকার অধিবাসী এবং এখানকার সবকিছুর অনিষ্ঠ থেকে পানাহ চাচ্ছি। (মুস্তাদরকে হাকিম)

* উক্ত শহর/গ্রামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে তিনবার পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا. (حصن حصين)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাদের জন্যে এর মধ্যে বরকত দাও। (হিসনে হাসীন)

* অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلٰى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا. (حصن حصين)

অর্থ: হে আল্লাহ, এখানকার ফল-ফলাদি আমাদের নসীব কর, এখানকার বাসিন্দাদের অন্তরে আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং এখানকার সৎ লোকদের ভালবাসা আমাদের অন্তরে দান কর। (হিসনে হাসীন)

* সফরের মধ্যে ভোর বেলায় পড়বে–

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ. (أبو داود –كتار الأدب)

অর্থ: শ্রবণকারী (আল্লাহ) আমাদের কৃত আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তাঁর নেয়ামত ও আমাদেরকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় রাখার স্বীকৃতির কথা শুনেছেন। হে



আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের সঙ্গী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই জাহান্নামের আগুন থেকে। (আবূ দাউদ)

* সফরে চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে দুই রাকআত পড়বে। একে কছর বলে। তবে ইমাম যদি চার রাকআত পড়নেওয়ালা হন, তবে তার পিছনে এক্তেদা করলে নামায পূর্ণই পড়তে হবে। বিশেষ ওজর না থাকলে সুন্নাত পড়তে হবে এবং পূর্ণ পড়তে হবে। নিজের এলাকা বা স্টেশন ছেড়ে গেলেই কছরের হুকুম আরম্ভ হয় এবং ৪৮ মাইল (সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটার) বা তার অধিক পথ সফরের এরাদায় রওয়ানা হলেই তখন পথিমধ্যে কছরের এই নিয়ম প্রযোজ্য হয়। আর গন্তব্যস্থানে পৌছার পর নিজের বাড়ী না হলে সেখানে ১৫ দিনের কম থাকার এরাদা হলে কছর করতে হবে। আর ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার এরাদা হলে কছর নয় বরং নামায পূর্ণ পড়তে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২৩৭ পৃষ্ঠা।

* সফরে সাথী-সঙ্গীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এবং সঙ্গীদের মাল-সামানের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে। শরীআতে সফরসঙ্গীদের হক প্রতিবেশীর হকের মত। তাই এদিকে খুব খেয়াল রাখা কর্তব্য।

* সফরে দুআ কবূল হয়, তাই দুআর প্রতি এহতেমাম রাখতে হবে।

## সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের আমলসমূহ

* সফরের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সফরে থাকা ভাল নয়।

* সফর থেকে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসবে, এতে তার জন্য অপেক্ষমান লোকদের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। (شرح شرعة الإسلام)

* প্রত্যাবর্তনকালে নিজ শহর বা এলাকায় প্রবেশকালে পড়বে–

اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. (رواه الترمذي وقال : حسن صحيح)

অর্থ: আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। (তিরমিযী)

* দূর-দূরান্তের সফর থেকে অনেক দিন পর বাড়িতে আসলে ঘরে প্রবেশের পূর্বে পরিবারকে সংবাদ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ঘরে প্রবেশ করবে, যাতে স্ত্রী স্বামীর জন্য পরিপাটি হয়ে নিতে পারে।

* আর অনেক রাত হলে উত্তম হল সকালে ঘরে আসবে। অবশ্য ঘরবাসীরা যদি তার অপেক্ষায় থাকে, তাহলে তখনই ঘরে প্রবেশ করাতে অসুবিধা নেই।

* সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য সুন্নাত হল ঘরে প্রবেশের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করে নেয়া।

* ঘরে পৌঁছে পড়বে–

أَوْبًا اَوْبًا لِرَبِّنَا تَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا. (حصن حصين)

অর্থ: ফিরে এলাম ফিরে এলাম, আমাদের রবের কাছে এমন তওবা করলাম যার ফলে আমাদের কোনো গোনাহ আর অবশিষ্ট থাকবে না। (হিসনে হাসীন)

* সফর থেকে ফিরে এসে সফরের মধ্যে যেসব বিপদ-আপদ বা কষ্ট ঘটেছে তার বর্ণনা পরিহার করত তার প্রতি আল্লাহ্র যেসব নেয়ামত ও অনুগ্রহ ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। এটাই উত্তম। (معرف القرآن)

## বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবতের সময় যা যা করণীয়

* মানুষের উপর বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবত কখনও তার পাপের কারণে এসে থাকে। এটা এ জন্য এসে থাকে যেন সে ভবিষ্যতে পাপের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়। অতএব এ বিপদ-আপদ তার প্রতি এক প্রকার রহমত। আবার কখনও বিপদ-মুছীবত তার পরীক্ষা স্বরূপ এবং তার দরজা বুলন্দ করার জন্যও এসে থাকে। এটাও তার প্রতি আল্লাহ্র রহমত। তবে বিপদ-আপদ আসলে এটা নিজের পাপের কারণেই এসেছে তাই মনে করতে হবে এবং সে প্রেক্ষিতে বিনয়ী হতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আর বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে। এ কথা বলা যাবে না কিংবা মনে করা যাবে না, আমার পরীক্ষা চলছে, কেননা এরূপ বলা বা মনে করার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হতে পারে যে, আমার পাপ নেই। অতএব পাপের কারণে আমার এ বিপদ ঘটেনি বরং আমি পরীক্ষা দিয়ে মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এটা এক ধরনের বড়ায়ী বা অহংকারের শামিল হয়ে যেতে পারে। সারকথা–

ক. বিপদ-আপদকে আল্লাহ্র রহমত মনে করতে হবে।

খ. তা নিজের পাপের কারণে ঘটেছে ভেবে আল্লাহ্র কাছে বিনয়ী হতে হবে।



(গ) তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহ্র নিকট বিপদ চেয়ে নেয়া ঠিক নয়।

(ঘ) সবর করতে হবে, বে-সবরী ও হাহুতাশ করা যাবে না।

* যেকোনো সমস্যা ও বিপদ-মুছীবত দেখা দিলে দুই রাকআত সালাতুল হাজত নামায পড়ে আল্লাহ্র নিকট তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করা সুন্নাত। বিপদ-আপদ বা সমস্যা দেখা দিলে সেই পেরেশানীতে পড়ে আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং ইবাদত ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে পিছিয়ে পড়া অন্যায়।

* ছোট-বড় যেকোনো ধরনের বিপদ দেখা দিলে এমনকি শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলেও নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا. (مسلم -كتاب الجنائز)

অর্থ: আমরা তো আল্লাহ্রই, আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ, এই মুছীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান দিও এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বদলা দান কর। (মুসলিম)

* কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ৪১ বার ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া অত্যন্ত ফলদায়ক এবং এটা পরীক্ষিত আমল।

* কোন রোগ-ব্যাধি হলে চিকিৎসা করাবে। চিকিৎসা করা মোস্তাহাব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫২৪ পৃষ্ঠা।

* কোনো বিষয়ে মনে দুশ্চিন্তা বা পেরেশানী থাকলে কিংবা অশান্তির মধ্যে পড়লে পাঠ করবে–

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. (أبو داود -كتاب الأدب)

অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক। (আবূ দাউদ)

অথবা পড়বে–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ. (مستدرك حاكم)

অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছু ধারণকারী, আমি তোমার রহমতের ওছীলা দিয়ে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অথবা পড়বে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. (ترمذي و مستدرك حاكم)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আর আমি অবশ্যই গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

* শত্রুর বা কোনো দুষ্ট লোকের দ্বারা ক্ষতির ভয় হলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ. (أبو داود –كتاب الصلاة)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমাকে তাদের মোকবিলায় দাঁড় করাচ্ছি এবং তাদের অনিষ্ঠ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। (আবূ দাউদ)

* শত্রু ঘিরে ফেললে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا. (حصن حصين)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা কর এবং ভয়-ভীতি থেকে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান কর। (হিসনে হাসীন)

* কোনো আপনজন মারা গেলে তখন কি করণীয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

* প্রচণ্ড মেঘ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا. (أبو داود–كتاب الأدب)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই মেঘের সাথে যে অনিষ্টকারিতা রয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর। (আবূ দাউদ)

* বিদুৎ চমকাতে দেখলে বা বজ্রপাতের শব্দ শুনলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ.

(رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থ:, হে আল্লাহ! তোমার গজব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেল না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না। তার আগে আমাদেরকে শান্তি দাও। (মুস্তাদরকে হাকিম)



* ভয়ংকর তুফান ও ঘূর্ণিবার্তা আসলে সেদিকে মুখ করে দুই হাঁটু গেড়ে বসে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا. (مشكاة)

অর্থ: হে আল্লাহ! এই বাতাসকে রহমত বানাও, আযাব বানিও না, এবং একে উপকারী বাতাস বানাও, অপকারী বাতাস বানিও না। (মিশকাত)

* অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْأَجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. (متفق عليه)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই বৃষ্টি আমাদের আশেপাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! উঁচুস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড় প্রণালী ও বৃক্ষ উৎপাদনের স্থানসমূহের উপর বর্ষণ কর। (বোখারী ও মুসলিম)

* কোনো জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে পড়বে, "আল্লাহু আকবার" (كتاب الأذكار عن ابن السني) অথবা পড়বে–

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. (الأنبياء : ٦٩)

অর্থ: হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও।

অন্যকে বিপদ-আপদ ও মুছীবতগ্রস্ত দেখলে যা যা করণীয়

* কোনো মুসলমানের বিপদ-মুছীবতে খুশি নয় বরং সমবেদনা প্রকাশ করতে হবে।

* কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত।

* কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

* কাউকে কোন মুছীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا. (رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন, যে অবস্থায় তোমাকে ফেলেছেন। (তিরমিযী)

তবে দুআটি এমনভাবে পড়বে না যে, উক্ত মুছীবতগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে। কেননা, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে।

* কেউ রোগগ্রস্ত হলে তার শুশ্রূষা করা সুন্নাত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ৫২৮ পৃষ্ঠায়।

* কারও আপনজন মারা গেলে তাকে সান্ত্বনা জানাবে এবং শোক প্রকাশ করবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

## নিজের ভাল অবস্থায় বা সুখের অবস্থায় যা যা করণীয়

* সুখের অবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়া, বে-পরোয়া হয়ে যাওয়া এবং ইবাদতে গাফেল হওয়া চরম না শুকরী। বরং সুখের অবস্থায় নেয়ামতের শোকর স্বরূপ বেশী বেশী আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত।

* কোন বিশেষ সুসংবাদ প্রাপ্ত হলে বা সুখের কিছু ঘটলে সাজদায়ে শোকর বা নামাযে শোকর আদায় করার নিয়ম রয়েছে। দেখুন ২৪১ পৃষ্ঠা।

* ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, মান-সম্মান প্রভৃতি যেকোনো নেয়ামত প্রাপ্ত হলে সেটা আল্লাহর অনুগ্রহে ঘটেছে মনে করতে হবে। নিজের বাহুবলে হয়েছে ভেবে অহংকার বোধ করা অন্যায়।

* কেউ কোন সু-সংবাদ নিয়ে এলে তাকে এনআম (পুরস্কার) দেয়া নবীদের সুন্নাত। (معرف القرآن ٥/□□)

* খুশির কিছু ঘটলে বন্ধু-বান্ধব প্রমুখ লোকদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো সুন্নাত। হযরত ওমর ফারুক (রা.) সূরা বাকারা পড়ে শেষ করার পর খুশিতে উট জবাই করে লোকদেরকে খাওয়ান। (معرف القرآن)

* কোনো পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. (رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যার দানে যাবতীয় সৎকর্ম পূর্ণত্ব লাভ করে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

* নতুন ফসল দেখলে এবং তাতে ক্ষতির আশংকা হলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا تَضُرَّهٗ. (كتاب الأذكار عن ابن السني)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দান কর এবং একে নষ্ট কর না।



## অন্যের ভাল অবস্থা দেখলে যা যা করণীয়

* কোনো মুসলমানের সুখের কিছু দেখলে কিংবা ভাল কিছু হলে তাতে নিজেকেও সুখী বোধ করা এবং সেটা প্রকাশ করা উচিত।

* কোনো মুসলমানের ভাল কিছু হলে সেটা ধ্বংস হওয়ার কামনা করা অন্যায়। বরং এরূপ চেতনা ভিতরে এলে তার নেয়ামত আরও বৃদ্ধি পাক এরূপ দুআ করতে হবে, তাহলে সে চেতনা দূরীভূত হয়ে যাবে।

* কোনো মুসলমানকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে পড়বে–

تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ. (حصن حصين)

অর্থ: তুমি যেন এই কাপড় পুরাতন করতে পার। (আল্লাহ তোমাকে এতটুকু হায়াত দরাজ করুন) এবং তারপর যেন আল্লাহ তোমাকে এ স্থলে নতুন কাপড় দান করেন। (হিসনে হাসীন)

* কোনো মুসলমানকে হাসতে দেখলে পড়বে–

أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ. (أبُوْ داود- كتاب الأدب)

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। (আবূ দাউদ)

## চিকিৎসা বিষয়ক বিধি-বিধান

* রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা করানো এবং ওষুধ সেবন করা মোস্তাহাব। (مرقاة ج/٨) কেউ কেউ বলেন, চিকিৎসা করানো সুন্নাত। চিকিৎসা করাতে থাকবে, কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতে হবে।

* ওষুধে হারাম জিনিস ব্যবহার করবে না। কোনো হারাম বস্তুকে ওষুধ হিসাবে সেবন করা বা হারাম বস্তু মিশ্রিত ওষুধ সেবন করা জায়েয নয়। তবে কখনও যদি এমন অনন্যোপায় অবস্থা হয় যে, উক্ত ওষুধ ব্যতীত জীবন রক্ষা করা মুশকিল, তাহলে প্রয়োজন পূরণ হয়– এতটুকু পরিমাণ উক্ত ওষুধ সেবন করা জায়েয হবে। আর যদি জীবনের আশংকা দেখা না দেয়, শুধু চিকিৎসার জন্য অনুরূপ ওষুধের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি উক্ত ওষুধ ব্যতীত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে। (امداد الفتاوى ٤/□□ و درس ترمذی ١/□□)

* শরীআতের বরখেলাপ তাবীজ-তুমার করা, ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয নয়। শরীআতসম্মত তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক হলে তা করা যায়, তবে উত্তম নয়। (تعليم الدين) এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৮৮ পৃষ্ঠা।

* শরীরে যদি অস্বাভাবিকতা থাকে (যেমনঃ আঙ্গুল বেশি আছে) তাহলে প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয। নিছক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য জায়েয নয়।

* কারও উপর বদ নজর লাগলে তখন কি করণীয় সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৮৮ পৃষ্ঠা।

* কালজিরা এবং মধুর মধ্যে আল্লাহ তাআলা বহু রোগ নিরাময়ের শক্তি রেখেছেন বলে হাদীছে বর্ণিত রয়েছে।

* চিকিৎসা অবস্থায় রোগের জন্য ক্ষতির বস্তু থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (رسول الله صلى الله عليه و سلم كى سنتيں)

* শরীরে রক্ত প্রদান এবং চক্ষু ও কিডনী সংযোজন সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩৯২ পৃষ্ঠা।

## খতমে ইউনুস/খতমে শেফা

* উলামায়ে কেরামের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সোয়া লক্ষ বার দুআয়ে ইউনুস পাঠ করে দুআ করা হলে রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটাকে খতমে ইউনুস বা খতমে শেফা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে আঁটকা পড়ে এই দুআটি পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন। দুআয়ে ইউনুস এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র, আমি তো পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

* উল্লেখ্য যে, এই দুআটি সোয়া লক্ষ বার পাঠ করে দুআ করলে বিপদ-আপদ বা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ হবে এ বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। অতএব খতমে ইউনুস/খতমে শেফা-কে সুন্নাত তরীকা মনে করা যাবে না, এরূপ মনে করলে তা বিদআত হয়ে যাবে। (এ সম্বন্ধে আরও জানার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার নোটটি দেখুন।)

* বিপদ-আপদ বা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে খতমে ইউনুস পাঠ করা হলে পাঠকারীকে বিনিময় বা পারিশ্রমিক প্রদান করা ও পাঠকারীর জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয।

## খতমে জালালী

* কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে এক লক্ষ বার কালিমায়ে তইয়্যেবা পাঠ করলে সে উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে থাকে। এটাকে জালালী খতম বা লাখ



কালিমা পাঠ বলা হয়ে থাকে। এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত বিষয়, কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটাকে সুন্নাত মনে করলে তা বিদআত হয়ে যাবে। কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে এ খতম পাঠ করা হলে তার পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়ই জায়েয।

## খতমে বোখারী

* বোখারী শরীফ খতম করে দুআ করা হলে দুআ কবূল হয়ে থাকে এবং কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে বোখারী খতম করে দুআ করা হলে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে। এটা ওলামা ও বুযুর্গদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত, কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। (এ সম্বন্ধে এ পৃষ্ঠার শেষের নোটটি দেখুন।)

* পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে বোখারী খতম করালে পাঠকারীকে তার বিনিময় প্রদান ও পাঠকারীর জন্য তা গ্রহণ উভয়টি জায়েয।

## খতমে খাজেগান

* খাজেগান অর্থ সাহেবগণ অর্থাৎ, মনীষী ও বুযুর্গানে দ্বীন। বুযুর্গানে দ্বীন যে খতম পড়ে দুআ করতেন সে খতমকে 'খতমে খাজেগান' বলে। খতমে খাজেগান পাঠ করে দুআ করা হলে কবূল হয়ে থাকে– এ ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এটা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটাকে সুন্নাত মনে করলে বিদআত হয়ে যাবে।

* পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে খতমে খাজেগান পাঠ করা হলে তার বিনিময় প্রদান ও গ্রহণ উভয়টি জায়েয।

**নোটঃ** খতমে শেফা, খতমে বোখারী, খতমে খাজেগান, খতমে দুরূদে নারিয়া ইত্যাদি খতম যেহেতু কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আমল নয়, তাই এগুলোর চেয়ে বিপদ-মুছীবতে পড়লে কুরআন-হাদীছে শেখানো আমলই উত্তম। আর বিপদ-মুছীবতে পড়লে কুরআন-হাদীছে শেখানো আমল হল দুআ করা, সালাতুল হাজত পড়া ও দান-খয়রাত করা। কোনো সংখ্যার বাধ্যবাধকতা ছাড়া দুআয়ে ইউনুস পড়ার কথাও হাদীছে এসেছে। কুরআন-হাদীছে শেখানো এসব আমলের সাথে এসব খতমের কোনো তুলনা হতে পারে না। কুরআন হাদীছের শেখানো আমল অবশ্যই অগ্রগণ্যতা রাখে।

## খতমে দুরূদে নারিয়া

দুরূদে নারিয়া কি এবং খতমে দুরূদে নারিয়া কি এ সম্পর্কে জানার

জন্য দেখুন ৬৫৫–৬৫৬ পৃষ্ঠা।

## আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে মাসায়েল

* পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুছীবত দূর করার জন্য বা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য যে আসবাব বা উপায়-উপকরণ গ্রহণ কিংবা যে চেষ্টা-তদবীর করা হয়ে থাকে তা তিন প্রকার এবং এই তিন প্রকারের হুকুম এক রকম নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। যথা–

(১) আসবাব যদি স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিত পর্যায়ের হয়ে থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা জরুরি। যেমনঃ ক্ষুধা বা পীপাসা দূর করার নিশ্চিত আসবাব বা উপায় হল খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা। এরকম আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এ রকম আসবাব পরিত্যাগ করা নাজায়েয। যদি কেউ তাওয়াক্কুলের দোহাই দিয়ে জীবনের আশংকা দেখা দেয়ার মুহূর্তেও এরূপ আসবাব বর্জন করে অর্থাৎ, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে, তাহলে এই আসবাব বর্জনটা হারাম হবে। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল নয়। বরং এ পর্যায়ে তাওয়াক্কুল হল আসবাব গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে এই বিশ্বাসও রাখবে যে, খাদ্য-পানীয় এবং তা গ্রহণের শক্তি আল্লাহ্‌র দেয়া। তিনি ইচ্ছা করলে এই খাদ্য-পানীয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিংবা তা গ্রহণের শক্তি আমার রহিত হয়ে যেতে পারে, কাজেই ভরসা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌রই উপর।

(২) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয় যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয় তবে অর্জিত হওয়ার প্রবল ধারণা করা যায়, যেমনঃ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক্তার বা হেকীমদের ওষুধপত্র গ্রহণ কিংবা সফরে গেলে পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে পাথেয় গ্রহণ, জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে আয় উপার্জনের কোনো পন্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এ ধরনের আসবাব বর্জন করা তাওয়াক্কুলের জন্য শর্ত নয়। এ ধরনের আসবাব গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এ ধরনের আসবাব গ্রহণই পূর্ববর্তীদের সুন্নাত। তবে কেউ যদি এমন মজবূত অন্তরের অধিকারী হন যিনি এসব আসবাব গ্রহণ না করার ফলে কোনো কষ্ট দেখা দিলে তখন পূর্ণ ছবর করতে পারবেন– কোনোরূপ হাহুতাশ করবেন না এবং ঈমান হারা হবেন না বা পাপ পথে অগ্রসর হবেন না, তাহলে তার জন্য এসব আসবাব বর্জন করা জায়েয হবে। আর এরূপ মজবূত অন্তরের অধিকারী না হলে তার জন্য এসব আসবাব পরিত্যাগ করা উচিত হবে না,



বরং তার জন্য এ ধরনের আসবাব গ্রহণ করাই উত্তম।

(৩) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র, যেমনঃ লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলে কোন রোগ-ব্যাধি দূর হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র। এমনিভাবে জীবিকা বৃদ্ধির জন্য আয়-উপার্জনের রকমারি পন্থায় ডুবে থাকা ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করার হুকুম রয়েছে। এ ধরনের আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে যা কিছু বলা হল তা পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি দ্বীনী বিষয় হয় তাহলে সে বিষয়টা যদি ফরয পর্যায়ের হয় তাহলে তার আসবাব গ্রহণ করাও ফরয, ওয়াজিব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণও ওয়াজিব হবে এবং মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণ করা মোস্তাহাব হবে। পক্ষান্তরে বিষয়টা হারাম বা মাকরূহ হলে তার আসবাব গ্রহণ করাও হারাম বা মাকরূহ হবে।

(ماخوذ از بیان القرآن وحاشیۂ کوکب الدری بحوالۂ عالمگیریہ و اربعین للغزالی و غیرہا)

## রোগী শুশ্রুষার সুন্নাত ও আদবসমূহ

* শুশ্রুষা করার জন্য প্রতিদিন যাবে না, দুই একদিন বিরতি দিয়ে দিয়ে যাবে। রোগীর সাথে শুশ্রুষাকারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে এটার মধ্যে তারতম্য হবে।

* খুব জাঁক-জমকের পোশাক বা ছেড়া-ফাটা ও নোংরা পোশাক পরে শুশ্রুষা করতে যাবে না বরং স্বাভাবিক পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে যাবে।

* দিনে রাতে সব সময় শুশ্রুষার জন্য গমন করা যায়।

* রোগীর হাঁটুর পাশে বসবে, মাথার দিকে নয়।

* রোগীর নিকট দীর্ঘ সময় থাকবে না, যাতে রোগীর কষ্ট না হয় বরং তাড়াতাড়ি চলে আসা সুন্নাত।

* রোগীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না বরং কোমল দৃষ্টিতে তাকাবে।

* হাসি মুখে থাকবে; চেহারা মলিন করবে না।

* রোগী অচিরেই রোগ মুক্ত হয়ে যাবে, সে দীর্ঘজীবি হবে ইত্যাদি আশা ব্যাঞ্জক কথা রোগীকে শুনাবে। কোনো হতাশা ব্যাঞ্জক কথা তাকে শোনাবে না।

* রোগীর কপালে বা হাতে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করবে সে কেমন আছে?

* রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলবে, لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ, কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহ চাহে তো অচিরেই পবিত্রতা (সুস্থতা) লাভ হবে।

* রোগীর রোগ মুক্তির জন্য দুআ করা সুন্নাত।

* রোগীর কাছে থেকে তার রোগ আরোগ্যের জন্য সাতবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ. (أبو داود – كتاب الجنان)

অর্থ: মহান আরশের মালিক আল্লাহ্‌র কাছে তোমার রোগ-মুক্তি কামনা করছি। (আবূ দাউদ)

* শুশ্রূষাকারী তার জন্য রোগীকে দুআ করতে বলবে। কেননা, রোগীর দুআ কবূল হয়।

* রোগী কিছু খেতে চাইলে এবং সেটা তার জন্য ক্ষতিকর না হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা দিতে বলেছেন। তবে রোগীকে কোনো কিছু খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। (احکام میت از حصن حصین)

* রোগীর কষ্টের স্থানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ে সাতবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ. (صحيح مسلم)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে ও তাঁর কুদরতের কাছে পানাহ চাচ্ছি যে কষ্টে আমি আছি তার অনিষ্ট থেকে এবং যার ভয় আমি পাচ্ছি তার অনিষ্ট থেকে। (মুসলিম)

## রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয়

* রোগকে আল্লাহ্‌র নেয়ামত মনে করবে। কেননা, আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন তাকেই কোন বিপদ দিয়ে থাকেন। তবে রোগ-মুক্তির জন্য চিকিৎসা করা বা দুআ করা এ ধারণার পরিপন্থী নয়। কারণ, রোগ-মুক্তি এবং নিরাপদ থাকাও আল্লাহ্‌র একটি নেয়ামত। দুর্বল বান্দার পক্ষে এই প্রকারের নেয়ামতই আহ্বান।

* রোগকে গোনাহ মোচনের ওছীলা মনে করবে।

* মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। তবে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। একান্তই কষ্ট যন্ত্রণায় অপারগ হয়ে গেলে নিম্নোক্ত দুআ করা যায়।



اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর, ততক্ষণ তুমি আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে (ঈমানের সাথে) আমার মৃত্যু ঘটাও। (বোখারী ও মুসলিম)

* অসুস্থ অবস্থায় সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করবে।

* ধৈর্য ধারণ করবে।

* নিম্নোক্ত দুআ করা যায়। হযরত ওমর (রা.) এ দুআ করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত নসীব কর এবং তোমার রসূলের দেশে আমার মৃত্যু ঘটাও। (বোখারী)

* চিকিৎসা করাবে। চিকিৎসা করানো সুন্নাত।

* যিকির, দুআ, নামায ও তিলাওয়াত পূর্বক শেফা কামনা করবে।

* কোনো কুলক্ষণ গ্রহণ করবে না।

* মিথ্যা বলবে না, যেমন: রোগ যতটুকু আছে তার চেয়ে বাড়িয়ে বলা ইত্যাদি।

* রোগের মাত্রা অধিক করে প্রকাশ করবে না, যেমন: কেউ এলে বসা থেকে শুয়ে যাওয়া কিংবা কাতরাতে থাকা ইত্যাদি।

* যত্ন-সেবাকারীদের প্রতি রাগান্বিত হবে না বা খাদ্য-খাবারের প্রতি রাগ প্রকাশ করবে না।

* লোভ করবে না, যেমন: কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় আগন্তুক শুশ্রূষাকারীর পকেটের দিকে তাকানো। এরূপ করলে লোভ প্রকাশ পায়। অতএব এটা করবে না।

* রোগ যন্ত্রণায় কাতরালে যদি কষ্ট লাঘব হওয়া বোধ হয়, তাহলে তা করা যেতে পারে। তবে তা যেন আল্লাহ্‌র প্রতি অভিযোগ ও অস্থিরতা প্রকাশের রূপ না নেয়।

* যে মুসলমান অসুস্থ্য অবস্থায় চল্লিশ বার দুআয়ে ইউনুস পড়বে, ঐ অসুস্থ্যতায় তার মৃত্যু হলে শহীদের সমান ছওয়াব পাবে, আর সুস্থ্য হলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। (المستدرك للحاكم رقم ١٩٠١)

* অসুস্থ অবস্থায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে এবং উক্ত রোগে তার মৃত্যু হলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। (তিরমিযী)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ. لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. (رواه الترمذي في أبواب الدعوات وقال : حديث حسن)

* রোগ মুক্তির পর গোসল করা মোস্তাহাব। (مفاتيح الجنان)

## মুমূর্ষ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয়

* মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হলে মনে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশা প্রবল করা সুন্নাত।

* মুমূর্ষ ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ কার্যাবলী সম্পর্কে মনে মনে হিসাব-নিকাশ ও পর্যালোচনা করবে না। কেননা, এতে মন্দের পরিমাণের আধিক্য দেখে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। মৃত্যুর সময় আল্লাহর রহমতের আশা প্রবল রাখা চাই।

* ঋণ থাকলে তা পরিশোধ এবং নামায রোযার ফেদিয়া প্রদান বা যেকোনো মালী ইবাদত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছিয়াত করবে। সে যদি এতটুকু সম্পদ রেখে যায় যা দ্বারা এসব আদায় করা সম্ভব, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে এ ওছিয়াত করা ওয়াজিব। (احکام میت از در مختار)

* মৃত্যুর পর জানাযা, কবর নির্মাণ, দাফন-কাফন, ঈছালে ছওয়াব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম, বিদআত ও রছম পালন করা হয়, তা থেকে ওয়ারিছ ও আপনজনকে বিরত থাকার ওছিয়াত করে যাওয়া ওয়াজিব। (احسن الفتاوی ٤/□□)

* পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে মাদ্রাসা, মসজিদ, গরীব আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির জন্য ওছিয়াত করে যাওয়া মোস্তাহাব। যদি তার ওয়ারিছগণ এমনিতেই সম্পদশালী হয়ে থাকে বা এমন হয় যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে তারা অনেক ধনবান হয়ে যাবে– এরূপ ক্ষেত্রেই এরকম ওছিয়াত করে যাওয়া মোস্তাহাব। অন্যথায় এরকম ওছিয়াত না করাই উত্তম। (احکام میت)



* মৃত্যুকে ভাল মনে করবে। কেননা, মৃত্যু দ্বারা পাপ থেকে রক্ষা ও পৃথিবীর এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মৃত্যু আল্লাহ্‌র কাছে তার পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম।

* বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকা সুন্নাত।

* মৃত্যুর জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* খাঁটি অন্তরে এখলাসের সাথে মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করতে থাকবে।

* হত্যা করা হবে বা ফাঁসী দেয়া হবে জানলে দু'রাকআত নামাযে কতল বা নিহত হওয়াকালীন নামায (দেখুন ২৩৪ পৃষ্ঠা) পড়ে নেয়া সুন্নাত।

* মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى. (رواه الترمذي وقال : حسن صحيح)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর। (তিরমিযী)

এবং আরও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ. (رواه الترمذي – أبواب الجنائز)

অর্থ: হে আল্লাহ, মৃত্যুর বিভীষিকা এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় এই পর্যায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর। (তিরমিযী)

## মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয়

* মুমূর্ষ রোগীর পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা মোস্তাহাব। এতে মৃত্যু যন্ত্রণা হ্রাস পায়। রোগী ছোট হোক বা বড় উভয়ের ক্ষেত্রে এটা করা মোস্তাহাব। (احسن الفتاوی ٤/□□)

* মুমূর্ষ রোগীকে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের সুসংবাদ প্রদান করতে হবে, যাতে তার মনে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশা প্রবল হয়।

* তার পাশে অনুচ্চস্বরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে থাকবে, যেন সে এটা শুনে নিজেও মুখে বা মনে মনে তা পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। তাকে এই কালেমা পড়ার নির্দেশ দিবে না, কেননা যন্ত্রণা এবং কষ্টবশত পড়তে

অস্বীকার করে বসলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

* মুমূর্ষ রোগীর নিকট থেকে হায়েয নেফাছ ওয়ালী মহিলা এবং যার উপর গোসল ফরয– এরূপ ব্যক্তিদেরকে সরিয়ে দিবে।

* মুমূর্ষ রোগীকে কেবলামুখী করে শুইয়ে দেয়া সুন্নাত। এই কেবলামুখী দুভাবে করা যায়। যথা:

(১) চিত শোয়া অবস্থায় পা কেবলার দিকে করে এবং মাথা উঁচুতে রেখে।

(২) উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে শুইয়ে।

তবে কেবলামুখী করতে গিয়ে রোগীর খুব বেশি কষ্ট হলে তাকে নিজের অবস্থায়ই থাকতে দিবে।

* তার নিকট সুগন্ধি উপস্থিত করবে এবং আশপাশ সুগন্ধিযুক্ত করবে। কেননা, মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন।

* নেককার লোকদেরকে পাশে সমবেত করবে।

* রূহ কব্জ হওয়া পর্যন্ত তার নিকট কুরআন পাঠ করতে থাকবে।

**কারও মৃত্যু হওয়ার পর তার ব্যাপারে অন্যদের করণীয়**

* নিজের সামনে কারও মৃত্যু হলে বা কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে পড়তে হয়–**اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ**

এরসঙ্গে নিম্নোক্ত দুআও যোগ করা উত্তম।

**وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِيْنَ، وَاجْعَلْ كِتَابَهٗ فِيْ عِلِّيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهٖ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.** (كتاب الأذكار)

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! তুমি তাকে তোমার কাছে নেককারদের তালিকাভুক্ত করে নাও, তার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রাখ এবং তার পরিবারের যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাদের মধ্যে তার উত্তম বদলা দান কর। আর তার প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং তার চলে যাওয়ার পর আমাদেরকে ফেতনায় ফেলো না। (কিতাবুল আযকার)

* মৃত্যু হয়ে গেলে একটা চওড়া পট্টি দ্বারা মৃতের চিবুকের নিচ দিক থেকে নিয়ে মাথার উপর গিরা দিয়ে বেঁধে দিবে।



* মৃতের চক্ষু বন্ধ করে দিবে।

* মৃতের দুই পায়ের দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল একত্রে মিলিয়ে বেঁধে দিবে। (بہشتی زیور)

* মৃতের উভয় হাত ডানে বামে সোজা করে রাখবে, সিনার উপর রাখবে না।

* একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে। (احکام میت)

* কোন চৌকি বা খাটের উপর মাইয়েতকে রাখবে; মাটির উপর রাখবে না। (احکام میت)

* মৃতের পেটের উপর কোন লম্বা লোহা বা ভারি বস্তু দ্বারা চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে পেট ফুলে যেতে না পারে। (احکام میت)

* হায়েয নেফাছ ওয়ালী মহিলাকে মাইয়েতের কাছে আসতে দিবে না। (احکام میت)

* সম্ভব হলে খুশবু (আগরবাতি প্রভৃতি) জ্বালিয়ে মৃতের কাছে রাখবে। (احکام میت)

* যথাসম্ভব লোকদেরকে মৃত্যুর সংবাদ অবগত করাবে। (بہشتی زیور)

* মাইকেও মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা যায়। তবে মসজিদের মাইকে বাইরের লোকদের সংবাদ দেয়া যায় না। অবশ্য উক্ত মাইয়েতের জানাযা নামাযের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য মসজিদের মাইকে মসজিদে এ'লান করাতে বাধা নেই। (কাফন-দাফনের মাসলা মাসায়েল)

* মাইয়েতের জন্য এস্তেগফার করতে থাকবে। (احکام میت)

* দ্রুত দাফন-কাফন সম্পন্ন করবে। এটাই উত্তম। জানাযার নামাযে অধিক লোক হওয়ার আশায় জানাযায় বিলম্ব করবে না। এরূপ করা মাকরূহ ও অনুচিত। (احسن الفتاوی)

* মৃতকে গোসল দেয়ার পুর্বে তার নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করা নিষেধ। (বেহেশতী জেওর)

* আপনজনের মৃত্যু হলে এরূপ পড়বে–

**إِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.** (مسلم –كتاب الجنائز)

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁরই নিকট

ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমার এই মুছীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান নসীব কর এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান কর। (মুসলিম)

* কোন ইসলামের শত্রুর মৃত্যু সংবাদে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَأَعَزَّ دِيْنَهٗ.** (كتاب الأذكار عن ابن السني)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন এবং তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন।

* আপনজনের মৃত্যুতে যে কষ্ট হয় তার জন্য ছওয়াব হবে– এই আশা রাখতে হবে।

* কারও মৃত্যুতে মাতম করা, জামা কাপড় ফাড়া-চেরা করা, বুক চাপড়ানো, ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদা, চিৎকার করে কাঁদা জায়েয নেই। মনের দুঃখে স্বাভাবিক যে চোখের পানি বা রোদন এসে যায় তা নিষিদ্ধ নয়।

* স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী "ইদ্দত" পালন করবে। তার গর্ভ থাকলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় চার মাস দশ দিন পর্যন্ত এই ইদ্দত পালন করবে। এ সময়ে সে সাজ-সজ্জা এবং রূপ চর্চা থেকে বিরত থেকে শোক পালন করবে। স্বামীর মৃত্যুর সময় সে যে ঘরে বসবাস করত সেখানেই থাকবে, সেখান থেকে বের হবে না। ভাড়ার বাসা হলে ভাড়া দেয়ার ক্ষমতা থাকলে সেখানেই থাকবে। তবে নিরাপত্তার অভাব হলে নিকটতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে ইদ্দত পালন করবে। এ সময়ের মধ্যে সে কারও সঙ্গে বিবাহ বসতে পারবে না।

## কাফন-দাফন

### কবর খননের নিয়মাবলী

* কবর মাইয়েত-এর সমপরিমাণ লম্বা হবে।

* যতটুকু লম্বা তার অর্ধেক পরিমাণ চওড়া হবে।

* মাইয়েত–এর দেহ যত লম্বা, কবর ততপরিমাণ গভীর হওয়া সবচেয়ে উত্তম, অন্তত তার অর্ধেক গভীর করলেও চলে। এরূপ কবরকে সিন্দুক কবর বলে।

* আর এরূপ খনন করার পর কবরের নিচে কেবলার দিকে আর একটি ছোট কুঠরির ন্যায় খনন করে তার মধ্যে মাইয়েতকে রাখা হলে তাকে বলে বুগলী কবর বা লাহ্‌দ। সিন্দুকের চেয়ে এরূপ কবর করা উত্তম। (فتاوى دار العلوم ج٥)



* কবরের উপরিভাগ অন্তত এক ফুট গভীরতা সহকারে একটু অধিক প্রশস্ত করে খনন করতে হবে। এ স্থানে বাঁশ, কাঠ বা স্লিপার দিয়ে তার উপর মাটি দেয়া হবে। (احکام میت)

### কাফনের কাপড় সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

* মাইয়েতকে কাফনের কাপড় দেয়া ফরযে কেফায়া।

* মাইয়েত জীবনে সাধারণত যে মানের কাপড় পরিধান করত, তার কাফনও উক্ত মানের হওয়া উচিত।

* কাফন সাদা রংয়ের হওয়া উত্তম। নতুন বা পুরাতন উভয়টিই সমান।

* কাফনের কাপড় পবিত্র হতে হবে।

* পুরুষের কাফনে তিনটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। যথা–

১। ইজার: এটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

২। লেফাফা/চাদর: এটা ইজার থেকে ৪ গিরা (৯ ইঞ্চি) লম্বা হয়।

৩। কুর্তা/জামা: (হাতা ও কল্লীবিহীন) এটা গর্দান থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

* মহিলাদের কাফনে পাঁচটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। উপরোক্ত তিনটা এবং

৪। সীনাবন্দ: এটা বগল থেকে রান পর্যন্ত হওয়া উত্তম। নাভি পর্যন্ত হলেও চলে।

৫। সারবন্দ/উড়না: এটা তিন হাত লম্বা হয়।

### কাফনের কাপড়ের পরিমাণ ও তৈরির বিবরণ

| ক্রমিক নং | নাম | লম্বা | চওড়া | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ইজার | আড়াই গজ | সোয়া ১ গজ থেকে দেড় গজ | মাথা থেকে পা পর্যন্ত |
| ২ | লেফাফা | পৌনে ৩ গজ | সোয়া ১ গজ থেকে দেড় গজ | ইজার থেকে চার গিরা (৯ ইঞ্চি) বেশি |
| ৩ | কুর্তা/জামা | আড়াই থেকে পৌনে তিন গজ | ১ গজ | গর্দান থেকে পা পর্যন্ত |
| ৪ | সীনাবন্দ | ১ গজ | সোয়া ১ গজ | বগলের নিচ থেকে রান পর্যন্ত |
| ৫ | সারবন্দ/উড়না | দেড় গজ | ১২ গিরা (২৭ ইঞ্চি) | যতদূর পৌঁছে |

(উপরোক্ত পরিমাণটা সাধারণত বড় মানুষের জন্য, ছোটদের জন্য তার সাইজ অনুসারে কেটে নিতে হবে।)

* সর্বমোট কাফনের কাপড় পুরুষের জন্য ৭¾ (পৌনে আট) গজ থেকে ৮ গজ এবং মহিলাদের জন্য ১১¼ (সোয়া এগার) গজ থেকে ১১½ (সাড়ে এগার) গজ। মহিলাদের গোছল ও দাফনের সময় পর্দা রক্ষার জন্য যে কাপড়ের প্রয়োজন সেটা এ হিসাবের বাইরে।

## মাইয়েতকে গোসল প্রদানের তরীকা

* পুরুষ মাইয়েতকে পুরুষ এবং নারী মাইয়েতকে নারী গোসল করাবে। আপনজন আপনজনকে গোসল করানো উত্তম।

* গোসলের স্থান পর্দা ঘেরা হতে হবে।

* যে খাটিয়ায় গোসল দেয়া হবে প্রথমে তিন পাঁচ বা সাতবার সেটায় আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া দিবে।

* মাইয়েতকে এমনভাবে খাটিয়ায় শোয়াবে, যেন কেবলা তার ডান দিকে থাকে, সম্ভব না হলে যে কোনোভাবে শোয়ানো যায়।

* একটা লম্বা মোটা কাপড় দিয়ে মাইয়েতের সতর ঢেকে তার ভিতর থেকে তার শরীরের কাপড় (প্রয়োজনে কেটে) খুলে নিবে।

* মাইয়েতের সতর দেখবে না, সতরের মধ্যে সরাসরি হাত লাগাবে না।

* বাম হাতে দস্তানা পরিধান করে বা কোনো কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা মাইয়েতকে তিন বা পাঁচটা ঢিলা দ্বারা ইস্তেন্‌জা করাবে, তারপর পানি দ্বারা ইস্তেন্‌জার স্থান ধৌত করবে।

* অতঃপর তুলা ভিজিয়ে তা দ্বারা ঠোঁট, দাঁত ও দাঁতের মাড়ি মুছে দিবে এবং উক্ত তুলা ফেলে দিবে। এভাবে তিন বার করবে।

* অতঃপর অনুরূপভাবে তিনবার নাকের দুই ছিদ্র পরিষ্কার করবে। তবে গোসলের প্রয়োজন (ফরয) অবস্থায় মৃত্যু হলে বা মহিলার হায়েয নেফাস অবস্থায় মৃত্যু হলে মুখে এবং নাকে পানি দেয়া জরুরি। পানি দিয়ে কাপড় বা তুলা দ্বারা উক্ত পানি তুলে নিবে। (احکام میت)

* অতঃপর মুখ এবং নাক ও কানের ছিদ্রে তুলা দিয়ে দিবে, যেন পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

* অতঃপর উযুর ন্যায় মুখ ও উভয় হাত ধৌত করাবে, মাথায় মাসেহ করাবে এবং উভয় পা ধৌত করাবে।



* অতঃপর সাবান বা এজাতীয় কিছু দ্বারা মাথা (পুরুষ হলে দাড়িও) পরিষ্কার করাবে।

* অতঃপর মাইয়েতকে বাম কাতে শুইয়ে বরই–এর পাতা জ্বালানো (অপারগতায় সাধারণ) কুসুম গরম পানি দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডান পার্শ্বে তিন বার এতটুকু পানি ঢালবে যেন নিচের দিকে বাম পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

* অতঃপর অনুরূপভাবে ডান কাতে শুইয়ে বাম পার্শ্বে তিন বার পানি ঢালবে।

* অতঃপর গোসলদাতা মাইয়েতকে তার শরীরের সাথে টেক লাগিয়ে বসাবে এবং পেটকে উপর দিক থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে মর্দন করবে এবং চাপ দিবে। এতে কিছু মল-মুত্র বের হলে তা মুছে ফেলে ধুয়ে দিবে।

* অতঃপর মাইয়েতকে বাম কাতে শুইয়ে কর্পূর মিলানো পানি ডান পার্শ্বে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে ঢালবে, যেন নিচে বাম পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

* অতঃপর আর একটি দস্তানা পরিধান করে বা কাপড় হাতে পেঁচিয়ে সমস্ত শরীর কোন কাপড় দ্বারা মুছে শুকিয়ে দিবে। এর পর মাইয়েতকে কাফনের কাপড় পরিধান করাবে।

এ হল মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সুন্নাত তরীকা।

* মাইয়েতকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতার নিজেরও গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব। (شامی)

* গোসলদাতা মাইয়েতের কোন দোষ (যেমনঃ চেহারা বিকৃত হওয়া, কাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) দেখলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না। পক্ষান্তরে তার কোনো ভাল কিছু দেখতে পেলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা মোস্তাহাব।

## কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের)

* কাফনের কাপড়ে সর্বপ্রথম তিন পাঁচ বা সাত বার আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া দিবে।

* তারপর প্রথমে লেফাফা বিছাবে, তার উপর ইজার, তার উপর কোর্তা/জামার নিচের অর্ধাংশ বিছাবে এবং অপর অর্ধাংশ মাথার দিকে গুটিয়ে রাখবে। তারপর মাইয়েতকে এই বিছানো কাফনের উপর চিত করে শোয়াবে এবং কোর্তা/জামার গুটানো অর্ধাংশ মাথার উপর দিয়ে

পায়ের দিকে এমনভাবে টেনে আনবে যেন কোর্তার/জামার ছিদ্র (গলা) মাইয়েতের গলায় এসে যায়। এরপর গোসলের সময় মাইয়েতকে যে কাপড় পরানো হয়েছিল সেটা বের করে নিবে এবং নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে। তারপর মাথা ও দাড়িতে আতর প্রভৃতি খুশবু লাগাবে। অতঃপর কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ে (সাজদার অঙ্গসমূহে) কর্পূর লাগাবে। তারপর ইজারের বাম পাশ উঠাবে অতঃপর ডান পাশ (ডান পাশ উপরে থাকবে) তারপর লেফাফার বাম পাশ অতঃপর ডান পাশ উঠাবে। অতঃপর কাপড়ের লম্বা টুকরা বা সুতা দিয়ে মাথা এবং পায়ের দিকে এবং মধ্যখানে (কোমরের নিচে) বেঁধে দিবে, যেন বাতাসে বা নড়াচড়ায় কাফন খুলতে না পারে।

## কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার)

* কাফনের কাপড়ে সর্বপ্রথম তিন, পাঁচ বা সাত বার আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া দিবে।

* প্রথমে লেফাফা বিছাবে, তারপর ইজার, তারপর সীনাবন্দ, তারপর কুর্তা/জামার নীচের অর্ধাংশ। তারপর মাইয়েতকে কাফনের উপর চিত করে শোয়াবে। অতঃপর পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুযায়ী প্রথমে কোর্তা/জামা পরিধান করাবে, অতঃপর মাইয়েতের শরীরের থেকে গোসলের কাপড় বের করে নিবে এবং নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে। অতঃপর পূর্বোক্ত নিয়মে খুশবু এবং কর্পূর লাগাবে (মহিলাকে খুশবুর স্থলে জাফরানও লাগানো যায়) অতঃপর মাথার চুল দুই ভাগ করে জামার উপর সীনার পরে রেখে দিবে- একভাগ ডান দিকে আরেক ভাগ বাম দিকে। অতঃপর সারবন্দ বা উড়না মাথা এবং চুলের উপর রেখে দিবে (বাঁধবে না বা পেঁচাবে না) অতঃপর সীনাবন্দ বগলের নিচে দিয়ে প্রথমে বাম দিকে অতঃপর ডান দিক জড়াবে। অতঃপর ইজারের বাম দিক তারপর ডান দিক এমনভাবে উঠাবে যেন সারবন্দ তার ভিতর এসে যায়। তারপর লেফাফা অনুরূপভাবে প্রথমে বাম পাশে তারপর ডান পাশে উঠাবে এবং সবশেষে পূর্বোক্ত নিয়মে তিন স্থানে বেঁধে দিবে। উল্লেখ্য, সীনাবন্দ ইজার ও লেফাফার মধ্যে বা সব কাপড়ের উপর বাইরেও বাঁধা যায়।

## জানাযা নামাযের বিবরণ

* জানাযা নামাযে মাইয়েত সামনে থাকা শর্ত। গায়েবানা জানাযা নামায হানাফী মাযহাবে জায়েয নেই। (احکام میت نقلا عن الشامی و البحر و غیرھا)



* কেবলামুখী হয়ে এবং দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়তে হবে। (এ দু'টো ফরয)

* ইমামের জন্য মাইয়েতের সীনা বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত। মুক্তাদীগণের কাতার তিনটা হওয়া মুস্তাহাব।

* নিয়ত করা ফরয। কারও কারও মতে নিয়তের মধ্যে মাইয়েত পুরুষ না মহিলা, ছেলে না মেয়ে তা-ও নির্ধারিত করা জরুরি।

* আরবীতে নিয়ত এভাবে করা যায়–

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْجَنَازَةَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَدُعَاءً لِلْمَيِّتِ. (بہشتی گوہر)

* বাংলায় নিয়ত এভাবে করা যায়: আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই মাইয়েতের জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে জানাযা নামাযের নিয়ত করছি।

* নিয়ত করার পর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠাবে।

* তারপর আল্লাহু আকবার বলবে। (এটা ফরয।) ইমাম আল্লাহু আকবার ও সালাম জোরে এবং মুক্তাদী আস্তে বলবে। অন্যান্য সবকিছু সকলেই আস্তে পড়বে।

* আল্লাহু আকবার বলে নামাযের ন্যায় উভয় হাত বাঁধবে।

* অতঃপর ছানা পড়বে। (এটা সুন্নাত।)

* ছানা পড়া শেষে আল্লাহু আকবার বলবে হাত উঠানো ব্যতীত। (এই তাকবীর বলা ফরয।)

* অতঃপর দুরূদ শরীফ পড়বে। (এটা সুন্নাত।) নামাযের দুরূদ পড়া উত্তম।

* অতঃপর পূর্বের ন্যায় আল্লাহু আকবার বলবে। (এই তাকবীরও ফরয।)

* অতঃপর দুআ পড়বে। (এটা সুন্নাত।)

* মাইয়েত বালেগ পুরুষ বা বালেগা নারী হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

এর সাথে নিম্নোক্ত দুআটি পড়াও উত্তম। এ দুআটিও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ، وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ، وَزَوْجَةً خَيْرًا مِّنْ زَوْجَتِهٖ، وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. (السنن الكبري للبيهقي)

* মাইয়েত নাবালেগ ছেলে হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

* আর মাইয়েত নাবালেগা মেয়ে হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَفِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

* দুআ পড়ার পর পূর্বের ন্যায় আল্লাহু আকবার বলবে। (এটা ফরয।)

* অতঃপর উভয় হাত ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে। (احسن الفتاوی ٤/۔۔ و بہشتی گوہر)

* উভয় সালাম ফিরানোর পর হাত ছাড়া যায় কিংবা ডান দিকের সালামের পর ডান হাত এবং বাম দিকের সালামের পর বাম হাত ছাড়া যায়।

* নামাযে জানাযার পর সাথে সাথে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করা মাকরূহ ও বিদআত। (احکام میت، خلاصة الفتاوی، نفع المفتي والسائل واحسن الفتاوی ج/١)

* জুতো খুলে মাটিতে দাঁড়িয়ে নামাযে জানাযা পড়া উত্তম। অবশ্য দাঁড়ানোর স্থান এবং জুতো পাক হলে জুতো পরেও নামায পড়া যায়। আর জুতো খুলে জুতোর উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ইচ্ছা হলে জুতোর উপরিভাগ পাক হওয়া শর্ত। (কাফন-দাফনের মাসলা মাসায়েল)

* জানাযার জন্য একাধিক লাশ একত্র হলে প্রত্যেকের জানাযা পৃথক পৃথক আদায় করা উত্তম। সে ক্ষেত্রে যাকে অধিক নেককার বলে মনে হয় তার জানাযা আগে পড়া ভাল। একত্রেও আদায় করা যায়। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লাশ থাকলে পুরুষের লাশ ইমামের সম্মুখে, তারপর ছোট বাচ্চাদের, তারপর বয়স্কা মহিলাদের, তারপর নাবালেগা মেয়েদের– এই তারতীবে লাশ রাখবে। (কাফন-দাফনের মাসলা মাসায়েল)



* যদি ওলীর অনুমতি এবং শিরকাতে জানাযার জামাআত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে পুনর্বার জানাযার নামায পড়া মাকরূহ এবং তা শরীআতসম্মত নয়। ওলীর অনুমতি ও শিরকাত ব্যতীত প্রথমে জানাযা হয়ে থাকলে ওলী দ্বিতীয় বার জামাআত করতে পারে। সেক্ষেত্রেও প্রথমবার যারা জানাযায় শরীক হয়েছে দ্বিতীয়বার তারা শরীক হতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

* কোন কোন স্থানে লাশ সম্মুখে রেখে লোকটা কেমন ছিল প্রশ্ন করা হয় আর উপস্থিত লোকেরা বলে ভাল ছিল, শরীআতে এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই। (প্রাগুক্ত)

## জানাযা বহন করার নিয়মসমূহ

* মাইয়েত দুধের শিশু বা হাতে হাতে বহনযোগ্য ছোট হলে পর্যায়ক্রমে হাতে হাতে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে। আর বড় হলে কোন খাটিয়া প্রভৃতিতে শুইয়ে নিয়ে যাবে, মাথা সামনের দিকে থাকবে।

* খাটিয়ার চার পায়াকে চার জনে উঠাবে।

* খাটিয়ার পায়াকে হাত দ্বারা উঠিয়ে কাঁধের উপর রাখবে।

* কবরস্থান দূর ইত্যাদি কোন ওজর না থাকলে জানাযা গাড়ী বা সওয়ারীতে উঠিয়ে নেয়া মাকরূহ।

### জানাযা বহন করার মোস্তাহাব তরীকা

* প্রথমে মাইয়েতের ডান দিকের সম্মুখ পায়া হাত দিয়ে নিজের ডান কাঁধে উঠিয়ে কমপক্ষে দশ কদম চলবে। অতঃপর ঐদিকের পিছনের পায়া ডান কাঁধে রেখে কম পক্ষে দশ কদম চলবে। তারপর মাইয়েতের বাম দিকের সম্মুখের পায়া বাম কাঁধে রেখে দশ কদম, তারপর পশ্চাতের পায়া অনুরূপ বাম কাঁধে রেখে দশ কদম চলবে।

* জানাযা নিয়ে দ্রুত কদমে চলা সুন্নাত। তবে দৌড়ে নয় কিংবা খুব দ্রুত নয়।

* সঙ্গীরা জানাযার ডানে বায়ে নয় বরং পশ্চাতে চলবে।

* সঙ্গীদের পায়ে হেঁটে চলা মোস্তাহাব। কোন বাহনে থাকলেও জানাযার পশ্চাতে চলবে।

* জানাযা বহনকারী ও সঙ্গীগণ কোন দুআ, যিকির শব্দ করে পড়বে না। শব্দ করা মাকরূহ।

* জানাযা কাঁধ থেকে রাখার পূর্বে কেউ বসবে না।

* জানাযার সাথে চলার সময় কোনো কথা বলবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় খামূশ থাকতেন। (احکام میت)

* দাফন হওয়ার পূর্বে মাইয়েত ওয়ালাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ ফিরে আসবে না।

* জানাযা মহিলা হলে খাটিয়া ঢেকে নেয়া মোস্তাহাব।

* জানাযার ইমামত ও দাফন সম্পর্কে মাইয়েতের কোন ওছিয়াত থাকলে সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪২৮ পৃষ্ঠা।

## দাফনের নিয়ম-পদ্ধতি

* সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা সুন্নাত।

* যেখানে যার মৃত্যু হয় সে এলাকার সাধারণ কবরস্থানে তাকে দাফন করা সুন্নাত। অন্যত্র (দুই তিন মাইলের অধিক দূরে) লাশ স্থানান্তর করা সুন্নাতের খেলাফ।

* প্রয়োজনে কবরের জন্য জমি ক্রয়ের অনুমতি রয়েছে।

* কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে মাইয়েতকে সতর্কতার সাথে উঠিয়ে কবরে নামাবে। (بہشتی گوہر)

* মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় নিম্নোক্ত দুআ বলা মোস্তাহাব।

**بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.** (الدر المختار – باب صلاة الجنازة)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র রসূলের ধর্মের উপর তাকে রাখলাম।

* মাইয়েতকে কেবলামুখী করে ডান কাতে শুইয়ে দেয়া সুন্নাত। চিত করে শুইয়ে শুধু মুখ কেবলামুখী করে দেয়া যথেষ্ট নয়। (بہشتی گوہر واصلاح انقلاب امت)

* কবরে রাখার পর খুলে যাওয়ার আশংকায় কাফনে যে গিরা দেয়া ছিল তা খুলে দিতে হবে। (بہشتی گوہر)

* মহিলাকে কবরে রাখার সময় পর্দা করে নেয়া মোস্তাহাব। আর মাইয়েতের শরীর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে পর্দা করা ওয়াজিব। (بہشتی گوہر)

* বুগ্‌লী (লাহ্‌দ) কবর হলে কাঁচা ইট, বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা বন্ধ করবে আর সিন্দুক কবর হলে কাঠ, বাঁশ বা স্লিপার দিয়ে ঢেকে দিবে এবং ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিবে।



* তারপর মাটি ফেলবে। মাইয়েতের মাথার দিক থেকে মাটি ফেলতে শুরু করা মোস্তাহাব। (بہشتی گوہر)

* প্রত্যেক ব্যক্তি উভয় হাতে মাটি নিয়ে তিনবার মাটি ফেলবে। প্রথমবার ফেলার সময় **مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ** দ্বিতীয়বার **وَفِيْهَا نُعِيْدُ كُمْ** এবং তৃতীয়বার **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى** পড়বে। (رد المحتار ج/٣– باب صلاة الجنازة)

* কবরের পিঠ উটের পিঠের ন্যায় এক বিঘৎ বা তার চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণ উঁচু করে বানানো মোস্তাহাব। (بہشتی گوہر)

* মাটি দেয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সর্বশেষে কবরের মাটি জমানোর জন্য কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। (احسن الفتاوی □□/۴)

* নিতান্ত অপারগতা ছাড়া এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করবে না।

* কবরের দু' পাশে খেজুরের ডাল বা যেকোনো ডাল পুতে দেয়ার সাথে গলদ আকীদা জড়িত হওয়ার কারণে এ থেকে বিরত থাকই উত্তম। (فتاوی دار العلوم □□/۲ و احسن الفتاوی □□/۱)

* যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাফন-দাফন সম্পন্ন করা উত্তম। এমনকি জানাযায় অধিক লোক হবে– এজন্যও বিলম্ব করা সুন্নাতের খেলাফ।

## দাফনের পর যা যা করণীয়

* দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর কবরের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করতঃ মৃতের ক্ষমার জন্য দুআ করবে অথবা কুরআন শরীফ পাঠ করে ছওয়াব পৌঁছে দিবে। এরূপ করা মোস্তাহাব। (احکام میت)

* মৃত যেন মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয় তার জন্য দুআ করবে। এরূপ করা সুন্নাত। (احکام میت)

* দাফনের পর কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে **مُفْلِحُوْنَ** পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ (**اٰمَنَ الرَّسُوْلُ** থেকে শেষ পর্যন্ত) আস্তে আস্তে পাঠ করা মোস্তাহাব। (فتاوی دار العلوم □□/۵ و احکام میت)

## মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যদের যা যা করণীয়

* প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য মোস্তাহাব হল মৃতের পরিবারের জন্য এক দিনের খাবার তৈরি করে পাঠাবে এবং দুঃখের কারণে তারা খেতে না চাইলে পীড়াপীড়ি করে খাওয়াবে। (احکام میت از شامی ودر مختار)

* মৃতের পরিবারকে তিন দিনের মধ্যে (এক বার) সান্ত্বনা জানানো মোস্তাহাব। দূরের লোকেরা শোকবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অর্থাৎ, পত্রের মাধ্যমেও এ মোস্তাহাব আদায় করতে পারেন। শরীআতের পরিভাষায় এটাকে তাযিয়াত বলা হয়।

* প্রচলিত শোক-প্রস্তাব অনুমোদন ও নীরবতা পালনের কোনো শরঈ ভিত্তি নেই। এটা বিধর্মীদের অনুকরণ বিধায় পরিত্যাজ্য। শরীআতের দৃষ্টিতে এতে কোনো ফায়দা নেই।

* স্বতন্ত্রভাবে একাকী তাযিয়াত করা সুন্নাত। তবে ঘটনাক্রমে যদি একাধিক লোক একত্র হয়ে যায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (احسن الفتاوى)

* তাযিয়াতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ক) সান্ত্বনা বাণী।

(খ) ছবর ও ধৈর্যের ফযীলত বর্ণনা এবং ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

(গ) আপনজনের মৃত্যুজনিত কষ্টের জন্য তাদের ছওয়াব লাভ করবে– এ কথার উল্লেখ।

(ঘ) তাযিয়াতের সময় হাত উঠানো ব্যতীত নিম্নোক্ত দুআ পড়া–

**أَعْظَمَ اللّٰهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَآئَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.** (احسن الفتاوى ج/٤)

* তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তাযিয়াত করা মাকরূহ, তবে সফরে থাকার কারণে এ সময়ের মধ্যে তাযিয়াত করতে না পারলে এরপরও করতে পারেন।

* তাযিয়াতকারীগণ মৃতের পরিবারের উপর তাদেরকে আপ্যায়ন করানোর বোঝা চাপাবে না। তাদের উপর এই বোঝা চাপানো অমানবিকতা এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। (احكام ميت)

* শোকসভা করা এমনিতে খারাপ নয়। তবে এখন এটা রছমে পরিণত হয়েছে। তদুপরি পত্র-পত্রিকায় নাম আসবে– এরূপ গলদ নিয়তও থাকে, তাই এটা পরিত্যাজ্য। (فتاوى محمودية ٢/□□)

## কবরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিধি-নিষেধ

* কবরের উপর দিয়ে চলা, বসা এবং কবরের সাথে হেলান দেয়া থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। (احكام ميت)

* কবরের দেয়াল পাকা করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো বা যে কোন ধরনের ইমারত বানানো থেকে বিরত থাকবে। সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে



এরূপ করা হারাম এবং মজবূত বানানোর উদ্দেশ্যে হলে তা মাকরূহ তাহরীমী, যা হারামের নিকটবর্তী। (احسن الفتاوى ٤/□□)

* কবর বসে গেলে তাতে দ্বিতীয়বার মাটি দেয়া যায়।

* কবরে বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ। (احسن الفتاوى □□/٤□ احكام ميت و زاد المعاد)

* কবরে ফুল দেয়া নিষিদ্ধ ও বিদআত। (احسن الفتاوى ٤/□□)

* চেনার জন্য কবরের উপরে কোন পাথর ইত্যাদি আলামত হিসাবে রাখা যায়। (احكام ميت)

* প্রয়োজনে নাম-ফলক স্থাপন করা যায়, তবে তাতে কুরআনের কথা লেখা নাজায়েয। (احسن الفتاوى ٤/□□)

* কবর বা বুযুর্গদের মাজারে চাদর চড়ানো নিষিদ্ধ ও হারাম। (احكام ميت از سنت و بدعت)

* কোনো মাজারে মানত মানা ও নযর প্রদান করা হারাম। (ঐ)

* মাজারে টাকা-পয়সা প্রদান করা হারাম।

## কবর যিয়ারতের আহকাম

* পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত করা মোস্তাহাব। নারী যুবতী হলে তার জন্য কবরস্থানে যাওয়া জায়েয নেই। তবে বৃদ্ধা হলে কান্নাকাটি, মাতম ইত্যাদি শরীআত বিরোধী কাজ করবে না– এরূপ একীন থাকলে সাজসজ্জা না করে খুশবু না মেখে পর্দার সাথে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। (احكام ميت بحوالہ شامى، امداد الفتاوى و امداد الاحكام)

* প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক বার কবর যিয়ারত করা মোস্তাহাব। (احكام ميت)

* শুক্রবার কবর যিয়ারত করা অধিক উত্তম। বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং সোমবারও কবর যিয়ারত করা উত্তম। (احسن الفتاوى ٤/□□ و احكام ميت)

* কবরস্থানে প্রবেশ করে সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম করবে।

**اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، وَنَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.** (احسن الفتاوى ج/٤)

অর্থঃ হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থলের অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও আল্লাহ চাহে তো অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য

শান্তির আবেদন করছি।

* অতঃপর উদ্দিষ্ট মাইয়েতের পায়ের দিক থেকে চেহারার (কেবলার) দিক যেয়ে দাঁড়াবে বা বসবে। বসলে জীবদ্দশায় তার সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক ছিল সে অনুযায়ী নিকটে বা দূরে বসবে। (احسن الفتاوی ۴/□□)

* সালামের পর কেবলার দিকে পিঠ এবং মাইয়েতের (কবরের) দিকে মুখ করে যথাসম্ভব কুরআন শরীফ পড়ে মাইয়েতকে ছওয়াব পৌঁছে দিবে। বিশেষভাবে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরছী, সূরা- বাকারার শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা-ফাতেহা, সূরা ইয়াসীন, সূরা মূল্‌ক, সূরা তাকাছুর বা সূরা এখলাস ১১/১২ বার কিংবা ৭ বার বা যে পরিমাণ সহজে পড়তে পারে পড়ে দুআ করবে। মাইয়েতের মাগফিরাতের জন্যও দুআ করবে। (احسن الفتاوی ۴/□□ و احکام میت)

* তিলাওয়াত ও দুআ দুরূদ পড়ার পর কেবলামুখী হয়ে (অর্থাৎ, মাইয়েতের দিকে পিঠ করে দুআ করবে। (جواہر الفقہ از ایصال ثواب للتھانوی)

## ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা

* নফল ইবাদত (যেমন: নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্জ ইত্যাদি) তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দান-সদকা করে তার ছওয়াব (মৃত বা জীবিতকে) পৌঁছে দেয়া এবং মাইয়েতের জন্য দুআ করাকে ঈছালে ছওয়াব বলে। ঈছালে ছওয়াব দ্বারা আমলকারীর ছওয়াব কমে না বরং আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমলকারী ও মাইয়েত উভয়কেই পূর্ণ পরিমাণ ছওয়াব দিয়ে থাকেন। কোন আমলের ছওয়াব একাধিক মাইয়েতকে পৌঁছানো হলে আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে আশা করা যায় সে ছওয়াব ভাগাভাগি করে নয় বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা পূর্ণ পরিমাণ দান করবেন, যদিও যুক্তি অনুযায়ী তা ভাগাভাগি হওয়ারই কথা।

* ইবাদতে মালিয়া অর্থাৎ, দান-সদকা দ্বারা ঈছালে ছওয়াব করা উত্তম। এর মধ্যে কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা:–

(ক) নগদ অর্থ প্রদান করা সবচেয়ে ভাল। এরূপ অর্থ সদকায়ে জারিয়ার কাজে ব্যয় করলে আরও উত্তম হবে।

(খ) তারপর কাঁচা খাবার (পাকানো ছাড়া) প্রদান করা।



(গ) আর সর্বনিম্ন স্তর হল খাদ্য-খাবার রান্না করে তা খাওয়ানো।

* ঈছালে ছওয়াবের একটি আদব এই যে, অন্তত কিছু পাঠ করে হলেও (যেমন: তিনবার সূরা এখলাস পাঠ করে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর রূহ মোবারককে তার ছওয়াব স্বতন্ত্রভাবে পৌঁছে দিবে।

* মাইয়েতের আপনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ স্থানে থেকে তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার পূর্বক কিংবা দুআর মাধ্যমে ঈছালে ছওয়াব করতে পারে। এর জন্য সকলে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে খতম পড়ার অবশ্যকতা নেই। তদুপরি আজকাল সম্মিলিতভাবে খতম পড়াটা রেওয়াজে পরিণত হযেছে। তাই এই রেওয়াজ পরিত্যাগ করা উচিত।

* টাকা-পয়সার বিনিময়ে কুরআন-খানী বা কোনো খতম করালে তার কোনো ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অতএব সেরূপ কুরআন-খানী ও খতমের দ্বারা ঈছালে ছওয়াবও হবে না বরং এরূপ বিনিময় গ্রহণ পূর্বক খতম ও কুরআন খানী করা এবং করানো উভয়টা হারাম।

* ঈছালে ছওয়াবের জন্য কোনো দিন তারিখ (যেমন– ৪ঠা, চল্লিশা, বার্ষিকী ইত্যাদি) নির্ধারণ করা বিদআত। অতএব তা পরিত্যাজ্য। এসব নির্দিষ্ট দিনের অনুসরণ ছাড়াই ঈছালে ছওয়াব করা উচিত।

(احسن الفتاوی □□/۱/□ جواہر الفقہ و احکام میت প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

# পরিবার নীতি

## পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

পরিবারে বিভিন্ন কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণগুলো শুরু থেকেই যদি এড়িয়ে চলা যায়, তাহলে একটি সুখী ও আনন্দময় পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেই সুখ ও আনন্দকে ধরে রাখা সম্ভব। সাধারণত যেসব কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়ে থাকে নিম্নে সেগুলো প্রতিকার ব্যবস্থাসহ উল্লেখ করা হল।

### (১) শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্র-বধূর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা।

সাধারণত শাশুড়ী শ্বশুর পুত্রের উপর অধিকার থাকার সুবাদে পুত্রবধূর উপরও কর্তৃত্ব করতে চায় এবং পুত্রের ন্যায়-পুত্রবধূকেও বাধ্যগত পেতে এবং রাখতে চায়। তারা পুত্র থেকে যে রকম আনুগত্য ও খেদমত পাওয়ার, পুত্রবধূ থেকেও সে রকম পেতে চায়। এর ফলে পুত্র-বধূর সাথে

কর্তৃত্বসুলভ আচরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে বাদীসুলভ ব্যবহারও করে থাকে। অনেক সময় পুত্রবধূ প্রফুল্ল চিত্তে না চাইলেও জবরদস্তী তার থেকে শাশুড়ী শ্বশুর কাজ ও খেদমত নিয়ে থাকেন এবং জবরদস্তী পুত্রবধূকে একান্নভুক্ত রাখা হয়। এসব কারণে পুত্রবধূর স্বাধীন চেতনা আঘাতগ্রস্ত হয়, কখনও কখনও সে আত্মমর্যাদায় আঘাতবোধ করে এবং এ সংসারকে সে আপন বলে মেনে নিতে পারে না, ফলে শাশুড়ী- শ্বশুরের সাথে শুরু হয় তার সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং তখনই পুত্রবধূ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। পুত্রবধূর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণেও অনেক সময় শাশুড়ী-শ্বশুরের প্রতি পুত্রবধূ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এর প্রতিকারের জন্য মনে রাখা দরকার যে, শাশুড়ী-শ্বশুরের খেদমত করা মৌলিকভাবে পুত্রবধূর দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তাদের পুত্রের উপর বর্তায়। পুত্রের পক্ষ থেকে তার বধূ যদি সে খেদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয় তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। শাশুড়ী-শ্বশুর যদি পুত্র-বধূর খেদমতকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করেন, তাহলে পুত্র-বধূর প্রতি তারা প্রীত হবেন এবং তার প্রতি তাদের বাদীসুলভ মনোভাব সৃষ্টি হবে না। এ সম্পর্কে, 'স্ত্রীর অধিকারসমূহ' শিরোনামে (৪৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

### (২) যৌথ পরিবার থাকা।

অনেক সময় একান্নভুক্ত পরিবার থাকার কারণেও সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়। বিশেষভাবে যদি স্ত্রীর জন্য থাকার ঘরও পৃথক করে দেয়া না হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক নারীই এ কামনা করবে যে, স্বামীকে নিয়ে সে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে একটা সংসার গড়ে তুলবে, তার থাকার জন্য একটা ভিন্ন ঘর থাকবে যেখানে সে তার মাল-সামান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে বিনোদন করতে পারবে। যৌথ পরিবার ও একান্নভুক্ত সংসার অনেক ক্ষেত্রেই এ কামনায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রমুখদের সাথে পুত্র-বধূর বনিবনা হয়ে ওঠে না।

অনেক মাতা-পিতাই মনে করে থাকেন তাদের পুত্রের ভিন্ন সংসার গড়ে উঠলে তারা অবহেলিত হবেন, তারা বঞ্চিত হবেন। কিন্তু পুত্রকে যদি



তারা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে পুত্রের সংসার ভিন্ন হলেও পুত্র তাদের অধিকার ও খেদমতে ত্রুটি করবে না- এটাও বাস্তব সত্য। তদুপরি জোর-জবরদস্তী কিছুদিন একান্নভুক্ত রাখা হলেও চরম অবনিবনা সৃষ্টি হওয়ার পর এক সময় তো পৃথক হতেই হবে, সেই পৃথক হওয়াটা আগে ভাগে করে ফেললেই তো ভাল। মনে রাখা দরকার– যৌথ পরিবার সাময়িক বিচারে ভাল হলেও স্থায়ী সুসম্পর্কটা বড় কথা। তদুপরি স্ত্রীর অধিকার আছে পৃথক হয়ে যেতে চাওয়ার, অন্তত একটা থাকার ভিন্ন ঘর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। এ সম্পর্কে "স্ত্রীর অধিকারসমূহ" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন ৪৪৭ পৃষ্ঠা) হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, দু' চুলার আগুন থেকেই সংসারের শান্তিতে আগুন লাগে। অতএব এই যুগে শুরু থেকেই চুলা পৃথক করে দেয়া সমীচীন। (تحفۂ زوجین) তবে স্ত্রীরও মনে রাখা দরকার বিনা প্রয়োজনে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই-বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

### (৩) আয়-ব্যয়ের মাঝে ভারসাম্য না থাকা।

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করা। অনেকেই সংসার জীবনের প্রথম দিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধ্যের বাইরেও অনেক বেশি ব্যয় করে থাকে। সব ক্ষেত্রেই সে তার স্টান্ডার্ড ছাড়িয়ে চলে যায়। এভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানাদির স্টান্ডার্ড বেড়ে যায় এবং এভাবে চলতে চলতে হয়তো এক সময় সে ঋণী হয়ে পড়ে কিংবা এভাবে চলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন পূর্বের স্টান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য তাকে অবৈধ আয়ের পথে পা বাড়াতে হয় কিংবা স্ত্রী পুত্র পরিজনের কাছে হেয় হতে হয়, তাদের মন রক্ষা করা সম্ভব হয় না, ফলে মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়। কুরআনে কারীমে একদিকে যেমন কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, অপর দিকে এত বেশি হাত-খোলা হতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে গিয়ে নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হয়ে যেতে হয় এবং হেয় হতে হয়। সুতরাং আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা উচিত। বিশৃংখল ব্যয় করা নিষিদ্ধ। বিশৃংখল ব্যয় করা বলতে বোঝায় যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা ব্যয় করে ফেলা এবং ভবিষ্যতে শরীআতসম্মত প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়া। এতে বুঝা গেল কিছুটা

সঞ্চয়ের নীতিতে চলা কর্তব্য। (ماخوذ از معرف القرآن و اسلام کا اقتصادی نظام)

**(৪) স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে না দেয়া।**

কোন গাড়ীর আরোহীগণ যদি গাড়ীর চালককে সহযোগিতা না করে, তাহলে চালক সে গাড়ি নির্বিঘ্নে চালাতে সক্ষম হয় না। তদ্রূপ সংসার জীবনে পুরুষ হল গাড়ী চালকের ন্যায় আর স্ত্রী হল সে গাড়ীর আরোহী এবং কিছুটা সে চালকও বটে। তাই স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে দেয়া উচিত, যাতে পুরুষের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সংসার পরিচালনায় সে সহযোগিতা করতে পারে এবং যাতে স্বামীর আয়ের সাথে সঙ্গতিহীনভাবে সংসার চালিয়ে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলে।

স্ত্রীর মধ্যে স্টান্ডার্ড বৃদ্ধি করার এবং আরও জাঁকজমকের সাথে চলার মনোবৃত্তি যেন সৃষ্টি হতে না পারে সে জন্য নিজের চেয়ে ধনবান পরিবারের বাড়িতে স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার বা পাঠানোর এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করানোর ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু স্ত্রী নয় বরং সংসারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এতসব সতর্ক পদক্ষেপ নেয়ার পরও কখনও যদি স্ত্রী বা সংসারের অন্য সদস্যদের মধ্যে সাধ্যের বাইরে জাঁকজমকের সাথে এবং আড়ম্বরের সাথে চলার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে দুনিয়া ত্যাগের ওয়াজ নছীহত শুনাতে হবে, দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ অলী-আল্লাদের জীবনী ও কাহিনী শুনাতে হবে বা এসম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করাতে হবে এবং গরীবদের সাথে উঠা-বসার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যে পরিবেশে যাওয়ার ফলে উক্ত মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে সে পরিবেশ থেকে তাদেরকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হবে।

**(৫) স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ।**

স্বামী স্ত্রী একে অপরের চরিত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লে এ থেকে সংসারে চরম অশান্তি দেখা দিতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথমত উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, দলীল প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কু-ধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। অতএব দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সন্দেহ না যায় তাহলে, যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে আমার মনে সন্দেহ



সৃষ্টি হচ্ছে, তুমি এ থেকে বিরত হও, আর বিরত হতে না পারলে আমার জন্য দুআ কর যেন আমার মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায়। নিজেও মন থেকে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করতে থাকবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় মনে মনে সন্দেহ, ক্ষোভ চাপা রাখলে সেটা খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে থাকবে।

আর বাস্তবিকই যদি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে যে কারণে সেটা ঘটছে সেটা প্রতিহত করবে। এর জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রীকে শরীআতসম্মত পর্দার মধ্যে রাখা। পর্দা ব্যবস্থায়ই হল চরিত্র ও সতীত্ব সংরক্ষণের সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা। আর যদি স্বামীর চরিত্র নষ্ট হতে থাকে, তাহলে স্ত্রী যেহেতু জোরপূর্বক স্বামীকে কোনো কিছু মানাতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এজন্য বকাঝকা করলে স্বামীর জিদ বেড়ে গিয়ে আরও হিতে বিপরীত হতে পারে, তাই স্ত্রীর তখন করণীয় হল–

(এক) স্বামীর মতি ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবে।

(দুই) যখন স্বামী নির্জনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় থাকবে তখন খুব নরম ভাষায় তাকে বুঝাতে থাকবে।

(তিন) স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আগের চেয়ে বেশি নিজেকে নিবেদিত করবে। এভাবে হয়ত স্বামীর সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এ না করে স্ত্রী যদি এরূপ মুহূর্তে স্বামীকে জব্দ করতে চায়, প্রকাশ্যে হেয় করতে চায় এবং স্বামীর মনোরঞ্জনে পূর্বের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

**(৬) একাধিক বিয়ে।**

ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে একাধিক বিয়ে (এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন) পুরুষের জন্য জায়েয রেখেছে। তবে শর্ত হল পুরুষ তার সকল স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে। স্বামী আরও স্ত্রী ঘরে আনুক, আরও একটা বিবাহ করুক সাধারণভাবে স্ত্রী তা মেনে নিতে চায় না এবং এ জন্য মনোমালিন্য ও সংসারে অশান্তি লেগে যায়। এ অশান্তির প্রতিকারের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কিছু করণীয় রয়েছে। স্বামীর করণীয় হল যদি একান্তই তাকে আবার বিয়ে করতে হয় তাহলে যে কারণে আগের স্ত্রী পরবর্তী বিয়েকে মেনে নিতে পারছে না অর্থাৎ, সে আশংকা করছে যে, অন্য স্ত্রীকেই বেশি আদর-সোহাগ করা হবে, তার

আদর-সোহাগ কমে যাবে, তার সন্তানাদি অবহেলিত হবে ইত্যাদি। স্বামীর কর্তব্য কার্যতঃভাবে এ আশংকাকে দূর করা অর্থাৎ, সে সকল স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণভাবে সমতা রক্ষা করবে, সকলকেই এক দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের সাথে এক রকম আদর-সোহাগের আচরণ করবে, তাহলে আস্তে আস্তে পূর্বের স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আর স্ত্রীর কর্তব্য হল প্রথমত সে মনকে বুঝাবে যে, পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ে করা যখন জায়েয, তখন আমার সেটা মেনে নিতে বাধা কোথায়। **দ্বিতীয়ত** সে জিদ ধরে স্বামীর খেদমত ও মনোরঞ্জনে ত্রুটি করবে না; তাহলে এই অবসরে পরবর্তী স্ত্রীর দিকে স্বামী বেশি ঝুঁকে পড়বে বরং তার জন্য উচিত হল স্বামীকে আরও বেশি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা, যাতে স্বামীকে ভারসাম্যের পর্যায়ে রাখা যায়। তৃতীয়ত সতীনকে প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যদি সতীনের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার আচরণ করা হয়, তাহলে সেও তাকে শত্রু ভাববে। এভাবে শুরু থেকেই অমিল লেগে গেলে ভবিষ্যতে তাকে আপন করে নেয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে– নতুন সতীনকে আপন করে নিতে না পারলে সংসারে যে অশান্তি আসবে, সে অশান্তি শুধু নতুন সতীনই ভোগ করবে না, তাকেও ভোগ করতে হবে। তাই জিদ ধরা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা হল শুরু থেকেই সতীনকে আপন করে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করা। আর নতুন স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর পুরাতন স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে, যেমন তার অধিকার রয়েছে। অতএব পুরাতন স্ত্রী থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। নতুন স্ত্রী যদি স্বামীকে সব স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে এক দিকে স্বামী অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে অপর দিকে আগের স্ত্রীও তাহলে নতুনজনের মুগ্ধ হবে এবং সর্বোপরি সংসারের শান্তি রক্ষা হবে।

### (৭) তালাক সম্পর্কিত কুসংস্কার।

তালাক দেয়া বা না দেয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমাজে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা রয়েছে। কিন্তু লোক কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, নিতান্ত ঠেকা ছাড়াই সামান্য সামান্য কারণে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয় এবং তিন তালাক দিয়ে বসে, যাতে করে পরে হুঁশ ফিরে এলেও আর স্ত্রীকে রাখা তার জন্য জায়েয থাকে না, তখন সে নানানভাবে পারিবারিক অশান্তিতে পড়ে যায়। মনে রাখতে হবে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বা নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি জুলুম ও অন্যায়। আর কখনও তালাক



দিতে হলেও এক তালাক দেয়া সমীচীন, যাতে পরে সম্বিত ও হুশ ফিরে এলে প্রয়োজনবোধে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। সারকথা, রাগের মাথায় তালাক দেয়া পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে।

আবার কতক লোক সমাজের নিন্দা সমালোচনার ভয়ে, পরিবারের তথাকথিত ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য নিতান্ত ঠেকায় পড়েও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। স্ত্রীর সঙ্গে কোনোভাবেই তার বনিবনা হচ্ছে না, কোনোভাবেই তারা মিলেমিশে চলতে পারছে না, দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তবুও তালাক দিতে পারছে না, ফলে সারাটা জীবন তাদের অশান্তিতে কাটছে। এটাও এক ধরনের কুসংস্কার। হিন্দুয়ানী কুসংস্কারের ফলেই তালাককে এত জঘন্য মনে করা হয়। ইসলামে তালাক দেয়াটা অত্যন্ত গর্হিত বটে, কিন্তু তা সব সময়ে এবং সব পরিস্থিতিতে নয় বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়াটা মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়া ওয়াজিব ও জরুরি হয়ে পড়ে। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, কিংবা মোটেই নামায না পড়ে, বা বোঝানো সত্ত্বেও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়াই মোস্তাহাব ও উত্তম। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারটা যদি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, স্বামী স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারে না, তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। (অবশ্য যদি স্ত্রী তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।) অতএব কোনোক্রমেই যে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কিংবা বংশে কেউ তালাক দেয়নি কাজেই তালাক দেয়া যাবে না– এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে গিয়ে উক্ত স্ত্রীকে রেখে জীবনকে দুর্বিষহ করার কোনো অর্থ নেই। যখন পারস্পরিক অনৈক্যের কোনোই সমাধান করা সম্ভব হয় না, তখন তালাক দিয়ে দেয়াই সমীচীন।

(ماخوذ از تحفۂ زوجین و احسن الفتاوی [illegible]/۵)

### (৮) অত্যধিক মহর ধার্য করা।

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি না থাকা সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না শুধু এ কারণে যে, তার ঘাড়ে চেপে আছে বিরাট অংকের মহর, যেটা পরিশোধ করার সাধ্য তার নেই। আবার এই মহরের অংক বড় থাকার সুবাদে অনেক স্ত্রীও স্বামীর অবাধ্য হওয়ার বা স্বামীকে যথাযথভাবে তোয়াক্কা না করার দুঃসাহস পায় এই ভেবে যে, সে যতই

করুক স্বামী তাকে ছাড়ার সাহস পাবে না মহর পরিশোধ করার ভয়ে। সাধ্যের বাইরে অত্যধিক মহর ধার্য করলে এভাবে সেটা সংসারের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহরটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের জন্য কাল, অশান্তি দূর করার পথে অন্তরায়। ইসলামের দৃষ্টিতে মহর পরিশোধযোগ্য একটি ঋণ, অন্যান্য ঋণের ন্যায় এ ঋণও পরিশোধ করা ওয়াজিব– এই চিন্তা থাকলে কোনো স্বামীই শুধু নাম-শোহরতের জন্য তার সাধ্যের বাইরে মহর ধার্য করত না। কিংবা করে থাকলেও ক্রমান্বয়ে তা পরিশোধ করে দিলে পরবর্তীতে তার জন্য সেটা কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। মূলত সমাজ মহরকে শুধু ধার্য করার বিষয় মনে করে, এটা যে পরিশোধ করা জরুরি তা মনে করে না, যার ফলেই সাধ্যের বাইরে মোটা অংকের মহর বাঁধা হয় এবং এটা কোন এক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

### (৯) যৌতুক প্রথা।

আমাদের বর্তমান সমাজে যৌতুক একটা বিরাট পারিবারিক অশান্তির কারণ। এই যৌতুকের অভিশাপে বহু নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়, বহু নারীকে জীবন দিতে হয় এবং বহু পরিবারে শান্তি বিনষ্ট হয়। যৌতুক একটা সামাজিক অভিশাপ এবং এটা সমাজের এক রকম মানসিক সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করা অপরিহার্য। যৌতুক চাওয়া যে অবৈধ, এটা একটা ঘৃণিত পন্থা, এটা অনধিকার চর্চা, এর কারণে যে স্বামী ও স্বামী পক্ষ স্ত্রী ও স্ত্রী পক্ষের কাছে হীন ও নীচ বলে প্রতিপন্ন হতে হয়– এ কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া আবশ্যক, তাহলে হয়ত ধীরে ধীরে এই ব্যাধি সমাজের মন-মানসিকতা থেকে দূর করা সম্ভব হতে পারে। অগ্রীম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে যারা যৌতুক চায় বা যৌতুক পাওয়ার লালসা রাখে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করাই উচিত। এরূপ সামাজিক অপরাধ প্রতিহত করার জন্য ইসলামের আলোকে কোন কঠোর আইনও প্রণয়ন করা যেতে পারে। যৌতুক সম্পর্কিত মাসায়েল এবং আরও কিছু কথা জানার জন্য দেখুন ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

### (১০) সন্তানাদির দ্বীনদার না হওয়া।

সন্তানাদি যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, খারাপ পথে চলে, এক কথায়



সন্তানাদি যদি দ্বীনদার ও ভাল না হয়, তাহলে সংসারে সেটা বিরাট অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রতিকার হল সন্তানাদিকে দ্বীনদার বানানো। সন্তানাদিকে দ্বীনদার বানানো ও ভাল করে গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫৭৬–৫৮০পৃষ্ঠা।

### (১১) পারস্পরিক অধিকার আদায় না করা।

পরিবারের মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে অধিকার তা আদায় না করলে, যার যা করণীয় তা না করলে পরস্পরে অমিল এবং এই অমিল থেকে অশান্তির সূত্রপাত ঘটতে পারে। এসব অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৩৫–৪৩৯, ৪৪৩–৪৫০ ও ৪৫৬ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিতে পারে, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে তার ইসলামী সমাধান জেনে নেয়া যেতে পারে।

## স্ত্রী অবাধ্য হলে তখন যা যা করণীয়

* স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় বা এমন আশংকা দেখা দেয় কিংবা স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য স্বামীকে যথাক্রমে পাঁচটি উপায় বলে দেয়া হয়েছে।

১. প্রথম পর্যায়ে ধৈর্য ধারণ করবে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

৩. তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য স্ত্রী থেকে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করবে বা এক বিছানায় থেকেও ভিন্ন দিকে পাশ ফিরিয়ে শুয়ে থাকবে। এই ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরও যদি সে দুষ্কর্ম থেকে এবং অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে–

৪. তাকে সাধারণ ভাবে হালকা মারধর করার অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ, এমন মারধর, যাতে তার শরীরে মারধরের প্রতিক্রিয়া বা জখম না হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদ দেখুন।

৫. উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার পরও যদি স্ত্রী মানতে আরম্ভ না করে এবং মনোমালিন্য ও বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায় –চাই তা স্ত্রীর স্বভাবের জটিলতা বা অবাধ্যতার কারণে হোক বা পুরুষের অহেতুক কড়াকড়ির

কারণে হোক– তাহলে পঞ্চম পর্যায়ে সরকার বা উভয় পক্ষের মুরব্বী, অভিভাবক কিংবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দিবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে আর একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। তারা যদি আন্তরিকতার সাথে সৎ নিয়তে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী হয়ে কাজ করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিবেন। (معرف القرآن و تحفۂ زوجین)

## স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নারীগণ বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দিলে বক্রই থেকে যাবে, আবার অতিরিক্ত কড়া শাসন পূর্বক সম্পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। তাই নারীদেরকে শাসনও করতে হবে এবং শাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, তবে পূর্ণ সংশোধন হবে– এমন আশা রাখা যায় না।

* স্ত্রী অবাধ্য হলে বা যথাযথ আনুগত্য না করলে তাকে সংশোধনের জন্য পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ধারায় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিছানায় তাকে ত্যাগ করতে হবে। এ পন্থায়ও সংশোধন না হলে তারপর তাকে কিছুটা হালকা মারধর করেও সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অনেক মুফাসসিরের মতে এ তিনটি পন্থার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, বোঝানো এবং উপদেশ প্রদানের পূর্বেই বিছানায় ত্যাগ করা জায়েয নয় বা বোঝানো ও বিছানায় ত্যাগ করার পন্থাদ্বয় গ্রহণ না করে প্রথমেই মারধর করে সংশোধন করতে যাওয়া বৈধ নয়।

* স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে– এ মারধর অর্থ নির্যাতন করা নয়, তাকে কষ্ট দেয়া নয়, তাকে লাঞ্ছিত করা নয় বরং তার আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। এ জন্যই ফোকাহায়ে কেরাম শর্ত করেছেন, শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়– এমনভাবে মারা যাবে না, চেহারায় মারা যাবে না,



কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এক স্থানে একাধিক বার আঘাত করা যাবে না এবং কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, মারবে রুমাল বা কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা বা মেসওয়াক দ্বারা। তদুপরি এই যতটুকু মারধর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা-ও সব ক্ষেত্রে নয় বরং ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, সাধারণভাবে চার কারণে মারা যেতে পারে। যথা:– **(এক)** স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করতে আহবান করার পরও স্ত্রী যদি অমান্য করে। **(দুই)** স্ত্রী শরীআতসম্মত ওজর ছাড়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ি থেকে বের হলে। **(তিন)** স্বামীর বলা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সাজসজ্জা ও রূপচর্চা না করে। **(চার)** শরীআতের ফরয কাজ পরিত্যাগ করলে; যেমন: নামায না পড়লে, ফরয গোসল না করলে, কোনো ওজর ছাড়াও রোযা না রাখলে ইত্যাদি।

* সর্বপরি কথা হল– মারধর করার অনুমতি রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা পছন্দনীয় পন্থা নয়। হযরত রসূল (সা.) এ পর্যায়ের শাস্তি দানকে পছন্দ করেননি বরং তিনি বলেছেন, ভাল লোক এমন করে না।

(معرف القرآن ও المشاكل الزوجية وحلولها থেকে গৃহীত।)

* স্ত্রীকে শাসন ও সংশোধন করার জন্য বকাঝকা করা, গালমন্দ করা বা মারধর করার ক্ষেত্রে অনেকেই রাগের বশে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। যার ফলে একদিকে শাসনের ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে পরে নিজের বাড়াবাড়ির জন্য নিজেকেই লজ্জিত হতে হয়। এর থেকে বাঁচার উপায় হল তিনটি। যথা:– **(এক)** ঠিক রাগের মুহূর্তে কিছুই বলবে না বা কিছুই করবে না। **(দুই)** কি কি শব্দ বলে তাকে গালমন্দ করতে হবে কিংবা কীভাবে কোন স্থানে কতটুকু প্রহার করবে তা আগে চিন্তা করে স্থির করে নিবে। **(তিন)** গালমন্দ বা প্রহার করার পূর্বে চিন্তা করে নিবে যে, পরে আবার তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে কত কিছু করা হবে, তখন যেন শরম পেতে না হয়। এ তিনটি পন্থা গ্রহণ করলে শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

* স্ত্রীকে শাসনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে স্বামী শাসক আর স্ত্রী শাসিত নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শাসক শাসিতের সম্পর্ক নয় বরং তাদের মধ্যে সম্পর্ক হল ভালবাসার সম্পর্ক, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক। অতএব কোনো শাসনই যেন ভালবাসার চেতনা বাদ দিয়ে নিছক রাগ ও ক্ষোভ

চরিতার্থ করার জন্য না হয়। (بضوء تحفۂ زوجین)

## স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর যা যা করণীয়

কোন কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে ওঠে, তখন স্বামীর রাগকে প্রশমিত করার জন্য এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ত্রীর চারটি কাজ করণীয়। যথা:

১. স্ত্রীকে মনে করতে হবে যে, সে স্বামীর অধীনস্থ ও স্বামীর কর্তৃত্বাধীন এবং এই অধীনস্থ ও কর্তৃত্বাধীন থাকার মধ্যেই সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণ ও শৃংখলা নিহিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীও এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব স্বামীর রাগ সময়িকভাবে তাকে সহ্য করে নিতে হবে, তার পক্ষেও উল্টো রাগ হওয়া সমীচীন হবে না।

২. স্বামী যদি রাগান্বিত হয় আর প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীর কোনো অন্যায় না-ও থাকে, তবুও সেই মুহূর্তে স্ত্রীর চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়, স্বামীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক নয়। তর্ক শুরু করলে স্বামীর রাগ আরও বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। যেমন: মারধরের দিকে যেতে পারে বা খোদা নাখাস্তা তালাকের দিকেও যেতে পারে। রাগের মুহূর্তেই এসব ঘটে থাকে। অতএব রাগ বৃদ্ধি না করে তা প্রশমিত করা উচিত। স্ত্রীর যদি কোনো অন্যায় না থাকে আর সে স্বামীর অন্যায় রাগের মুহূর্তেও চুপ থাকে- কথা কাটাকাটি না করে, তাহলে পরে স্বামীর যখন রাগ ঠাণ্ডা হবে তখন সে নিজের অন্যায় রাগের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হবে, তার অনুগত হয়ে পড়বে আর ভবিষ্যতে রাগ করতে গেলেও ভেবে-চিন্তে রাগ করবে।

৩. স্বামীর রাগের পেছনে স্ত্রীর অন্যায় থাকুক বা না থাকুক স্ত্রীর উচিত খোশামোদ-তোশামোদ করে হলেও স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো। স্ত্রীর যদি অন্যায় থাকে তাহলে তো তার জিদ ধরা চরম অন্যায় হবে বরং সে মুহূর্তে তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। যদি তার অন্যায় না-ও থাকে, তবুও সে জিদ ধরলে হয়তবা স্বামীকে নত করা সম্ভব হবে না। তাহলে তার সামান্য জিদের কারণে পরিণতি খারাপ হয়ে পড়তে পারে। স্ত্রীর একথা মনে করা উচিত নয় যে, আমার অন্যায় নেই, অতএব খোশামোদ করতে যাওয়া আমার জন্য অপমানজনক। বরং এই খোশামোদের ফলে স্বামীকে স্বাভাবিক করতে পারলে পরে স্বামীর হুশ ফিরে আসার পর সে উক্ত স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ এবং তার অনুগত হয়ে যাবে– এভাবেই তার মান বেড়ে যাবে।



৪. চুপ থেকে, তর্ক না করে, খোশামোদ-তোশামোদ করেও যদি স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো না যায়, তাহলে নির্জনে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তার কাছে সত্যিকার অবস্থা তুলে ধরবে এবং নিজের অন্যায় থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ স্বামীর রাগ প্রশমিত হবে।

## স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ এলে স্বামীর যা যা করণীয়

কোন দোষ-ত্রুটির কারণে স্ত্রীর প্রতি রাগ এসে গেলে তখন স্বামীর করণীয় হল–

১. স্বামীর চিন্তা করা উচিত যে, প্রাকৃতিক নিয়মে এবং আইনগত ভাবে স্ত্রী তার কর্তৃত্বাধীন ও অধীনস্থ হলেও সেও স্ত্রীর ভালবাসা ও খেদমতের ঋণে তার কাছে দায়বদ্ধ। এ হিসেবে সেও স্ত্রীর অনুগ্রহের অধীন। স্ত্রীর প্রতি তার অনুগ্রহ থাকলে তার প্রতিও স্ত্রীর অনুগ্রহ রয়েছে। স্ত্রীর যেমন স্বামীকে প্রয়োজন, স্বামীরও স্ত্রীকে প্রয়োজন, উভয়েই উভয়ের কাছে ঠেকা। অতএব একতরফাভাবে কর্তৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে কথায় কথায় স্ত্রীর প্রতি রাগ করা তার পক্ষে ঠিক নয়।

২. স্বামীর সব সময়ই স্ত্রীর অসহায়ত্ব এবং তার জন্য স্ত্রীর আপনজন ছেড়ে চলে আসার কথা স্মরণ রাখা দরকার, তাহলে স্ত্রীর প্রতি রাগ নয় বরং সহানুভূতি জাগ্রত হবে এবং রাগের মুহূর্তে এটা স্মরণ করলে রাগ প্রশমিত হবে।

৩. কোন একটা দোষের কারণে রাগ এসে গেলে তার অন্য অনেক গুণ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করে তার প্রতি প্রীত হওয়ার চেতনা জাগ্রত করবে।

৪. উপরোক্ত পন্থায় রাগ প্রশমিত না হলে রাগ দমন করার স্বাভাবিক যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে তার উপর আমল করবে। এর জন্য দেখুন ৬২৭ পৃষ্ঠা।

## স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার

দোষ-গুণে মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ থাকে, আবার তার অনেক গুণও থাকে। স্ত্রীর মধ্যেও এমন কিছু পরিলক্ষিত হতে পারে যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগবে। যদি স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু পরিলক্ষিত হয় যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগে এবং তার কারণে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে মনে চায় বা তাকে ছেড়ে দিতে মনে চায় কিংবা তার প্রতি ভালবাসা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয়, সে মুহূর্তে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তায় আনতে হবে।

১. তার অন্য গুণাবলীর কথা চিন্তা করা এবং এভাবে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা।

২. এই চিন্তা করা যে, এসব দোষ দেখেও যদি ছবর করা হয়, তাহলে ছওয়াব হবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অতএব আল্লাহ আমাকে এ স্ত্রী দান করে আমার প্রতি অনুগ্রহই করেছেন– আমার ছওয়াব লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন।

৩. নিজের কিছু দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে ভাববে যে, আমার এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তো স্ত্রী আমাকে ভালবেসে যাচ্ছে, সে ছবর করে যাচ্ছে, তাহলে আমি কেন তার দোষ-ত্রুটি দেখে ছবর করতে পারব না, আমি কেন এসব সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে পারব না?

৪. একান্তই তাকে ছেড়ে দিতে মনে চাইলে এই চিন্তা করবে যে, আমি তাকে ছেড়ে দিলে সে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের ঘরে যাবে এবং তার কষ্টের কারণ হবে। অতএব তাকে রেখে দিলে অন্য ভাইকে কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করার ছওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথায় অন্য আর এক ভাইকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমিও দায়ী হয়ে যাই কি না?

৫. স্ত্রীর এমন কোন কিছুর কারণে যদি তাকে অপছন্দ লাগে, যা তার এখতিয়ার বহির্ভূত; যেমনঃ স্বামী ছেলে কামনা করে অথচ স্ত্রীর গর্ভে শুধু কন্যাই জন্ম নেয় বা তার সন্তানই হয় না। কিংবা স্ত্রীর একের পর এক রোগ-ব্যাধি লেগে থাকে ইত্যাদি, আর এ কারণে যদি স্ত্রীকে স্বামীর অপছন্দ লাগে, তাহলে স্বামীর ভেবে দেখতে হবে যে, এ অপছন্দ লাগার জন্য স্ত্রী দায়ী নয়, এতে স্ত্রীর কোনো দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে রাগ করা হলে এ রাগ মূলত তাকদীরের উপর এবং আল্লাহ্‌র ফায়সালার উপর গিয়ে পড়ে, যা মারাত্মক অন্যায়। তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি এবং তাকদীরের উপর যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই এরকম অপছন্দ লাগাকে দূর করা সম্ভব।

৬. এই চিন্তা করবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র কত নাফরমানী করি, আল্লাহ্‌র অপছন্দ লাগার কত কাজ করি, তারপরও আল্লাহ আমাদের সাথে করুণার আচরণ করেন। আল্লাহ্‌র এ চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আমারও



উচিত করুণার আচরণ করা।

## স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে যেসব বিষয় চিন্তা করে দেখতে হবে –যা পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে– স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে মন থেকে সে অপছন্দ লাগাকে দূর করার জন্য স্ত্রীকেও সে বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ দেখে নিন।

## স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* স্বামীকে বশীভূত করার অর্থ যদি এই হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বাধ্যগত হয়ে থাকবে, তার কথায় স্বামী উঠা-বসা করবে এবং স্ত্রী স্বামীর নাকে রশি লাগিয়ে ঘুরাতে পারবে, এরকম বশীভূত করতে চাওয়া ঠিক নয়। এরকম বশীভূত করার জন্য কোন তাবীজ-তুমার করাও হারাম। কেননা, এটা শরীআতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শরীয়ত চায় স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে এবং স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে। তবে হ্যাঁ স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে যথাযথ ভাল না বাসে, তার হক আদায়ে ত্রুটি করে, তাহলে তাকে বশীভূত করতে চাওয়া এই অর্থে যে, সে স্ত্রীর প্রতি যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়, স্ত্রীকে যেন যথার্থ ভালবাসে, তার হকসমূহ যেন আদায় করে, এরূপ বশীভূত করতে চাওয়া অন্যায় নয়। স্বামীকে এরূপ বশীভূত করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রী স্বামীর সাথে খোশামোদ-তোশামোদ করে চলবে, স্বামীর কল্যাণ ও স্বামীর খেদমতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করে দিবে। একথা মনে রাখা দরকার যে, জোরপূর্বক স্বামীকে বশীভূত করা যায় না। কোন স্ত্রী জোর জবরদস্তী করে রাগারাগি করে, জিদ ধরে, তর্কাতর্কি করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে স্বামীকে স্থায়ীভাবে বশীভূত করতে পারে না। একমাত্র খোশামোদ- তোশামোদ করেই স্বামীকে অনুগত করা যায়। তবে হ্যাঁ, এভাবেও যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তখন কুরআন হাদীছের কোন ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ ব্যবহার করলে করতে পারে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ পূর্বক কোন মিষ্টান্ন দ্রব্যে দম করে স্বামীকে খাওয়ানো হলে ইনশাআল্লাহ স্বামী স্ত্রীর প্রতি মেহেরবান হয়ে যাবে।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ. (সূরা বাকারা: ১৬৫)
তবে উল্লেখ্য যে, অবৈধ স্থানে এরকম করলে কোনো আছর হবে না।
(تحفۂ زوجین থেকে গৃহীত।)

## শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার নীতি

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাসের কতিপয় আদব ও নীতি রয়েছে, যা মেনে চললে শ্বশুর বাড়ীতে সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা যায় এবং সকলের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। এ নীতিগুলো অমান্য করলেই বিবাদ ও ঝগড়া কলহের সূত্রপাত ঘটে এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। নীতিগুলো নিম্নরূপ।

১. স্বামীর হক যথাযথভাবে আদায় করা। স্বামীর হক সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

২. যত দিন শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকবেন তাদের খেদমত ও আনুগত্যকে ফরয বলে জানবে এবং সেমতে তাদের খেদমত ও আনুগত্য করবে। তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় আদব-সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ রাখবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা আইনত ফরয না হলেও নৈতিক দায়িত্ব।

৩. শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রমুখদের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সংসার গড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। যদিও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে ভিন্ন হতে চাওয়ার, কিন্তু সে এরূপ দাবি করলে, এর জন্য পীড়াপীড়ি করলে শ্বশুর-শাশুড়ী যখন জানবে তখন তারা এই ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যে, পুত্রবধূ আমাদের পুত্রকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এখান থেকেই ফ্যাসাদের সূত্রপাত ঘটবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৪৭-৪৪৮ পৃষ্ঠা।

৪. শ্বশুর বাড়ীর কোনো দোষ ত্রুটি মা-বাপের কাছে বলবে না বা শ্বশুরালয়ের কারও সম্পর্কে কোনো গীবত-শেকায়েত বাপের বাড়ীতে করবে না। এ থেকেই ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের মন খারাপ হয়ে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৫. শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকা অবস্থায় যদি একান্নভুক্ত সংসার হয় তাহলে স্বামী সংসার চালানোর টাকা-পয়সা স্ত্রীর হাতে দিতে চাইলে সে স্বামীকে বলবে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে দেয়ার জন্য, যাতে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন পরিষ্কার থাকে এবং তারা এই ভাবতে না পারে যে, পুত্রবধূ



আমাদের পুত্রকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

৬. শ্বশুর বাড়ীর সকল বড়দেরকে আদব-সম্মান এবং ছোটদেরকে স্নেহ করবে।

৭. শাশুড়ী, ননদ প্রমুখরা যে কাজ করবে তা করতে লজ্জাবোধ করবে না। তাদের কাজে সহযোগিতা করবে বরং তারা করার পূর্বেই সম্ভব হলে তাদের কাজ করে দিবে, তাহলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

৮. নিজের কাজ কারও জন্য ফেলে রাখবে না এই ভেবে যে, অমুক করে দিবে। নিজের সবকিছুকে নিজেই সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখবে।

৯. দুই চারজনে কোন গোপন কথা বলতে থাকলে সেখান থেকে সরে যাবে, তারা কী বলছিল সেটা জানার জন্য খোঁজ লাগাবে না। অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, তারা হয়ত আমার কোন দোষ বলাবলি করছিল।

১০. শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম প্রথম মন না বসলেও মনকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, কান্না জুড়ে দিবে না। এসে পারলে না– এরই মধ্যে আবার যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করবে না। এভাবে কিছুদিন পর মন ঠিক হয়ে যাবে।
(تحفۂ زوجین থেকে গৃহীত।)

## পুত্র-বধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর যা যা করণীয়

১. পুত্র-বধূ এলেই শাশুড়ী মনে করবে না যে, এখন থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘরের কোনো কাজ আর আমাকে করতে হবে না, এখন কাজের মানুষ এসে গেছে। পুত্র-বধূ ঘরের বাঁদি বা চাকরানী নয় বরং পুত্রবধূ ঘরের শোভা, পুত্রবধূকে চাকরানী মনে করবে না এবং চাকরানীসুলভ আচরণ তার সাথে করবে না।

২. শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা পুত্রবধূর আইনত দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। অতএব শ্বশুর-শাশুড়ীর যতটুকু খেদমত/সেবা সে করবে তার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী প্রীত হবেন এবং সেটাকে তার অনুগ্রহ মনে করবেন। আর যতটুকু সে করবে না তার জন্য তাকে জবরদস্তী করতে পারবেন না। কিংবা তার কারণে তার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবেন না।

৩. পুত্র-বধূর অধিকার রয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একান্নভুক্ত না থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার। অতএব পুত্রবধূ যদি পৃথক হতে চায় তাহলে তাতে বাধা দিতে পারবে না। বরং হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, এই জমানায় একান্নভুক্ত থাকার কারণেই পরিবারে

অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই শুরুতেই ফ্যাসাদ লাগার আগেই পুত্র ও বধূকে পৃথক করে দেয়া সমীচীন। তাতে মহব্বত ভাল থাকবে। অন্যথায় যখন ফ্যাসাদ লাগবে তখন পৃথকও করে দিতে হবে আবার মহব্বত ও সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। (تحفۂ زوجین)

৪. পুত্রের সাথে পুত্রবধূর অত্যাধিক ভালবাসা হতে দেখলে উষ্মাবোধ করবে না এবং অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, বধূ আমাদের পূত্রের মাথা খেয়ে ফেলবে কিংবা আমাদের থেকে বুঝি তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা হয়ে যাওয়াই তো শরীআতের কাম্য। তাদের মধ্যে মহব্বত হতে দেখলে উষ্মাবোধ করবে, আবার অমিল হয়ে গেলে মিল করানোর জন্য তাবীজের সন্ধানে ছুটাছুটি করবে– এই বিপরীতমুখিতার কোনো অর্থ হয় না।

৫. পুত্রবধূকে স্নেহ করবে, আদর-সোহাগ করবে এবং তার আরাম ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখবে, যেন পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্নেহময়ী পিতা-মাতার মত পেয়ে তাদেরকে আপন মনে করে নিতে পারে এবং তাদের জন্য সব রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করাকে নিজের গৌরব মনে করে নিতে পারে।

৬. পুত্রবধূর কাছে নিজেদেরকে তার কল্যাণকামী হিসাবে প্রমাণিত করতে হবে, যাতে তাদের প্রতি পুত্র-বধূর আজমত ভক্তি বৃদ্ধি পায়।

৭. যৌতুকের জন্য পুত্রবধূকে কোন রকম চাপ তো দূরের কথা ইশারা-ইঙ্গিতেও কিছু বলবে না। এমনকি পুত্রবধূ তার বাপের বাড়ী থেকে কি কি মাল-সামান এনেছে, কি কি আনেনি বা কেন আনেনি– এ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনাই তুলবে না। মনে রাখতে হবে যৌতুক চাওয়া হারাম এবং এই যৌতুকের কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন কোন পিতা-মাতা যৌতুকের কথা তুলে পুত্রের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে কি না, সেটা পিতা-মাতার উচিত হবে কি না, তা তাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। অনেক সময় পুত্র স্ত্রীকে এসব কথা কিছুই বলে না, পিতা-মাতাই নিজেদের থেকে এসব আলোচনা তুলে থাকে, কিন্তু পুত্রবধূ মনে করে স্বামীর ইশারাতেই এগুলো বলা হচ্ছে। এভাবে পিতা-মাতার এসব আলোচনা দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে মন কষাকষি এবং ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়ে যেতে পারে।

৮. পুত্রবধূকে সংসার চালানো শিখিয়ে দিবে।

৯. পুত্রবধূকে এই নতুন সংসারে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার



জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান করবে।

১০. পুত্রবধূ এক হিসাবে শ্বশুর-শাশুড়ীর অধীনস্থ। অতএব পুত্রবধূর দ্বীনদারী, ইবাদত-বন্দেগী ও তার ইজ্জত-আব্রুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

## সন্তান লালন-পালন

### শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা

* সন্তান জন্মলাভ করার পরপরই তাকে গোসল দিবে। প্রথমে লবণ পানি দিয়ে তারপর খালেস পানি দিয়ে গোসল করাবে, তাহলে ফোড়া, গোটা ইত্যাদি অনেক ব্যাধি থেকে শিশু মুক্ত থাকবে। এরপর শরীরে বেশি ময়লা থাকলে কয়েক দিন পর্যন্ত এরূপ লবণ পানি দিয়ে গোসল করাবে; অন্যথায় শুধু খালেস পানি দিয়ে গোসল করাবে।

* গোসলের পর অন্তত চার/পাঁচ মাস পর্যন্ত তেল মালিশ করা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

* ভেজা কাপড় দিয়ে শিশুর নাক, কান, গলা, মাথা ভালভাবে পরিষ্কার করবে।

* মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য খুবই উপকারী।

* দুধমায়ের দুধ খাওয়াতে হলে সুস্থ, সবল ও অল্পবয়সী দুধমাতা নির্বাচন করতে হবে। যে মায়ের বাচ্চার বয়স ছয় সাত মাসের বেশি হয়নি– এরূপ মহিলার দুধ তাজা হয়ে থাকে, এরূপ মহিলাকে দুধমাতা নির্বাচন করা ভাল।

* শিশুকে খারাপ দুধ খাওয়াবে না। যে দুধ এক ফোটা নখের উপর রাখলে সাথে সাথে প্রবাহিত হয় বা মোটেই প্রবাহিত হয় না বা যে দুধের উপর মাছি বসে না সেটাই খারাপ দুধ। আর যে দুধ সামান্য প্রবাহিত হয়ে থেমে যায় সেটা ভাল দুধ।

* দুধ পান করানোর পূর্বে মধু বা চিবানো খেজুর প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য আঙ্গুলে লাগিয়ে শিশুর গালে লাগিয়ে দিয়ে তারপর দুধপান করানো ভাল।

* শিশুদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য খারাব হবে।

* শিশুদেরকে নিজে বা কোন সমঝদার ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা খাওয়াবে, যাতে বে-আন্দাজ খেয়ে তাদের রোগ-ব্যাধি দেখা না দেয়, কিংবা পাকস্থলী দুর্বল হয়ে না যায়।

* ছোট শিশুদেরকে বার বার এ পাশ ওপাশ করে শোওয়াবে, যাতে এক দিকে বেশিক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ট্যারা হয়ে না যায়, কিংবা এক পাশে

বেশিক্ষণ শুয়ে মাথা বাঁকা হয়ে না যায়।

* শিশুদেরকে সকলের কোলে যাওয়ার অভ্যাস করাবে, যাতে শিশু একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। অন্যথায় তার অবর্তমানে শিশুর অসুবিধা হতে পারে।

* পেশাব-পায়খানার পর শিশুকে শুধু মুছে দেয়া যথেষ্ট নয় বরং পেশাব পায়খানার পর তৎক্ষণাৎ পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে হবে।

* বাচ্চাকে বেশি কোলে রাখবে না, তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। বরং সম্ভব হলে কিছু কিছু দোলনায় ঝুলানো ভাল।

* শোয়ানো বা কোলে নেয়ার সময় শিশুর মাথা কিছুটা উঁচুতে রাখবে।

* শিশুদেরকে নির্দিষ্ট সময় খাওয়ানোর অভ্যাস করানো ভাল, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

* শিশুদেরকে বিশেষ কোন এক ধরনের খাদ্যের প্রতি অভ্যস্ত করে তুলবে না বরং মৌসুমী সব ধরনের খাদ্য খাওয়াবে, তাহলে অভ্যাস ভাল হবে।

* টক জিনিস বেশি খাওয়াবে না।

* একবার খাওয়ানোর পর হজম হওয়ার পূর্বে অন্য খাবার দিবে না। কিংবা এত বেশি খাওয়াবে না যা হজম হতে পারবে না।

* সক্ষম হওয়ার পর শিশুদেরকে নিজের হাতে নিজের খাবার খেতে অভ্যস্ত করে তুলবে।

* খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করে দিবে।

* শিশুদেরকে তাকিদ করবে যেন কেউ কোন খাবার দিলে মাতা-পিতাকে না দেখিয়ে তারা না খায়।

* শিশুদেরকে ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করাবে।

* দুধ ছাড়ানোর সময় হলে এবং দুধের বাইরে বাড়তি খাবার শুরু করলে খেয়াল রাখতে হবে যেন শক্ত কিছু না চিবায়, অন্যথায় দাঁত উঠতে মুশকিল হবে এবং দাঁত চিরতরে দুর্বল হয়ে যাবে।

* বাচ্চাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন নিজের কাজ নিজে করে। এভাবে তারা আত্মনির্ভশীল হয়ে গড়ে উঠবে।

* বাচ্চাদেরকে কিছুটা হালকা ব্যায়াম যেমন: হাঁটা-চলা করা, দৌড়া-দৌড়ি করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং



অলসতা আসবে না।

* কিছুটা খেলা-ধুলা ও ফুর্তির সুযোগ দিবে, তাহলে মন ও স্বাস্থ্য উভয়টার উপকার হবে।

* বাচ্চাদেরকে মাজন মেসওয়াক ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলবে।

* বাচ্চাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

* ভাল খাবার ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য-খাবার দিবে, তবে বিলাসিতায় যেন অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে।

* বদ নজর লাগলে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বাচ্চাকে ফুঁক দিবে কিংবা লিখে বেঁধে দিবে।

**وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ. وَّمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.**

* বদ নজর থেকে বাঁচার আর একটি পদ্ধতি ৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

* শিশুদেরকে দু'বছরের বেশি দুধ পান করানো যাবে না। শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)−এর মতে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করানো যেতে পারে, তারপর অবশ্যই দুধ ছাড়াতে হবে। এরপরও দুধ পান করানো সকলের ঐক্যমতে হারাম।

* বাচ্চার দুধ ছাড়ানো মুশকিল হলে সুরা বুরূজ লিখে বেঁধে দিলে সহজেই দুধ ছেড়ে দিবে।

* সময়মত শিশুর দাঁত না উঠলে সূরা ক্বাফ (২৬ পারা)−এর শুরু থেকে **اَلْخُرُوْج** পর্যন্ত লিখে তা ধুয়ে পানি পান করালে সহজে দাঁত উঠবে। (اعمال قرآنی)

* মেয়েলোকের দুধ কমে গেলে সূরা হুজুরাত (২৬ পারা) লিখে তা ধুয়ে পান করালে দুধ বৃদ্ধি পাবে।

(معرف القرآن ও تربیت اولاد প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## শিশুর মানসিক পরিচর্যা

* শিশু কিশোরদের সামনে বা তাদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় বরং ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। মনে রাখতে হবে শিশু অবুঝ হলেও, তারা কোন কথা ও আচরণ পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার ভাল বা মন্দ

প্রতিক্রিয়া তাদের মনে পড়বে এবং তাদের মন-মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখবে। শিশুর মন ভিডিও-র ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে তার একটা চিত্র শিশুর মনে অংকিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে শিশুকালে যেসব চিত্র তার মনে অংকিত হয়েছিল এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শিশুর সামনে অবলিলায় সবকিছু বলা বা করা যাবে না বরং শধু এমন সবকিছুই তার সামনে বলতে বা করতে হবে যাতে তার মন-মানসিকতা ভাল এবং উন্নত হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

* জন্মের সময় শিশুর (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের) কানে আযান ও ইকামতের শব্দগুলো বলবে (ডান কানে আযানের শব্দাবলী এবং বাম কানে ইকামতের শব্দাবলী); তাহলে একটা ফায়দা এ-ও হবে যে, তার মনে ঈমানের শক্তি সৃষ্টি হবে।

* অবুঝ শিশুর জাগ্রত থাকা অবস্থায় তার সামনেও পিতা-মাতা অশ্লীল কথা-বার্তা ও যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না। সেরূপ করলে শিশুর মধ্যে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হতে পারে।

* শিশুর সাথে অনাদর ও অবহেলার আচরণ করবে না, তাহলে তাদের মন নিষ্ঠুর ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

* শিশুকে আদর-সোহাগ করতে করতে হবে পরিমিত। মাত্রাহীন আদর সোহাগ করলে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

* শিশুদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করালে তাদের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা গঠিত হবে। অন্যথায় তাদের মধ্যে নোংরা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

* শিশু কিশোরদেরকে যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজের হাতে করতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে তারা আত্মনির্ভরশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

* শিশু কিশোরদেরকে অতি বেশি জাঁকজমক ও বিলাসিতায় লালন-পালন করলে তাদের মধ্যে বিলাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

* শিশুদের সব জিদ ও সব দাবী পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হটকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সব জিদ



ও সব দাবি পূরণ করতে নেই। বিশেষভাবে অন্যায় জিদ ও অন্যায় দাবি পূরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আবার তাদের কোনো দাবিই যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে তাদের মন ছোট হয়ে যাবে এবং তারা সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী হবে। তাই তাদের দাবি পূরণ করার ক্ষেত্রে খুব ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে।

* অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র শিশুদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে দিবে না। অন্যথায় তাদের চরিত্রের কুপ্রভাব ওদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিশুদের খেলার সাথী নির্বাচনের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

* ছেলেদেরকে মেয়েদের সংগে একত্রে খেলাধূলা করতে দিলে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলীপনা বা পর্দাহীনতার মনোভাব দেখা দিতে পারে।

* শিশুদেরকে বাঘের ভয়, শিয়ালের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখাবে না, তাহলে তারা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে।

* শিশুরা অন্যায় করলে আল্লাহ্র ভয় দেখাবে, জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখাবে, তাহলে তাদের মনে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবে। আর তাদের অন্যায় কাজে বাধা না দিলে অন্যায়কে তারা ন্যায় বলে ভাবতে শিখবে।

* ভাল কাজের জন্য আল্লাহ্র খুশি হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নেয়ামত লাভের কথা শোনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

* প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ সবকিছুই দেখেন ও জানেন– এ বিষয়টা তাদের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে খোদামুখী চেতনা গড়ে উঠবে।

* শিশুদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে এবং বীর-বাহাদুরের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে বীরত্বের মনোভাব জাগ্রত হবে।

* শিশুদেরকে তাগিদ সহকারে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন মুরব্বী ছাড়া কারও নিকট কিছু না চায় কিংবা কেউ কিছু দিলে মুরব্বীর অনুমতি ব্যতীত যেন গ্রহণ না করে। এরূপ না করলে তাদের মনে লোভ-লালসা জন্ম নিবে।

* গরীব মিসকীনকে দান-সদকা করতে হলে শিশুদের হাত দ্বারা সেটা দেওয়াবে, তাহলে শিশুদের মধ্যে দানশীলতা সৃষ্টি হবে।

* শিশুরা ভাল কাজ করলে বা ভাল লেখাপড়া করলে তাদেরকে সামান্য পুরস্কার প্রদান করবে এবং সাবাশি প্রদান করবে, তাহলে ভাল কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত মন্দ কাজ করলে

অবস্থা অনুযায়ী সামান্য তিরস্কার ও সামান্য শাস্তি প্রদান করবে, তাহলে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এটা মন্দ। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশি সাবাশি দেয়া বা খুব বেশি পুরস্কৃত করা ঠিক নয়, তাহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পক্ষান্তরে খুব বেশি শাস্তি দিলে তারা খিটখিটে বা জেদী হয়ে যেতে পারে বা বেশি তিরস্কৃত করলে নিজের ব্যাপারে তার অনাস্থা জাগতে পারে। বস্তুত সাবাশি বা পুরস্কার দান, কিংবা তিরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বিষয়টা অত্যন্ত নাজুক, এ ব্যাপারে খুব বিবেচনা সহকারে মেপে মেপে পদক্ষেপ নিতে হবে।

* শিশুদেরকে কোন খাদ্য-খাবার দিলে তারা যেন সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে সকলে মিলে খায়– এরূপ অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাহলে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্টি হবে না।

* শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে, তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

## শিশুদের আদর-সোহাগ প্রসঙ্গ

* বাচ্চাদের আদর-সোহাগ করা সুন্নাত। পরিমিত আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে বাচ্চাদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

* বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ খুব বেশি করা তাদের জন্য ক্ষতিকর। এতে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

* আদর করে ছেলেকে আব্বু ডাকা এবং মেয়েকে আম্মু ডাকা জায়েয, এতে কোনো ক্ষতি নেই। (امداد الفتاوى)

* আদর-সোহাগ করতে গিয়ে শিশুদেরকে খোঁচা দেয়া, আঁচড় দেয়া বা কোনোরূপ উত্যক্ত করা হলে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা যদি শিশুর মানসিক কষ্ট হয় বলে বুঝা যায়, তাহলে এরূপ করা জায়েয নয়। (حسن العزيز)

* আদর-সোহাগ করে নাম বিকৃত করে ডাকা ঠিক নয়। নাম বিকৃত করলে নামের অর্থ বিগড়ে যায়। এতে খারাপ আছর হয়। তদুপরি ভাল নামের ভাল অর্থের ভাল আছর থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

## সন্তানের নাম রাখা

* ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখা উচিত, কারণ নামের অর্থের আছর হয়ে থাকে।

* সবচেয়ে উত্তম নাম আব্দুল্লাহ, তারপর আব্দুর রহমান। যে সকল নামের শুরুতে আব্দ এবং শেষে আল্লাহ তাআলার নামসমূহের যে কোনো একটি থাকে– এই প্রকারের নাম রাখাও উত্তম। আল্লাহ তাআলার



নামসমূহের জন্য দেখুন ৫৮–৭৪ পৃষ্ঠা।

* আম্বিয়া, সাহাবা এবং ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গদের নামের অনুরূপ নাম রাখাও উত্তম।

* মেয়েদের নাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর বিবি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কন্যা এবং অন্যান্য নেককার বিবিদের নামের অনুরূপ রাখবে।

* কারও নাম অপছন্দনীয় রাখা হলে তার নাম বদলে ভাল নাম রাখবে। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও নাম অপছন্দনীয় হলে তার নাম বদলে ভাল নাম রেখে দিতেন।

* একাধিক নাম রাখা জায়েয। তবে ভাল নামটি কাগজে কলমে রেখে বাজে অর্থহীন আর একটা ডাক নাম রেখে সেই নামে ডাকার যে প্রচলন আজকাল দেখা যায় তা কাম্য নয়। একাধিক নাম রাখলে প্রত্যেকটা নামই ভাল নাম হওয়া উচিত।

* সপ্তম দিবসে সন্তানের নাম রাখা মোস্তাহাব। (بہشتی زیور)

## সন্তানকে কাপড়-চোপড়, খাদ্য-খাবার ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি প্রদান করা সম্পর্কে কতিপয় নীতি

* সন্তানকে কাপড়-চোপড় দিবে তাদেরকে মালিক বানানোর নিয়তে নয় বরং তারা শুধু ব্যবহার করবে– এই নিয়তে, মালিক নিজে থাকবে। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান যার মালিক হয়ে যায় সেটা আর কাউকে দেয়া যায় না, নিজে মালিক থাকলে পুরাতন হওয়ার পর অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে। ছোট ছেলে-মেয়েরা যার মালিক হয়ে যায় তা অন্য কাউকে একেবারে দিয়ে দেয়া বা কর্জ স্বরূপ দেয়াও জায়েয নয়।

* ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবরা যে টাকা দিয়ে থাকে পিতা-মাতাই তার মালিক। অবশ্য যদি কেউ স্পষ্টতই বাচ্চাকে দেয়া উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করে বা বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস দেয় তাহলে বাচ্চাই তার মালিক।

* প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে পোশাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও সেরূপ পোশাক প্রদান করা নিষিদ্ধ।

* ছেলেদেরকে সাদা পোশাক পরিধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং রং চংয়ের পোশাকের প্রতি অনুৎসাহিত করবে এই বলে যে, এরূপ

পোশাক মেয়েলী পোশাক, তুমি মাশাআল্লাহ পুরুষ ছেলে ইত্যাদি।

* সন্তানকে খাদ্য-খাবার প্রদানের বিষয়ে পূর্বে শিশুদের স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। দেখুন ৫৬৬–৫৬৮ পৃষ্ঠা।

* সন্তানকে অতিরিক্ত বিলাসী খাদ্য-খাবার ও বিলাসী পোশাক প্রদান করবে না, এতে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

* সন্তানদেরকে অবৈধ বস্তু ক্রয়ের জন্য টাকা-পয়সা প্রদান করা জায়েয নয়; যেমন: পটকা ও আতসবাজি ক্রয়ের জন্য।

* সব সন্তানকেই একই মানের জিনিস ও কাপড়-চোপড় দেয়া কর্তব্য, বিনা কারণে বৈষম্য করা মাকরূহ।

* সন্তানদেরকে টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি হাদিয়া দিলে সকলকে সমান দেয়া কর্তব্য (উত্তম)। তবে কোন সন্তান যদি তালেবে ইল্ম হয়, দ্বীনের খাদেম হয় বা উপার্জনে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে কিছু বেশি দেয়া হলে তাতে কোনো দোষ নেই।

* সন্তানদের যদি নিজস্ব সম্পদ থাকে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার তার সম্পদ থেকে হতে পারে। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার উপর উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে সন্তান বালেগ এবং উপার্জন করতে সক্ষম হলে তার ভরণ-পোষণও আইনত পিতা-মাতার উপর ওয়াজিব নয়। আর সন্তান যদি নাবালেগ হয় এবং তার নিজস্ব কোনো সম্পদ না থাকে কিংবা বালেগ হলেও সে আয়-উপার্জন করতে সক্ষম না হয় এবং তার নিজস্ব সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় পিতা জীবিত থাকলে উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষণ শুধু পিতার উপর ওয়াজিব, মাতার উপর ওয়াজিব নয়। আর পিতা জীবিত না থাকলে মাতার উপর ওয়াজিব এবং রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয় থাকলে সকলের উপর এ দায়িত্ব বণ্টিত হবে।

* সন্তানকে দুধ পান করানোর মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন 'সন্তানের অধিকার' পৃষ্ঠা নং ৪৩৭ ।

(ماخوذاز تربیت اولاد و بہشتی زیور)

## সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল

* শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যেবা শিক্ষা দিবে।

* নিয়মিত লেখা-পড়া শুরু করানোর পূর্বেও সময়-সুযোগমত তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঈমানের কথা ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে শিক্ষা দিবে এবং


মৌখিকভাবে দুআ দুরূদ ইত্যাদি শিখাবে।

* শিশুদেরকে পিতা, মাতা ও দাদার নাম এবং বাড়ির কিংবা বাসার ঠিকানা অবশ্যই শিক্ষা দিবে। যাতে খোদা নাখাস্তা হারিয়ে গেলে অন্যরা তাকে সেই পরিচয় অনুযায়ী পৌঁছে দিতে পারে।

* সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া কর্তব্য।

* কত বয়স থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া শুরু করাতে হবে– এ ব্যাপারে কুরআন হাদীছে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সাত বৎসর বয়স থেকেই সন্তানকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অর্থাৎ, নামাযের জন্য যখন সাত বৎসর বয়সকে নির্ধারণ করা হয়েছে এর থেকে আমার মনে হয় এ বয়সটাই নিয়মতান্ত্রিক লেখা পড়া শুরু করানোর উপযুক্ত সময়।

* স্কুল কলেজে পড়ানো এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার শর্ত ও প্রয়োজন অপ্রয়োজন সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন ৪২ পৃষ্ঠা।

* শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যও আদর্শ ও নেককার শিক্ষক নির্বাচন করা উত্তম।

* যতদূর সম্ভব বিজ্ঞ, দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষাদান করানো প্রয়োজন, তাহলে সন্তানও তদ্রূপ বিজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠবে। শুধু সস্তা শিক্ষক খোঁজা হলে শুরু থেকেই শিশুর শিক্ষার মান বিগড়ে যাবে, তার পর সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

* নিয়মতান্ত্রিক লেখা-পড়া শুরু হওয়ার পর মামুলী ছুটি ব্যতীত বারবার ছুটি দেয়া চলবে না। তবে নিতান্ত জরূরত হলে ভিন্ন কথা।

* কঠিন পাঠগুলো সকালের দিকে এবং সহজ পাঠগুলো বিকালের দিকে পড়াবে। কেননা বিকালে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কঠিন পাঠ দেয়া হলে তার মধ্যে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

* শিশুদের পড়ার সময় ও পাঠের পরিমাণ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করবে। যেমন: প্রথম দিকে এক ঘণ্টা করে তারপর দুই ঘণ্টা করে। এমনিভাবে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে সময় ও পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকবে, এক সঙ্গেই সারা দিন লেখা-পড়ার চাপ দিলে একদিকে ক্লান্তিবশত সে পড়া চুরি করা শুরু করতে পারে, অপরদিকে ধারণ ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ

পড়লে তার স্মৃতি শক্তি ও মেধায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

* সন্তানদেরকে আয়-উপার্জন করারমত একটা জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা দিবে। এটা সন্তানের হক। (تربیت اولاد)

* শিশুদেরকে কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, পান-আহার, সালাম-কালাম ইত্যাদির আদব-কায়দা ও চরিত্র শিক্ষা দেয়া মাতা-পিতার দায়িত্ব।

## সন্তানের দাবি-দাওয়া ও জিদ পূরণ করার কতিপয় নীতি ও মাসায়েল

* সন্তানের বৈধ দাবি-দাওয়া কিছু কিছু পূরণ করতে হয়, অন্যথায় তাদের মন ছোট হয়ে যায়।

* সন্তানের সব জিদ পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বিশেষত সন্তান যদি কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দাবি করে বা জিদ ধরে তাহলেও তা করা জায়েয নয়, হারাম। এরূপ জিদ থেকে বিরত না হলে প্রয়োজনে তাকে শাসন করতে হবে।

* যেটা দেয়ার ইচ্ছা নেই, সন্তানকে ভুলানোর জন্য বা থামানোর জন্য এরূপ কোনো বিষয়ের ওয়াদা করা নিষেধ। এটাও মিথ্যার শামিল। এরূপ কোনো ওয়াদা করে ফেললে তা পূরণ করা জরুরি হয়ে পড়ে, যদি কোন অবৈধ বিষয়ের ওয়াদা না হয়ে থাকে।

## শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* অনেক সময় নম্র কথায় এবং নম্র আচরণে শিশুর সংশোধন না-ও হতে পারে। এরূপ মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন ও শাসনের প্রয়োজন। প্রয়োজনের মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন পূর্বক শাসন না করা খেয়ানত।

* শাসন ও শাস্তি প্রদানের কয়েকটা পদ্ধতি হতে পারে। যথা:

(১) তিরস্কার করা (২) ধমক দেয়া (৩) কড়া কথা বলা। (৪) হাত বা লাঠি দ্বারা মারা (৫) আঁটক করে রাখা (৬) কান ধরে উঠা-বসা করানো (৭) ছুটি বন্ধ করে দেয়া। এই শেষোক্ত শাস্তিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। শিশুদের মনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। (تربیت اولاد)

* মারধর অতিরিক্ত করা হলে, উঠতে বসতে লাথি জুতো করতে থাকলে শিশুরা নির্লজ্জ হয়ে যায় এবং মারের ভয় তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। তার পর তাকে শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা অন্যায়। ফোকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে



বলেছেন, যে মারপিট দ্বারা হাত ভেঙ্গে যায়, চামড়া ফেটে যায় বা চামড়ায় দাগ পড়ে যায়, সেরূপ মারপিট করা নিষিদ্ধ। কোন পিতা বা উস্তাদ এরূপ মারধর করলে তিনি শাস্তির যোগ্য। (تربیت اولاد عن رد المحتار ج/٣) মনে রাখতে হবে– অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা জুলুম।

* মারধরের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা থেকে বাঁচার উপায় হল রাগের মুহূর্তে মারধর না করা। কেননা রাগের মুহূর্তে ব্যালেন্স ঠিক থাকে না। রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর কতটুকু অন্যায় এবং তার জন্য কতটুকু কীভাবে শাস্তি দেয়াটা উপযোগী তা চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দিতে হবে। হাদীছেও রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। খুব বেশি রাগ এসে গেলে রাগ দমন করার পদ্ধতিসমূহের উপর আমল করবে। তার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা নং ৬২৭।

* কখনও অতিরক্ত শাস্তি দেয়া হয়ে গেলে শাস্তি দেয়ার পর তাকে আদর-সোহাগ করে, অনুগ্রহ করে খুশি করে দিবে।

* বকাবকি ও ভর্ৎসনা করার ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করবে না, লাগামহীনভাবে মুখে যা আসে বলবে না, বরং পূর্বে চিন্তা করে নিবে কি কি শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন।

## সন্তানকে সুচরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা

* একটি সু-সন্তান লাভ করার জন্য এবং সন্তানকে সুচরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর জন্য মাতা-পিতার অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই শুরু করতে হবে সন্তানকে ভাল বানানোর ফিকির ও প্রচেষ্টা, আর সেই ফিকির ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। এই ফিকির ও প্রচেষ্টার একটা মোটামুটি রূপরেখা নিম্নে প্রদান করা হল–

* একটা সু-সন্তান পেতে হলে একজন সৎ ও ভাল নারীকে বিবাহ করতে হবে। ভাল নারীর গর্ভেই ভাল সন্তানের আশা বেশি করা যায়।

* পিতা-মাতা উভয়কেই হালাল খাবার গ্রহণ করতে হবে। কেননা হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট বীর্যের মধ্যে খারাপ আছর হতে পারে, আর তার থেকে সৃষ্ট সন্তানের মধ্যেও তার প্রভাব থেকে যেতে পারে।

* স্ত্রী সহবাসের সময় সহবাসের সুন্নাত ও আদবসমূহের প্রতি লক্ষ রাখবে। এর জন্য দেখুন ৫০৮ পৃষ্ঠা।

* সু-সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে নিম্নোক্ত দুআ করবে।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে পবিত্র বংশধর দান কর। অবশ্যই তুমি দুআ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান: ৩৮)

* সন্তান গর্ভে আসার পর মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মায়ের মন-মানসিকতা ও মায়ের আচার-আচরণ সবকিছুর প্রভাব পড়ে থাকে গর্ভস্থ সন্তানের উপর। তাই সন্তান গর্ভে আসার পর মাকে সব কু-চিন্তা ও পাপের চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং নেক চিন্তা ও ভাল চিন্তা-ভাবনা রাখতে হবে, তাহলে সন্তানের উপর তার সু-প্রভাব পড়বে।

* সন্তান জন্ম নেয়ার পর তাকে গোসল দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনাবে। এতে করে শুরু থেকেই তার মনে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূলের নাম ও কালিমা ইবাদতের সু-প্রভাব পড়বে। যদিও সে তখন আযান ইকামতের মর্ম বুঝতে সক্ষম নয় তবুও তার সু-প্রভাব পড়বে।

* অতঃপর কোন দ্বীনদার বুযুর্গ দ্বারা খেজুর বা কোন মিষ্ট দ্রব্য চিবিয়ে তার সামান্য কিছু নব জাতকের তালুতে লাগিয়ে দিবে। (এটাকে বলা হয় 'তাহ্‌নীক'।) এটা করা সুন্নাত। এতে করে বুযুর্গের মুখের লালার মাধ্যমে বুযুর্গীর সু-প্রভাব নবজাতকের মধ্যে প্রবেশ করবে।

* শিশুর একটা সুন্দর নাম রাখবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫৭১ পৃষ্ঠা।

* শিশুকে মা ব্যতীত অন্য কোনো দুধমাতার দুধ পান করালে দ্বীনদার পরহেযগার ও সু-স্বভাবের অধিকারী মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা দুধের মাধ্যমে দুধদাত্রীর স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে।

* শিশুর মন-মানসিকতা ও মেজায প্রকৃতি যেন ভাল হয়ে ওঠে তার জন্য পূর্বে "শিশুর মানসিক পরিচর্যা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে (৫৬৮-৫৭১ পৃষ্ঠায়) যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর উপর আমল করতে হবে।

* শিশুকে সুশিক্ষা প্রদান করতে হবে। এর জন্য পূর্বে সন্তান ও শিশুর শিক্ষা বিষয়ক যে নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে তার উপর আমল করতে হবে। দেখুন ৫৭৩-৫৭৫ পৃষ্ঠা।

* শিশুকে প্রয়োজনে শাসন করতে হলে শাসন করার সুষ্ঠ পদ্ধতি ও মাসায়েল অনুযায়ী শাসন করতে হবে। এ জন্য দেখুন ৫৭৫-৫৭৬ পৃষ্ঠা।



* কিছুটা বুঝ হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেকটা পদে পদে ধীরে ধীরে শিশুকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে থাকতে হবে এবং অন্যায় ত্রুটি হলে সংশোধন করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তম্বীহ ও মুনাছেব শাস্তিও দিতে হবে।

* সাত বৎসর বয়স থেকেই শিশুকে নামাযের হুকুম দিবে এবং পুরুষ ছেলে হলে জামআতের সাথে নামায পড়তে অভ্যস্ত করাবে। দশ বৎসর বয়স হলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও নামায পড়াতে হবে।

* শিশুদেরকে রোযা রাখানোর ক্ষেত্রে সাত বৎসরের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, সে যখন যে কয়টা রোযা রাখতে সক্ষম হবে তখন তার দ্বারা তা রাখাতে হবে। শিশুর নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আখলাক-চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জননীকেই বেশি খেয়াল রাখতে হবে, কেননা তার কাছেই সন্তানরা বেশি সময় কাটায়।

* প্রতিদিন ঘরে একটা নির্ধারিত সময়ে দ্বীনী কথা-বার্তা আলোচনার বা দ্বীনী কিতাব তালীমের সিলসিলা জারী রাখতে হবে। এতে সন্তানদের সাথে সাথে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উপকার হতে থাকবে। রাতে শুতে যাওয়ার পূর্বে এর জন্য সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, তখন সকলের সময় অবসর থাকে। প্রথমদিকে সকলে তালীম শুনতে না চাইলেও তালীম করে যেতে হবে, আস্তে আস্তে সকলে শুনতে অভ্যস্তও হবে এবং আছরও হতে থাকবে।

* শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হবে, যেন খারাপ সাথীদের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে উঠতে না পারে। অধিকাংশত কুসংসর্গ থেকেই সন্তানরা কুপথে ধাবিত হয়।

* সন্তানদেরকে মুসলমানদের সাথে, বিশেষভাবে গরীব সৎ মুসলমানদের সাথে উঠা-বসা করতে অভ্যস্ত করাবে।

* সন্তানকে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন কোনো কাজ গোপনে না করে। কেননা গোপনে সে এমন কাজই করবে যেটাকে সে অন্যায় বলে মনে করে, এভাবে গোপনে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।

* হালাল সম্পদ দ্বারা সন্তানের ভরণ-পোষণ প্রদান করবে। হারাম সম্পদের দ্বারা কুস্বভাব ও শরীআত-বিরুদ্ধ চেতনা জন্ম নেয়। পক্ষান্তরে হালাল সম্পদের দ্বারা সৎ স্বভাব ও নেক চরিত্রের বুনিয়াদ গঠিত হয়।

* সন্তানকে যৌন বিষয়ক ও প্রেম-প্রীতি বিষয়ক বই-পত্র ও নভেল-নাটক পড়তে বা দেখতে দিবে না।

* মনে রাখতে হবে– সন্তানের প্রথম বয়সই তার এছলাহ বা সংশোধনের উপযুক্ত সময়। প্রথমে নষ্ট হয়ে গেলে পরে তার এছলাহ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে অবুঝ সন্তান বলে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

* সন্তানদের সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কেননা পরবর্তী সন্তানরা প্রায়শই প্রথম জনের অনুকরণ করে থাকে।

* সন্তানের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। এর জন্য দেখুন ৪৩৭ পৃষ্ঠা।

* সন্তান যেন নেককার হয়, অসৎ না হয়, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা ও দুআ করতে থাকবে। কুরআন ও হাদীছ থেকে এরূপ কয়েকটি দুআ নিম্নে পেশ করা হল।

(১) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কালিমা করনে ওয়ালা বানাও। হে আমার রব, আমার দু'আ কবূল কর। (সূরা ইব্রাহীম: ৪০)

(২) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের বিবি ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য সুখের বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের অগ্রণী বানাও। (সূরা ফুরকান: ৭৪)

(৩) اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার সন্তানদের এছলাহ করে দাও। আমি তোমার দিকে ধাবিত হয়েছি এবং আমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের বিবি ও সন্তানদের মধ্যে বরকত দান কর এবং আমাদের তওবা কবূল কর। তুমিই তো তওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।

(৫) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ ضَآلٍّ وَلَا مُضِلٍّ.



অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি মানুষকে যে ভাল সন্তান, সম্পদ ও বিবি দান করে থাক, আমি তোমার নিকট তদ্রূপের প্রার্থনা করছি, বিভ্রান্ত বা অন্যকে বিভ্রান্তকারী সন্তান ও বিবি নয়।

(৬) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَّكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এমন সন্তান থেকে পানাহ চাই যা আমার জন্য বিপদের কারণ হবে।

## কোনোক্রমেই সন্তানকে সুপথে আনতে না পারলে তখন কি করণীয়

* সন্তানকে সুপথে আনার চেষ্টা করা মানুষের আয়ত্বের মধ্যে, কিন্তু সে চেষ্টার ফলাফল মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। অনেক সময় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তান সুপথে না আসতে পারে এবং তার কারণে পিতা-মাতার পেরেশানীর অন্ত না থাকতে পারে। এরূপ মুহূর্তে পিতা-মাতার করণীয় হল।

১. চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কিন্তু ফলাফল লাভের অপেক্ষায় থাকবে না; অর্থাৎ, তারা যেমন চায় সন্তান তেমনই হয়ে যাবে– এই অপেক্ষায় থাকবে না, তাহলে পেরেশানী কমে যাবে।

২. সন্তান সুপথে আসছে না এ জন্য স্বভাবত যে কষ্ট ও দুঃখ হবে তার কারণে ছওয়াব হবে– এই বিশ্বাস রাখবে, তাহলেও মনে একটু তৃপ্তি পাওয়া যাবে। মনে রাখবে যে, এভাবেও হয়ত আল্লাহ আমার গোনাহ মোচন ও ছওয়াব লাভের পথ করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করছেন।

৩. সন্তানের সুমতি ও হেদায়েতের জন্য সর্বদা দুআ করতে থাকুন।

৪. এরূপ সন্তানের কপাল ধরে اَلشَّهِيْدُ শব্দটি পাঠ করবে কিংবা এক হাজার বার পড়ে সন্তানকে দম করবে, আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে সন্তান ফরমাবরদার হয়ে যাবে।

(تربیت اولاد و اعمال قرآنی থেকে গৃহীত।)

## যার সন্তান মারা যায় তার জন্য কিছু কথা

যার সন্তান মারা যায় তার সান্ত্বনা লাভের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে।

১. যে সন্তান মারা গিয়েছে তার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, সে বেঁচে থাকাটা তার জন্য খারাপ ছিল। এটা তার বুঝে না আসলেও আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন ও বোঝেন, তিনি অত্যন্ত হেকমতওয়ালা।

২. এই সন্তানের কারণে মানুষ কত রকম পেরেশানী ও মুসীবতের সম্মুখীন হয় সেগুলো চিন্তা করে মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে সেসব পেরেশানী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই হয়ত আমার সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছেন, কাজেই এটা আমার প্রতি আল্লাহ্‌র এক অনুগ্রহ।

৩. সন্তানের মৃত্যুর কারণে যে কষ্ট হয় তার বিনিময়ে ছওয়াব অর্জিত হয়। বিশেষ করে নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হলে সে সন্তান পরকালে তার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে, সে সন্তান জাহান্নাম ও তার মাঝে আঁড় হয়ে দাঁড়াবে। এক হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী বড় সন্তানের মৃত্যু হলেও সে কারণে যে কষ্ট হবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন।

## যার কোনো সন্তান হয় না তার জন্য কিছু কথা

যার ছেলে মেয়ে কোনো সন্তানই হয় না তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে।

১. সন্তান না হওয়াই তার জন্য ভাল। আল্লাহ পাক প্রত্যেকেরই কল্যাণ চান এবং সব কিছুর রহস্য তাঁর জানা আছে। সে মতে তার সন্তান না হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যা আল্লাহ অবগত আছেন।

২. সন্তান থাকলে যেসব পেরেশানী হয় সেগুলো চিন্তা করে মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে সেসব পেরেশানী থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বস্তুত সন্তান দেয়া যেরকম আল্লাহ্‌র নেয়ামত, সন্তান না দেয়াও এক একম নেয়ামত। সুতরাং সন্তান না হওয়ার জন্য শোকরের মনোভাব রাখতে হবে- না-শোকরের মনোভাব নয়।

৩. সন্তান না হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায়। কারণ এটা স্ত্রীর এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়, এটা স্ত্রীর কোনো অন্যায় নয়। এজন্য আল্লাহ্‌র প্রতিও নারাজ হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ হয়ত এরই মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

৪. একথা মনে করবে না যে, সন্তান ও বংশধর না থাকলে আমার নাম টিকে থাকবে না। মূলত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হতে পারলেই নাম টিকে থাকে, সন্তান দ্বারা নয়। বরং সন্তান হয়ে যদি খারাপ হয় তাহলে উল্টো বদনামী হয়ে থাকে।

৫. সন্তান লাভের জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করা যায়।

(ক) এই দুআ করবে- رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ.



অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে বংশধরহীন রেখ না, তুমিই উত্তম উত্তরাধিকারী। (সূরা আম্বিয়া: ৮৯)

(খ) উঠতে বসতে সর্বক্ষণ পাঠ করবে- اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ

(গ) প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পড়বে-

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাকে উত্তম আওলাদ দান কর। অবশ্যই তুমি দুআ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান: ৩৮)

(ঘ) বন্ধা মহিলা সাত দিন পর্যন্ত রোযা রাখবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করবে এবং ইফতার করার পর ২১ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবে, তাহলে আল্লাহ চাহে তো গর্ভ সঞ্চার হবে।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ.

## যার পুত্র সন্তান হয় না তার জন্য কিছু কথা

১. পুত্র না হওয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ- এ কথা চিন্তা করবে।

২. পুত্র সন্তানের কারণে মানুষ যেসব পেরেশানীর সম্মুখীন হয় সেগুলো চিন্তা করবে, তাহলে সান্ত্বনা পাবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি শোকর আসবে এই ভেবে যে, আল্লাহ আমাকে সেসব পেরেশানী থেকে হয়ত নাজাত দিতে চান। বাস্তবেও দেখা যায় পুত্র সন্তানই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে কন্যা সন্তান পিতা-মাতার অনুগত ও ফরমাবরদার হয়ে থাকে।

৩. পুত্র সন্তান না হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা অন্যায়। কারণ এটা স্ত্রীর এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়, সে চাইলেই তার গর্ভে পুত্র সন্তান আনতে পারে না। এর জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিও নারাজ হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ হয়ত এরই মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, যা হয়ত তার জানা নেই, তার বুঝে আসছে না, কিন্তু আল্লাহ সব জানেন, সব বুঝেন, তিনি অত্যন্ত হেকমতওয়ালা!

৪. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বলেছেন, যে মেয়েলোকের কন্যা ব্যতীত ছেলে না হয় তার পেটের উপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটা গোল বেষ্টনী আঁকবে, তারপর আঙ্গুল দিয়ে সেই বেষ্টনীর মধ্যে يامتين শব্দটি সত্তর বার লিখবে এবং মুখেও শব্দটি বলতে থাকবে, তাহলে আল্লাহ চাহে তো পুত্র সন্তান লাভ হবে।

## সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের জন্য যা করণীয়

সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তান বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই আত্মীয়দের যা হক ও অধিকার রয়েছে তাদের বেলায়ও তা পালন করতে হবে। বরং অনেক আলেমের মতে বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয় আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের হক একই রকম। এমতে নিজের সন্তানের জন্য যা যা করণীয় সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের জন্যও তা-ই করণীয়। বিশেষত সতীন যদি মারা যায় তাহলে সৎ মাকে এ কথা চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আমি সতীনের সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করলে খোদা নাখাস্তা আমার সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে অন্য সতীন ঘরে এসে আমার সন্তানের প্রতিও দুর্ব্যবহার করতে পারে। স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের বেলায় স্বামীকেও অনুরূপ ভেবে দেখতে হবে। এরূপ ভাবনা মনে উপস্থিত রাখলে সতীনের সন্তান ও স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানকে নিজের সন্তানের মত বরণ করে নেয়া সহজ হবে এবং দুর্ব্যবহারের মনোভাব জাগ্রত হবে না বরং করুণার মনোভাব জাগ্রত হবে।

## জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মাসায়েল

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচলিত তিনটা ব্যবস্থা রয়েছে। যথা:-

**১. স্থায়ী ব্যবস্থা:** যেমন: পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি ও মহিলাদের জন্য লাইগেশন। এ ব্যবস্থায় অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ বা নারীর সন্তান দেয়ার ও নেয়ার ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়।

**২. মেয়াদী ব্যবস্থা:** যেমন: নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইনজেকশন, নিরাপদকাল মেনে চলা এবং আই, ইউ, ডি (এক ধরনের প্লাস্টিক কয়েল) ব্যবহার করা ইত্যাদি।

**৩. সাময়িক ব্যবস্থা:** যেমন: কনডম ব্যবহার করা, জন্মনিরোধক পিল/বড়ি ব্যবহার করা ইত্যাদি।



* জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয় বরং হারাম, উদ্দেশ্য বা কারণ যা-ই হোক না কেন। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ্র দেয়া একটা ক্ষমতা (প্রজনন ক্ষমতা)কে নষ্ট করা হয় এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি (মেয়াদী ব্যবস্থা) গ্রহণ করা মাকরূহ তাহরীমী। আর মাকরূহ তাহরীমী হারামের কাছাকাছি।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের তৃতীয় পদ্ধতি (সাময়িক ব্যবস্থা) গ্রহণের পিছনে যদি উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এতে করে পৃথিবীর লোক সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকবে, খাদ্যের সংকট হবে না, বাসস্থানের সংকট হবে না ইত্যাদি, তাহলে এটা ঈমান বিরোধী চেতনা থেকে হওয়ার কারণে জায়েয নয়। মনে রাখতে হবে- আল্লাহ্র পরিকল্পনা সকলের পরিকল্পনার চেয়ে উত্তম, তিনি ভূত ভবিষ্যত এমনভাবে জানেন যা কেউ জানে না, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির রিযকের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।

* আর তৃতীয় পদ্ধতি যদি স্ত্রী বা সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা জায়েয।

* আর তৃতীয় পদ্ধতি যদি বিলাসিতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় এই ভেবে যে, সন্তান কম হলে ঝামেলা কম হবে, ছিমছাম থাকা যাবে ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয, তবে এটা খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। কেননা এটা ধর্মীয় চাহিদা বিরোধী। ধর্ম চায় রসূলের উম্মত বৃদ্ধি পাক, রসূলের উম্মত বৃদ্ধি পেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন এ নিয়ে গর্ব করবেন বলে হাদীছে উল্লেখ এসেছে।

(জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উপরোক্ত মাসায়েল মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের ফতওয়া এবং দারুল উলূম দেওবন্দ-এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুফতী হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী [দামাত বারাকাতুহুম]-এর বয়ান থেকে গৃহীত।)

* উল্লেখ্য যে, হাদীছে কোন কোন সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযল (সঙ্গমকালে বীর্য স্ত্রী যোনির বাইরে স্খালন করা)-এর অনুমতি দিয়েছেন বলে পাওয়া যায়। তবে অনুমতি দেয়ার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানও দুরস্ত করে দিয়েছেন এই বলে যে, জেনে রেখ কিয়ামত পর্যন্ত যত সন্তান দুনিয়াতে আসার তারা আসবেই। তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অনুমতি প্রদানের সময় এটা না করার জন্য উৎসাহিত

করেছেন এই বলে যে, না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? সারকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযল (একটা সাময়িক ব্যবস্থা) সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন ঈমান দুরস্ত করে, নষ্ট করে নয়, আবার তার জন্য অনুৎসাহিত করেছেন এবং এই অনুমতি প্রদান ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে। এখন এই আযলের অনুমতি দেখে (যা সাময়িক ব্যবস্থা) জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থাকে জায়েয বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত মেয়াদী ও সাময়িক অন্যান্য পদ্ধতিগুলোকেও এই আযলের উপর ঢালাওভাবে কেয়াছ বা অনুমান করা ঠিক নয়। কেননা বর্তমানে প্রচলিত এ পদ্ধতিগুলোকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং তাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া হয়েছে। আর বর্তমানে এর জন্য অনুৎসাহিত করা নয় বরং উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, অধিকন্তু বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। সর্বোপরি এসব পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে এমন সব বক্তব্য দিয়ে যা ঈমানী চেতনা বিরোধী। অতএব দেখা গেল– হাদীছে আযলের অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে আঙ্গিকে এবং যে মানসিকতার ভিত্তিতে, প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক ও ভিন্ন মানসিকতা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই হাদীছের আযলের অনুমতি থেকে বর্তমানে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহকে ঢালাওভাবে অনুমোদন দেয়ার কোনোই অবকাশ নেই।

## রান্না-বান্না সম্পর্কিত মাসায়েল

* মহিলাদের জন্য ঘরের কাজ করা, রান্না-বান্না করা বা চাকর-নওকর থাকলে এসব কাজে তাদের সহযোগিতা করা বা তত্ত্বাবধান করাও ইবাদতের শামিল এবং এতে তাদের ছওয়াব হয়ে থাকে। মহিলাদের এসব কাজ ছওয়াব মনে করে করা উচিত। স্বামীর চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করার সঙ্গতি না থাকলে এবং স্ত্রী রান্না-বান্না করতে সক্ষম হলে রান্না-বান্না করা তার উপর নৈতিক ওয়াজিব।

* রান্না-বান্না করার জন্য চাউল, আটা ইত্যাদি মেপে নিবে। তবে মূল পাত্রে কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকল সেটা মেপে দেখবে না, তাহলে বরকত কমে যাবে।

* যখন গোসল ফরয সে অবস্থায়ও রান্না-বান্না করাতে কোনো দোষ নেই। (احسن الفتاوی ج/۲)

* বিসমিল্লাহ বলে রান্না-বান্না শুরু করবে।

* গোবরের জ্বালানী দিয়ে রান্না-বান্না করা জায়েয। (فتاوی محمودیہ ج/۵)



* গোবর বা মনুষ্য মল থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা রান্না করা জায়েয। (فتاوی رحیمیہ ج/٦)

* রান্না শেষ হওয়ার পর চুলার আগুন নিভিয়ে রাখবে, যাতে করে অন্য কিছুতে আগুন লাগতে না পারে। গ্যাসের চুলা হলেও নিভিয়ে রাখবে। একটা ম্যাচের শলাকা বাঁচানোর জন্য গ্যাস জ্বালিয়ে রাখলে অপব্যয়ের গোনাহ হবে। অপব্যয় করা কবীরা গোনাহ।

* রান্না শেষ হওয়ার পর খাদ্য-খাবার ঢেকে রাখবে।

## যেসব পশু-পাখি খাওয়া জায়েয ও হালাল

যেসব পশু-পাখি পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায় না তা (জবাই করে) খাওয়া জায়েয ও হালাল। যেমন: পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, উভয় প্রকারের খরগোস, বন্য গরু এবং পাখীর মধ্যে হাঁস, মুরগি, বন্যহাস, বন্যমুরগি, ময়না, টিয়াপাখী, বক, সারস, চড়ুই, পানকৌড়ি, কবুতর ইত্যাদি। ঘোড়া খাওয়া জায়েয তবে মাকরূহ। যেসব মুরগি খোলা থাকে এবং নাপাক খেয়ে বেড়ায় তাদেরকে তিনদিন না বেঁধে রেখে খাওয়া মাকরূহ। (بہشتی زیور و فتاوی رشیدیہ)

## যেসব পশু-পাখি খাওয়া জায়েয নয়

যেসব পশু-পাখি পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায় বা যাদের খাদ্য শুধু নাপাক বস্তু, সেসব পশু-পাখি খাওয়া জায়েয নয়। যেমন: বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, বানর, বেজী, গাধা, খচ্চর, সজারু কচ্ছপ, গুইসাপ, বাজ, চিল, শিকরা, শকুন, ঈগল, কাল কাক ইত্যাদি। (বেহেশতী জেওর)

## হালাল পশু-পাখির যা যা খাওয়া নাজায়েয

হালাল পশু-পাখির নিম্নোক্ত জিনিসগুলো খাওয়া জায়েয নয়। পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পিত্ত, মূত্রথলি, অণ্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, পায়খানার রাস্তা, শরীরের অতিরিক্ত মাংসগ্রন্থি যেমন: টিউমার ইত্যাদি ও মেরুদণ্ডের হাড়ের মগজ। কোন কোন আলেমের মতে মেরুদণ্ডের হাড়ের মগজ মাকরূহ তানযীহী আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা মাকরূহ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে সতর্কতা হল তা না খাওয়া। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী গুর্দা খাওয়া মাকরূহ তানযীহী। হালাল জানোয়ারের নাড়ীভুঁড়ি খাওয়া জায়েয। (فتاوی رشیدیہ و غیرہ)

## মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল

* পানির প্রাণীর মধ্যে মাছ (সব ধরনের মাছ) খাওয়া জায়েয।

* মাছ খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য জবেহ করা শর্ত নয়।

* যে মাছ আপনা আপনি মরে চিৎ হয়ে ভেসে ওঠে তা খাওয়া জায়েয নয়। তবে গরমের কারণে, আঘাতের কারণে, চাপাচাপির কারণে, ওষুধ দেয়ার কারণে বা কিছু খাওয়ার কারণে যদি মরে ভেসেও ওঠে, তবুও তা খাওয়া জায়েয। কিংবা স্বাভাবিকভাবে মরে ভেসে উঠেছে কিন্তু চিৎ হয়নি বরং পিঠ এখনও উপরের দিকে রয়েছে তাহলেও খাওয়া জায়েয। (شامی و احسن الفتاوی ج/۷)

* ছোট মাছ হলেও তার পেটের মল আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা ব্যতীত খাওয়া জায়েয নয়। (احسن الفتاوی □□/۷)

* শুটকি মাছ খাওয়া জায়েয।

* কোন কোন আলেম চিংড়ি মাছকে পানির পোকা আখ্যায়িত করে তা খাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। আবার অনেকের মতে মাকরূহ নয়। আমাদের দেশে সমাজে এটাকে মাছ বলা হয় এবং মাছ মনে করা হয় তাই আমাদের ফতওয়া মতে তা খাওয়া মাকরূহ নয়।

* কচ্ছপ, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক, বেঙ ইত্যাদি খাওয়া জায়েয নয়।

* পানির প্রাণীর মধ্যে মাছ ব্যতীত অন্য প্রাণী যেমনঃ কুমির, শুশুক জলহস্তি, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি খাওয়া জায়েয নয়। হাঙ্গর খাওয়া বিতর্কিত, অতএব তা পরিহার করাই শ্রেয়।

* পানির কোনো পোকা-মাকড় খাওয়া জায়েয নয়।

## জবাই করার মাসায়েল

* জবাইকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত। কাফেরের জবাই করা জন্তু খাওয়া হারাম।

* মুসলমান পুরুষ হোক বা মহিলা উভয়ের জবাই খাওয়া হালাল।

* নাবালেগ ছেলে মেয়ে জবাই করতে জানলে এবং বিসমিল্লাহ (আল্লাহ্‌র নাম) বললে তার জবাই খাওয়া হালাল।

* জবাই করার সময় জন্তু ও জবাইকারী উভয়ের মুখ কেবলার দিকে থাকা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।



* জবাই করার সময় জবাইকারী কর্তৃক আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা শর্ত। "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে সাধারণত এ শর্ত পূরণ করা হয়। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ না বললে বা অন্য কোনো বাক্যে আল্লাহ্‌র নাম না নিলে সে জন্তু খাওয়া হারাম হয়ে যায়। তবে ভুলে ছুটে গেলে খাওয়া দুরস্ত আছে।

* জবাইর মধ্যে জানোয়ারের চারটা রগ কাটতে হবে। তিনটা রগ কাটলেও দুরস্ত আছে। তিনটার কম কাটলে সে জন্তু মৃত বলে গণ্য এবং হারাম হয়ে যাবে। রগ চারটা এই– শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ও দুইটা শাহরগ।

* ধারালো ছুরি দ্বারা জবাই করা উত্তম। ভোঁতা বা কম ধারালো ছুরি দ্বারা জবাই করা মাকরূহ।

* ছুরির অভাবে ধারালো পাথর, বাঁশ বা আখের ধারালো বাক্‌লা দ্বারা জবাই করা দুরস্ত আছে।

* পাথরের আঘাতে, বন্দুকের গুলিতে মারা গেলে খাওয়া দুরস্ত নয়। তবে বন্দুকের গুলি বা পাথরের আঘাত লাগার পর মরে যাওয়ার পূর্বে জবাই করতে পারলে তা খাওয়া জায়েয।

* দাঁত বা নখ দ্বারা জবাই করা দুরস্ত নয়।

* জবাই করার সময় জানোয়ারের মাথা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেও তা খাওয়া দুরস্ত আছে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ কেটে আলাদা করে দেয়া মাকরূহ। তবে এরূপ জানোয়ার খাওয়া মাকরূহ নয়।

* জবাই করার পর জানোয়ার ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসানো, হাত পা কাটা বা ভাঙ্গা কিংবা সমস্ত গলা কেটে দেয়া মাকরূহ।

* গোসল ওয়াজিব বা উযূ নেই– এমন অবস্থায়ও জবাই করা যায়। (شامی و احسن الفتاوی □□/۷)

* হাঁস, মুরগি ইত্যাদির পালক ছাড়ানোর জন্য ফুটন্ত পানিতে হাঁস মুরগিকে যদি এতক্ষণ রাখা হয় যাতে তার পেটের নাপাকী গোশতের মধ্যে ভেদ করার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে তার গোশত নাপাক হয়ে যায়– পাক করার আর কোনো উপায় থাকে না। অবশ্য পানি যদি ফুটতে না থাকে শুধু গরম হয় তাহলে তাতে দীর্ঘক্ষণ চুবিয়ে রাখলেও অসুবিধা নেই, কিংবা ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে সাথে সাথে উঠিয়ে ফেললেও অসুবিধা নেই। (شامی و احسن الفتاوی □□/۷)

* জবাই করার পূর্বে প্রাণীকে ক্ষুধার্থ রাখা জুলুম।

ঘর সাজানো গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাসায়েল

* ঘর এবং ঘরের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সুন্নাত। (ترمذی)

* বিনা প্রয়োজনে মাকড়সা মারা অনুচিত, তবে তার জাল ভেঙ্গে ঘর পরিষ্কার করা যাবে। (فتاوی رحیمیۃ ج/٦)

* পিপড়া, ছারপোকা ইত্যাদি কোনো প্রাণী আগুন দ্বারা পুড়িয়ে মারা নিষেধ। একান্ত ঠেকা অবস্থায় গরম পানি দিয়ে ছারপোকা তাড়ানো যায়।

* টিকটিকি ও গিরগিটি মারা ছওয়াবের কাজ। (৫/[illegible] فتاوی محمودیۃ)

* ঘরের জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা সাংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ।

* প্রাণীর ফটো বা মূর্তি রাখা হারাম। কোন বুযুর্গ বা গুরুজনের ফটোর বেলায়ও একই হুকুম। যে ঘরে ফটো বা মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

* রাতের বেলায় ঘর ঝাঁট দেয়ায় কোনো দোষ নেই। (امداد الفتاوی ج/٤)

* আয়না বা কোন প্লেটে লিখিত আল্লাহ, রসূলের নাম, কালিমা, আয়াত সৌন্দর্যের নিয়তে রাখা বে-আদবী। তবে বরকতের নিয়তে রাখাতে অসুবিধা নেই। (بضوء امداد الفتاوی ج/٤)

* ঘরের দরজা জানালায় পর্দা দিবে শরীআতের পর্দার হুকুম পালন করার নিয়তে, সৌন্দর্যের নিয়তে নয়।

## সমাজনীতি

### সমাজ সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠনের জন্য যা যা করণীয়

১. সমাজের কুসংস্কার, বেদআত, রছম ও প্রচলিত অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণার প্রতি সমাজ সদস্যদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে হবে।

২. সেই সাথে সাথে ইসলামের নির্ভেজাল ও শাশ্বত আদর্শ এবং ইসলামী মূল্যবোধ সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৩. বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে সমাজকে দূরে রাখার সর্বপ্রযত্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে ব্যক্তি গঠন পূর্বক তাদেরকে আদর্শের নমুনা হিসাবে সমাজের সামনে দাঁড় করাতে হবে। তাহলে নমুনা সামনে পেয়ে সমাজ সদস্যগণ অনুরূপ হওয়াকে সহজবোধ করবে এবং অনুরূপ হওয়ার বাস্তব অনুপ্রেরণা লাভ করবে।



### সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করণীয়

শান্তি মূলত অশান্তি দূর হওয়ার নাম, আর বিশৃংখলা দূর করার নাম হল শৃংখলা বিধান। অতএব সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার কারণ যা যা, তার প্রতিকার করলেই সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে। নিম্নে এই সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার কারণ কি কি এবং তার প্রতিকার ব্যবস্থা কি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার রচিত 'ইসলামী মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থের সমাজ মনোবিজ্ঞান অধ্যায় পাঠ করা যেতে পারে।)

১. **দায়িত্বে অবহেলা:** প্রত্যেকের যা দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শুধু অধিকার আদায়ে সোচ্চার হলে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও অশান্তির সূচনা হয়। এর প্রতিকারের জন্য সকলকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে হবে এবং নিজের অধিকারের চেয়ে অন্যের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়ার মনোভাব এবং নিজের অধিকার আদায় না হওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহনশীল হওয়ার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে।

২. **সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাব:** মানুষে মানুষে স্বার্থ নিয়ে সংঘাত লাগলে তা নিরসনের জন্য এবং সমাজকে সুষ্ঠু লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু নেতৃত্বের প্রয়োজন। অন্যথায় সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা রোধ করা সম্ভব হয় না। তাই এমন নেতার প্রয়োজন যার মধ্যে নেতৃত্বের সব গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে এবং যিনি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। নেতার গুণাবলী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি এ সম্পর্কে পরবর্ত পরিচ্ছেদী  আলোচনা করা হয়েছে।

৩. নৈতিক অবক্ষয়ের ফলেও সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এর প্রতিকারের জন্য সমাজ শিক্ষায় নৈতিকতাকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দিতে হবে।

৪. **সামাজিক অপরাধ:** চুরি, ডাকাতি, মদ, জুয়া, নেশা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের মোকাবিলা ও তা প্রতিহত করতে না পারলে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. **শ্রেণী বৈষম্য** এবং তার ফলে সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সংঘাত সামাজিক অশান্তির একটি অন্যতম কারণ। এর প্রতিকারের জন্য ইসলামের

বৈষম্যহীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

৬. ইসলামের দেয়া সামাজিক রীতি-নীতি, মানবাধিকার প্রভৃতি লংঘন করলে সমাজে অশান্তি দেখা দেয়। এক কথায় মানুষের কৃতকর্মের দরুনই সমাজে অশান্তি দেখা দেয়।

## নেতার গুণাবলী

নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণ অপরিহার্য, নেতাকে যেসব গুণ অর্জন করতে হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল।

১. নেতার মধ্যে নেতৃত্বের মোহ থাকতে পারবে না। সে কাজ করবে দেশ ও জাতির স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে নয়। নেতৃত্বের প্রতি মোহ থাকলে মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার তাগিদে কাজ করতে পারে না।

২. নেতার মধ্যে বিনয় থাকতে হবে। কথা-বার্তা, আচার-আচরণে বিনয় না থাকলে বরং অহংকার থাকলে সেরূপ নেতাকে কেউ মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে চায় না।

৩. সমস্যা ও সংকটের মুহূর্তে নেতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে দলীয় সদস্যরা নেতাকে স্বার্থপর বা ভীরু ভাবতে না পারে কিংবা নিজেদেরকে যেন তারা অসহায় না ভাবে।

৪. অনুসারী ও দলীয় সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি থাকতে হবে এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও আশা-আকাংখার খোঁজ-খবর রাখতে হবে।

৫. ভালবাসা দিতে ও ভালবাসা নিতে পারার গুণ থাকতে হবে। এরূপ হলে নেতার উপস্থিতি কর্মী ও দলীয় সদস্যদের কাছে কাম্য হবে এবং নেতা কর্মীদের মন জয় করতে পারবেন।

৬. নেতার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা এবং সমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে পরিজ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমস্যার নানান দিক বিশ্লেষণ পূর্বক যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৭. নেতাকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে, যাতে তার স্বভাব-চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় এবং অনুসারীরা আদর্শচ্যুত হওয়ার দুঃসাহস না পায়। কেননা এরূপ নেতার নিকট আদর্শহীনতা প্রশ্রয় পাবে না।



৮. নেতা চরমপন্থী হবেন না, নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয়ার জন্য গোঁ ধরবেন না বরং প্রয়োজনের তাগিদে মূল আদর্শ বহাল রেখে নীতি নির্ধারণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে আপোষের মনোভাব নিয়ে চলবেন।

## নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. দলীয় সদস্যদের ঐক্য বজায় রাখা। যাতে দলীয় সদস্য ও সমাজ সভ্যগণ ঐক্যহীনতার ফলে বিপন্ন হয়ে না যায়।

২. নেতা তার কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কর্মীদেরকে কাজের অনুপ্রেরণা যোগাবেন এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন।

৩. নেতাকে বাস্তবমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে, যাতে দল ও সমাজের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয়।

৪. নেতাকে শুধু প্রতিভার অধিকারী হলে চলবে না বরং সেই সাথে সাথে সযত্নে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৫. নেতাকে যোগ্য উত্তরসূরী গড়ে যেতে হবে, যেন তার অবর্তমানেও কাজের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে।

৬. নেতৃত্ব যেহেতু জনগণের আমানত, তাই নেতাকে জবাবদিহিতার চেতনা নিয়ে কাজ করতে হবে।

৭. বহুমুখী লোকদেরকে নিয়ে নেতাকে চলতে হয়, অনেক অবান্তর ও উল্টোপাল্টা সমালোচনার সম্মুখীনও তাকে হতে হয়, নেতাকে তাই ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির সাথে চলতে হবে। তাহলে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

## সামাজিক অপরাধ প্রতিকারের জন্য যা যা করণীয়

১. ইসলামী আইনে বিভিন্ন অপরাধের যে শাস্তি রয়েছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার যথার্থ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. আইন মানার জন্য মানসিকতা গঠন করতে হবে এবং আইন মানার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. জনসমক্ষে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যাতে অনুরূপ অপরাধ সংঘটনে জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এভাবে সমাজ থেকে অপরাধ হ্রাস পেতে থাকে।

৪. তড়িৎ আইন প্রয়োগ করতে হবে। আইন প্রয়োগে বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রতা অন্যান্য অনেক ক্ষতির পাশাপাশি অপরাধ-বিরোধী চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাস্তির ভূমিকাকে হ্রাস করে দেয়। এরূপ হলে দেখা যায় দীর্ঘ দিন পর কোন একটা অপরাধের শাস্তি হয় কিন্তু সেই শাস্তি জনমনে তেমন বিশেষ প্রভাব ফেলে না, এভাবে শাস্তির ভূমিকা হ্রাস পায়।

৫. অপরাধীদেরকে সৎ ও ভাল মানুষের সাহচর্যে এবং নীতি-নৈতিকতার পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অপরাধের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে অপরাধ-বিরোধী মানসিকতা গঠন করতে হবে।

৭. কেউ নেশা জাতীয় অপরাধে জড়িত হলে তাকে সেই নেশা থেকে মুক্ত করাতে চাইলে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে তার সে অভ্যাস ছাড়াতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬০২ পৃষ্ঠা।

**বি. দ্র.** সমাজনীতি অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়াবলীর দলীল-প্রমাণ আমার রচিত ইসলামী মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

### পঞ্চায়েত কোন সামাজিক অপরাধের কি শাস্তি দিতে পারেন

* শরীআতে যেনা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন শাস্তির বিধান রয়েছে, তবে আইনত এই শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে ইসলামী কাজী বা হাকিম। যেখানে ইসলামী আদালত নেই সেখানে পঞ্চায়েত বা বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বিচারকমণ্ডলী শরীআত-নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন না। তারা সমীচীন মনে করলে অপরাধীকে তম্বীহ স্বরূপ সমাজ থেকে এক ঘরে করে রাখতে পারেন অর্থাৎ, অপরাধীর সাথে ক্রয়-বিক্রয়, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও মেলা-মেশা বন্ধ রাখার শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন কিংবা তম্বীহ স্বরূপ কিছু চড়-থাপ্পড় বা দু' চারটা বেত্রাঘাতও করতে পারেন। কিন্তু তারা শরীআত-নির্ধারিত শাস্তি ৮০/১০০ দোর্‌রা মারা কিংবা রজম (প্রস্তরাঘাত) করার অধিকার রাখেন না। (فتاوی دار العلوم ج/۱۲)

* কোনো অপরাধের কারণে আর্থিক জরিমানা করা জায়েয নয়। করলে সে অর্থ তাকে ফেরত দিতে হবে কিংবা তার মর্জি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী সে অর্থ ব্যয় করতে হবে। (فتاوی دار العلوم ج/۱۲)



## রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি

### রাজনীতি করা ও রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়ার বিধান

* দ্বীনের হেফাজত ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সাধ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত স্থাপন তথা খলীফা/ইমাম/আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করা ফরযে কেফায়া। কোন খলীফা/ইমাম/আমীরুল মু'মিনীন না থাকলে আলেম, বুদ্ধিমান ও কর্তৃপক্ষীয় লোকগণ সাধ্য থাকলে অনতিবিলম্বে খলীফা নিযুক্ত করবেন এবং খলীফা হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি এ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নিজেকে পেশ করবেন। কোন একজন খলীফা/ইমাম নিযুক্ত হয়ে গেলে সকলেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবেন। আর কাউকেই দায়িত্বশীল না বানালে সকলেই দায়ী হবেন। (شامی، الأحكام السلطانية و امداد الفتاوی □□/۴)

* ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করা হলে সেরূপ রাজনীতি করাও ফরযে কেফায়া হবে। অন্তত কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই দায়ী থাকবেন। তবে রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো সম্ভব না হলে সেরূপ রাজনীতি থেকে বিরত থাকাই জরুরি। কেননা রাজনীতি মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হল দ্বীন ও ঈমান আমল।

* আলেম নন– এরূপ লোকদের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হল উলামায়ে কেরাম থেকে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণ করে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হল তাদেরকে রাহনুমায়ী করা তথা দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। তবে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি উলামায়ে কেরামের রাহনুমায়ীতে পরিচালিত না হন সেরূপ ক্ষেত্রে সহীহ রাজনীতি করার জন্য বা-হিম্মত (সাহসী) উলামায়ে কেরামকে এগিয়ে আসতে হবে। (حکیم الامت حضرت تھانوی رح کے سیاسی افکار و العلم والعلماء)

* যেসব রাজনৈতিক দল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং ক্ষমতার মোহে বা পার্থিব কোন স্বার্থে কিংবা কুফ্‌র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয় তাতে যোগদান করা বা তাদের সহযোগিতা করা জায়েয নয়।

### হরতাল ও অবরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হরতাল ও অবরোধ ডাকা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে দু'টো মত লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ

শর্ত সাপেক্ষে হরতাল অবরোধ ডাকা জায়েয বলতে চান। তাদের বক্তব্য হল– জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল অবরোধ পালন করে এবং অবরোধ পালন করার সময় কারও জান-মালের ক্ষতি সাধন করা না হয়, তাহলে এরূপ হরতাল অবরোধ ডাকা অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

উলামায়ে কেরামের অপর একপক্ষ হরতাল অবরোধ ডাকা জায়েয নয় বলে মত পোষণ করেন। তারা বলেন, সাধারণত নির্দিষ্ট কোন হরতাল অবরোধের ব্যাপারে সমস্ত জনগণ একমত হয় না এবং একমত না হওয়া সত্ত্বেও জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ভয়ে হরতাল পালন করতে হয় অর্থাৎ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ী ঘোড়া, দোকান-পাট ও যানবাহন বন্ধ রাখতে হয় এবং এতে করে বহু লোকের আয়-উপার্জন বন্ধ থাকায় তাদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যেহেতু জায়েয নয়, অতএব যে হরতালের কারণে এটা হয় তাও অনিবার্য কারণেই নাজায়েয হবে।

আমাদের সমাজে হরতাল অবরোধের ডাক দেয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই জোর পূর্বক সকলকে হরতাল মানতে বাধ্য করা হয়, অন্যথায় জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, জ্বালাও পোড়াও এবং ভাঙ্গচুরের সম্মুখীন হতে হয়। এ হল সমাজের প্রচলিত অবস্থা। আর ফতওয়া হয়ে থাকে প্রচলিত অবস্থার আলোকেই। অতএব ফতওয়ার নীতি হিসাবে হরতাল অবরোধ সম্পর্কে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। (والله أعلم الصواب)

* হরতালের সময় কারও জান-মালের ক্ষতি সাধন করা বা ইজ্জত-আব্রুর হানি করা হারাম ও কবীরা গোনাহ।

* জোরপূর্বক কাউকে হরতাল মানতে বাধ্য করা বা অবরোধ করা তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। আর এভাবে কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়। অন্যায় করবে একজন, আর সেই অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে, এটা শরীআতের নীতি হতে পারে না।

## অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গ

* রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে হোক বা এমনিতেই কোন দাবী-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে হোক, অনশন ধর্মঘট করা শরীআতসম্মত নয়। অনশন ধর্মঘট আত্মহত্যার সমার্থবোধক। এভাবে মৃত্যু হলে হারাম মৃত্যু হবে এবং আত্মহত্যার পাপ হবে। (حکیم الامت حضرت تھانوی رح کے سیاسی افکار)



## সরকারের আনুগত্য বা সরকার উৎখাতের আন্দোলন সম্পর্কে বিধি-বিধান

* যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান কোন পাপ কাজের জন্য বাধ্য না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কোন পাপ কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না।

* সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান কোনো পাপ কাজের জন্য জনগণকে বাধ্য না করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা বৈধ নয়। তবে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং পাপ-প্রীতির কারণে কোন পাপ কাজের জন্য বাধ্য করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা বৈধ এই শর্তে যে, উৎখাতকারীগণ সরকার /রাষ্ট্রপ্রধানকে উৎখাত করার পর দেশ ও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত রাখতে সক্ষম হবেন। (حکیم الامت حضرت تھانوی رح کے سیاسی افکار وغیرہ)

## বিবদমান পক্ষসমূহের যা যা করণীয় ও যা যা বর্জনীয়

* মানুষে মানুষে বা দলে দলের মধ্যে মতানৈক্য, মতবিরোধ বা বিবাদ প্রায়শঃই ঘটে থাকে এবং সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষই কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন ও ব্যালেন্স হারিয়ে বসেন। ফলে যা করার তা বর্জন করেন এবং যা বর্জন করার তা করে বসেন। এ জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষেরই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মান্য করা উচিত।

১. প্রতিপক্ষের বক্তব্য, তাদের যুক্তি-প্রমাণ ও তাদের অবস্থানকে সত্যিকারভাবে না বুঝেই তাদের প্রতি বদগোমানী করা অন্যায়। এরূপ না করা উচিত।

২. এরূপ ক্ষেত্রে অনেক কথাই সত্য মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে বা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে এসে থাকে। তাই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ছাড়া কোনো কিছু কানে আসলে তাহকীক তদন্ত করা ব্যতীত তা বিশ্বাস না করা উচিত এবং তাহকীক তদন্ত ব্যতীত সে ব্যাপারে মুখ খোলা অনুচিত। অন্যথায় অনেক সময় পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

৩. প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও প্রতিপক্ষের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্যালেন্স রক্ষা করে চলা উচিত, লাগামহীন হওয়া ঠিক নয়। যাতে পরবর্তীতে দুপক্ষের মধ্যে মিল মহব্বত হয়ে গেলে অতীতের কর্মকাণ্ড বা অতীতের অতিরঞ্জিত বক্তব্য স্মরণ করে লজ্জিত হতে না হয়। জবান সংযত না রাখা অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে লজ্জিত হওয়ার কারণ ঘটে।

৪. প্রতিপক্ষের ভালকে ভাল বলার উদারতা থাকা চাই। তাদের ভালকেও বিকৃত করে দেখা উচিত নয়।

৫. অন্য যে কেউ কোন দোষ করলে সেটার জন্য প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা একটা জঘন্য মনোবৃত্তি এবং মিথ্যাচারের শামিল বিধায় তা মহাপাপ।

৬. এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একপক্ষের সকলেই অন্যপক্ষের সকলের ব্যাপারে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন এবং প্রতিপক্ষের সকলের ব্যাপারে বেধড়ক মন্তব্য শুরু করেন। এটা লক্ষ করা হয় না যে, আমি প্রতিপক্ষের যার ব্যাপারে মুখ খুলছি তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, আমল-আখলাকে অনেক উর্ধ্বে, আমি তার সমপর্যায়ের নই। অতএব তার ব্যাপারে আমার মুখ খোলা শোভা পায় না। তার ব্যাপারে তিনিই মুখ খুলতে পারেন যিনি তার সমপর্যায়ের। তবে হ্যাঁ স্পষ্টতই কেউ কোন অন্যায় করলে তার বিরোধিতা করতে হবে, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন। তবে তিনি উস্তাদ/গুরুজন হলে এবং বিরোধিতা করার প্রয়োজন হলে আদব রক্ষাপূর্বক বিরোধিতা করতে হবে।

## বিবাদ নিরসন ও ঐক্য সংহতি সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয়

* কয়েকজন বা কয়েক পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে কেউ বা কোন পক্ষ যদি স্পষ্টত কুরআন সুন্নাহ্-র উপর এবং ন্যায়ের উপর আর অন্যজন বা অন্যপক্ষ স্পষ্টত কুরআন সুন্নাহ্-র বিপক্ষে এবং অন্যায়ে থাকেন, তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি সৃষ্টির একটিই মাত্র পদ্ধতি, আর তা হল– যিনি বা যে পক্ষ কুরআন সুন্নাহ্-র বিরুদ্ধে রয়েছেন তিনি বা সে পক্ষ নিজের মত পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহ্কে গ্রহণ করবেন। আর মতবিরোধ যদি ইজতিহাদগত বিষয়কে কেন্দ্র করে বা পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির দরুন হয়ে থাকে, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

১. উভয়পক্ষকেই তাওয়াযু বা বিনয় অবলম্বন করতে হবে এবং অহংকার বর্জন করতে হবে। অন্যথায় নিজের মত পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে না এবং ঐক্যও সৃষ্টি হবে না। কোন এক পক্ষ যদি গোঁ ধরেন বা অন্যের মত মেনে নিতে তার অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না।



২. বিবদমান লোক বা পক্ষসমূহের মধ্যে আপোষ ও ঐক্য সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন যোগ্য সালিশ বা তৃতীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে, যিনি সকল পক্ষের বক্তব্য, সকল পক্ষের দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি শুনবেন এবং সকল পক্ষের প্রকৃত অবস্থান অনুধাবন করবেন, তারপর যে পক্ষের অবস্থানকে অধিকতর সঠিক মনে করবেন তাদের অনুকূলে অন্যপক্ষকে মানার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং সে পক্ষ তা মেনে নিবে।

৩. উভয়পক্ষের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে কোনো বিরোধ নেই তাকে কেন্দ্র করে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে, যদি তাতে শরীআতের বিধিবদ্ধ কোনো বিষয় পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে না দাঁড়ায়। (الاعتدال فى مراتب الرجال وغيره)

## নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া সম্পর্কে শরীআতের বিধান

* সাধারণভাবে নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া বা কোন পদের জন্য নিজে দাঁড়নো জায়েয নয়, মাকরূহ। তবে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিশেষ কোন পদ চাওয়া ও তার জন্য নিজেকে পেশ করা জায়েয। শর্তগুলো এই–

১. যদি বিশেষ কোন পদ সম্পর্কে জানা থাকে যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে।

২. যদি উক্ত পদে গিয়ে কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে।

৩. যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির মোহে না হয় বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পদ চাওয়া হয়।

**বি. দ্র.** মানুষের উচিত যোগ্য ও সৎলোক জানা থাকলে তাকে ডেকে এনে পদ দান করা।

(معارف القرآن ও ভোট সম্পর্কে শরীআতের নির্দেশ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## ভোটের ক্যানভ্যাস ও নির্বাচনী প্রচারকার্য সম্পর্কে বিধি-বিধান

* অসৎ ও অবিশ্বস্ত লোক এবং যাদের জন্য পদপ্রার্থী হওয়া বৈধ নয় তাদের পক্ষে কারও থেকে ভোট দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি নেয়া দুরস্ত নয়। এরূপ ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেয়াও উচিত নয়। ভুলবশত বা লজ্জায় পড়ে বা চাপের মুখে ওয়াদা দিয়ে থাকলেও সে ওয়াদা পালন করা উচিত নয়। তবে দেশের কোন দ্বীনদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি তার ভোট কোন

যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে দেয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং তার অনুসরণ করে অন্য লোকও সেদিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে ভোট দেয়ার জন্য মত প্রকাশ করা উচিত।

* মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা। অতএব অযোগ্য ও অসৎ প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করতে গিয়ে তাকে যোগ্য ও সৎ বলে প্রচার করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার শামিল হিসাবে গোনাহে কবীরা ও হারাম।

* জালেম ও ফাসেকের প্রশংসা করা গোনাহে কবীরা এবং পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা গোনাহে কবীরা। অতএব নির্বাচন-প্রার্থী যদি ফাসেক বা জালেম হয়, তাহলে প্রচারকালে তার প্রশংসা করাও গোনাহে কবীরা হবে। প্রার্থী যদি এমন হয় যাকে ভোট দেয়া অন্যায়, তাহলে তার পক্ষে প্রচার করাও অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করার শামিল এবং গোনাহে কবীরা হবে।

* নিজের প্রশংসা নিজে করা গোনাহে কবীরা। অতএব নির্বাচনী প্রচারকালে নিজের প্রশংসা নিজে করলে গোনাহে কবীরা হবে। তবে কারও অন্যায় অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে নিজের সঠিক অবস্থানকে মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বা মানুষকে ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে যদি নিজের কোন ভাল বিষয়কে তুলে ধরা হয় তাহলে তার অনুমতি রয়েছে।

* নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে গিয়ে প্রায়শই অন্য প্রার্থীদের দোষ চর্চা বা গীবত করা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক দোষ চর্চাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং গীবত করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। তবে সত্যি সত্যিই কেউ যদি কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বা কাউকে হেয় করে নিজেকে বড় করে দেখানোর বা অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয় বরং মানুষকে কারও সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে অন্যের দোষের কথা আলোচনা করে, তাহলে তাতে পাপ হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, মনের গোপনতম কথাও আল্লাহ জানেন, আল্লাহর কাছে কোনো লুকোচুরি চলে না। সবকিছুর জন্য তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

### ভোট প্রদান সম্পর্কে শরীআতের বিধান

১. যদি ইসলামের দাবি এবং জনগণের ন্যায্য দাবি পেশ করার বিশ্বস্ত, যোগ্য একজন মাত্র লোক থাকেন এবং তিনি কোন অনৈসলামিক



দলভুক্ত না হন, তাহলে তাকে প্রতিনিধিত্বের পদে বরণ করে নেয়ার জন্য ভোট দেয়া ওয়াজিব।

২. যদি অনুরূপ একাধিক ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহলে যিনি অধিক ইসলাম দরদী, অধিক গরীব দরদী হবেন তাকে সমর্থন করা মোস্তাহাব।

৩. আত্মীয়তার খাতিরে বা দলপুষ্টির খাতিরে বা দেশী খেশী হওয়ার খাতিরে অযোগ্য, অসৎ বা দুর্নীতি পরায়ণ বা ধর্মদ্রোহীকে প্রতিনিধিত্বের পদের জন্য ভোট দেয়া মহাপাপ, হারাম।

৪. যদি কেউ একবার অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়ে থাকে অথচ আগামীতে বিশ্বস্ত দলভুক্ত হয়ে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করে এবং তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত লোক পাওয়া না যায় তাহলে তাকে ভোট দেয়া মাকরূহ।

৫. যদি কারও অবিশ্বস্ত হওয়া প্রমাণিত না হয়ে থাকে অথচ সে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করে এবং তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত লোক মওজুদ না থাকে, তাহলে তাকে ভোট দেয়া মোবাহ।

৬. অসৎ, অবিশ্বস্ত লোককে ভোট দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত নয়। ভুলবশত বা লজ্জায় পড়ে বা চাপে পড়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও সে প্রতিশ্রুতি পালন করা উচিত নয়।

৭. যারা ভোটপ্রার্থী হয়েছে তাদের মধ্যে যদি কাউকে বিশ্বস্ত, ধার্মিক ও সৎকর্মী বলে অনুমিত না হয় এবং ইসলাম ও কুফ্‌রের মোকাবিলা না হয় তাহলে কাউকেই ভোট না দিয়ে ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত। ভোটটাকে কেন নষ্ট করব? এই যুক্তিতে অপাত্রে ভোট দেয়া উচিত নয়। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে ভোট না দিলে পাপ হবে না, পক্ষান্তরে সে ভোটের দ্বারা জয়ী হয়ে গেলে সে জনগণের রক্ত-শোষণ, ইসলামী শরীআতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আইন পাশ ইত্যাদি করে যত পাপ অর্জন করবে, তাকে ভোট প্রদানকারীগণও সে পাপের অংশীদার হবে।

৮. ইসলামের পক্ষ থেকে দাবি তুলে ধরার মত যোগ্য প্রার্থী আছে, কিন্তু তার একার কথায় কোনো কাজ হবে না– এ কথাও জানা আছে, এরূপ ক্ষেত্রেও তাকে সমর্থন করতে হবে, সে জয়ী হতে পারবে না মনে হলেও। হকের সমর্থনের স্বার্থে, হকের আওয়াজ যেন মরে না যায় এ স্বার্থে তাকে সমর্থন করতে হবে। তার বিপক্ষে যাওয়া হারাম হবে।

৯. কোন প্রার্থী যদি এমন হন যিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও দ্বীনদার, কিন্তু তিনি এমন একটা দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যে দল ইসলাম বিরোধী আইন পাশ করেছে বা করার প্রবল আশংকা আছে, যেহেতু তাদের দলে শরীআত মান্যতার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বা শরীআত বিরোধিতায়ও কোনো নিষেধ নেই, এরূপ সৎ লোককেও ভোট দেয়া জায়েয নয়।

১০.যারা সাধারণত ভোট আদায়ের সময় টাকা-পয়সা ছড়িয়ে, দাওয়াত যিয়াফত খাইয়ে, স্কুল মসজিদ মাদ্রাসায় দান সাহায্য করে ভোট আদায় করে থাকে, তারা সাধারণত যত টাকা ব্যয় করে তার চেয়ে বেশিগুণ জাতীয় সম্পদ খেয়ানত করে আদায় করার উদ্দেশ্যে করে থাকে, এরূপ প্রার্থীকে সমর্থন করা জায়েয নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমর্থনকারীগণ আমানতের খেয়ানতকারীদের দলভুক্ত হবে এবং পাপী হবে।

(হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রচিত "ভোটারের দায়িত্ব ও ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## খলীফা/রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মৌলিকভাবে খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য দশটি। যথা–

১. শরীআতের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও পূর্বসূরীদের ঐকমত্য অনুসারে দ্বীনের হেফাজত করা, বিদআত প্রতিহত করা, ফরয ওয়াজিবের উপর মানুষকে টিকিয়ে রাখা ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সকলকে দূরে রাখা।

২. বিবদমান লোকদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেয়া।

৩. রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সীমানা সংরক্ষণ করা এবং মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা।

৪. রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ করা এবং সীমান্ত প্রহরার ব্যবস্থা করা, যাতে সীমান্তের বাইরে থেকে কেউ অনুপ্রবেশ করে দেশের লোকদের জান-মালের ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

৫. শরীআত নির্ধারিত হুদূদ বা শাস্তির বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। যেমন: হত্যার শাস্তি হিসাবে কেসাস গ্রহণ, যেনার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ ইত্যাদি।

৬. ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা। দাওয়াত গ্রহণ না করলে ইসলামের জেহাদের নীতি অনুসারে জেহাদ পরিচালনা করা।



৭. কোনোরূপ জুলুম অবিচার না করে শরীআতের বিধান ও ফেকাহর মাসায়েল অনুসারে খারাজ (রাজস্ব/খাজনা/ট্যাক্স) ও যাকাত উসূল করা।

৮. বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা এবং যথাযথভাবে (প্রয়োজনের চেয়ে কমও নয় বেশিও নয়) নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ করা।

৯. দ্বীনদার, আমানতদার, যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে মন্ত্রী, গভর্ণর, প্রতিনিধি ইত্যাদি দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করা।

১০. নিজে সমস্ত রাজ্যের সবকিছুর তত্ত্বাবধান করা এবং খোঁজ-খবর রাখা।

(الأحكام السلطانية থেকে গৃহীত।)

## কোন পদে লোক নিয়োগের নীতিমালা

কোন পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানত যে যে নীতিমালা রয়েছে তা নিম্নরূপ।

১. যে পদের জন্য লোক নিয়োগ করা হবে, সে পদের দায়িত্ব পালন করারমত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বিদ্যা তার মধ্যে থাকতে হবে।

২. যাকে যে পদের জন্য নিয়োগ করা হবে তার মধ্যে উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করারমত আমানতদারী ও সততা থাকতে হবে।

৩. উক্ত পদের জন্য যে সব শর্ত ও যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে তার মধ্যে সেসব শর্ত ও যোগ্যতা বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন: কোন কোন পদের জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত, কোন কোন পদের জন্য আলেম হওয়া শর্ত, কোন কোন পদের জন্য বিচক্ষণতা ও ইজতেহাদের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক ইত্যাদি।

৪. শ্রমের সময়, পারিশ্রমিক ও বেতন-ভাতা ইত্যাদি নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

৫. চাকরি এক ধরনের লেন-দেন, অতএব বাকিতে লেনদেনের বিষয়ের ন্যায় চাকরি সংক্রান্ত বিষয়েরও একটা লিখিত চুক্তিনামা থাকা উত্তম।

৬. যোগ্যতা ও শর্তাবলী পূরণ হওয়ার ভিত্তিতে কোন আপনজন বা আত্মীয়কে নিয়োগ প্রদান করা স্বজনপ্রীতি বা অন্যায় নয়। যোগ্যতা ও শর্তাবলীর দিকটাকে উপেক্ষা করে নিছক আত্মীয়তার ভিত্তিতে বা আপনজন হওয়ার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া অন্যায়।

(معارف القرآن ও الأحكام السلطانية প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ সম্পর্কে বিধান

* কারও অধীনে পদ গ্রহণ করা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করারই নামান্তর। আর অমুসলিমকে যেহেতু সাহায্য-সহযোগিতা করা অবৈধ, তাই সাধারণভাবে অমুসলিম/কাফের সরকারের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয নয়। তবে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে অমুসলিম/কাফের সরকারের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয।

১. যদি এমন হয় যে, উক্ত পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা নিজের অত্যাচার উৎপীড়নের শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে আর উক্ত সরকারকে উৎখাত করারও ক্ষমতা নেই।
২. যদি এরূপ বুঝা যায় যে, সে সরকার তাকে শরীআত-বিরোধী কোনো আইন জারী করতে বা মান্য করতে বাধ্য করবে না।

## জেহাদ প্রসঙ্গ

### জেহাদের সংজ্ঞা

কাফেরদেরকে সত্য দ্বীনের দিকে আহবান করতে হবে, না মানলে তাদেরকে জিয্‌য়া কর দিতে সম্মত করতে হবে। যদি তারা এতে অসম্মত হয় এবং তাদের সাথে শান্তিচুক্তি না থাকে, তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরপদ্রুব ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে লড়ায়ী করে তাদেরকে অবদমিত করতে হবে। সাধারণভাবে একে বলা হয় 'জেহাদ'। (كشاف قواعد الفقه الفنون ও إصطلاحات প্রভৃতি অবলম্বনে।)

### জেহাদের উদ্দেশ্য

জেহাদের উদ্দেশ্য এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ (إعلاء كلمة الله) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুলন্দ করা তথা ইসলাম ধর্মকে বিজয়ী করা, ইসলাম ধর্মের পক্ষে বাধাকে অপসারণ করা।

### কাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হয়

১. কাফের শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ হবে; যদি তারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে জিয্‌য়া কর দিতে প্রস্তুত না হয়। তবে কোন কাফের শক্তি বা কোন কাফের রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক চুক্তি লংঘন না করা পর্যন্ত জেহাদ মুলতবি থাকবে। কোন কাফের ব্যক্তি/গোষ্ঠি মুসলিম রাষ্ট্রের



নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক হলে বা ভিসা গহণ পূর্বক কোন মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলবে না।
২. কোন মুসলমান গোষ্ঠি সম্মিলিতভাবে নামায পড়তে বা যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হবে।
৩. কোন মুসলমান গোষ্ঠি ইসলামের কোনো শেআর (বৈশিষ্ট্য) সম্মিলিতভাবে বর্জন করলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হবে। যেমন: কোন গোষ্ঠি সম্মিলিত- ভাবে আযান প্রদান বন্ধ করলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হবে।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাগাওয়াত তথা বিদ্রোহ করলে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ হবে। (إنعام الباري. تقي عثماني)

### জেহাদের হুকুম

সাধারণভাবে জেহাদ করা ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ, কিছু লোক জেহাদের দায়িত্ব পালন করলে সকলে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তবে কখনও (বহিঃশক্তি কর্তৃক মুসলিম রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিলে খলীফা তথা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক) জেহাদের সাধারণ ডাক দেয়া হলে তখন জেহাদ ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়। তখন সকল আকেল বালেগ সক্ষম পুরুষদের উপর জেহাদের আহবানে সাড়া দেয়া ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়। (شرعة الإسلام و شرحه مفاتيح الجنان)

### জেহাদের শর্ত

১. পরিবার সন্তানাদি ও মাতা-পিতার খেদমতের প্রয়োজন থেকে ফারেগ না হলে জেহাদে বের হবে না। (شرعة الإسلام)
২. (প্রতিপক্ষ অমুসলিম হলে তাদেরকে) তম্বীহ স্বরূপ ইসলামের দিকে আহবান না জানিয়ে জেহাদ শুরু করবে না, যদি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে না থাকে। পৌঁছে থাকলেও জেহাদ শুরু করার পূর্বে দাওয়াত দিয়ে নেয়া মোস্তাহাব। (عمدة القاري)

### জেহাদের সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. প্রথমে ইবাদত-বন্দেগীতে নিজের নফ্‌সের সাথে মুজাহাদা করা তার পর শত্রুর সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া।
২. তীরন্দাজী শিক্ষা করা (অর্থাৎ, অস্ত্র-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা)।
৩. বৃহস্পতিবার জেহাদে বের হওয়া মোস্তাহাব।

৪. জেহাদে বের হওয়ার পর যাবতীয় কষ্ট-ক্লেষকে ছওয়াবের মনে করা।

৫. যুদ্ধ তথা হত্যা-হত্যির ব্যাপারে অত্যধিক আগ্রহী না থাকা। বরং আল্লাহ্‌র কাছে শান্তি কামনা করা। কেননা যুদ্ধ বিপদজনক। তবে শত্রু মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলে অবিচলতার সাথে মোকাবেলা চালিয়ে যাওয়া এবং শাহাদাতের তামান্না (আকাংখা) রাখা।

৬. শত্রুর মোকাবেলায় স্থিরপদ থাকা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করা।

৭. যুদ্ধের সময় বেশি বেশি যিকির করতে থাকা।

৮. যুদ্ধের সময় স্ত্রী পুত্র পরিজন, ধন-সম্পদ ও বাড়ি ঘরের কথা স্মরণ করা থেকে বিরত থাকা।

৯. মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগরুক রাখা যে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু বা অন্য কোনো বিপদ ঘটে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا.

অর্থঃ হে নবী! তুমি বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তার বাইরে আমাদের আদৌ কোনো বিপদ ঘটবে না। (সূরা তওবাঃ আয়াত নং ৫০)

১০. জেহাদের ইমাম (সেনাপতি/আমীর) মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন অনুমোদিত কৌশলে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন।

(انعام البارى ও مفاتيح االجنان، شرعة الإسلام প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## কয়েকটি বিশেষ রাষ্ট্রনীতি

* অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাষ্ট্রনীতিতেও মিথ্যা এবং ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম।

* ইসলাম সরকার-নির্বাচনের জন্য কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তবে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে কয়েকটি নমুনা পাওয়া যায়। যথা:–

১. খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তী খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়ে যাবেন। যেমনঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।



২. খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তী খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণ করে যাবেন। যেমনঃ হযরত ওমর (রা.) করে গিয়ে ছিলেন।

৩. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তী খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নাম ঘোষণা করে যাবেন। যেমনঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মাশওয়ারা পূর্বক পরবর্তী খলীফা হিসাবে হযরত ওমর (রা.)–এর নাম ঘোষণা করে যান।

* জনগণের মতের ভিত্তিতে খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করতে হলে এ ব্যাপারে ইসলাম দায়িত্বজ্ঞানশীল ও বিশ্বস্ত লোকদের মত গ্রহণের পক্ষপাতী। ইসলাম দায়িত্বজ্ঞানহীন, অবিশ্বস্ত, বিক্রিত বা বিকৃতদের মত গ্রহণের পক্ষপাতী নয়।

* ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব (সমুদয় ভূমির প্রভুত্ব অর্থে) আল্লাহ তাআলার, জনগণ বা সর্বহারাদের নয়।

* ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের উৎস আল্লাহ, জনগণ নয়। ইসলাম মানুষকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়নি। তবে যার মূলধারা কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে কিন্তু উপধারা বর্ণিত হয়নি– এরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্ব জ্ঞানশীল ইজতেহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন (মুজতাহিদ) আলেম বা ফকীহদেরকে আইনের উপধারা রচনা করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সে উপধারাসমূহের Valid হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত এই যে, কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ যেন না হয়। সারকথা, ইসলাম জনগণকে Final authoity বা Sovereign power বলে বিশ্বাস করে না।

* কুরআন-সুন্নাহর কোনো ধারাকে ৯৯% ভোটের দ্বারাও বাতিল করা যাবে না।

* রাষ্ট্র পরিচালিত হবে মাশওয়ারা বা পরামর্শের ভিত্তিতে, কারও একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয়।

(الأحكام السلطانية – معرف القرآن ও সংক্ষেপে ইসলাম প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## মাশওয়ারা বা পরামর্শ বিষয়ক নীতিমালা

* যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় স্পষ্ট বিধান বর্ণিত নেই বা যেসব বিষয় করতেই হবে তা নয়– এমন সব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও কর্মপদ্ধতি

গ্রহণের ক্ষেত্রে মাশওয়ারা বা পরামর্শ করে নেয়া সুন্নাত। যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় স্পষ্ট বিধান বর্ণিত আছে কিংবা যা করতেই হবে, করা জরুরি– এমন কোনো বিষয়ে মাশওয়ারা নেই।

* মাশওয়ারা শুরু করার পূর্বে এই দুআ পড়ে নিবে–

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ أُمُوْرِنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের করণীয় সঠিক বিষয়টি আমাদের অন্তরে উদিত করে দাও এবং আমাদের নফ্সের ধোঁকা ও কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা কর।

* মাশওয়ারা মজলিসে একজন আমীর বা মাশওয়ারা শেষে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী থাকতে হবে।

* মত সংগ্রহের বেলায় ইসলাম দায়িত্বজ্ঞানশীল বিশ্বস্তদের মত গ্রহণের পক্ষপাতী। তবে নিয়মতান্ত্রিক মাশওয়ারা গ্রহণের মত যোগ্য ব্যক্তি না থাকলে বা নিয়মতান্ত্রিক বড়রা না থাকলেও ছোট এবং সঙ্গীদের থেকে মাশওয়ারা গ্রহণও ফায়দা থেকে খালি নয়।

* মাশওয়ারা বা পরামর্শ ও মত প্রদানকারীকে কুরআন-হাদীছের মূলনীতির আলোকে পরামর্শ ও মত দিতে হবে।

* মত গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্টের মতের ভিত্তিতে দিতে হবে, না আমীর যেটা ভাল মনে করেন সেটার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে– এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, সংখ্যাগরিষ্টের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতে হবে। আবার অনেকে বলেন, আমীর যেটা ভাল মনে করেন সেটাই হবে সিদ্ধান্ত, চাই সেটা সংখ্যাগরিষ্টের মত হোক বা অল্প সংখ্যকের মত হোক কিংবা সেটা একান্তভাবে আমীরের একারই মত হোক। তবে এই অধিকার বলে আমীর গোঁ ধরে অন্যদের উপযুক্ত মতকেও উপেক্ষা করে নিজের মতকে চালিয়ে দিয়ে মাশওয়ারাকে প্রহসনে পরিণত করতে পারবেন না।

* কোনো পরামর্শদাতা তার পরামর্শ গ্রহণ করা হল না কেন– এ জন্য অভিযোগ তুলতে পারবেন না বা তার পরামর্শ গ্রহণ করা হল না বিধায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে বা মন খারাপ করতে পারবেন না।



* পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে কাজ শুরু করতে হবে।

* মজলিস শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নিলে উক্ত মজলিসে সংঘটিত পাপ-ক্রটির কাফ্ফারা হয়ে যায়।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ.

* মাশওয়ারার মজলিসে মজলিসের অন্যান্য যেসব সুন্নাত, আদব ও নীতিমালা রয়েছে সে দিকেও লক্ষ রাখবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

**চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত**

# পঞ্চম অধ্যায়: আখ্‌লাকিয়্যাত

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অর্থ: যে আত্মশুদ্ধি করে সে সফলকাম হয়। আর যে আত্মাকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হয়। (সূরা: আশ্-শাম্স- ৯)

পঞ্চম অধ্যায়

## আখ্লাকিয়্যাত

(চরিত্র এবং আত্মশুদ্ধি তথা তায্কিয়া/তাসাওউফ বিষয়ক)

নামায, রোযা-প্রভৃতি শরীআতের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরুরি, তদ্রূপ এখলাস, তাকওয়া, ছবর, শোকর প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরীআতের বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও জরুরি ও ওয়াজিব। এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্কিয়া বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনাও বলা হয়। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ বা সূফীবাদ।



## কয়েকটি আত্মিক গুণ ও তা অর্জনের পন্থা

### এখ্লাস ও সহীহ নিয়ত

ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্কে রাজী-খুশি করার নিয়তে করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রাজী-খুশী করার ইচ্ছা বা নিজের নফসের কোনো খাহেশকে মিশ্রিত না করার নাম হল এখলাস তথা খাঁটি নিয়ত। কোন কোন ইবাদতে কিছু কিছু পার্থিব ফায়দাও হাছেল হয়ে থাকে, তবে সেটাকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ইবাদত করা ঠিক নয়। এই এখলাস ও খাঁটি নিয়ত না হলে কোনো ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

**নিয়ত খাঁটি করা তথা এখলাস হাছিল করার পদ্ধতি হল:**

১. ইবাদত করার পূর্বে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করছি এই চিন্তা করে নেয়া এবং দেলের মধ্য থেকে অন্যান্য বাজে উদ্দেশ্য দূরে নিক্ষেপ করা।
২. অন্তর থেকে ‘রিয়া’ দূর করার পদ্ধতি গ্রহণ করা। (৬২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন) বস্তুত রিয়া দূর করাই হল এখলাস।

### তাক্ওয়া ও খোদাভীতি

“তাক্ওয়া” কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) ভয়। (২) বিরত থাকা। বস্তুত ভয় আসলেই মানুষ কোন কিছু থেকে বিরত থাকে; তাই ভয় হল বিরত থাকার কারণ আর বিরত থাকা (অর্থাৎ গোনাহ থেকে বিরত থাকা) হল আসল উদ্দেশ্য। তাক্ওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা:

ক. কুফ্র ও শির্ক থেকে বিরত থাকা।
খ. হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকা।
গ. গোনাহে ছগীরা থেকে বিরত থাকা।
ঘ. সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে অর্থাৎ, যেখানে হালাল না হারাম-এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকা।
ঙ. অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।
চ. যেসব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকা।

**তাকওয়া অর্জনের পন্থা হল:**

১. আল্লাহ্র আযাব গযবের কথা, পরকালের আযাবের কথা চিন্তা করা এবং স্মরণ করা।

২. বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবত গ্রহণ করা। তাঁদের মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাই তাঁদের সোহবত বা সাহচর্যে তাকওয়ার প্রভাব এসে থাকে।
৩. ওলী-আল্লাহদেরকে কষ্ট না দেয়া।
৪. সঠিক কথা বলা।

(شریعت اور طریقت এবং معارف القرآن প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## ছবর

ছবর অর্থ মনকে মজবূত রাখা, মনকে ধরে রাখা। ছবর কয়েক প্রকার:

(ক) ইবাদতের সময় ছবর, অর্থাৎ, ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দির সাথে ধরে রাখা এবং ধৈর্য সহকারে সহীহ তরীকায় তা আদায় করা।

(খ) গোনাহের সময় ছবর, অর্থাৎ, মনকে গোনাহ থেকে দূরে ধরে রাখা।

(গ) কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় ছবর, অর্থাৎ, কেউ কোন কষ্ট দিলে প্রতিশোধ না নেয়া এবং রোগ-ব্যাধি হলে বা জান-মালের ক্ষতি হলে বে-ছবর হয়ে শরীআতের খেলাফ কোনো কথা মুখ থেকে বের না করা বা বয়ান করে ক্রন্দন না করা।

### এই ছবর হাছিল করার পন্থা হল:

১. খাহেশাতে নফসানীকে দুর্বল করা।
২. ইবাদত করলে, গোনাহ থেকে বিরত থাকলে এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাআলা যে ছওয়াবের ওয়াদা করেছেন তা স্মরণ করা।
৩. রোগ-ব্যাধি ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হলে মনকে এই বলে বোঝানো যে, এ সবই আমার কোনো না কোনো মঙ্গলের জন্য হচ্ছে, যদিও আমি বুঝছি না। তাছাড়া ধৈর্য ধরলে এতে আমার পাপ মোচন হয়ে দরজা বুলন্দ হবে। তদুপরি আমি ছবর না করলেও তাকদীরে যা আছে তা তো হবেই, আমি বে-ছবরী করে অহেতুক ছওয়াব হারাব কেন?

## হিল্‌ম বা সহনশীলতা

রাগ দমন করার গুণটি যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন সে গুণটিকে বলা হয় হিল্‌ম বা সহনশীলতা। যেমন– রাগের মুহূর্তে উত্তেজনাকে বলপূর্বক দমন করে রাখলে সেটা হবে রাগ দমন আর



সর্বক্ষণ এরূপ করতে করতে যখন রাগ দমন করাটা তার স্বভাবে পরিণত হবে তখন সেটা সহনশীলতা বলে আখ্যায়িত হবে।

রাগ দমন করার যেসব পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, উপর্যুপরি সেগুলো অবলম্বন করতে থাকলে সহনশীলতার গুণ অর্জিত হবে। বিশেষভাবে সহনশীলতার গুণ আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়– একথাও স্মরণে রাখতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য গুণের প্রশংসা করেছেন।

## তাফবীয বা নিজেকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করা

মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তার পর তার জাহিরী, বাতিনী, শারীরিক, মানসিক যা কিছু অনুকূল বা প্রতিকূলে ঘটবে সেটাকে সে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ মনে করবে। এভাবে সে নিজেকে আল্লাহ্‌র সোপর্দ করবে। মানুষ চেষ্টা করবে কিন্তু ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করবে। এটাকে বলা হয় তাফ্‌বীয। কেউ এরূপ করলে ব্যর্থতা আসলেও তার মনে কষ্ট আসবে না, সর্বাবস্থায় আরাম বোধ হবে। তবে আরামের নিয়তে তাফবীয করা দ্বীন নয় বরং দুনিয়া। এতে তাফবীযের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে বরং তাফবীয করা কর্তব্য এবং এটা আল্লাহ্‌র হক– এই নিয়তে তাফবীয করতে হবে।

এটা হাছিল করার তরীকা হল কোনো অযাচিত বা অপছন্দনীয় বিষয় ঘটলে সেটাকে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ মনে করা।

## রেযা বিল কাযা বা আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রাজী থাকা

আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর অভিযোগ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'রেযা বিল কাযা'। মানুষ আসবাব গ্রহণ করবে, চেষ্টা-চরিত্র করবে, দুআ করবে সুন্নাত ও আনুগত্য হিসাবে। তার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফয়সালা ঘটবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং মুখে বা অন্তরে কোনো অভিযোগ আনবে না। স্বয়ং চেষ্টা ও দুআ করার সময়ও মনের এই অবস্থা রাখবে যে, উদ্দেশ্য মোতাবেক না ঘটলেও তাতে আমি সন্তুষ্ট। এটাই হল রেযা বিল কাযা।

### 'রেযা বিল কাযা' হাছিল করার তরীকা হল–

১. আল্লাহর মহব্বত হাছিল হলেই রেযা বিল কাযা হাছিল হয়ে যাবে। অতএব এর জন্য আল্লাহ্‌র মহব্বত হাছিল করার পন্থা গ্রহণ করতে হবে। (দেখুন ৬১৮–৬১৯ পৃষ্ঠা)

২. বিশেষভাবে এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ ভাল, তাঁর সব কাজই ভাল, তিনি পরম দয়ালু, বিন্দুমাত্র নিষ্ঠুর নন; অতএব তিনি যা করেন তাতেই মঙ্গল নিহিত।

## তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা)

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না– এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। যেহেতু তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না, তাই শরীআতের নিয়মানুযায়ী যেকোনো চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল। উল্লেখ্য, চেষ্টা-তদবীর না করে হাত পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে ফলের আশা করা শরীআতের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুলও বলা হয় না। বরং নিয়মমত চেষ্টা-তদবীর করে, নিয়মমত আসবাব গ্রহণ করে তার ফলের জন্য এবং কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

(**বি. দ্র.** আসবাব গ্রহণ করা না করার বিস্তারিত নীতিমালা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫২৭ পৃষ্ঠা)

**তাওয়াক্কুল হাছিল করার পন্থা হল:**

১. কিছুক্ষণ সময় নির্ধারিত করে এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ দয়াময়, তিনিই মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।

২. অতীতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যেসব কামিয়াবী হাছিল হয়েছে সেগুলোকে স্মরণ ও চিন্তা করা।

## শোকর

নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনে করবে, স্বাভাবিকভাবে তার ফলশ্রুতি স্বরূপ সে আল্লাহ্‌র প্রতি মনে মনে প্রফুল্ল হবে এবং সর্বাগ্রহে সেই অনুগ্রহ দানকারী আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হবে, তাঁর নির্দেশ পালনে তৎপর হবে এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর নাফরমানীর কাজে লাগাবে না। এটাকেই বলা হয় শোকর বা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা।



**শোকর হাছিল করার তরীকা হল:**

১. আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ করা এবং চিন্তা করা।

২. সব নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনে করা।

উল্লেখ্য, আল্লাহর কোন নেয়ামতের ভিত্তিতে শুধু মুখে "আলহামদু লিল্লাহ" বললেই শোকর আদায় হয়ে যায় না; বরং প্রকৃত শোকর হল নেয়ামতের ভিত্তিতে মনে মনে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রফুল্ল হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নেয়ামতদাতা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে তৎপর হওয়া। তবে এর সাথে সাথে খুশিতে জবান থেকে "আলহামদু লিল্লাহ" বের হলে সেটাও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং ছওয়াবের হবে।

## তাওয়াযু' (বিনয়/নম্রতা)

তাওয়াযু' অর্থাৎ, বিনয় বা নম্রতা। তাওয়াযু' বলা হয় নিজেকে ছোট মনে করাকে, নিজের অহমিকাবোধ বিলীন করাকে। সমস্ত মুসলমানের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে। যদিও আপাত ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাউকে নিজের চেয়ে অধিক পাপী ও অপরাধী বলে মনে হয়, তবুও তার থেকে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে এই ভেবে যে, হতে পারে তার মধ্যে এমন কোনো গুণ রয়েছে যার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র নিকট সে আমার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দনীয়, কিংবা ভবিষ্যতে সে আমার চেয়ে অধিক গুণাবলীর অধিকারী হবে এবং সে অবস্থায়ই সে আল্লাহ্‌র নিকট হাজির হবে। পক্ষান্তরে আমার পরিণতি কি হবে তা আমার জানা নেই। পরিণামের দিকে নজর দিয়ে একজন কাফের থেকেও নিজেকে বড় মনে করার উপায় নেই। কেননা মৃত্যুর পূর্বে সেই কাফেরের ঈমান নসীব হতে পারে। পক্ষান্তরে ঈমানের সাথে আমার মৃত্যু হওয়ার কোনো গ্যারান্টি আমার কাছে নেই। তবে বর্তমান অবস্থায় একজন কাফেরের যেহেতু ঈমান নেই আর আমার ঈমান নসীব হয়েছে, তাই বর্তমানের বিচারে আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ– এই বোধ রাখতে হবে। এটা তাওয়াযু' বা বিনয়ের পরিপন্থী নয় অর্থাৎ, অহংকার নয়, বরং এটা হল দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহ আমাকে ঈমানের মত বড় নেয়ামত দান করেছেন সেই নেয়ামতের প্রতি বড়ত্ববোধ। মনে রাখতে হবে কখনও তাওয়াযু' বা বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে যেন আল্লাহ্‌র কোনো নেয়ামতের না-শুকরি প্রকাশ হয়ে না পড়ে।

এখানে আরও মনে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ বা পদ পাওয়ার লালসায় কোন ধনী বা পদস্থ লোকের সামনে বিনয়ভাব প্রকাশ করাও বিনয় নয় বরং সেটা হল হীনতাবোধ।

**তাওয়াযু' হাছিল করার পন্থা হলঃ**

১. তাকাব্বুর দূর করার পন্থাই হল তাওয়াযু' হাছিল করার পন্থা। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ৬২৬)

২. অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করলে তাওয়াযু' পয়দা হয়। (আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করার পন্থার জন্য এই পৃষ্ঠার শেষে দেখুন।)

## খুশু'-খুযু' (স্থিরতা ও একাগ্রতা)

দেহ মন স্থির করে ইবাদত করা, একাগ্রতা সহকারে ইবাদত করা এবং চলা-ফেরা, উঠা-বসায় উগ্রতা পরিহার করাকে বলা হয় খুশু'-খুযু'। ইবাদতের মধ্যে দেহ স্থির করার অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া না করা। আর মন স্থির করার অর্থ হল ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপস্থিত না করা এবং ইবাদতের সময় ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা। অনিচ্ছাকৃতভাবে যেটা মনে এসে যায়, বান্দা তার জন্য দায়ী নয়।

**এই খুশু'-খুযু' হাছিল করার তরীকা হলঃ**

১. এই চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত, আল্লাহ আমার সব কিছু শুনছেন এবং দেখছেন এবং আল্লাহ্র কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

২. আল্লাহ্র ভয় অন্তরে বসানো। (এর জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টির পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষভাবে নামাযে মন স্থির করার পদ্ধতির জন্য দেখুন ২০৪ পৃষ্ঠা।)

## খাওফ বা আল্লাহ্র ভয়

শরীআতে খাওফ বা ভয় বলতে নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্র আযাবের ভয়-ভীতির সম্ভাবনা বোধ করাকে বোঝানো হয়। এই ভয় এত উত্তম জিনিস যে, এটা এসে গেলে মানুষ থেকে কোনো গোনাহ হতে পারে না।

খাওফ বা আল্লাহ্র ভয় অর্জন করার উপায় হল আল্লাহ্র আযাব-গযবের কথা স্মরণ করা এবং তা নিয়ে চিন্তা করা।



## রজা বা আল্লাহ্র রহমতের আশা

আল্লাহ্র আযাবের ভয় যেমন রাখতে হবে তেমনিভাবে আল্লাহ্র রহমত, মাগফেরাত, জান্নাত এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের আশাও মনে থাকতে হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না। ভয় এতটা কাম্য নয় যে, আল্লাহ্র রহমতের ব্যাপারে হতাশা জন্মাবে। আবার আল্লাহ্র রহমতের আশাও এতটা প্রবল হওয়া ঠিক নয় যাতে আল্লাহ্র বিধান লংঘন করার মত দুঃসাহস দেখা দেয় এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা রহমত করবেন। বরং ভয় ও আশা এতদুভয়ের মধ্যে ব্যালেন্স ও ভারসাম্য থাকতে হবে।

এই রজা হাছিলের উপায় হল আল্লাহ্র অসীম ও অপার রহমতের কথা চিন্তা করা।

উল্লেখ্য, কেউ যদি শুধু আল্লাহ্র রহমত, মাগফেরাত ও জান্নাত লাভের আশা করে কিন্তু তা লাভের পদ্ধতি অর্থাৎ, নেক আমল, তওবা প্রভৃতি অবলম্বন না করে, তাহলে সেটাকে রজা বা আশা বলা হবে না বরং সেটা হবে বীজ বপন না করে ফসল অর্জনের আশা করার মত অলীক কল্পনা।

## আল্লাহ্র মহব্বত ও শওক

আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত বা ভালবাসার অর্থ হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অন্য সকলের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া। এরূপ মহব্বত রাখা ওয়াজিব। এরূপ মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর হল কুফ্র–এর উপর ঈমানকে প্রাধান্য দেয়া। এটা না হলে মানুষ মুমিনই থাকে না। তারপরের স্তর হল আল্লাহ্র বিধানকে অন্যের বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়া। বিধান যে পর্যায়ের, তার প্রতি ভালবাসা বা সেটাকে প্রাধান্য দেয়ার হুকুমও সেই পর্যায়ের– ওয়াজিব হলে ওয়াজিব, মোস্তাহাব হলে মোস্তাহাব। উপরোক্ত ভালবাসাকে বলা হয় মহব্বতে আক্লী বা বুদ্ধিজাত ভালবাসা। আর এক প্রকারের ভালবাসা রয়েছে যাকে মহব্বতে ত্বাব্য়ী বা স্বভাবজাত ভালবাসা বলে। তা হল আল্লাহ্র সঙ্গে প্রাণের টান হয়ে যাওয়া, তাঁর কথা শুনলে তা মানার জন্য মনের উদ্বেল হয়ে ওঠা এবং তাঁর নাফরমানী ছেড়ে তাঁর আনুগত্য শুরু করে দেয়া। প্রথম প্রকারের ভালবাসা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত এবং তার উপর টিকে থাকলে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসা মনে সৃষ্টি হয়ে যায়।

কুরআন-হাদীছের আলোকে আল্লাহ্র মহব্বত সৃষ্টির জন্য বুযুর্গানে দ্বীন নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণের কথা বলেছেন।

১. দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা করা।
২. হিম্মত সহকারে শরীআতের জাহিরী বাতিনী সব ধরনের আমলের পাবন্দী করা, জাহের এবং বাতেন উভয়কে শুদ্ধ ও পবিত্র করা।
৩. আমলের মধ্যে যে দিকটি আরামের সে দিকটি গ্রহণ করা। (যদি তা গ্রহণে শরীআতের কোন বাধা না থাকে)।
৪. আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম পুরোপুরি মেনে চলা। ফরযসমূহকে পুরোপুরি আদায় করার সাথে সাথে বেশি বেশি নফলে লিপ্ত হওয়া। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র মাহবূব হযরত রসূল (সা.)–এর পূর্ণ পায়রবী করা।
৫. আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি করার নিয়তে নেক আমলে অটল থাকা।
৬. কিছুক্ষণ নির্জনে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করা।
৭. আল্লাহ্‌র সঙ্গে যাদের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে এরূপ বুযুর্গদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদের কাছে যাতায়াত করা, সম্ভব না হলে অন্তত চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক রাখা।
৮. নিজে কি করছি এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কত দয়া এবং নিয়ামত তা স্মরণ করা। (নির্জনে বসে কিছুক্ষণ এটা চিন্তা করবে।)
৯. দুআ করবে যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে মহব্বত বৃদ্ধি করে দেন।
১০.এই মোরাকাবা (ধ্যান) করা যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে চান। এর দ্বারা বান্দার অন্তরেও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।
১১.আল্লাহ্‌র আছমায়ে হুছনা (উত্তম নামসমূহ)–এর সাথে মহব্বত পয়দা করা এবং বেশি বেশি সেগুলো পাঠ করা। (দেখুন ৫৮–৭৪ পৃষ্ঠা)
১২.বেশি বেশি তওবা করা।

## হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ

ঈমান পূর্ণ করার জন্য যেমন আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে হবে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি রাখতে হবে, তেমনি আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে গুণকে ভালবাসেন তাকেও ভালবাসতে হবে। একে বলা হয় "হুব্ব ফিল্লাহ" অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র জন্য দুস্তী রাখা বা আল্লাহ্‌র ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা। এর বিপরীত আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে দোষকে ঘৃণা করেন, না পছন্দ করেন, তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। একে বলে "বুগ্‌য ফিল্লাহ" অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা বা আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা। এমনিভাবে রসূলের



প্রিয় যারা তাঁদেরকে ভালবাসা এবং রসূলের দুশমন যারা অন্তর থেকে তাদের সাথে দুশমনী রাখাও ঈমানের জন্য জরুরি।

## দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেম

নিজের জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও প্রেমানুভূতিকে বলা হয় দেশাত্মবোধ। শরীআতের দৃষ্টিতে দেশাত্মবোধ একটি প্রশংসনীয় গুণ। তিরমিযী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা রওয়ানা হন, তখন বার বার মক্কাভূমির দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং বলছিলেন, হে মক্কার মাটি, আমার গোত্র যদি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করত, তাহলে কখনও তোমায় আমি ছেড়ে যেতাম না। এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, দেশ প্রেমের এই প্রেরণা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসনীয় যতক্ষণ তা জাতীয় গোঁড়ামী ও বিদ্বেষে পরিণত না হয় এবং মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাথে তার সংঘাত না ঘটে, যেমনটা ঘটেছিল হিটলার ও নাজিবাদের আধুনিক ইউরোপীয় দেশাত্মবোধের ফলশ্রুতিতে এবং যা সূচনা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

দেশাত্মবোধ একটি স্বভাবজাত প্রেরণা। জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে গেলেই তা দেশাত্মবোধে পরিণত হয়। আল্লাহ যে ভূখণ্ডকে আমার জন্মভূমি বানিয়েছেন আমার জীবন কর্মময়তায় মণ্ডিত হবে সেখানে, সে-ই আমার আপনভূমি– এরূপ চিন্তা থেকে দেশাত্মবোধ জন্ম নিয়ে থাকে।

## গায়রত বা আত্মমর্যাদা বোধ

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা শ্রদ্ধেয় বস্তুর নিন্দা বা অবমাননা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে একটা ক্রোধভাবের উদ্রেক হয়, এই ক্রোধভাবকে বলা হয় গায়রত বা আত্মমর্যাদা বোধ। যেমনঃ পিতা-মাতাকে কেউ গালি দিলে বা নিন্দা করলে আত্মমর্যাদা বোধে আঘাত লেগে থাকে। এরূপ আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূল, কুরআন, কা'বা, ইসলাম, দ্বীন, ঈমান প্রভৃতির অবমাননা বা তিরস্কার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হতে দেখলে মুসলমানদের অন্তরে এই গায়রত জাগ্রত হওয়া উচিত। এই গোস্বা দুষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয় এবং ঈমানের পরিচায়ক। আর এই চেতনা না থাকা ঈমানহীনতার পরিচায়ক। নিজের সম্মান, পরিবার- পরিজন ও

বন্ধু-বান্ধবের সম্মান এবং দেশ ও জাতির সম্মান সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট ক্রোধের অনুপ্রেরণা এই আত্মমর্যাদা বোধের পরিধিভুক্ত।

## যুহ্‌দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ

বৈধ আসবাব ও সম্পদ বর্জন করা নয় বরং সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম যুহ্‌দ। সম্পদ পেলেও খুব আনন্দিত নয়, আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়– মনের এই অবস্থাই হল যুহ্‌দের উচ্চ স্তর। একজন যাহেদ বা দুনিয়ার মোহত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রয়োজন পূরণ করার এবং আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার নজর থাকবে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি নয়।

যুহ্‌দ হাছিল করার উপায় হল এই চিন্তা করা যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখেরাত চিরস্থায়ী, দুনিয়ার সবকিছুই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত আর পরকালের সবকিছু ত্রুটি ও দোষমুক্ত।

## মোরাকাবা (আল্লাহ্‌র ধ্যান)

ইবাদতের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা যে, তিনি আমাকে দেখছেন, আমার ইবাদত সুন্দর হচ্ছে কি না তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। এমনিভাবে প্রত্যেকটা কথা এবং কাজের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা যে, তিনি আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন। তাই কোন মন্দ কথা বা মন্দ কাজ হলে এই ভাবা যে, আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দিবেন; দুনিয়াতেই শাস্তি দিবেন না হয় পরকালে তো দিবেনই। পক্ষান্তরে কোন ভাল কথা বা ভাল কাজের ব্যাপারে এই ভাবা যে, আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট হবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। এরূপ মোরাকাবা বা আল্লাহ্‌র ধ্যান অমূল্য রতন।

মোরাকাবা গুণ হাছিল করার তরীকা হল–

১. প্রথম দিকে বারবার জোর করে মনে এই চিন্তা টেনে আনা। পরে এটা করা সহজ হয়ে যাবে।
২. মুখে অনবরত আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকা।
৩. আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকা।

(معارف القرآن، بصائر حکیم الامت، شریعت اور طریقت প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)



## ক্বানায়াত (অল্পেতুষ্টি)

অল্পে তুষ্ট থাকাকে বলে ক্বানায়াত। জীবিকার ব্যাপারে, অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে সদুপায়ে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সীমাহীন দুরাকাংখাকে মনে স্থান দেয়া যাবে না। বরং বৈধ উপায়ে স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনার পর যা পাওয়া যাবে তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে। এতেই প্রকৃত শান্তি। অন্যথায় কোটি কোটি টাকার উপর শুয়ে থেকেও মনে শান্তি জুটবে না।

দুনিয়ার মহব্বত ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে দূরীভূত করতে পারলে এই অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জিত হয়।

## ফিক্‌র (চিন্তা-ভাবনা) ও মুহাছাবা (হিসাব-নিকাশ)

ফিক্‌র বা চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে আত্মসংশোধনের একটি মৌলিক বুনিয়াদ। প্রত্যেকটা কথা এবং কাজের শুরুতে চিন্তা-ভাবনা করে নিতে হবে যে, এর পরিণাম কি হবে, এটা করা উচিত হবে কি না, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না অসন্তুষ্ট। এমনিভাবে আরও চিন্তা করা উচিত যে, দিন দিন আমার আমলের উন্নতি হচ্ছে না অবনতি। এর জন্য প্রতিদিন নিজের আমলের মুহাছাবা অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ নিতে হবে এবং যা কিছু নেক কাজ হয়েছে তার জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে হবে, আর যা গোনাহ হয়েছে তার জন্য তওবা করতে হবে এবং আগামীতে তা না করার সংকল্প করতে হবে। বিশেষভাবে ফিকরে আখিরাত বা পরকালের চিন্তা মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

**ফিক্‌র হাছেল করার পন্থা হলঃ**

১. দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের স্বরূপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।
২. বিশেষভাবে ফিক্‌রে আখেরাত আসবে মৃত্যুকে স্মরণ করলে।

## কয়েকটা মনের রোগ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়

## রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব

ইবাদত ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে এই উদ্দেশ্য রাখা যে, এতে মানুষের চোখে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে– একে বলে রিয়া বা লোক দেখানো। এটা মহাপাপ। রিয়া নানাভাবে হয়ে থাকে। কখনও মুখে বলে, কখনও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে, কখনও হাঁটা-চলা, ভাব-ভঙ্গি, আওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে, কখনও পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে, কখনও ইবাদত

সুন্দর ও দীর্ঘভাবে আদায়ের মাধ্যমে ইত্যাদি। মোটকথা, ইবাদত ও আনুগত্যের কাজে যে কোনোভাবে মাখলূকের প্রতি নজর রাখা হল রিয়া। এমনকি লোকে দেখবে এজন্য ইবাদত গোপনে করার প্রতি জোর দেয়াও রিয়া। কেননা গোপনে ইবাদত করার প্রতি জোর সে-ই দিবে যার নজর মাখলূকের প্রতি রয়েছে। কেউ দেখবে কি দেখবে না এই চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়াই হচ্ছে পূর্ণ রিয়া থেকে মুক্তি এবং এটিই হল পূর্ণ এখলাস।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার নেক কাজ দেখে অন্য কেউ তা করতে উদ্বুদ্ধ হবে– এরূপ চেতনা থেকে নেক কাজ প্রকাশ্যে করলে তা রিয়া বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে আমাকে কেউ নেক কাজ করতে দেখলে স্বভাবত আমার মন যে খুশি হয় এই ভেবে যে, আলহামদু লিল্লাহ লোকটা আমাকে ভাল অবস্থায় দেখে– এটাও রিয়া নয়। বরং রিয়া হল এই চিন্তা এবং এই খুশি যে, প্রকাশ্যে ইবাদত করলে মানুষের কাছে আমার সুনাম হবে, আমার প্রতি লোকদের ভক্তি বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি।

এই রিয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগ, এতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্থলে মানুষের সন্তুষ্টিকে স্থান দেয়া হয়। তাই রিয়াকে এক ধরনের শির্ক (শির্কে আছগর বা ছোট শির্ক) বলা হয়।

**রিয়া থেকে মুক্তির উপায় হলঃ**

১. হুব্বে জাহ বা সম্মান-প্রীতি অন্তর থেকে বের করতে হবে।

২. রিয়ার চেতনা এসে গেলেও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং সহীহ নিয়ত অন্তরে উপস্থিত করে কাজ করে যেতে থাকবে, এভাবে আস্তে আস্তে সেটা আদত বা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং আদত থেকে ইবাদত ও এখলাসে পরিণত হবে।

৩. যে ইবাদত প্রকাশ্যে করার বিধান, তা তো প্রকাশ্যেই করতে হবে, এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদত প্রকাশ করারও নিয়ত রাখবে না, গোপন করারও উদ্যোগ নিবে না।

## হুব্বে জাহ্ (প্রশংসা ও যশ-প্রীতি)

প্রশংসা, সুনাম ও সম্মানের লোভকে বলা হয় হুব্বে জাহ। এ লোভ মনে এলে অন্যের প্রশংসা, সুখ্যাতি ও সম্মান দেখে মনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং হিংসা লাগে আর অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনে মনে আনন্দ জন্মে। এমনিভাবে অনেক খারাবী এ রোগের কারণে দেখা দেয়। এ রোগের প্রতিকার হল–



১. এই চিন্তা করা যে, আমি যাদের নিকট ভাল হতে চাই তারাও থাকবে না আমিও থাকব না। অতএব, এমন অসার জিনিসের প্রতি মন লাগানো নির্বুদ্ধিতা বৈ কি?

২. এমন কোন কাজ করা, যা শরীআতের খেলাফ নয় কিন্তু লোক চোখে সেটা লজ্জাজনক, যেমনঃ বাড়ির কোন নগন্য জিনিস বিক্রি করা ইত্যাদি।

## দুনিয়া এবং মালের মহব্বত

টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার তা মনে ঢুকলে সেখানে আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র স্মরণ থাকতে পারে না। এমনিভাবে ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা, আসবাব-পত্র, কাপড়-চোপড়, ইত্যাদির মহব্বত এক কথায় দুনিয়ার মহব্বত তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুর মহব্বত এমন এক জঞ্জাল, যার মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বত থাকতে পারে না। এই দুনিয়ার মহব্বতের কারণে মানুষ হক-নাহক, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার বিচার হারিয়ে ফেলে। এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমানহারা অবস্থায়ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

তবে উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদ, মাল-আসবাব ইত্যাদির প্রতি স্বভাবগতভাবে মানুষের কিছু আকর্ষণ থাকে। এটা শরীআতে নিন্দনীয় নয়। এমনিভাবে শরীআতসম্মত পদ্ধতিতে (দ্র. ৩৭৭ পৃষ্ঠা) সম্পদ উপার্জন করাও নিন্দনীয় নয় বরং নিন্দনীয় হল যদি কেউ সম্পদের প্রতি মনের আকর্ষণকে এতটা বল্গাহীন ছেড়ে দেয় বা এমনভাবে সম্পদ উপার্জনে মত্ত হয় যে, আল্লাহ্র হুকুম- আহকামের পরোয়া থাকে না এবং আল্লাহ ও আল্লাহ্র রসূলের আদর্শের চেয়ে সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

**এ রোগের প্রতিকার হলঃ**

১. এ সবকিছু একদিন ছেড়ে যেতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে– একথা বেশি বেশি স্মরণ করা।

২. ব্যবসা-বাণিজ্য, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র, মানুষের সঙ্গে দুস্তী-মহব্বত, আলাপ-পরিচয় জরুরতের চেয়ে বেশি না করা।

৩. অপব্যয় না করা। কেননা অপব্যয় থেকে আয় বৃদ্ধির লোভ জন্মে।

৪. সাধারণ খাওয়া-পরার অভ্যাস করা।

৫. দরিদ্রদের সংসর্গ গ্রহণ ও ধনীদের সংসর্গ বর্জন করা।

৬. দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের জীবনী পাঠ করা।
৭. যে জিনিসের প্রতি মন বেশি লেগে যায়, তা হয় কাউকে দিয়ে দেয়া (দান স্বরূপ দিতে মনে না চাইলে অন্তত যাকাত সদকা স্বরূপ হলেও দিয়ে দেয়া) কিংবা বিক্রি করে দেয়া।

## বুখ্‌ল বা কৃপণতা

শরীআতের আলোকে যেখানে ব্যয় করা জরুরি বা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরি, সেখানে ব্যয় করতে সংকীর্ণতা করাকে বলা হয় বুখ্‌ল বা কার্পণ্য। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ আর শেষোক্ত স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ নয় তবে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। এই কৃপণতা এত খারাপ জিনিস যে, এর কারণে অনেক ফরয ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমনঃ যাকাত দেয়া, কুরবানী করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি আদায় না হওয়া। এগুলো হল দ্বীনী ক্ষতি। আর কৃপণকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এটা হল পার্থিব একটা বড় ক্ষতি।

**এ রোগের প্রতিকার হলঃ**

১. দুনিয়ার মহব্বত ও মালের মহব্বত অন্তর থেকে বের করতে হবে। (দেখুন এই পৃষ্ঠার উপরিভাগ।)
২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মনে না চাইলেও মনের উপর জোর দিয়ে সেটা কাউকে দিয়ে দেয়া। কৃপণতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ করতে থাকা।

## হির্‌ছ বা লোভ-লালসা

অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি মনের লোভকে বলা হয় হির্‌ছ। প্রশংসা ও যশ-প্রীতি এবং দুনিয়া ও মালের মহব্বত পরিচ্ছেদে বর্ণিত চিকিৎসাই এ রোগের চিকিৎসা। এছাড়া এই চিন্তা করতে হবে যে, লোভী ব্যক্তি সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, শরীআতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি লোভ বা আগ্রহ নিন্দনীয় নয় বরং তা পছন্দনীয়।

## এশ্‌রাফে নফ্‌ছ

কারও থেকে কিছু পাওয়ার আশায় এমনভাবে অপেক্ষায় থাকা যে, তা না পেলে মন খারাপ হয়ে যায় এবং যার থেকে পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল



তার প্রতি রাগ জন্মে, এটাকে বলা হয় এশ্‌রাফে নফ্‌ছ। এ-ও এক প্রকারের হির্‌ছ বা লোভ। এটা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হওয়ার কারণে নিন্দনীয়। তবে শুধু যদি পাওয়ার চিন্তা মনে উদয় হয় কিন্তু না পেলে মনে কষ্ট আসে না বা তার প্রতি রাগ জন্মে না, তাহলে এতটুকু গর্হিত নয়। এমনিভাবে কোন পেশাদার যে গ্রাহকের অপেক্ষায় থাকে তাও এশ্‌রাফে নফ্‌ছের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমনঃ ডাক্তার রোগীর অপেক্ষায় থাকে ইত্যাদি। হির্‌ছ বা লোভ-লালসার প্রতিকার যা, এ রোগের প্রতিকারও তাই।

## তাকাব্বুর বা অহংকার

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি যেকোনো দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে করা এবং সেই সাথে অন্যকে সে ক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে বলে তাকাব্বুর বা অহংকার। অহংকার গোনাহে কবীরা। কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে সে কারও উপদেশ গ্রহণ করে না, কারও সৎপরামর্শও গ্রহণ করে না। এ রোগ হক ও সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এ হল দ্বীনী ক্ষতি। আর অহংকারীকে মনে প্রাণে সকলে ঘৃণা করে এবং সময় সুযোগে তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে, এভাবে দুনিয়াতেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ সবকিছুর প্রেক্ষিতে তাকাব্বুর বা অহংকারকে সর্বরোগের মূল বলা হয়। তাকাব্বুর হারাম ও বড় গোনাহ।

**এ রোগ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলঃ**

১. নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে, আমি নাপাক পানি থেকে তৈরী এবং বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে মুখে ও নাকের ভিতর ময়লা ভরা। আর মৃত্যুর পর আমার সবকিছু পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। ইত্যাদি।
২. এ কথা চিন্তা করা যে, সমস্ত গুণ মূলত আল্লাহ্‌রই একান্ত দান, আমার বুদ্ধি বা বাহু বলে তা অর্জিত হয়নি, নতুবা আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারেনি। অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যা অর্জিত হয়েছে তার জন্য আমার অহংকার বা বড়ত্ববোধ করা বোকামি বৈ কি? বরং এর জন্য আল্লাহ্‌র সামনে আমার বিনয়ী হওয়া উচিত।
৩. যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে, মনে না চাইলেও জোর-জবরদস্তী তার সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে।
৪. অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বেশি উঠা-বসা রাখতে হবে।

৫. মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে।
৬. নিজের দোষ-ত্রুটি, নিন্দা-অপবাদ শুনেও প্রতিবাদ না করা।
৭. ক্রোধ প্রকাশ পেলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া (ছোটদের থেকে হলেও)।
৮. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ছোট-খাট কাজ নিজেই করা, মজদুর বা চাকর-নওকর না লাগানো।
৯. সকলকে আগে সালাম দেয়া।
১০. তাকাব্বুর দূর করার সবচেয়ে উত্তম ও সহজ পন্থা হল তাকাব্বুরের ধরন ও বিবরণ জানিয়ে হক্কানী পীর ও শায়খে তরীকত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। কারণ নিজে তাকাব্বুরের ধরন ও প্রতিকারের পন্থা বুঝতে অনেক সময় কঠিন হয়ে থাকে।

## উজ্ব বা আত্মগর্ব

"অহংকার"–এর সংজ্ঞায় নিজেকে বড় মনে করার সাথে সাথে অন্যকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি কোন বিষয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করে শুধু নিজেকে বড় মনে করে গর্ববোধ করে, তাহলে সেটাকে বলা হয় উজ্ব বা আত্মগর্ব। আত্মগর্ব করাও গোনাহে কবীরা।

**উজ্ব বা আত্মগর্ব রোগের প্রতিকার হল:**

১. নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করে দেখা।
২. গুণকে আল্লাহ্‌র দান মনে করা।
৩. উক্ত দানের জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা।
৪. এই আশংকা রাখা যে, আল্লাহ্‌র শক্তি আছে যেকোনো সময় তিনি এটা ছিনিয়ে নিতে পারেন।
৫. দুআ করা যেন আল্লাহ উক্ত দান থেকে মাহরূম না করেন, সেটা যেন ছিনিয়ে না নেন।

## রাগ বা গোস্বা

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে বলে রাগ (غضب) বা গোস্বা। এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না, তখন মুখ দিয়েও অনেক অন্যায় কথা বের হয়ে যায়। আবার অনেক অন্যায় কাজও করে ফেলে এবং পরিণামে অনেক ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। রাগ স্বভাবগত বিষয়, এর জন্য মানুষ দায়ী নয়। তবে রাগ চরিতার্থ করা না করা মানুষের ইচ্ছার অধীন, তাই এর জন্য সে দায়ী।



**রাগ দমনের পন্থা হল:**

১. রাগ হলেই আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পড়ে নেয়া।
২. لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়া।
৩. যার উপর রাগ হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া বা নিজে অন্যত্র সরে যাওয়া।
৪. তারপর এ চিন্তা করা যে, সে আমার নিকট যতটুকু অপরাধী, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়ে বেশি অপরাধী। আমি যেমন চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমারও তেমনি উচিত তাকে ক্ষমা করা।
৫. এতেও রাগ না গেলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।
৬. তাতেও রাগ না গেলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে বা উযূ কিংবা গোসল করে নিবে।
৭. এই চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। অতএব আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে?
৮. স্বভাবগতভাবে যিনি বেশি রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল– যার উপর রাগ হয় রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর জনসমক্ষে তার হাত পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার জুতো সোজা করে দিবে। দু' একবার এরূপ করলেই রাগের হুশ ফিরে আসবে।

**বি. দ্র.** রাগ সব স্থানেই নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েয বরং জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রাগ শক্তির ব্যবহার করা অনেক সময় ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। আর রাগ দমন করার গুণটি যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে তখন সেটাকে বলা হয় সহনশীলতা। আল্লাহ্‌র নিকট এই সহনশীলতার গুণ অনেক পছন্দনীয়।

## বুগ্য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকোচন

রাগ চরিতার্থ করতে না পারলে রাগ দমনের দ্বারা মনের মধ্যে ক্ষোভ, মনস্তাপ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অন্য ভাবে তার প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও অন্যভাবে তাকে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস জাগে। এই প্রয়াস বা মনোভাবকে বলা হয় বুগ্য বা কীনা। আর অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব যদি জাগ্রত না হয় কিংবা সেরূপ উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা না আসে বরং রাগের কারণে মনের মধ্যে শুধু একটা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়

এবং যার উপর রাগ হয় তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে মন চায় না, তাহলে সেটাকে বলে ইন্‌কিবাযে তব্‌য়ী বা 'স্বভাব সংকোচন', সেটা নিন্দনীয় নয়। কারণ সেটা স্বভাবগত বিষয়, যা ইচ্ছার অধীন নয়। তবে কারও ব্যাপারে স্বভাবের মধ্যে সংকোচন ভাব আসলে সেটা দূর করার জন্য কখনও কখনও এই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে যে, তাকে বলে দিবে, আপনার এই কথা বা আচরণে আমার কষ্ট লেগেছে। এতে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, বিদ্বেষ ও শত্রুতা যদি পার্থিব কোন বিষয়ের কারণে হয় তবেই তা নিন্দনীয় ও গর্হিত। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান দ্বীনের কারণে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যদি কারও সাথে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রাখে তবে তা নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম।

**বুগ্‌য বা কীনা রোগের প্রতিকার হল:**

১. যার প্রতি বিদ্বেষ হয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া।
২. মনে না চাইলেও তার সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখা।

## হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা) ও গেবতা

কারও জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং আকাংখা হওয়া যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা– এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা)। সাধারণত তাকাব্বুর (নিজের বড়ত্ববোধ) বা শত্রুতা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয় কিংবা কারও মন যদি খবীছ হয় তাহলেও এই মনোবৃত্তি জাগতে পারে। হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হতে হয়। হিংসুক ব্যক্তি চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারও ভাল কিছু দেখে সেটা ধ্বংসের কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করা গর্হিত নয় বরং এরূপ কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে মোস্তাহাব আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ। এটাকে হাছাদ নয় বরং 'গেবতা' বলা হয়।

**হাছাদ রোগের প্রতিকার হল:**

১. যার প্রতি হাছাদ বা হিংসা হয়, মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করা।



২. যার যে নেয়ামতের কারণে হাছাদ হয়, সেটা তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাক আল্লাহ্‌র কাছে এই দুআ করতে থাকা।
৩. মনে না চাইলেও দেখা হলে তাকে সালাম করা, তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো এবং নম্র ব্যবহার করা।
৪. মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া প্রদান করা।

**বি. দ্র.** কোন কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বেদআতী লোকের কোন বিষয়-সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তা দ্বারা ফেতনা ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে।

## বদগোমানী বা কু-ধারণা রোগ

যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ ও নেককার বলে মনে হয়, তার সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ব্যতীত কুধারণা পোষণ করা হারাম ও গোনাহে কবীরা।

**বদগোমানী রোগের প্রতিকার হল:**

১. নির্জনে বসে এই চিন্তা করা যে, কু-ধারণা পোষণ করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। এটা করলে আল্লাহ্‌র আযাবের আশংকা রয়েছে। হে নফ্‌স, তুমি কীভাবে আযাব বরদাশ্‌ত করবে!
২. তওবা করবে।
৩. আল্লাহ্‌র নিকট অন্তর সাফ হয়ে যাওয়ার জন্য দুআ করবে।
৪. যার প্রতি কু-ধারণা হয়েছে তার উভয় জগতের কামিয়াবী ও সুখ-শান্তির জন্য দুআ করবে।
৫. প্রতিদিন তিনবার উপরোক্ত আমলসমূহ একাধারে তিন দিন করার পরও যদি মন থেকে কু-ধারণা না যায়, তাহলে যার প্রতি কু-ধারণা হয়েছে তাকে যেয়ে বলবে, অহেতুক আপনার প্রতি আমার বদগোমানী হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য দুআ করুন যেন আমার মন থেকে এটা দূর হয়ে যায়।

## গোনাহের প্রতি আকর্ষণ

তাকওয়া বা পরহেযগারীর স্বাদ এবং নূর ভিতরে না থাকার কারণে গোনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, বিকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। তাকওয়ার স্বাদ

অর্জিত হলে গোনাহের প্রতি বিকর্ষণ সৃষ্টি হবে এবং গোনাহ করতে তখন খারাপ লাগবে। অতএব গোনাহের প্রতি আকর্ষণ-রোগের চিকিৎসা হল তাকওয়া অর্জনের পন্থা গ্রহণ করা। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ৬১২) গান-বাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলে তার প্রতিকারের জন্য দেখুন ৬৩২ নং পৃষ্ঠা। অশ্লীল নভেল-নাটক, খেলাধূলা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ থাকলে তার জন্য দেখুন ৬৩৩ ও ৬৪২ নং পৃষ্ঠা।

(معارف القرآن ও الفرقان، بصائر حکیم الامت বেহেশতী জেওর شریعت و طریقت প্রভৃতি থেকে গৃহীত।)

## অবৈধ প্রেম

কোন নারী বা বালকের অবৈধ প্রেমে পড়লে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যা যা করতে হবে তা হল–

১. প্রথমত বুঝতে হবে যে, সাহস কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা ব্যতীত কোনো সহজ কাজও হয় না। শরীরের সামান্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে গেলেও তিতা ওষুধ সেবন করতে হয়। জাহিরী রোগের যখন এই অবস্থা, তখন অভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

২. তার সাথে কথা-বার্তা, দেখা-শুনা, আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। অন্য কেউ তার আলোচনা করলে তাকে বাধা দিতে হবে এবং লৌকিকভাবে হলেও যার প্রেমে পড়েছে পরিকল্পিতভাবে এক এক বাহানায় তার সমালোচনা করতে থাকবে।

৩. একটা নির্জন সময়ে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে আতর ও সুগন্ধি মেখে দুই রাকআত তওবার নামায (২৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন) পড়বে এবং কেবলামুখী অবস্থায় বসে খুব তওবা-এস্তেগফার করে এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করবে এবং পাঁচশত থেকে এক হাজার বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর যিকির করবে। লা-ইলাহা বলার সময় ঘাড় ডান দিকে ঘুরাবে এবং এই ধ্যান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে অন্তর থেকে বের করে দিলাম। অতঃপর ইল্লাল্লাহ বলার সময় বাম স্তনের সামান্য নিচের দিকে খেয়াল করে মাথা সেদিকে স্বজোরে ঝুকাবে আর ধ্যান করবে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত অন্তরে গেঁথে দিলাম। এরূপ খেয়াল করা দ্বারা মনের উপর আছর পড়বে। মনের উপর গভীর খেয়ালের আছর হয়ে থাকে– এটা পরীক্ষিত বিষয়।



৪. দোযখের বর্ণনা এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কারণে আল্লাহ কিরূপ অসন্তুষ্ট হন– এ জাতীয় বর্ণনা যে কিতাবে আছে এমন কোন কিতাব বা হাদীছের গ্রন্থ পাঠ করবে।

৫. একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে বসে এ চিন্তা করবে যে, আমি কিয়ামতের ময়দানের আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান রয়েছি আর আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়ে বলছেন, "হে বেহায়া, বেশরম! তোমার লজ্জা হয় না, আমাকে ছেড়ে একটা মুরদার দিকে ঝুঁকে পড়লে? এর জন্য তোমাকে আমি পয়দা করে ছিলাম? বেহায়া, আমার দেয়া চোখ আমার দেয়া অন্তরকে তুমি আমার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করলে? তোমার শরম হয় না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

**বি. দ্র.** এসব আমল করতে থাকবে, ফল পেতে দেরী হলেও পেরেশান হবে না। চেষ্টাতেও তো ছওয়াব পাওয়া যাবে।

## কয়েকটা বদ অভ্যাস ও পাপ এবং তা বর্জনের উপায়

### গান-বাদ্য শ্রবণ

আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, সহীহ ইব্‌নে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীছে গান-বাদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। কুরআন শরীফেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোনো পাপ-পঙ্কিলযুক্ত না হয় তাহলে তা জায়েয। যদি কেউ গান-বাদ্য শ্রবণের বদ অভ্যাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হল–

১. গান-বাদ্যের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ থেকে থাকে, এ আকর্ষণ সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়া স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব। তবে মনে চাইলেই ইচ্ছাকৃতভাবে মনের চাহিদার বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে কষ্ট হলেও কারও তাড়াতাড়ি বা কারও ধীরে ধীরে সেই চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. গান-বাদ্যের উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, গান-বাদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কিত দলীল-প্রমাণ জানতে চাইলে আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন।

## অশ্লীল উপন্যাস, কবিতা ও নভেল নাটক পাঠ

অনেক যুবক-যবতী অশ্লীল উপন্যাস, নভেল-নাটক, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠের বদ অভ্যাসে অক্রান্ত। এসব বিষয়ও নিষিদ্ধ। এ সবের বদ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে মনের চাওয়ার বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এসবের উপকরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিছু দিন এরূপ করলেই মনের এসব চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

## সিনেমা, বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন

এগুলোর মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ রয়েছে। (১) সময় নষ্ট (২) সম্পদ নষ্ট (৩) স্বভাব-চরিত্র নষ্ট (৪) স্বাস্থ্য নষ্ট (৫) ঈমান ও আমল নষ্ট। যদি নারী চরিত্র ও অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করা হয়, তাহলে তার মধ্যে এতগুলো পাপ থাকবে না শুধু জীবের ছবি তোলার পাপ থাকবে। আর জীবের ছবিও বাদ দিয়ে শুধু সু-শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করা হলে তাতে কোনো পাপ থাকবে না। সিনেমার পার্ট ও প্লে করা, এর ব্যবসা করা এবং এডভারটাইজ করা সবই কবীরা গুনাহ। সিনেমা বাইস্কোপ দেখার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

## মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতির নেশা

শরীআতে এসব নেশাকর দ্রব্য সম্পূর্ণ হারাম, অল্প হোক চাই বেশি হোক। এ সবের শারীরিক, আত্মিক, নৈতিক, আর্থিক ও জাগতিক বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতির কারণেই শরীআত এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। এ সবের বদ-অভ্যাসে কেউ জড়িত হয়ে পড়লে তা ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করলে ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

১. প্রথমত এসব নেশার মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করাতে হবে এবং তার মনে এর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

২. যেকোনো নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তা থেকে বেরিয়ে আনতে হবে।



৩. তার কাছ থেকে নেশার উপকরণ, পাত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি দূরে সরিয়েদিতে হবে বা তাকে নেশাটির উপকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যতদিন পর্যন্ত তার মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়।

৪. সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে– নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে। (بضوء معارف القرآن و فتح الملهم)

## বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ও তামাক সেবন

বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ইত্যাদি ধুমপান ও তামাক সেবন মাকরূহ তানযীহী। আর এগুলোর দুর্গন্ধ মুখে থাকা অবস্থায় মসজিদে গমন করা হারাম। (فتاوی رشیدیہ) ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫ম খণ্ডে বলা হয়েছে, তামাক যদি নেশাযুক্ত হয় তাহলে নিষিদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত হলে মাকরূহ, অন্যথায় জায়েয।

বিড়ি সিগারেট প্রভৃতির বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য। যথা:–

১. প্রথমত এসব নেশার মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো নেশাখোর ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করাতে হবে এবং তার মনে এর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

২. যেকোনো নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

৩. তার কাছ থেকে নেশার উপকরণ, পাত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি দূর করে দিতে হবে বা তাকে নেশার উপকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যত দিন তার মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়।

৪. সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে– নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে।

## অপব্যয় (تبذیر)

শরীআতের আলোকে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষেধ সে ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বলা হয় তাব্‌যীর বা অপব্যয়। কুরআনে কারীম অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করেছে। অপব্যয় করা গোনাহে কবীরা।

## অমিতব্যয় (اسراف)

যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েয সেসব ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকে বলা হয় এছরাফ বা অমিতব্যয়। এটা শরীআতে নিষিদ্ধ। এটাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘন বা অতিরিক্ত ব্যয় বলেও আখ্যায়িত করা যায়। 'প্রয়োজন' বলতে বোঝায় এতটুকু পরিমাণ, যা না হলে কোন দ্বীনের কাজ বা দুনিয়ার কাজ করা সম্ভব হয় না বা অত্যন্ত কষ্ট ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় কল্পিত প্রয়োজনকে আমরা জরূরত বা প্রয়োজন মনে করে বসি; অথচ সেটা জরূরত বা প্রয়োজন নয় বরং তা হল খাহেশাত বা লোভ। প্রয়োজন ও খাহেশাতের মধ্যে পার্থক্য বোধ রাখতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বত এবং লোভ প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা, অমিতব্যয়ের বদ অভ্যাস প্রতিকারের জন্যও তাই গ্রহণ করতে হবে। (দেখুন ৬২৪ নং পৃষ্ঠা)

## যেনা (ব্যভিচার)

যেনা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। এটা অতি জঘন্য কবীরা গোনাহ। বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে এবং তা স্বীকার করলে অথবা চার জন সত্যবাদী চাক্ষুস সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হলে তার শাস্তি পাথর মেরে প্রাণ বধ করে ফেলানো। আর অবিবাহিত অবস্থায় অনুরূপভাবে যেনা প্রমাণ হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। তবে উল্লেখ্য যে, একমাত্র শরঈ কাজীই এ শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

### যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যা যা করতে হবে তা হল−

১. যেনার উপসর্গ যেমনঃ প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, গায়র মাহরামের সঙ্গে নির্জন বাস, পর্দা লংঘন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।
২. যেনার কারণে জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি হবে তা স্মরণ করা।
৩. একথা স্মরণ করা যে, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন, আমার এ অবস্থাও তিনি দেখবেন এবং কোনো মানুষ এখন না দেখলেও কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনে এটা প্রকাশ করে দেয়া হবে। তখন শরমের অন্ত থাকবে না।
৪. বিয়ে না করে থাকলে বিয়ে করে নেয়া, না পারলে রোযা রাখা। আর স্ত্রী থাকার পরও কোন নারীর প্রতি খাহেশ হলে এই চিন্তা করা যে, তার যা আছে আমার স্ত্রীরও তো তা আছে, তাহলে অহেতুক কেন তার প্রতি ঝুঁকতে হবে?



৫. যেনার খাহেশ প্রবল হলে নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়ে শরীরে ফুঁক দিবে।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

৬. যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে বা যে পরিবেশে যেনার সুযোগ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।
৭. যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে তার সম্বন্ধে চিন্তা করবে যে, সে অত্যন্ত কুৎসিত, বিশ্রী চেহারার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি। এতেও মন থেকে তার সংগে যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেতনা হ্রাস পাবে।
৮. যেসব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিংবা যা পড়লে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা যেনার মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকা।

## হস্তমৈথুন

হস্তমৈথুন করা মহাপাপ। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ২, ৩ ও ৮ নং পন্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব যুবক এ রোগে আক্রান্ত তারা এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার রচিত "যদি জীবন গড়তে চান" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট শিরোনামের আলোচনা পড়ে নিন।

## বালক মৈথুন

বালকের সাথে কুকর্ম করা যেনার চেয়েও বড় পাপ। এ জন্যই বালকের সাথে কুকর্মকারীর শাস্তি বলা হয়েছে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া।

যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেসব পন্থা গ্রহণীয়, বালক মৈথুন থেকে পরিত্রাণের জন্যও সেসব পন্থা গ্রহণীয়।

## বদ নজর

গায়র মাহরাম মহিলার দিকে নজর করা বা শ্মশ্রুবিহীন বালকের দিকে খাহেশাতের দৃষ্টিতে তাকানো হল বদ নজর। বদ নজর দ্বারা কলব অন্ধকার হয়ে যায়, ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এতে নজরের যেনা হয়। আবার তাকে নিয়ে কোন পাপের চিন্তা করলে মনের যেনা হয়। অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তাতে কোন পাপ নেই, কিন্তু তারপর ইচছাকৃতভাবে

দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করলে বা বারবার দেখলে পাপ হবে। এই বারবার কিংবা দীর্ঘক্ষণ দেখতে চাওয়া মূলত মনের একটা রোগ বিশেষ।

**বদ নজর রোগ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলঃ**

১. এ চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার মনের অবস্থা দেখছেন এবং কিয়ামতের দিন এ নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে এবং এই পাপের দরুন জাহান্নামের আযাব হবে।

২. এই চিন্তা করবে যে, আমার আপনজনকে কেউ এভাবে দেখলে তো আমার অপছন্দ লাগে, তাহলে আমার দেখাটা কি তাদের অপছন্দনীয় নয়?

৩. এরপরও তাকে সুন্দর মনে হলে এবং নজর দিতে মনে চাইলে তাকে কুৎসিত কল্পনা করবে।

৪. হিম্মত এবং এরাদা করা যে, এ থেকে বিরত থাকব। আর হঠাৎ নজর পড়ে গেলে তার থেকে নজর ফিরিয়ে নিলে কলবে নূর পয়দা হয়– এই ফিকির রাখা।

## গীবত (অপরের দোষ চর্চা)

হেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে কারও প্রকৃত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বুহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোশাক- পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। মুখে বলা দ্বারা যেরূপ গীবত হয়, তেমনি অঙ্গভঙ্গী এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও গীবত হয়। গীবত যেমন জীবিত মানুষের হয় তেমনি মৃত মানুষেরও হয়। ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দোষ চর্চাই গীবত।

গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুতর কবীরা গোনাহ। অবশ্য ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের যে দোষ বর্ণনা করতে হয়, কিংবা কাউকে অপরের দ্বীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্থদেরকে শাসন করানোর জন্য যে দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হয় তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্বেচ্ছায় এবং মনোযোগ সহকারে গীবত শ্রবণ করাতেও গীবতের গোনাহ হয়। কারও গীবত করে ফেললে নিজে এস্তেগফার করা, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য এস্তেগফার করা এবং সম্ভব হলে ও সংগত



মনে করলে তার নিকট ওজরখাহী করা উচিত। এভাবেই গীবতের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দাও, না পারলে সে মজলিস ত্যাগ কর, না পারলে সে কথা থেকে মনোযোগ হটিয়ে মনে মনে অন্য কিছু ভাবতে বা পড়তে থাক।

**গীবত শোনার পর যে কয়টা কাজ করা উচিতঃ**

১. এ শোনা কথা অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

২. যার দোষ শোনা হল তার দোষ খুঁজতে শুরু না করা।

৩. তার উপর বদগোমানী না করা।

৪. পারলে গীবতকারীকে এই গীবতের অভ্যাস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া।

৫. প্রয়োজন মনে করলে আসল ব্যক্তির থেকে জেনে নেয়া যে, ব্যাপারটা কতদূর সত্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গীবতকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয়।

**গীবতের বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য করণীয় হলঃ**

১. কারও গীবত করে ফেললে তার প্রশংসা করা।

২. তার জন্য দুআ ও এস্তেগফার করা।

৩. তাকে এ বিষয়টা জানিয়ে দিয়ে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে জানাবে না।

৪. কারও সম্পর্কে কিছু বলতে মনে চাইলেও চিন্তা করে নেয়া যে, এটা গীবত হয়ে যাচ্ছে না তো? যদি গীবতের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তা না বলা।

৫. গীবত হয়ে গেলে নিজে তওবা-এস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করা।

৬. গীবত কখনো ক্রোধ থেকে করা হয়, কখনও অহংকারের কারণে হয়, কখনও সম্মানের মোহ থেকে হয়, আবার কখনও হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য হয়ে থাকে। যে কারণে গীবত হয় সে কারণের চিকিৎসা করা দরকার।

## চোগলখোরী (কোটনাগিরি)

চোগলখোরী অর্থ কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেয়া, যা সে তার কাছে গোপন করতে ও গোপন রাখতে চায় এবং

তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে অপছন্দ করে। এটা কোন দোষের কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখোরীর সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে, তাহলে তা একই সঙ্গে দুটো পাপের হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। চোগলখোরী করা কবীরা গোনাহ, যা মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক ফ্যাসাদ ঘটায়।

### তোষামোদ বা চাটুকারিতা

তোষামোদ বা চাটুকারিতা হল নিজের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে অন্যকে খুশী করার জন্য নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের বিপরীতে তার প্রশংসা করা। এটা এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা। পক্ষান্তরে পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলের সাথে স্বচ্ছ ও খোলা মন নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে মনের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করাকে বলা হয় বাস্তববাদিতা বা স্বচ্ছতা। তবে স্বচ্ছতা বা বাস্তববাদিতার অর্থ আদৌ এই নয় যে, সব সত্য কথা সব স্থানে প্রকাশ করে দিতে হবে। বরং অনেক স্থানে বলার চেয়ে চুপ থাকাটাই শ্রেয় হতে পারে। বিনা প্রয়োজনে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানবে বা অন্যকে বিব্রত করবে– এরূপ কথা বলাকে বাস্তববাদিতা আখ্যা দেয়া যাবে না। কিংবা বাস্তববাদিতার দোহাই দিয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা গেয়ে বেড়ানো বা আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়াও সমীচীন নয়। বাস্তববাদিতার অর্থ হল– যতটুকু বলতে হবে তা যেন অবশ্যই বাস্তবানুগ হয় এবং তাতে কোনোরূপ কপটতা না থাকে।

তোষামোদ বা চাটুকারিতা যে প্রতারণা, কপটতা ও পাপ– এই চেতনা মনে বদ্ধমূল রাখলে তোষামোদের মনোবৃত্তি অবদমিত হবে।

### গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা

যেটা প্রকাশ করতে মানুষ শরম বোধ করে, এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয় গালি বা অশ্লীল কথা। আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। কাউকে গালি দেয়া হারাম, এমনকি কাফের বা জীবজন্তুকেও। (شریعت و طریقت)

মিথ্যা ও বেশি কথা বলার বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য যে চিকিৎসা এর চিকিৎসাও অনুরূপ। (দেখুন ৬৪১ পৃষ্ঠা।)



### রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা

কারও চলা-ফেরা, উঠা-বসা, বলা, গঠন-আকৃতি ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের দোষ এমন ভাবে প্রকাশ করা যে মানুষের হাসির উদ্রেক করে, কিংবা কাউকে লোক সমক্ষে হেয় করাকে বলা হয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। শরীআতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ এমন রসিকতাও শরীআতে নিষিদ্ধ যাতে কেউ মনে কষ্ট পায়। রসিকতা শরীআতে জায়েয, যদি রসিকতার মধ্যে অবাস্তব কিছু বলা না হয় এবং শ্রোতার মনে আঘাত না লাগে। যে রসিকতা দ্বারা শ্রোতার অন্তরে আঘাত লাগা নিশ্চিত, সেরূপ রসিকতা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। (شریعت و طریقت)

রসিকতাকে অভ্যাস বানানো ঠিক নয়, মাঝে মধ্যে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে করা যেতে পারে। এ রোগের চিকিৎসাও পূর্বে উল্লেখিত রোগের চিকিৎসার ন্যায়।

### রুক্ষ কথা বলা

কথা নরমে এবং মিষ্টভাবে বলা শরীআতের কাম্য। এমনকি হক কথাও এমন রুক্ষভাবে বলা ঠিক নয় যাতে শ্রোতার মনে আঘাত লাগে। কারণ তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। অনেক সময় রুক্ষ কথা স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকে, আবার বদ-অভ্যাসের কারণেও হয়। স্বভাবের তো পরিবর্তন হয় না, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করলে অভ্যাসগত কারণে হয়ে থাকলে তার পরিবর্তন হবে এবং স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকলেও কিছুটা মার্জিত হবে।

১. কথা বলার সময় এই অভ্যাসটা ক্ষতিকর– এই ভেবে লৌকিকতা করে হলেও নরমে এবং মিষ্টভাবে বলার চেষ্টা করা।
২. হক কথা কারও কাছে তিক্তবোধ হলেও বলব– এই মনোভাব যখন আসবে, তখন সে হক কথা তখনই বলার একান্ত প্রয়োজন হলে নিজে না বলে অন্যের দ্বারা বলাবে, আর তখনই বলার আবশ্যকতা না থাকলে কিছুদিন সে নছীহত করা ও এরূপ কথা বলা বন্ধ রাখবে। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে তবীয়তে ভারসাম্য পয়দা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

### মিথ্যা বলা

যেটা বাস্তব নয় এরূপ কথা হল মিথ্যা। মিথ্যা বলা গোনাহে কবীরা। তাহকীক-তদন্ত ও যাচাই না করেই কোন কথা বর্ণনা করা বা তাহকীক ছাড়াই যেকোনো কথা শুনে তা বলে দেয়াও মিথ্যা বলার মত গোনাহ।

তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কোন কথা জানলে তা তাহকীক ছাড়াই বলা ও বর্ণনা করা যায়। চারটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম ও গোনাহে কবীরা এবং হাদীছে মিথ্যাকে গোনাহের মাতা অর্থাৎ, বহু গোনাহের জন্মদাত্রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যে চারটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অবাস্তব বলার অনুমতি রয়েছে, তা হল–

১. বিবদমান দুইজন বা দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ নিরসন ও মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।
২. স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে।
৩. যুদ্ধের সময় যুদ্ধের কৌশল হিসাবে। তবে কেউ কেউ এ ক্ষেত্রেও সরাসরি মিথ্যা না বলে প্রকৃত সত্য উহ্য থাকে এমনভাবে কিছু ইংগিত করে দেয়ার কথা বলেছেন।
৪. নিজের হক উদ্ধার বা বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ৪৭৫ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন ।

মিথ্যা বলার বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য একটা জিনিসেরই প্রয়োজন, আর তা হল "ইচ্ছা"। প্রত্যেকটা কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা যে, এটা মিথ্যা নয়তো? হলে তা বর্জন করা। এভাবেই মিথ্যা বর্জনের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

## বেশি কথা বলা

দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বেশি কথা বলাও একটা বদ অভ্যাস। প্রয়োজনীয় কথা হল: (এক) যা নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে বলা হয়। (দুই) যা গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়। (তিন) যা না বললে পার্থিব ক্ষতি হয়।

বেশি কথা বলা দ্বারাও মানুষ শত শত গোনাহে লিপ্ত হয়। যেমন: মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়ায়ী বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেয়া, কারও সাথে অহেতুক তর্ক জুড়ে দেয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীত কম কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই কম কথা বলা ভাল। বেশি বলার রোগের চিকিৎসা হল–

১. কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে নেয়া যে, ছওয়াবের বা দরকারী হলে বলা আর অনুরূপ না হলে বর্জন করা।
২. ভিতর থেকে নফ্স বলার জন্য খুব বেশি তাগাদা করলে তাকে এই বলে বোঝানো যে, এখন চুপ থাকতে যে কষ্ট, তার চেয়ে বেশি কষ্ট হবে



দোযখের আযাবে। একান্তই না বলে থাকতে না পারলে অল্প বলে চুপ হয়ে যাবে। এভাবে কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।
৩. একান্ত জরূরত না হলে কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না।

## খেলাধুলা করা ও দেখা

যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার লক্ষ্যে হয়, সে খেলা শরীআত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি করা না হয়, শরীআতের কোনো হুকুম লংঘন করা না হয় এবং তাতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম বিঘ্নিত না হয়। পক্ষান্তরে যে খেলায় কোনো ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা নেই, কিংবা যে খেলায় শরীআতের বিধান লংঘন হয় যেমন: সতর খোলা হয়, বা যাতে মত্ত হয়ে নামায রোযা ইত্যাদি ফরয কর্ম বিঘ্নিত হয় অথবা জুয়ার ভিত্তিতে হার-জিতে যে সকল প্রকার খেলা হয়ে থাকে সেগুলো শরীআতে নিষিদ্ধ– কতক পরিষ্কার হারাম আর কতক নিষিদ্ধ।

খেলাধুলা করার ও দেখার বদ অভ্যাসে যারা অভ্যস্ত তাদের এই বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

১. মনে চাইলেও ইচ্ছাকৃত তা থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. খেলাধুলার আলোচনা করা ও আলোচনা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৩. খেলাধুলার উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিছুদিন এরূপ করলে মন থেকে খেলাধুলার আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকবে।

## কয়েকটা খেলা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা

### দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা

এ জাতীয় খেলা হারাম। কেননা এসবে অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে, ফলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর বাজি ধরা না হলেও অনর্থক বিধায় তা নিষিদ্ধ।

### তাশ, পাশা, চৌদ্দগুটি ইত্যাদি

এসব খেলার মধ্যে যদি টাকা-পয়সার হার জিত শর্ত থাকে তাহলে হারাম। এরূপ শর্ত না থাকলেও তাতে কোনো ধর্মগত বা স্বাস্থ্যগত উপকারিতা না থাকায় তা মাকরূহ।

## ফুটবল ও ক্রিকেট

এ খেলা শরীরের ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে খেললে জায়েয, যদি সতর খোলা না হয়, অতিরিক্ত সময় বা পয়সা নষ্ট না হয়, যদি নামায ইত্যাদি জরুরি কাজকর্ম ও ইবাদত নষ্ট না হয়। এ খেলাতেও টাকা-পয়সার হার জিত শর্ত থাকলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে উল্লেখ্য যে, যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়, যেমন: যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে আর এতে যদি চাঁদা নেয়া না হয় তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।

ক্রিকেট খেলা জায়েয নয়। কারণ, এতে শারীরিক ক্ষতি বা অঙ্গহানির আশংকা বিদ্যমান।

## কেরাম বোর্ড, ফ্লাস ও ঘোড় দৌড়

এ সবের মধ্যে বাজি রাখা হলে হারাম, আর তা না হলে মাকরূহ তাহরীমী।

(معارف القرآن –هداية ج/٤ ও বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।)

**বি. দ্র.** বর্তমান যুগে খেলাধুলার জন্য যেরূপ অতিরিক্ত আড়ম্বর করা হচ্ছে, সময় নষ্ট করা হচ্ছে, সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। (فروع الايمان)

## জুয়া

জুয়া বলা হয় এমন লেন-দেনকে, যেখানে কোন মালের মালিকানা এমন সব শর্ত-নির্ভর হয় যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে; যার ফলে পূর্ণ লাভ বা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই থাকে– কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায়, অনেকে কিছুই পায় না।

শরীআতে সব ধরনের জুয়াই হারাম। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারী জুয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম। কেননা এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে, ফলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

তাশ খেলাতে যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, অর্থাৎ, বাজি ধরা হয়, তবে তাও হারাম ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

খেলাধুলা করা ও দেখার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের যে পন্থা, জুয়ার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্যাণের জন্যও সেসব পন্থা গ্রহণীয়। দেখুন পূর্বের পৃষ্ঠা।



# কয়েকটি উত্তম চরিত্র

## সততা ও সত্যবাদিতা

ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন মো'আমালা-মো'আশারা যাবতীয় ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও সততার উপর টিকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং এর বিপরীত মিথ্যাকে করা হয়েছে হারাম। মিথ্যাচারিতার পরিণাম হল ধ্বংস ও ব্যর্থতা।

## আমানতদারী

আমানতদারী হল সততা ও সত্যবাদিতার একটি বিশেষ অংশ। মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করা যেমন আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোন গোপনীয় কথা জানালে বা কোনোভাবে কারও কোন গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শরীআতের যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা সমুদয় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত। তার হক আদায় করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। টাকা-পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি যেকোনো আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

## সদ্ব্যবহার

ইসলাম আপন-পর, ছোট-বড় মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে, এমনকি অবলা প্রাণীর সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। কারও সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল তার সাথে যা করণীয় তা করা এবং তার হক বা অধিকার আদায় করা। তাই পিতা-মাতার অধিকার থেকে শুরু করে জীব-জন্তুর অধিকার পর্যন্ত সবকিছু রক্ষা ও আদায় করা এই সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। (দেখুন ৪৩৫ পৃষ্ঠা থেকে ৪৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।) মনকে সকলের অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করে তুললেই সদ্ব্যবহার গুণ অর্জিত হবে।

## আত্মীয়তা রক্ষা করা

আত্মীয়তা রক্ষা করার কি অর্থ এবং আত্মীয়তা রক্ষার জন্য কি কি করণীয় এ সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন "আত্মীয়-স্বজনের অধিকার" পৃষ্ঠা নং ৪৫৬।

## অতিথি পরায়ণতা

অতিথি পরায়ণতা মূলত একটি মনের চরিত্র। মেহমানকে শুধু পর্যাপ্ত আপ্যায়ন করানোর নাম অতিথি পরায়ণতা নয়, বরং সাধ্য অনুযায়ী মেহমানকে আপ্যায়ন তো রয়েছে, সেই সাথে প্রফুল্লচিত্তে এবং বিকশিত মনে মেহমানকে গ্রহণ করা ও তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করাই হল সত্যিকার অতিথি পরায়ণতা।

মেহমান এলে আমার পানাহারে শরীক হবে, আর্থিক ক্ষতি হবে, ঝামেলা বাড়বে– এরূপ দুঃশ্চিন্তা মনকে বিকশিত হতে দেয় না, আর এটাই অতিথি পরায়ণতা গুণ সৃষ্টি হওয়ার অন্তরায়। পক্ষান্তরে যদি কেউ চিন্তা করে যে, তাকদীরের বিশ্বাস অনুসারে মেহমান তারই হিস্যা ভোগ করবে, আমার নয়, তদুপরি আমি মেজবানের প্রতি মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে, তাহলে আতিথ্যের জন্য মন আর সংকুচিত হবে না বরং বিকশিত হবে এবং তখনই সৃষ্টি হবে অতিথি পরায়ণতা চরিত্র। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, অবশ্যই তোমার প্রতি তোমার মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে।

## ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা

ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। হৃদয়ের যে কমনীয়তা, মাধুর্য, আবেগ, অনুরাগ ও অনুগ্রহ; ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে স্নেহ-মমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে প্রেম ভালবাসা বলে ব্যক্ত করা হয়, আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি সেটাকে নিবেদন করা হলে তা ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর এসব অনুভূতি যখন আপনজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনীন মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে নিবেদিত হয় তখন তাকে বলা হয় সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আর শুধু মুসলমানদের প্রতি নিবেদিত হলে সেটাকে বলা হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামে স্নেহ-মমতা ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব এত বেশি যে, কারও মধ্যে এ গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে, সমস্ত মুসলমান একটা দেহের ন্যায়, একটা দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয় তাহলে



অন্যান্য অঙ্গ যেমন তা উপলব্ধি করতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এরূপ একাত্মতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত, সকলেই এক আল্লাহ্র বান্দা, সকলেই এক আদমের সন্তান– মনের মধ্যে এই উপলব্ধি বদ্ধমূল ও উজ্জীবিত থাকলে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহমর্মিতা বোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর। (বোখারী ও মুসলিম)। হাদীছে আরও ইরশাদ হয়েছে, তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা বলে ভ্রাতৃত্ববোধকে উদ্বেলিত করা হয়েছে।

## ত্যাগ ও বদান্যতা

ত্যাগ হল কৃপণতার বিপরীত এবং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়। আর বদান্যতা অর্থ দানশীলতা। দানশীলতার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা:

১. নিজের প্রয়োজন পূরণে যেন কোনোরূপ ব্যাঘাত না ঘটে– এই পরিমাণ অন্যের জন্য খরচ করা।

২. অন্যকে এই পরিমাণ দান করা যার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কিছুটা কম নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে।

৩. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া। এই শেষোক্ত পর্যায়টিকে বলা হয় ত্যাগ।

ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে এবং কৃপণতা বা বখীলীর চেতনা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ ও কৃপণতার বিপরীত প্রেরণা লাভ করতে হবে এবং সুন্দর চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ সৃষ্টি করতে হবে। (নীতিদর্শন গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## উদারতা

ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন স্বার্থের চিন্তায় মনের বিকশিত হওয়াকে বলা হয় উদারতা। উদারতার বিপরীত চরিত্রকে বলা হয় সংকীর্ণতা। চিন্তার সংকীর্ণতা বহু ধরনের পংকিলতার উৎস হয়ে থাকে। সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হয় না। এরূপ মানসিকতা মানুষের জ্ঞানকে পক্ষপাতগ্রস্থ ও অনুভূতিহীন করে ফেলে। এই সংকীর্ণ মন- মানসিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষ আমিত্বকে নিয়েই ব্যস্ত

থাকে। ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে সে কিছু চিন্তা করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য কোন বিরাট অবদান রাখতে পারে না। এই উদারতা না থাকার ফলে ক্ষমা, দয়া, আত্মত্যাগ প্রভৃতি বহু গুণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায়। এদিক থেকে চিন্তা করলে উদারতা এমন এক চরিত্র যা বহু চরিত্রের উৎসমূল। আমি শুধু আমার জন্য নই, আমার সবকিছু শুধু আমারই জন্য নয়, বরং আমি পূর্ণাঙ্গ সমাজদেহের একটি অংশ মাত্র– এরূপ চিন্তা অর্থাৎ, চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করা উদারতা সৃষ্টির সহায়ক হয়ে থাকে। তদুপরি উদার মানুষের সাহচর্য এবং এমন মহামনীষীদের জীবনী পাঠও উদারতার মনোভাব জাগ্রত করে থাকে, যারা আত্মত্যাগ ও সার্বজনীন সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

## হায়া বা লজ্জাশীলতা

নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কোন দূষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়ত্ববোধ হয়ে থাকে সেটাকে বলে হায়া বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যেই হাদীছে বলা হয়েছে, লজ্জা কেবল সুফল ও কল্যাণই বয়ে আনে। (বোখারী ও মুসলিম)। এর বিপরীত লজ্জা না থাকলে মানুষ যেকোনো অন্যায় কাজই করতে পারে। তাই প্রবাদ আছে, যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তাই কর।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তাবোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ বলে আখ্যায়িত হবে না। যেমন– পর্দা করতে বা দাড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তাবোধ হল, এটা লজ্জা বা হায়া নয় বরং এটা হল ধর্মীয় হীনম্মন্যতাবোধ। এমনিভাবে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে প্রকাশ করা, যেখানে সেখানে চুপ করে থাকা এবং হীনতা প্রকাশ করা এটাও লজ্জা বা হায়া বলে প্রশংসিত হবার নয় বরং এটা হল স্বাভাবগত দুর্বলতা।

যদি কেউ দৈহিক ও আত্মিক শক্তিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং পানাহারের চাহিদা ও আত্মিক কামনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে, তাহলে তার মধ্যে লজ্জার যথার্থ বিকাশ ঘটবে। (أدب الدنيا والدين)

**বড়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা:** এর জন্য দেখুন ৪৫২ পৃষ্ঠা।

**ছোটদের স্নেহ করা:** এর জন্য দেখুন ৪৫৩ পৃষ্ঠা।



## ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন

বিপদ-আপদে মানুষের প্রতি দয়া করা এবং অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না", "যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে না আল্লাহও তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না।" এখানে ক্ষমা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও যে পরিমাণ জুলুম কেউ করে ততটুকুর প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া জায়েয, তবে উত্তম হল প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া। উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা করার প্রশ্ন ব্যক্তিগত হক নষ্ট করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কেউ দ্বীনের হক নষ্ট করলে যেমন: মুরতাদ হয়ে ধর্মের অবমাননা করলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। এমনিভাবে বিচারক আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করবেন, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন না। কারণ সেটা তার ব্যক্তিগত হক নষ্ট হওয়ার সাথে জড়িত বিষয় নয়।

দয়া শুধু মুসলমানদের প্রতি নয় বা আপনজনদের প্রতি নয়। আপন-পর, শত্রু-বন্ধু, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি এমনকি অবলা জীব- জন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শনের আদর্শ ইসলামে রয়েছে। এই দয়া যেমন পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্য হবে, তেমনি পরকালীন কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্যও দয়া প্রদর্শিত হতে হবে। ঈমানহীনের ঈমান এবং আমলহীনের আমল পয়দা করার জন্য মনের পেরেশানীও তাই বড় দয়া বলে গণ্য।

## ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতা

যার যা হক ও প্রাপ্য তাকে তা যথাযথভাবে দেয়াকে বলা হয় ইনসাফ বা ন্যায় পরায়ণতা। আর তার চেয়ে কম করা হল জুলুম বা অবিচার। ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায্য বিচারের গুরুত্ব এত বেশি যে, অমুসলিমদের সাথেও তা রক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। জুলুম ও অবিচারকে হারাম করা হয়েছে। ফয়সালার ক্ষেত্রে নিজের ও অন্যের মধ্যে ব্যবধান করার তথা পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইনসাফ করতে হবে, যদিও তা আপনজনের বিরুদ্ধে চলে যায়।

## অঙ্গীকার রক্ষা করা

অঙ্গীকার রক্ষা করা তথা ওয়াদা খেলাফ না করা সততারই অংশ বিশেষ। অঙ্গীকার রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি বালক বা শিশুকে সান্ত্বনা

দেয়ার জন্য কোনো কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করলেও তা পূরণ করা জরুরি। পূরণ করার নিয়ত না থাকলে অঙ্গীকার করবে না। তবে কোন পাপ কাজের অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা যাবে না। অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হযরত রসূল (সা.) তাঁর ভাষণে প্রায়ই বলতেন, যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বিষয়ে যত্নবান নয়, দ্বীন ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশ নেই।

### পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পাক-ছাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। এজন্যই ইসলাম শরীর, কাপড়-চোপড়, ঘড়-বাড়ির আঙ্গিনা ইত্যাদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শরীরের অবাঞ্ছিত পশম নিয়মানুযায়ী কেটে বা উপড়ে ফেলা, খতনা, করা, নখ কাটা, মোচ কাটা এসবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আওতাভুক্ত। এসব হল জাহিরী অর্থাৎ, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। এর সাথে রয়েছে বাতিনী অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার দিক। মনের রোগ থেকে নফ্স ও আত্মাকে এবং কুচরিত্র থেকে আখলাককে পবিত্র করার মাধ্যমেই এ দিকটি অর্জিত হবে।

**আমর বিলমা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারঃ** এর জন্য দেখুন ৪৭৭ পৃষ্ঠা।

### আধ্যাত্মিক সংশোধন ও আমল-আখলাক হাছিলের জন্য পীর বা শায়খে তরীকতের প্রয়োজন প্রসঙ্গ

নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত প্রভৃতি শরীআতের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরুরি তেমনিভাবে এখলাস, আল্লাহ্‌র মহব্বত, রেজা, প্রভৃতি কলবের গুণাবলী হাছিল করা এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা বাতিনী বিধানের উপর আমল করাও জরুরি এবং ওয়াজিব। এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্‌কিয়া, এসলাহে বাতেন বা রূহানী এসলাহ। ফতওয়ার ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা বলা হয় না যে, পীর ধরা ফরয বা ওয়াজিব। তবে তায্‌কিয়া বা এসলাহে বাতেন ওয়াজিব। সাধারণভাবে যেহেতু উস্তাদ বিহনে কোন শাস্ত্র সঠিকভাবে আয়ত্ত করা যায় না এবং পথ প্রদর্শক ছাড়া পথ চলা যায় না বা চলা গেলেও বিপথগামী হওয়ার ও ভুলপথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া রোগ নির্ণয় করা যায় না বা করা সম্ভব হলেও নিজে নিজে চিকিৎসা করতে যাওয়াতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়– এসবের ভিত্তিতে



একজন সঠিক উস্তাদ, একজন সঠিক পথ প্রদর্শক ও একজন অভিজ্ঞ রূহানী চিকিৎসক হিসাবে পীর বা শায়খে তরীকতের সহযোগিতা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন– হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলমানের খায়েরখাহী করা, ধর্ম সম্বন্ধে কারও নিন্দাবাদ গালির পরওয়া না করা, কারও সামনে হাত না পাতা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বায়আত গ্রহণ করেছেন। এসব দলীলের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বায়আতে সুলূক (অর্থাৎ পীরের হাতে বায়আত) সুন্নাত। এক সময় খেলাফতের বায়আতের সাথে গোলমাল না হয় এই ভয়ে সালাফে সালেহীন (পূর্বসূরীগণ) বায়আতে সুলূক বাদ দিয়ে শুধু ছোহবতের উপর ক্ষান্ত করেন। আবার বায়আতের পরিবর্তে খের্কার রছমও জারী হয়। পরে যখন খেলাফতের বায়আতের সাথে গোলমালের আর কোনো ভয় না থাকে, তখন সুফিয়ায়ে কেরাম আবার এই মুরদা সুন্নাত যিন্দা করেন।

পীর বা শায়খে তরীকত মুরীদকে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম পালন এবং তাঁর জাহিরী বাতিনী ভুল-ত্রুটি সংশোধনের পন্থা বাতলে দিবেন এবং মুরীদ সে অনুযায়ী চলে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করবে। এই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর রেজামন্দী হাছিল করা তথা আল্লাহ্‌কে পাওয়াই হল পীর-মুরীদী ও ফকীরী-দরবেশী শিক্ষা করার আসল উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে, যেমনঃ মুরীদ হলে নানা রকম কারামত লাভ করা যাবে বা পীর সাহেব কিয়ামতের দিন পার হওয়ার ব্যবস্থা করবেন বা পীর তাওয়াজ্জুহ দিয়ে সব ঠিক করে দিবেন বা পীরের থেকে নানান রকম তাবীয-তদবীর লাভ করা যাবে, অন্তরে জযবা এসে একেবারে মত্ত দিওয়ানা হয়ে যাবে ইত্যাদি– এসব উদ্দেশ্য ঠিক নয়, এগুলো পীর মুরীদীর উদ্দেশ্য নয়।

সারকথা, পীর-বুযুর্গের হাতে বায়আত গ্রহণ করা সুন্নাত এবং নফসের এসলাহ করা জরুরি। আর এই জরুরি দায়িত্ব পালনে হক্কানী পীরের ছোহবত ও দিক-নির্দেশনা অত্যন্ত উপকারী। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ভণ্ড ঠকবাজ পীরের হাতে বায়আত হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। হক্কানী পীর না পেলে হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে মাসলা-মাসায়েল জেনে এবং সহীহ দ্বীনী কিতাবাদী পড়ে ও জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে। হক্কানী বুযুর্গের ছোহবত লাভের সুযোগ না পেলে তাদের কিতাব ও

মালফূজাত পাঠ করেও বহু ফায়দা পাওয়া যাবে। শায়খে কামেলের অনেকটা বিকল্প হল তাঁদের কিতাব ও মালফূজাত পাঠ করা।

(তাসাউফ তত্ত্ব طریقت و شریعت، تعلیم الدین، فروف الایمان গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত।)

## কামেল ও খাঁটি পীরের আলামত

১. পীর তাফসীর, হাদীছ, ফেকাহ-অভিজ্ঞ আলেম হবেন। অন্তত পক্ষে মেশকাত শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়েছেন এতটুকু পরিমাণ ইল্‌ম থাকা আবশ্যক।

২. পীরের আকীদা ও আমল শরীআতের মোয়াফেক হওয়া দরকার এবং স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলী যেরকম শরীআত চায় সেরকম হওয়া দরকার।

৩. পীরের মধ্যে টাকা-পয়সার ও সম্মান-সুখ্যাতির লোভ থাকবে না। নিজে কামেল হওয়ার দাবি করবেন না।

৪. তিনি কোন কামেল ও খাঁটি পীরের কাছ থেকে এসলাহে বাতেন ও তরীকত হাছিল করে থাকবেন।

৫. সমসাময়িক পরহেযগার মোত্তাকী আলেমগণ এবং খাঁটি সুন্নাত তরীকার পীর মাশায়েখগণ তাকে ভাল বলে মনে করেন।

৬. দুনিয়াদার অপেক্ষা সমঝদার দ্বীনদার লোকেরাই তার প্রতি বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখে– এমন হতে হবে।

৭. তার মুরীদদের অধিকাংশ এমন যে, তারা শরীআতের পাবন্দী করে এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা কম রাখে।

৮. পীর মনোযোগ সহকারে মুরীদদের তালীম তালকীন ও এসলাহে বাতেন করান, তাদের কোনো দোষ-ত্রুটি দেখলে সংশোধন করে দেন, তাদের মতলব ও মর্জিমত স্বাধীন ছেড়ে দেন না।

৯. তার ছোহবতে কিছুদিন থাকলে দুনিয়ার মহব্বত কম ও আখেরাতের চিন্তা বেশি হতে থাকে।

১০. পীর নিজেও রীতিমত যেকের শোগল করেন। (অন্তত পক্ষে করার এরাদা রাখেন) কেননা নিজে আমল না করলে তার তা'লীম তালকীনে বরকত হয় না।

(কছদুছ ছাবীল ও তাসাউফ তত্ত্ব থেকে গৃহীত।)

**পীরের জন্য মুরীদের করণীয়ঃ** (৪৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)

**মুরীদের জন্য পীরের করণীয়ঃ** (৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)



## কয়েকটি বিশেষ আমল, যার প্রতি যত্নবান হলে অন্যান্য বহু আমলের পথ খুলে যায়

১. ইলমে দ্বীন হাসিল করাঃ চাই কিতাব পড়ে হোক অথবা উলামায়ে কেরামের ছোহবতে গিয়ে হোক। কিতাবের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উলামায়ে কেরামের ছোহবতে যাওয়া আবশ্যক। উলামা বলতে বোঝানো হচ্ছে যারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেন এবং শরীআত ও মারেফতের জ্ঞানে প্রাজ্ঞ। এরকম বুযুর্গ আলেমদের সোহবত যত বেশি লাভ করা যায় ততই মঙ্গল। যদি প্রতিদিন সম্ভব না হয়, তবে সপ্তাহে অন্তত এক/আধ ঘণ্টা বুযুর্গদের ছোহবতে থাকা দরকার। এর সুফল কিছু দিন গেলে স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন।

২. নামাযঃ যেভাবেই হোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করবে। যথাসম্ভব জামাতের পাবন্দী করার চেষ্টা করবে। এতে করে দরবারে এলাহীর সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এর বরকতে ইনশাআল্লাহ নিজের হালাত ঠিক থাকবে, অশ্লীলতা ও গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

৩. কম কথা বলা, কম মেলা-মেশা করা এবং যথাসম্ভব ভেবে-চিন্তে কথা বলারচেষ্টা করবে। হাজারো বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এটা একটা বড় উপায়।

৪. মুহাছাবা ও মুরাকাবাঃ অন্তরে সর্বদা এই খেয়াল রাখবে যে, আমি আমার মালিকের দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছি। তিনি আমার সমস্ত কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও গতি-বিধির প্রতি লক্ষ রাখছেন। এটাই মুরাকাবা। আর কোন একটা সময় নির্দিষ্ট করে নির্জনে বসে সারাদিনের আমল স্মরণ করে খেয়াল করবে যে, এখন আমার হিসাব হচ্ছে এবং আমি জবাব দিচ্ছি। এটা হল মুহাছাবা।

৫. তওবা ও ইস্তিগফারঃ যখনই কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তখন দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে নির্জন পরিবেশে সাজদায় গিয়ে ক্ষমা চাইবে, কান্না-কাটি করবে। যদি কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ছুরত ধারণ করবে। যাহোক এখানে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হল। যথাঃ উলামায়ে কেরামের ছোহবত, পাঞ্জেগানা নামায, কম কথা বলা ও কম মেলা-মেশা করা, মুহাছাবা মুরাকাবা এবং তওবা ও ইস্তিগফার। ইনশাআল্লাহ এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হলে –যা মোটেও কঠিন নয়– সমস্ত ইবাদতের দরজা খুলে যাবে।

## কয়েকটা বিশেষ গুনাহ যা থেকে বিরত থাকলে প্রায় সকল গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়

১. **গীবতঃ** সবারই জানা এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের নানা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আজকাল অনেক লোক এই রোগে আক্রান্ত। এর থেকে বাঁচার সহজ উপায় এই যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারও সম্পর্কে ভাল-মন্দ আলোচনা করবে না, শুনবেও না। নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে মশগুল থাকবে। আলোচনা করতে হলে নিজের আলোচনাই করবে। নিজের কাজই তো শেষ করা যায় না, অপরের আলোচনা করার অবকাশ কোথায়?

২. **জুলুমঃ** অন্যের জান-মালের উপর জুলুম করা, কথার দ্বারা কষ্ট দেয়া, কম হোক বেশি হোক কারও হক নষ্ট করা, কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া অথবা কাউকে বে-ইজ্জত করা– এ সবই জুলুম।

৩. **নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যদের ছোট মনে করাঃ** এ রোগ থেকেই জুলুম ও গীবত জন্ম নেয়। এছাড়া হিংসা-বিদ্বেষ এবং ক্রোধের মত নিন্দনীয় প্রবৃত্তিও এর থেকেই সৃষ্টি হয়।

৪. **ক্রোধঃ** ক্রোধে আক্রান্ত হলে পরিণামে পস্তাতে হয়। কারণ ক্রোধ অবস্থায় বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে যায়। তাই এ সময় সব কাজই হয় বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থী। মুখ দিয়ে এমন মারাত্মক কথা বের হয়ে পড়ে, অথবা হাত দিয়ে এমন অশোভন কাজ সংঘটিত হয় যা অনেক সময় মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্রোধ অবদমিত হওয়ার পর তখন আর কিছু করার থাকে না এবং তা সারা জীবন মনোপীড়ার কারণ হয়ে থাকে।

৫. **বেগানা নারী-পুরুষের সাথে যে কোন ধরনের (অবৈধ) সম্পর্ক রাখাঃ** বেগানা নারী পুরুষের সঙ্গে দেখা করা, কথা-বার্তা বলা, নির্জনে ঘনিষ্ঠভাবে বসা, অথবা তাকে খুশী করার জন্য নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা বা মোলায়েম ও মিষ্ট স্বরে কথা বলা– এসবই অবৈধ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এই অবৈধ সম্পর্ক খারাপ পরিণতি ও বিপদ ডেকে আনে।

৬. **হারাম খাওয়াঃ** এর থেকেই সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার জন্ম। কারণ, খাদ্যরস থেকে রক্ত সৃষ্টি হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং খাদ্য যে রকম হবে, সেই প্রভাব সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সৃষ্টি হবে এবং সেই ধরনের কাজই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত হবে। যাহোক ছয়টা গুনাহ



উল্লেখ করা হল। এই গুনাহ্সমূহ বর্জন করলে অন্যান্য গুনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যাবে বরং আশা করা যায় আপনা আপনিই দূর হয়ে যাবে।

(এ পরিচ্ছেদ ও পূর্বের পরিচ্ছেদ জাযাউল আ'মাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

## যিকিরের সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. যিকিরের জন্য উযূ থাকা শর্ত নয় তবে উযুর সাথে যিকির করলে যিকিরের আছর বেশি হয় এবং নূরানিয়্যাত হাছিল হয়।

২. কেবলামুখী হয়ে যিকিরে বসা উত্তম।

৩. হুজুরে কল্ব বা একাগ্রতার সাথে যিকির করতে হবে।

৪. এই একীনের সাথে যিকির করতে হবে যে, আল্লাহ আমার যিকির শুনছেন, তাই আল্লাহ্র রহমত ও মহব্বতের সাথে যিকির করতে হবে।

৫. এখলাসের সাথে যিকির করতে হবে।

৬. যিক্‌রে খফী বা অনুচ্চস্বরে যিকির করা উত্তম। তবে রিয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং কারও নিদ্রা, ইবাদত বা জরুরি কাজে ব্যাঘাত না ঘটলে যিকরে জলী তথা উচ্চস্বরে যিকির করাও জায়েয বরং কোন কোন শায়েখ উক্ত শর্ত সাপেক্ষে সেটাকেই উত্তম বলেছেন। কেননা উচ্চস্বরে যিকির করার মধ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা, ওয়াছওয়াছা হ্রাস পাওয়া এবং যিকিরের আওয়াজের বরকত ছড়িয়ে পড়া প্রভৃতি বহুবিধ ফায়দা রয়েছে। তবে খুব বেশি উচ্চস্বরে না হওয়া চাই এবং উচ্চস্বরে করাকে ছওয়াবের বা ইবাদতের মনে না করা চাই। (شرعة الإسلام، شریعت وطریقت)

৭. শুধু সংখ্যা পূরণ করার নিয়তে নয় বরং যিকির দ্বারা ফায়দা ও বরকত হবে এই নিয়তে যিকির করতে হবে, অন্যথায় যিকিরের বরকত হবে না। (بصائر حکیم الامت)

৮. যে শব্দের দ্বারা যিকির করবে তার অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে।

৯. পীর/মুর্শিদের নির্দেশ মোতাবেক যিকির করবে। আর নিজের থেকে যিকির করলে তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ করে নেয়া উত্তম।

## কয়েকটি বিশেষ যিকির

১. কুরআন তিলাওয়াত

২. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৩. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

৪. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

৫. তাসবীহে ফাতেমী (৫০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬. আল্লাহ, আল্লাহ বলা।

## দুরূদ শরীফের বিধি-বিধান প্রসঙ্গ

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। জীবনে অন্তত একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয।

* যদি কোন মজলিসে একাধিক বার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম মোবারক উল্লেখ করা হয়, তাহলে একবার দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, অবশিষ্ট বারগুলোতে মোস্তাহাব।

* খতীব খুতবার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম উল্লেখ করলে কিংবা يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا আয়াত পাঠ করলে জিহ্বা নাড়ানো ব্যতীরেকে মনে মনে দুরূদ পাঠ করে নিবে।

* দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য উযূ থাকা জরুরি নয়। থাকলে ভাল।

* উঠা-বসা, হাঁটা-চলা, সর্বাবস্থায় দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়।

* দুরূদ পাঠের সময় শরীরে ঝাঁকুনি দেয়া বা আওয়াজ উচ্চ করা মূর্খতা। (شرح فيض الكلام و الدر المختار)

* ওয়াজের সময় শ্রোতাদের সম্মিলিতভাবে জোর আওয়াজে দুরূদ শরীফ পাঠ করা মাকরূহ। (فتاوی محمودیۃ □□/١٠)

* দুরূদে তাজ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এর ফযীলতে যা লেখা হয় তা ভিত্তিহীন। তদুপরি তার মধ্যে কিছু শির্‌কপূর্ণ কথা রয়েছে। অতএব তা পরিত্যাজ্য। পড়তে হলে সেই অংশ বাদ দিয়ে পড়া যায়। (فتاوی رحیمیۃ □□/٢)

* ছোট এবং বড় দুরূদের মধ্যে যেটিই ভাল লাগবে সেটিই পড়বে।

* সাধারণভাবে عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেই দুরূদ ও সালাম হয়ে যায়।

* সংক্ষেপে চাইলে নিম্নের দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ.

* যেকোনো বিপদ বা সমস্যার সম্মুখীন হলে দুরূদে নারিয়া ৪৪৪৪ (চার হাজার চারশত চুয়াল্লিশ বার) একই উযুতে একই বৈঠকে যেকোনো সংখ্যক



লোক মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা উক্ত বিপদ থেকে মুক্তি দেন ও সমস্যার সমাধান করে দেন। এটা বুযুর্গদের পরীক্ষিত আমল, হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটাকে সুন্নাত তরীকা মনে করা যাবে না। দুরূদ নারিয়ার বাক্যগুলো মূলত মরক্কোর শায়খ ইবরাহীম তাযী (রহ.)–এর রচিত।

দুরূদে নারিয়া এই:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ، وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ. (رسول الله صلى الله عليه وسلم کی سنتیں

مجالس حکیم الامت ও اسلام کیاہے، شرح فیض الکلام গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত।)

উল্লেখ্য, দুরূদে নারিয়া ইত্যাদির আমল যেগুলো কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়– এমন আমলের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে বিপদাপদ বা সমস্যা দূর করার জন্য কুরআন-হাদীছে যেসব আমল বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রতিই গুরুত্ব দেয়া চাই। সেগুলো হল– সদকা করা, দুআয়ে ইউনুস পড়া (যেকোনো সংখ্যক বার), সালাতুল হাজত পড়া, দুআ করা ইত্যাদি।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ বলেন, দুরূদে নারিয়ার মধ্যে تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ، ইত্যাদি বাক্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে জটিলতা নিরশন করা, বিপদ-আপদ লাঘব করা ও হাজত পূর্ণ করার দুআ চাওয়া হয় বিধায় এসব বাক্য শিরকী বাক্য। তাদের এ কথা ঠিক নয়। এসব বাক্যের অর্থ হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওছীলায় জটিলতা নিরশন হয়, বিপদ লাঘব হয় এবং হাজত পূর্ণ হয়। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম– এর ওছীলা দিয়ে দুআ করা উদ্দেশ্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসব বিষয় চাওয়া উদ্দেশ্য নয়। এরূপ ওছীলা দিয়ে দুআ চাওয়া জায়েয। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওফাতের পর তাঁর ওছীলা দিয়ে দুআ করা যায়– এ সম্পর্কে আমার রচিত “ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ” গ্রন্থে সহীহ দলীল-ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

## তওবা-এস্তেগফারের নিয়ম-পদ্ধতি

তওবা অর্থ গোনাহ থেকে আনুগত্যের দিকে এবং গাফলত থেকে আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ফিরে আসা। আর এস্তেগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

* প্রত্যেকের উপর কৃত পাপ থেকে তওবা-এস্তেগফার করা ওয়াজিব।

**তওবার জন্য মোট পাঁচটি কাজ করতে হবে। যথাঃ−**

১. খাঁটি অন্তরে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র আল্লাহ্র আযাবের ভয় ও তাঁর নির্দেশের মহত্বকে সামনে রেখে তওবা করতে হবে।
২. অতীত পাপের প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।
৩. উক্ত পাপ থেকে এখনই বিরত হতে হবে।
৪. ভবিষ্যতে উক্ত পাপ না করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।
৫. আল্লাহ্র হক বা বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকলে তার সংশোধন ও প্রতিকার করতে হবে। যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্র হক আদায় না করে থাকলে তা আদায় করতে হবে। আর বান্দার হকের মধ্যে অর্থ সম্পদ বিষয়ক হক নষ্ট করে থাকলে উক্ত অর্থ বা উক্ত পরিমাণ অর্থ হকদারের নিকট বা তার মৃত্যু হয়ে থাকলে তার উত্তরাধিকারীর নিকট ফেরত দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে তাদের থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। আর অর্থ সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন হক নষ্ট করে থাকলে যেমনঃ গীবত বা গালি-গালাজ করে থাকলে বা মুখে কিংবা কথায় কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। কোন ফিতনার আশংকা না থাকলে উক্ত অন্যায় উল্লেখ পূর্বক ক্ষমা চাইতে হবে, অন্যথায় অন্যায় উল্লেখ করা ছাড়াই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তার মধ্যেও ফেতনার আশংকা থাকলে শুধু আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। নেক কাজ করবে এবং দান সদকা করবে। আর হকদার ব্যক্তি মৃত হলে তার উদ্দেশ্যে কিছু সদকা করে দিবে।

**বি. দ্র.** উপরোল্লেখিত পাঁচটি বিষয় পূর্ণ করা ব্যতীত শুধু গতানুগতিকভাবে মুখে তওবা-এস্তেগফারের বাক্য আওড়ালেই তওবা হয়ে যায় না। যদিও শুধু তওবার বাক্য মুখে আওড়ানোও একেবারে ফায়দা থেকে খালি নয়।

## কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয় আমলসমূহ

* কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে নেয়া উত্তম।

* কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে উযূ করে নেয়া উত্তম, আর কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হলে উযূ করে নেয়া জরুরি।



* ভাল পোশাক পরিধান করে খুশবু মেখে এবং পরিপাটি হয়ে তিলাওয়াতে বসা আদব। (شرعة الإسلام)

* কেবলামুখী হয়ে বসে (হেলান বা টেক না দিয়ে) তিলাওয়াত করা আদব। (التبيان في آداب حملة القرآن وشرعة الإسلام)

* এখলাসসহ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করতে হবে।

* তিলাওয়াতের সময় এই মনোভাব জাগ্রত রাখবে যে, সে মহান আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করা হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে তার একান্ত কথাবার্তা হচ্ছে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। (كتاب الأذكار)

* খুশু-খুযু ও বিনয়ের সাথে তিলাওয়াত করা উত্তম। (التبيان في آداب حملة القرآن وكتاب الأذكار)

* আমলের নিয়তে তিলাওয়াত করবে।

* কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল ও চিন্তা সহকারে তিলাওয়াত করা উত্তম। তবে কেউ না বুঝে পড়লেও তার তিলাওয়াত অর্থহীন নয়। কেউ যদি বলে, না বুঝে পড়লে কোনো লাভ নেই, তাহলে সে ব্যক্তি মূর্খ বা বে-দ্বীন। কেননা, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা নিম্নোক্ত ফায়দাগুলো সর্বাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে।

(১) তিলাওয়াতের দ্বারা দেলের জং (গুনাহের কালিমা) মুছে যায়।
(২) কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে অন্তত ১০টি নেকী অর্জন হয়।
(৩) কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ্র মহব্বত বাড়ে।

* তিলাওয়াতের শুরুতে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম" ও "বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম" বলা ওয়াজিব। তিলাওয়াতের মধ্যে কোন নতুন সূরা আসলে তার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে সূরা তাওবা ব্যতীত, তবে তওবা থেকেই তিলাওয়াত শুরু করলে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। সূরা তওবার শুরুতে আউযুবিল্লাহি মিনান্নারি ... যে দুআটি পড়ার রেওয়াজ রয়েছে এ দুআটির কোন প্রমাণ নেই।

* তাজবীদ ও তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। (التبيان في آداب حملة القرآن) তাজবীদ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৬৬২−৬৭৮ পৃষ্ঠা।

* দরূদ এবং ওয়াজ্দ (মহব্বত)−এর স্বরে তিলাওয়াত করবে।

* রোদন বা রোদনের ভঙ্গিসহ তিলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الأذكار)

* সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা উত্তম। সুন্দর আওয়াজ বলতে বোঝায় এমন স্বরে তিলাওয়াত করা যেন শ্রবণকারী বুঝতে পারে যে, তিলাওয়াতকারী আল্লাহ্‌র ভয় নিয়ে তিলাওয়াত করছে। (شرعة الإسلام)

* রিয়ার আশংকা থাকলে কিংবা কোন নামাযী বা ঘুমন্ত ব্যক্তি প্রমুখের অসুবিধার আশংকা থাকলে নিম্নস্বরে তিলাওয়াত করা উত্তম। অন্যথায় মধ্যম জোর আওয়াজে তিলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الأذكار)

* কুরআন শরীফ রেহাল/বালিশ প্রভৃতি উঁচু কিছুর উপর রেখে তিলাওয়াত করবে।

* কুরআন খতম হলে তখনই আবার শুরু থেকে কিছুটা আরম্ভ করে রাখা সুন্নাত। (رواه الترمذي في أبواب الدعوات)

* কুরআন খতম করার প্রাক্কালে দু'আ করা মোস্তাহাব। (أيضا)

* তিলাওয়াতের শুরু বা শেষে কুরআনকে চুমু দেয়া বা চোখে মুখে ছোয়া লাগানো জায়েয। (خير الفتاوى ١/□□)

**(নামাযের বাইরে) কুরআন পাঠের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াতের পর নিম্নোক্ত বাক্য বলা বা নিম্নরূপ করা সুন্নাত/মোস্তাহাব।**

| কুরআনের আয়াত | সূরা | যা বলা/করা মুস্তাহাব |
|---|---|---|
| সূরা ফাতিহা শেষ করার পর | | اٰمِيْنَ বলা |
| سُبْحَانَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ. | বাকারা | উঁচু আওয়াজে পড়া |
| সূরা বাকারা শেষ করার পর | | اٰمِيْنَ বলা |
| اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَآئِمُوْنَ. | আ'রাফ | উঁচু আওয়াজে পড়বে |
| সূরা বানী ইসরাঈল শেষ করে | | اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا পড়া |
| وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا. اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا. | মারয়াম | উঁচু আওয়াজে পড়বে |



| কুরআনের আয়াত | সূরা | যা বলা/করা মুস্তাহাব |
|---|---|---|
| প্রত্যেকটি فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এর পর | আর-রাহমান | وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ পড়া |
| اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ. ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ. | ওয়াকেয়াহ | بَلٰى يَارَبِّ তিনবার বলা |
| ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ. | ওয়াকেয়াহ | بَلٰى يَارَبِّ তিনবার বলা |
| ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ. | ওয়াকেয়াহ | بَلٰى يَارَبِّ তিনবার বলা |
| ءَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ. | ওয়াকেয়াহ | بَلٰى يَارَبِّ তিনবার বলা |
| সূরা ওয়াকেয়াহ শেষ করে | | سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া |
| اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ..الخ | হাদীদ | بَلٰى يَارَبِّ তিনবার বলা |
| সূরা মুল্‌ক শেষ করে | | اَللّٰهُ يَأْتِيْنَا وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ পড়া |
| সূরা হাক্কাহ শেষ করে | | سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া |
| اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى. | ক্বিয়ামাহ | بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. |
| هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا. | দাহ্‌র | اَيْ وَ عِزَّتِكَ বলা |
| فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ | মুরসালাত | اٰمَنَّا بِاللّٰهِ বলা |
| سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى. | আ'লা | سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়া |
| فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا. | শামস | اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا পড়া |

| | | |
|---|---|---|
| সূরা দোহা থেকে নাছ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরা পড়া শেষে | | لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَكْبَرُ এবং এর সঙ্গে اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ বলা |
| اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ. | তীন | بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ |
| قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. | এখলাস | اَنْتَ اللّٰهُ اَحَدٌ বলা |
| قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. | ফালাক | اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ বলা |
| قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. | নাছ | اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলা |

## কুরআনের আদব ও আজমত সম্পর্কিত
## আরও কয়েকটি বিধান

* পড়ার অযোগ্য ছেড়া ফাটা পুরাতন কুরআন শরীফ পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দেয়া উত্তম। (فتاوی محمودیۃ ১/□□)

* ভুলে কুরআন শরীফ পড়ে গেলে তওবা এস্তেগফার করে নিবে। (أيضا) এর জন্য কুরআনের ওজনে কোন কিছু দান করা জরুরি বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা ভুল।

* কুরআন শরীফ বরাবর রাখা থাকলে সেদিকে পা ছড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে কুরআন শরীফ উঁচুতে থাকলে সেদিকে পা ছড়িয়ে দেয়াতে অসুবিধা নেই। (فتاوی محمودیۃ ১/□□)

* গ্রামোফোন হল ক্রীড়া কৌতুকের উপকরণ, তাই তাতে কুরআন তিলাওয়াত রেকর্ড করা নিষিদ্ধ। পয়সার বিনিময়ে তিলাওয়াত রেকর্ড করা জায়েয নয়। এরূপ রেকর্ড বিক্রি করাও নিষিদ্ধ। (فتاوی محمودیۃ ১/□□)

* রেকর্ড করার জন্য টেপরেকর্ডারে তিলাওয়াত বা ওয়াজ করা জায়েয। টেপরেকর্ডার থেকে তিলাওয়াত বা ওয়াজ শোনাও জায়েয। (آلات جدیدۃ کے شرعی احکام)

* রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত কালামুল্লাহ (আল্লাহ্‌র কালাম)-এর আজমতের খেলাফ। (فتاوی محمودیۃ ২/□□)

* মুফতী শফী সাহেব (রহ.) রেডিওতে তিলাওয়াতকে জায়েয বলেছেন তবে হাঁটে-বাজারে হোটেলে, দোকানে ইত্যাদি নানাবিধ ব্যস্ততা ও আমোদ- প্রমোদের মজলিসে –যেখানে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ দেয়া হয় না এরূপ স্থানে– রেডিও, টেপের তিলাওয়াত শুনানোকে বে-আদবী ও নাজায়েয বলেছেন। (آلات جدیدۃ کے شرعی احکام)



## তাজবীদের বয়ান

প্রত্যেকটা হরফ-কে সঠিক মাখরাজ থেকে পূর্ণ ছিফাত সহকারে আদায় করাকে 'তাজবীদ' বলে। তাজবীদ রক্ষা করে কুরআন পাঠ করা ফরয। (غنية القاري) হরফের মাখরাজ ও ছিফাত সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা পেশ করা হল।

উল্লেখ্য, শুধু এসব বর্ণনা দেখে কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ করা সম্ভব নয়। যিনি সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারেন- এরূপ লোকের নিকট মশ্‌ক করা ব্যতীত কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ শিক্ষা করা যায় না। এখানে প্রয়োজনে নিয়ম-কানুন দেখে নেয়ার সুবিধার জন্যই প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন লিখে দেয়া হল।

### মাখরাজের বর্ণনা

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফ ২৯ টি, হরফ উচ্চারণের স্থান তথা মাখরাজ ১৭ টি।

১. নাম্বার মাখরাজ: হলকের শুরু থেকে ء–ه উচ্চারিত হয়।
২. নাম্বার মাখরাজ: হলকের মধ্যখান থেকে ع–ح উচ্চারিত হয়।
৩. নাম্বার মাখরাজ: হলকের শেষ ভাগ থেকে غ–خ উচ্চারিত হয়।
৪. নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার গোড়াকে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ق উচ্চারিত হয়।
৫. নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বেড়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ك উচ্চারিত হয়।
৬. নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার মধ্যখানকে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ج–ش–ى উচ্চারিত হয়।
৭. নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ীর দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে ض উচ্চারিত হয়।
৮. নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ل উচ্চারিত হয়।
৯. নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগাকে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ن উচ্চারিত হয়।
১০.নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ر উচ্চারিত হয়।

১১.নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগাকে সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ط–د–ت উচ্চারিত হয়।

১২.নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগাকে সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ص–س–ز উচ্চারিত হয়।

১৩.নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগাকে সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ظ–ذ–ث উচ্চারিত হয়।

১৪.নাম্বার মাখরাজ: নিচের ঠোটের পেটে সামনের উপরের দুই দাঁতের আগা লাগিয়ে ف উচ্চারিত হয়।

১৫.নাম্বার মাখরাজ: দুই ঠোট থেকে و–ب–م উচ্চারিত হয়। ب এবং م উচ্চারণ করার সময় উভয় ঠোট মিলে যায় আর و উচ্চারণের সময় দুই ঠোট গোল হয়ে মধ্যখানে ছিদ্র হয়ে যায়।

১৬.নাম্বার মাখরাজ: মুখের খালি জায়গা থেকে মদের হরফ পড়া যায়। যেমন: با–بو–بى

১৭.নাম্বার মাখরাজ: নাকের বাঁশী থেকে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন: اِنَّ–اَنْتَ

## ছিফাতের বর্ণনা

* হরফের গুণাবলী বা উচ্চারণের অবস্থাকে ছিফাত বলে। যেমন: উচ্চারণের সময় নরম হওয়া বা শক্ত হওয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে কতক ছিফাত এমন আছে যা ছাড়া হরফ হরফই হয় না বা এক হরফ অন্য হরফ থেকে পৃথক হয় না বা আরবদের ন্যায় উচ্চারণ হয় না। এরূপ আবশ্যকীয় ছিফাত (صفت/لازمہ/مميّزه ذاتيہ) ১৮টি। যথা:

**১. হাম্‌ছ (همس):** অর্থাৎ, এমন নরম করে আদায় করা যাতে শ্বাস জারী থাকে এবং আওয়াজে এক ধরনের পস্তী বা দুর্বলতা মনে হয়। হাম্‌ছের হরফ ১০টি। যথা: فحثه شخص سكت যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মাহ্‌মূছা' বলে।

**২. জিহ্‌র (جهر):** এই ছিফাত হল হামছ্–এর বিপরীত অর্থাৎ, যা এমন শক্তভাবে আদায় করা হয় যে, আওয়াজ ও শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মাজ্‌হুরা' বলে। হাম্‌ছের ১০টি হরফ ব্যতীত অন্য হরফগুলোতে এই ছিফাত পাওয়া যায়।



**৩. শিদ্দাত (شـدت):** অর্থাৎ, এমন শক্তভাবে আদায় করা যাতে হরফে সাকিন করলে আওয়াজ থেমে যায়। এর হরফ ৮টি। যথা: اجد قط بكت। যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'শাদীদাহ' বলে। উল্লেখ্য, জিহ্‌র–এর মধ্যে আওয়াজ বন্ধ হয় স্বয়ং হরফের কারণে আর শিদ্দাত–এর মধ্যে আওয়াজ বন্ধ হয় আওয়াজের শক্তির কারণে।

**৪. রিখ্‌ওয়াত (رخـوت):** এই ছিফাত হল শিদ্দাত–এর বিপরীত। অর্থাৎ, যা এমন নরমভাবে আদায় করা হবে যে, হরফে সাকিন করলে আওয়াজ জারী থাকবে। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'রাখ্‌ওয়া' (رخـوه) বলে। শাদীদাহ ও মুতাওয়াচ্ছিতাহ ব্যতীত অন্যান্য হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

**৫. তাওয়াচ্ছুত (توسط):** শিদ্দাত ও রিখওয়াত–এর মাঝামাঝি হল তাওয়াচ্ছুত। অর্থাৎ, যা উচ্চারণের সময় আওয়াজ একেবারেও বন্ধ হবে না বা বেশিক্ষণ জারীও থাকবে না। যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুতাওয়াচ্ছিত।' বলে। এর হরফ ৫টি। যথা: لن عمر

**৬. ইস্তি'লা (استعلاء):** অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার গোড়া তালুর দিকে উঠে যায়, যার কারণে হরফ মোটা হয়ে উচ্চারিত হয়। এর হরফ ৭টি। যথা: خص ضغط قظ যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুস্তা'লিয়া' বলে।

**৭. ইস্তিফাল (استـفـال):** এই ছিফাতটি ইস্তি'লা-র বিপরীত অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার গোড়া তালুর দিতে উঠে না। ইস্তি'লার ৭টি হরফ ব্যতীত অবশিষ্ট হরফে এই ছিফাত রয়েছে। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুস্তাফিলাহ' বলে।

**৮. ইত্‌বাক্ব (اطـبـاق):** অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার মধ্যখান উপরের তালুর সাথে মিলিত হয়। ص ض ط ظ এই চারটি হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুতবাক্বাহ' বলে।

**৯. ইন্‌ফিতাহ (انفتاح):** অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার মধ্যখান উপরের তালুর থেকে পৃথক থাকে (ইত্‌বাক্ব–এর বিপরীত)। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুন্‌ফাতিহা' বলে। ইত্‌বাক্ব–এর ৪টি হরফ ব্যতীত অবশিষ্ট সব হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

**১০. ইয্‌লাক্ব (اذلاق):** অর্থাৎ, জিহ্বা ও ঠোটের কিনারা থেকে সহজে দ্রুত আদায় হয়ে যায়। ৬টি হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায়। যথা: فر من لب এই ছিফাতযুক্ত হরফকে ‘মুয্‌লাক্বাহ’ বলা হয়।

**১১. ইস্‌মাত (اصـمـات):** ইসমাত ইযলাকের বিপরীত। ইযলাকের ৬টি হরফ ব্যতীত অবশিষ্ট হরফের মধ্যে ইসমাত ছিফাত পাওয়া যায়। সেগুলোকে ‘মুসমাতাহ’ বলা হয়।

**১২. সফীর (صـفـيـر):** অর্থাৎ, সিটির ন্যায় তেজ আওয়াজ বের হওয়া। তিনটি হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায়। যথা: ز س ص এই হরফগুলোকে ‘সাফীরিয়্যাহ’ বলা হয়।

**১৩. ক্বল্‌ক্বালাহ (قـلـقـلـه):** এর হরফ পাঁচটি। ق ط ب ج د এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এই হরফগুলোকে ‘হুরূফে ক্বলক্বালাহ’ বলা হয়।

**১৪. লীন (لـيـن):** অর্থাৎ, মাখরাজ থেকে এমন নরমভাবে আদায় করা যে, তার উপর মদ করতে চাইলে করা যায়। و সাকিন বা ى সাকিনের পূর্বে যবর থাকলে সে দুটো লীনের হরফ বলে গণ্য হয়। এই হরফগুলোকে ‘হরফে লীন’ বলা হয়।

**১৫. ইন্‌হিরাফ (انـحـراف):** অর্থাৎ, ঝুঁকে যাওয়া। এর হরফ দুটি ل এবং ্য লাম আদায় করার সময় জিহ্বার কিনারা এবং ر আদায় করার সময় জিহ্বার পিঠের দিকে এবং কিছুটা লামের স্থানের দিকে ঝোঁক পাওয়া যায়। এই হরফগুলোকে ‘মুন্‌হারিফাহ’ বলা হয়।

**১৬. তাকরীর (تكـريـر):** অর্থাৎ, উচ্চারণের সময় জিহ্বায় একটা কাঁপুনির মত হওয়া। এক মাত্র ر হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়। ছিফাতটিকে তাকরার (تكرار) ও বলা হয়।

**১৭. তাফাশ্‌শী (تفشى):** অর্থাৎ, উচ্চারণের সময় মুখের ভিতর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়া। একমাত্র ش হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

**১৮ ইস্তিত্বালাত (استطالت):** অর্থ দীর্ঘ হওয়া। একমাত্র ض হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়। ض উচ্চারণের সময় জিহ্বার পার্শ্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এই হরফকে ‘মুস্তাত্বীলাহ’ বলা হয়।



**১৮টি ছিফাতের মধ্যে কোন্ কোন্ হরফে কি কি ছিফাত পাওয়া যায় তার একটি নকশা**

| হরফ | যে যে ফিছাত পাওয়া যায় |
|---|---|
| ا | জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ, |
| ب | জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ক্বলক্বালাহ |
| ت | হাম্‌ছ, শিদ্দাত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ث | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ج | জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ক্বলক্বালাহ |
| ح | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| خ | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| د | জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ক্বলক্বালাহ |
| ذ | জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ر | জিহ্‌র, তাওয়াচ্ছুত, ইস্তিফাল ইনফিতাহ ও তাকরীর |
| ز | জিহ্‌র, রিখওয়াত ইস্তিফাল ও ছফীর |
| س | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ছফীর |
| ش | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও তাফাশ্‌শী |
| ص | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তি’লা ইত্‌বাক্ ও ছফীর |
| ض | জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তি’লা, ইতবাক্ব ও ইস্তিত্বালাত |
| ط | জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তি’লা ইতবাক্ব ও ক্বলক্বালাহ |
| ظ | জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তি’লা ও ইতবাক্ব |
| ع | জিহ্‌র, তাওয়াচ্ছুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| غ | জিহ্‌র, রিখওয়াত ইস্তি’লা ও ইনফিতাহ |
| ف | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ق | জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তি’লা, ইনফিতাহ ও ক্বলক্বালাহ |
| ک | হাম্‌ছ, শিদ্দাত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ل | জিহ্‌র, তাওয়াচ্ছুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| م | জিহ্‌র, তাওয়াচ্ছুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ن | জিহ্‌র, তাওয়াচ্ছুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| و | জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ه | হাম্‌ছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ء | জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |
| ى | জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ |

(নকশাটি فوائد مكية থেকে গৃহীত।)

* হরফের আর এক ধরনের ছিফাত রয়েছে যা রক্ষা করলে হরফে সৌন্দর্য ও খুবী রক্ষা করা হয়। এ ধরনের ছিফাতকে "সৌন্দর্যসূচক গুণাবলী" (صفات محلیہ/مزینہ/محسنہ/عارضیۃ) বলে। এ ধরনের ছিফাত সব হরফের মধ্যে নেই বরং আটটি হরফের মধ্যে রয়েছে। যথা:

১. ل
২. ر
৩. সাকিন বা তাশদীদ যুক্ত م
৪. সাকিন বা তাশদীদযুক্ত ن কিংবা তানবীনযুক্ত ن
৫. আলিফ; যার পূর্বে যবর থাকে।
৬. و সাকিন' যার পূর্বে পেশ থাকে।
৭. ی সাকিন যার পূর্বে যের থাকে।
৮. ء (হামযা)। এই হরফগুলোর উপরোক্ত প্রকারের ছিফাত কতকটা উস্তাদের নিকট পড়া শিখলেই এসে যায় আর কতকগুলো সামনে বর্ণিত এসব হরফের সাথে সংশ্লিষ্ট গুন্নাহ, মদ, পূর/বারীক ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি পালনের মাধ্যমে এসে যাবে।

## নূন সাকিন/তানবীনকে পড়ার নিয়ম

ن -একে নূন সাকিন বলে। দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ্‌কে তানবীন বলে।

* নূন সাকিন ও তানবীনকে পড়ার চারটি নিয়ম। যথা:

**১. কল্‌ব/ইক্‌লাব:** কল্‌ব/ইক্‌লাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। কলবের একটি হরফ ب নূন সাকিন বা তানবীনের পর কলবের হরফ আসলে নূন সাকিন ও তানবীন (উচ্চারণ করতে যে নূন হয় সেটা)-কে م দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হবে এবং গুন্নাহও হবে। যেমন:

مِنْۢ بَعْدِ– خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا–حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ – رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ.

**২. ইদ্‌গাম:** ইদ্‌গাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগামের হরফ ৬টি ی–ر–م–ل–و–ن এর মধ্যে ی–م–و–ن এই চারটি ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ-র হরফ এবং ر–ل -এই দুইটি ইদ্‌গামে বেগুন্নাহ-র হরফ। নূন সাকিন বা তানবীনের পর ইদগামে বা-গুন্নাহ-র হরফ আসলে সেই হরফে তাশদীদ দিয়ে মিলিয়ে পড়তে হবে এবং গুন্নাহও হবে। যেমন:



مَنْ يَّفْجُرُكَ–مِنْ مَّسَدٍ–مِنْ وَّرٰى–مِنْ نِعْمَةٍ– مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

* তবে একই শব্দে নূন সাকিনের পর ইদগামে বা-গুন্নাহ-র হরফ আসলে গুন্নাহ হবে না এবং সেই হরফে তাশদীদ দিয়েও পড়া হবে না। একে 'এজহারে মুত্‌লাক্ব' বলে। যেমন:

صِنْوَانٌ– قِنْوَانٌ– بُنْيَانٌ– دُنْيَا.

* আর নূন সাকিন বা তানবীনের পর ইদগামে বেগুন্নাহ-র হরফ আসলে সেই হরফে তাশদীদ দিয়ে মিলিয়ে পড়া হবে তবে গুন্নাহ হবে না। যেমন:

اَنْ لَّآ اِلٰهَ– مِنْ رَّ بِّهِمْ

**৩. ইজ্‌হার:** ইজহার অর্থ স্পষ্ট করে (গুন্নাহ ছাড়া) পড়া। ইজহারের হরফ ৬টি ء–ه–ع–ح–غ–خ নূন সাকিন বা তানবীনের পর ইজহারের হরফ আসলে নূন সাকিন/তানবীনকে স্পষ্ট করে গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হয়। একে 'ইজহারে হালক্বী' বলে। যেমন:

مَنْ اَحْيَيْتَهٗ. عَنْهُ. اَنْعَمْتَ. لِمَنْ حَمِدَهٗ. مِنْ غَيْرِ. مِنْ خَوْفٍ.
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ. غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

**৪. ইখ্‌ফা:** ইখ্‌ফা অর্থ লুকিয়ে পড়া। ইখ্‌ফার হরফ ১৫টি। যথা:

ت.ث.ج.د.ذ.ز.س.ش.ص.ض.ط.ظ.ف.ق.ك

* নূন সাকিন/তানবীনের পর ইখ্‌ফার হরফ আসলে নূন সাকিন/তানবীনকে লুকিয়ে পড়তে হয় অর্থাৎ, জিহ্বা উপরের তালুতে না লাগিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে 'ইখ্‌ফায়ে হাক্বীক্বী' বলে। যেমন:

اٰمَنْتُ. مِنْ جُوْعٍ. عِنْدَكَ. اَنْزَلْنَاهُ. نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ. كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.

## মীম সাকীনকে পড়ার নিয়ম

(জযম ওয়ালা মীমকে [যেমন: مْ] মীম সাকিন বলে)

* মীম সাকিনকে পড়ার তিনটি নিয়ম। যথা:

১. মীম সাকিনের পরে ب থাকলে মীমকে ইখ্‌ফা করে (অর্থাৎ, গুন্নাহ সহকারে) পড়তে হয়। একে 'ইখ্‌ফায়ে শাফাবী' বলে। যেমন:

قُمْ بِاِذْنِ اللهِ. عَلَيْكُمْ بِمُصَيْطِرٍ.

২. মীম সাকিনের পরে م থাকলে ইদগাম করে পড়তে হয় অর্থাৎ, পরবর্তী মীমে তাশদীদ দিয়ে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। একে 'ইদগামে শাফাবী' বলে। যেমন: عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ. عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

৩. মীম সাকিনের পরে ب এবং م ব্যতীত অন্য কোন হরফ আসলে ইজহার করে (অর্থাৎ, মীমকে নাকে না নিয়ে গুন্নাহ ছাড়া) পড়তে হয়। একে
'ইজ্হারে শাফাবী' বলে। যেমন: لَمْ يَلِدْ. وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

## ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ

* নূন (ن) বা মীমে (م) তাশদীদ থাকলে ঐ নূন ও মীমকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। এই প্রকার গুন্নাহকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। গুন্নাহের পরিমাণ এক আলিফ। (ادب القرآن و فوائد مكيه) এই প্রকারের গুন্নাহ আদায় করার সময় জিহ্বার আগার পিঠ উপরের তালুর সাথে লাগবে।

## মদ-এর বিবরণ

* 'মদ' অর্থ লম্বা করা, টেনে পড়া। মদ্দের হরফ তিনটি (১) আলিফ খালী; যার পূর্বে যবর থাকে। (২) ওয়াও সাকিন (وْ) যার পূর্বে পেশ থাকে। (৩) ইয়া সাকিন (یْ) যার পূর্বে যের থাকে।

১। মদের হরফের বামে সাকিন ও হামযা না থাকলে সেই মদের হরফকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এই প্রকার মদকে 'মদ্দে ত্ববায়ী' বলে। যেমন: نوحيها উল্লেখ্য যে, এক আলিফ টানা অর্থ দুইটা হরকত উচ্চারণ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ টানা। কেউ কেউ বলেছেন, একটা বন্ধ আঙ্গুল খুলতে বা একটা খোলা আঙ্গুল বন্ধ করতে যতটুকু সময় লাগে সেটাই হল এক আলিফ–এর পরিমাণ (غنية القارى وادب القرآن)। যবর, যের ও পেশকে হরকত বলে।

২। খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টো পেশ-কে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন اَلرَّحْمٰنُ. لَهٗ. بِهٖ উল্লেখ্য- খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টো পেশ মদের হরফ এবং মদ্দে ত্ববায়ীর হুকুমে।

৩। মদের হরফের পরে আর্‌যী সাকিন (অর্থাৎ, ওয়াক্‌ফ বা থামার কারণে যে সাকিন হয়) থাকলে তাকে 'মদ্দে আর্‌যী' বলে। এই প্রকার মদকে এক থেকে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়া যায়। সবচেয়ে উত্তম তিন আলিফ টানা, তারপর দুই আলিফ, তারপর এক আলিফ। (جمال القرآن)



যেমন:
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ. سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

৪। মদ্দের হরফের পরে একই শব্দের মধ্যে হামযা আসলে চার আলিফ বা তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। একে 'মদ্দে মুত্তাছিল' বলে। যেমন: سَوَآءٌ. سُوْٓءَ. شَآءَ

৫। মদ্দের হরফের পরে ভিন্ন শব্দের শুরুতে হামযা আসলে চার আলিফ বা তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়; একে 'মদ্দে মুনফাছিল' বলে। তবে উক্ত মদ্দের হরফের উপর যদি ওয়াক্‌ফ করা হয় এবং পরবর্তী শব্দকে পৃথক ভাবে পড়া হয় তাহলে সেটা মদ্দে মুনফাছিল হবে না। (ادب القرآن)

মদ্দে মুনফাছিলের উদাহরণ- اِنَّآ اَعْطَيْنَا. قَالُوْٓا اٰمَنَّا

৬। দুই যবরের বামে ওয়াক্‌ফ করলে সেখানে এক যবর পড়তে হবে এবং এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে। যেমন- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا একে 'মদ্দে এওয়াজ' বলে।

৭। যবরের বামে و সাকিন বা যবরের বামে ی সাকিন থাকলে ঐ و এবং ی কে হরফে লীন বলে। হরফে লীনের পরে আর্‌যী সাকিন (অর্থাৎ, ওয়াক্‌ফ বা থামার কারণে যে সাকিন হয় তা) থাকলে তাকে 'মদ্দে লীন' বলে। মদ্দে লীনে সবচেয়ে উত্তম এক আলিফ টানা, তারপর দুই আলিফ, তারপর তিন আলিফ। তবে এই তিন পদ্ধতির যেটাই গ্রহণ করবে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সে ভাবেই করবে- একেক স্থানে একেক রকম করা ভাল নয়। (ادب القرآن)

মদ্দে লীনের উদাহরণ যেমন: لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ. وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

৮। মদের হরফের পরে আস্‌লী সাকিন (অর্থাৎ, আর্‌যী সাকিন নয়) বা তাশদীদ থাকলে তাকে "মদ্দে লাযেম" বলে। মদ্দে লাযেম-কে চার আলিফ বা তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। মদ্দে লাযেম চার প্রকার যথা:

(ক) মদ্দে লাযেম কাল্‌মী মুছাক্কাল। অর্থাৎ, যদি মদের হরফের পর তাশদীদ থাকে, যেমন- دَآبَّةٍ. تَاْمُرُوْٓنِّيْ. ضَآلِّيْنَ

(খ) মদ্দে লাযেম কাল্‌মী মুখাফফাফ। অর্থাৎ, যদি মদের হরফের পর সাকিন থাকে। যেমন - آٰلْئٰنَ

(গ) মদ্দে লাযেম হরফী মুছাক্কাল, অর্থাৎ, যদি হুরূফে মুকাত্তাআত (সূরার শুরুতে যেসব বিচ্ছিন্ন হরফ ব্যবহৃত হয়)-এর পর তাশদীদ থাকে। যেমন الٓمّٓ. طٰسٓمّٓ

(ঘ) মদ্দে লাযেম হারফী মুখাফ্‌ফাফ। অর্থাৎ, হুরূফে মুকাত্তাআত-এর শেষে যদি সাকিন হয়। যেমন- یٰسٓ. نٓ. قٓ

## ل এবং الله (আল্লাহ) শব্দ পড়ার নিয়ম

১. আল্লাহ (الله) শব্দের ডানে যবর বা পেশযুক্ত হরফ থাকলে আল্লাহ শব্দের লামকে পূর করে (অর্থাৎ, মুখকে গোল করে) পড়তে হবে। যেমন: اَللّٰهُمَّ. اَرَادَ اللّٰهُ. رَفَعَ اللّٰهُ

২. আল্লাহ (الله) শব্দের ডানে যেরযুক্ত হরফ থাকলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারীক করে (অর্থৎ, পূর করা ছাড়া) পড়তে হবে। যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ

৩. আল্লাহ (الله) শব্দের লাম ব্যতীত অন্যান্য যত লাম আছে সব লামকে বারীক করে পড়তে হবে। যেমন: مَا وَلّٰهُمْ. قُلْ لَّهٗ. اِنَّ الَّذِيْنَ

## ر পূর করা কিংবা বারীক পড়ার নিয়ম

*ر -এর উপর যবর বা পেশ থাকলে ر -কে পূর পড়তে হয়। যেমন: رُبَمَا. رَبُّكَ

* ر -এর নিচে যের থাকলে ر কে বারীক পড়তে হয়। যেমন: رِجَالٌ

* তাশদীদযুক্ত رّ -কেও উপরোক্ত নিয়মে পূর বা বারীক পড়তে হবে, যেমন: سِرًّا কে পূর এবং ضُرِّىْ কে বারীক পড়তে হবে। তাশদীদযুক্ত رّ কে এক ر হিসাবে পড়তে হবে। অনেকে তাশদীদযুক্ত ر কে দুই ر ধরে প্রথমটা সাকিন এবং দ্বিতীয়টাকে হরকতযুক্ত ধরে পড়ে থাকেন, এটা ভুল। (جمال القرآن)

* ر -এর উপর সাকিন থাকলে তার পূর্বের হরফকে দেখতে হবে; যদি পূর্বের হরফে যবর বা পেশ থাকে তাহলে ر কে পূর পড়তে হবে। যেমন: بَرْقٌ يُرْزَقُوْنَ. قُرْآنٌ আর পূর্বের হরফে যের থাকলে ر কে বারীক পড়তে হবে। যেমন: تُنْذِرْهُمْ তবে তিন ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। যথা:–

১. পূর্বের যের ও ر -ভিন্ন ভিন্ন শব্দে হলে ر কে পূর পড়তে হবে। যেমন: رَبِّ ارْجِعُوْنِ. اَمِ ارْتَابُوْا

২. এমনিভাবে ر সাকিন পূর্বে যের থাকা সত্ত্বেও যদি ر এর পরে خص ضغط قظ -এই সাতটি বর্ণের কোন একটি থাকে তাহলেও ر কে পূর পড়তে হবে। যেমন: قِرْطَاسٌ. اِرْصَادٌ. فِرْقَةٌ. مِرْصَادٌ (কুরআনে এই নিয়মের মাত্র এই চারটি শব্দই পাওয়া যায়) সূরা শুআরার فِرْقٍ শব্দটি উভয় রকম পড়া যায়।



৩. ر -সাকিনের পূর্বের যের যদি আস্‌লী না হয়, আর্‌যী হয়, তাহলেও ر কে পূর পড়তে হবে যেমন: اِرْجِعِىْ. اِنِ ارْتَبْتُمْ তবে আরবী গ্রামার জানা ব্যতীত এরূপ যের চেনা মুশকিল, তাই কোথাও সন্দেহ হলে জানা লোকদের থেকে জেনে নিতে হবে।

* ر সাকিনের পূর্বের হরফের উপর যদি সাকিন থাকে (এরূপ অবস্থা ওয়াক্‌ফের সময় থাকে) তাহলে তার পূর্বের হরফের হরকত দেখতে হবে– যদি যবর বা পেশ থাকে তাহলে ر -কে পূর পড়তে হবে। আর যের থাকলে ر - কে বারীক পড়তে হবে। যেমন: اَلْقَدْرُ. اَلْعُسْرِ. اَلْغَفَّارُ শব্দে ر পুর এবং اَلذِّكْرُ শব্দে ر বারীক পড়তে হবে। তবে ر সকিনের পূর্বে যদি ى সাকিন হয় তাহলে তখন ى -এর পূর্বের হরকত দেখা হবে না বরং তখন সর্বাবস্থায় ر কে বারীক পড়তে হবে। যেমন: خَيْرٌ. بَصِيْرٌ আর ر সাকিনের পূর্বের সাকিনযুক্ত হরফ خص ضغط قظ এই সাতটির কোন একটি হলে সেই ر কে পূর বা বারীক উভয় রকম পড়া যায়। তবে مِصْر শব্দের ر কে পূর পড়া উত্তম এবং اِذَا يَسْرِ ও عَيْنَ الْقِطْرِ শব্দদ্বয়ের ر কে বারীক পড়া উত্তম। (ادب القرآن)

## ক্বলক্বলার আহকাম

* ق. ط. ب. ج. د. এই পাঁচটি হরফে সাকিন থাকলে বা এর উপর ওয়াক্‌ফ করলে ক্বলক্বলা করতে হয়। ক্বলক্বলা অর্থ ধাক্কা লাগা এবং আওয়াজ জোর হওয়া। ওয়াক্‌ফের অবস্থায় ক্বলক্বলা একটু বেশি প্রকাশ করতে হবে এবং কিছুটা যবরের ভাব প্রকাশ করতে হবে (পুরো যবর উচ্চারণ নয়)। যেমন: شَدِيْدٌ. حِسَابٌ আর মধ্যবর্তী স্থানে সাকিন হওয়ার কারণে হলে ক্বলক্বলা হালকা হবে এবং যবরের ভাব প্রকাশ পাবে না। (نزہۃ القاری)

## সাক্‌তাহ-এর বর্ণনা

(পড়ার সময় থামতে হবে কিন্তু শ্বাস ছাড়া যাবে না, একে সাক্‌তাহ বলা হয়।)

* কুরআন শরীফে ৪ জায়গায় সাক্‌তাহ করতে হয়। যথা :

১. সূরা কাহ্‌ফ–এর শুরুতে عِوَجًا শব্দের আলিফ–এর উপর।

২. সূরা ইয়াছীন–এর مِنْ مَّرْقَدِنَا শব্দের আলিফ–এর উপর।

৩. সূরা ক্বিয়ামাহ–এর مَنْ رَاقٍ এর مَنْ -এর নূন–এর উপর।

৪. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন–এর بَلْ رَانَ –এর بَلْ শব্দের লামের উপর।

## ওয়াক্ফ বা থামার নিয়ম-নীতি

* কুরআন শরীফে যেখানে যে ওয়াকফের চিহ্ন রয়েছে সেই চিহ্ন অনুযায়ী আমল করতে হবে। ওয়াক্ফের চিহ্নাদি সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদ দেখুন।

* যেখানে ওয়াক্ফের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে শ্বাস নিতে বাধ্য হওয়ার কারণে থামতে হলে শব্দের শেষ হরফে সাকিন দিয়ে থামতে হবে, তারপর আবার পড়ার সময় সেই শব্দ বা আরও দুই এক শব্দ পিছন থেকে মিলিয়ে নিয়ে পড়তে হবে।

* যে শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হবে তার শেষ হরফে গোল তা (ة) ব্যতীত অন্য কোনো হরফে দুই যবর থাকলে এক যবর পড়তে হবে এবং শেষে একটা আলিফ যোগ করে (অনেক স্থানে আলিফ লেখা থাকে) এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। যেমনঃ وَاِنْ كُنَّ نِسَاءً –এর উপর ওয়াক্ফ করলে পড়তে হবে। وَاِنْ كُنَّ نِسَاءَا

* যে শব্দে ওয়াক্ফ করা হবে তার শেষে গোল তা (ة) থাকলে ওয়াক্ফের সময় ঐ গোল তা-কে (ه) পড়তে হবে।

* হরকতযুক্ত হরফের উপর ওয়াক্ফ করলে একটি নিয়ম হল শেষের হরফকে সাকিন দিয়ে পড়া, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও দুইটি নিয়ম রয়েছে। যথাঃ–

১. শেষ অক্ষরের হরকতকে খুব হালকা ভাবে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ, সেই হরকতের এক তৃতীয়াংশ উচ্চারণ হবে এবং এমন ভাবে উচ্চারণ হবে যেন শুধু নিকটের লোকেরাই শুনতে পারে। এরূপ করাকে ‘রূম’ (روم) বলে। শেষ হরফে যের বা পেশ থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে-যবর থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

২. শেষ হরফে সাকিন করা হবে তবে আওয়াজ বন্ধ হওয়ার পর ঠোঁটের ইশারায় শেষ হরকত প্রকাশ করা হবে। এরূপ করাকে এশমাম (اشمام) বলে। শেষ হরফে পেশ থাকলেই কেবল এশমাম করা হয়- যবর বা যের থাকলে এশমাম করা যাবে না।

* তাশদীদযুক্ত হরফের উপর ওয়াক্ফ করলে মাখরাজের উপর একটু বিলম্ব করতে হবে যাতে দুই হরফ বোঝা যায়। যেমন مُسْتَقَرٌّ. وَتُبَّ



## ওয়াক্ফের চিহ্নসমূহ

১. ○-আয়াতের শেষে এরূপ চিহ্ন থাকে। এ-কে ‘ওয়াক্ফে তাম’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করতে হবে। কিন্তু ওয়াক্ফে তাম–এর উপর অন্য কোন চিহ্ন থাকলে (যেমনঃ ط. ج. م. ز. ص ইত্যাদি) সেই চিহ্ন অনুসরণ করতে হবে।

২. م -এই চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফে লাযেম’ বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ না করলে অর্থ বিগড়ে যেতে পারে, তাই ওয়াকফ করা দরকার।

৩. ط -এই চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফে মুতলাক্ব’ বলে। এখানে ওয়াক্ফ করা উত্তম- ওয়াক্ফ না করা ভাল নয়।

৪. ج এই চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফে জায়েয’ বলে। এখানে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয তবে ওয়াক্ফ না করা ভাল।

৫. ص -এই চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফে মুরাখ্খাছ’ বলে। এরূপ স্থানে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া ভাল। তবে নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে ওয়াক্ফের অনুমতি আছে।

৬. قف -এই চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফে আম্‌র’ বলে। এটা ওয়াক্ফ করার জন্য নির্দেশ করে।

৭. ق -এই চিহ্নকে ‘ক্বীলা আলাইহি ওয়াক্ফুন’ বলে। অর্থাৎ, কেউ কেউ এখানে ওয়াক্ফ আছে বলেন, আবার কেউ কেউ ওয়াক্ফ না করার কথা বলেন। এখানে ওয়াক্ফ না করা ভাল।

৮. لا -একে ‘লা ওয়াক্ফা আলাইহি’ বলে। অর্থাৎ, এখানে ওয়াক্ফ নেই, এখানে ওয়াক্ফ না করার হুকুম।

৯. صل -একে ‘ক্বাদ ইউছালু’ বলে। অর্থাৎ, কোন কোন সময় এতে ওয়াক্ফ করা হয় আবার কখনও মিলিয়ে পড়া হয় কিন্তু ওয়াক্ফ করাই উত্তম।

১০. صلے -একে ‘আল-ওয়াছলু আওলা’ বলে। এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম। ওয়াক্ফ করলেও ক্ষতি নেই।

১১. سكتہ -একে ‘সাক্তাহ’ বলে। এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম। ওয়াক্ফ করলেও ক্ষতি নেই।

১২. وقفہ এখানে সাক্তার চেয়ে একটু বেশি সময় থামতে হয়, তবে শ্বাস ছাড়া যাবে না।

১৩. ∴ -এই চিহ্নকে 'মু'আনাকা' বলে। এই চিহ্ন শব্দ বা বাক্যের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে আসে। পড়ার সময় প্রথম জায়গায় ওয়াক্‌ফ করলে অপর জায়গায় মিলিয়ে পড়তে হবে। কুরআন শরীফের পার্শ্বে এরূপ স্থানে مع বা معانقه লেখা থাকে।

১৪. وقف النبى صـ-এখানে ওয়াক্‌ফ করা অতি উত্তম।

১৫. وقف غفران -এখানে ওয়াক্‌ফ করলে গোনাহ মাফ হয়।

১৬. وقف جبرائيل এখানে ওয়াক্‌ফ করা বরকতপূর্ণ।

উল্লেখ্য, যেখানে একই স্থানে উপর নিচে দুইটি ওয়াক্‌ফের চিহ্ন থাকে, সেখানে উপরের চিহ্নটি অনুসরণ করা হবে।

## যেসব স্থানে লেখা হয় এক রকম পড়তে হয় অন্য রকম

* ১২ পারার ৪র্থ রুকূতে যে مَجْرٖهَا শব্দটি আছে তাকে মাজরীহা পড়া যাবে না। বরং মাজরেহা পড়তে হবে।

* ২৬ পারার সূরা হুজুরাতের ২য় রুকুতে যে بِئْسَ الِاسْمُ রয়েছে তাকে এভাবে পড়তে হবে بِئْسَ لِسْمُ

* কুরআন শরীফে যত স্থানে اَنَا শব্দ আছে (অর্থ: আমি) সেখানে আলিফ পড়া হবে না অর্থাৎ, নূনে মদ হবে না। তবে চার স্থানে اَنَا -তে মদ হবে। যথা: اَنَاسِىَ. اَنَامِلَ. اَنَابُوْا. اَنَابَا

* بَصْطَةً ও يَبْصُطُ শব্দের ص -এর উপরে সাধারণত একটা ছোট س লেখা থাকে। এই س লেখা থাকুক বা না থাকুক এখানে ص পড়া হবে না বরং س পড়া হবে।

* ৪ পারার اَفَائِنْ مَاتَ শব্দের ف -এর পরের আলিফ পড়া হবে না পড়তে হবে এরূপ اَفَئِنْ

* ৪ পারার لَا اِلَى اللهِ -এর لا এর আলিফ পড়া হবে না। পড়তে হবে এরূপ لَ اِلَى اللهِ

* ৬ পারার اَنْ تَبُوْٓءَا শব্দের হামযার পরের আলিফ পড়া হবে না।

* ৯ পারার مَلَاۡئِهٖ শব্দের লামের পরের আলিফ পড়া হবে না। পড়তে হবে এরূপ مَلَئِهٖ

* ১০ পারার (সূরা তাওবা) وَلَا اَوْ ضَعُوْا শব্দের লামের পরের আলিফ পড়া হবে না। পড়তে হবে এরূপ وَلَ اَوْ ضَعُوْا



* ১২ পারার এবং ২৬শ পারার ثَمُوْدَا শব্দের আলিফ পড়া হবে না।

* ১৩ পারার لِتَتْلُوَا শব্দের আলিফ পড়া হবে না।

* ১৫ পারার (সূরা কাহ্‌ফ) لَنْ نَدْعُوَا শব্দের আলিফ পড়তে হবে না।

* ১৫ পারার لِشَاْئٍ শব্দের আলিফ পড়া হবে না। পড়া হবে এরূপ لشئ

* ১৫ পারার (সূরা কাহ্‌ফ) لٰكِنَّا শব্দের নূনের পরের আলিফ পড়া হবে না।

* ১৯ পারার (সূরা নাম্‌ল) لَا اَذْبَحَنَّهٗ শব্দের লামের পরের আলিফ পড়া হবে না।

* ২৩ পারার (সূরা সাফ্‌ফাত) لَا اِلَى الْجَحِيْمِ -শব্দের لا এর আলিফ পড়া হবে না।

* ২৯ পারার সূরা দাহ্‌র-এর سَلَا سِلَا শব্দের শেষ আলিফ পড়া হবে না এবং এই সূরাতে قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَا শব্দটি পাশাপাশি দুইবার আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় قَوَارِيْرَا শব্দের শেষের আলিফ কোনো অবস্থাতেই পড়া হবে না, চাই ওয়াক্‌ফ করা হোক বা না হোক। আর প্রথম قَوَارِيْرَا শব্দের শেষের আলিফ ওয়াক্‌ফ করলে পড়া হবে এবং ওয়াক্‌ফ না করলে পড়া হবে না।

* কুরআন শরীফে কোন হরফের উপর জযম থাকলে এবং তার পরের হরফে তাশদীদ থাকলে ঐ জযম ওয়ালা হরফকে পড়তে হবে না। যেমন: اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا. اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ. قَالَتْ طَّائِفَةٌ. قَدْ تَّبَيَّنَ

## তিলাওয়াতের সাজদা

* কুরআন শরীফে মোট ১৪টি সাজদার আয়াত আছে; এগুলো পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে সাজদা দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। একে সাজদায়ে তিলাওয়াত বা তিলাওয়াতের সাজদা বলে। উক্ত ১৪টি আয়াত এই-

১. সূরা আ'রাফ (৯ম পারা)–এর শেষ আয়াত। আয়াত নং ২০৬।
২. সূরা রা'দ (১৩শ পারা)–এর ১৫ নং আয়াত।
৩. সূরা নাহ্‌ল (১৪শ পারা)–এর ৫০ নং আয়াত।
৪. সূরা বনী ইসরাঈল (১৫শ পারা)–এর ১০৯ নং আয়াত।
৫. সূরা মারইয়াম (১৬ শ পারা)–এর ৫৮ নং আয়াত।

৬. সূরা হজ্জ (১৭শ পারা)–এর ১৮ নং আয়াত।
৭. সূরা ফুরকান (১৯শ পারা)–এর ৬০ নং আয়াত।
৮. সূরা নাম্‌ল (১৯শ পারা)–এর ২৬ নং আয়াত।
৯. সূরা সাজ্‌দা (২১ তম পারা)–এর ১৫ নং আয়াত।
১০. সূরা সাদ (২৩ তশ পারা)–এর ২৪ নং আয়াত।
১১. সূরা হা মীম সাজ্‌দা (২৪ তম পারা)–এর ৩৮ নং আয়াত।
১২. সূরা নাজ্‌ম (২৭ তম পারা)–এর শেষ আয়াত (৬২ নং আয়াত)।
১৩. সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব (৩০ তম পারা)–এর ২১ নং আয়াত।
১৪. সূরা আলাক্ব (৩০ তম পারা)–এর শেষ আয়াত।

* সাজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম এই যে, নামাযের ন্যায় পাক পবিত্র অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে একটি সাজদা করবে, সাজদায় তিনবার সাজদার তাসবীহ পড়ে আবার আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। হাত উঠাতে বা বাঁধতে হবে না। না দাঁড়িয়ে বসে বসেও এই সাজদা করা যায় বা দাঁড়িয়ে সাজদায় গিয়ে সাজদা করে বসে থাকলেও দুরস্ত আছে। শয্যাশায়ী রোগী নামাযের সাজদায় যেরূপ ইশারা করে এই সাজদাও তদ্রূপ ইশারায় করলেই আদায় হয়ে যাবে।

* সাজদার আয়াত তিলাওয়াত বা শ্রবণের সময় উযূ না থাকলে পরে যখন উযূ করবে তখন সাজদা করে নিলেও আদায় হয়ে যাবে। উযূ থাকলেও পরে আদায় করে নেয়া যায়, তবে উযূ থাকলে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত বা শ্রবণের সাথে সাথে সাজদা করে নেয়া উত্তম।

* যে সমস্ত তিলাওয়াতের সাজদা আদায় করা হয়নি, মৃত্যুর পূর্বে সেই সমস্ত সাজদা আদায় করে নিতে হবে; নতুবা গোনাহগার হতে হবে।

* হায়েয নেফাস অবস্থায় সাজদার আয়াত শুনলে সাজদা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু গোসলের হাজতের অবস্থায় বা হায়েয নেফাস থেকে পাক হয়ে গোসলের পূর্বাবস্থায় সাজদার আয়াত শুনলে সাজদা ওয়াজিব হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়লে সাজদার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ সাজদা করে নিতে হবে। তৎক্ষণাৎ সাজদা না করে এক দুই আয়াত আরও পড়ার পর সাজদা করলেও দুরস্ত আছে। কিন্তু আরও বেশি পড়ার পর সাজদা করলে সাজদা আদায় হবে না, তাতে গোনাহগার হতে হবে।



* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়ে নামাযের মধ্যে সাজদা না করলে নামাযের বাইরে এই সাজদা আদায় করলে আদায় হবে না। চিরকালের জন্য পাপী থাকতে হবে। এর জন্য এস্তেগফার করতে হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়ে তৎক্ষণাৎ যদি রুকূতে চলে যায় এবং রুকূর মধ্যে সাজদায়ে তিলাওয়াতেরও নিয়ত করে, তাতেও সাজদা আদায় হয়ে যাবে। আর রুকূতে অনুরূপ নিয়ত না করলে তারপর যখন সাজদা করবে তখন নিয়ত না করলেও তিলাওয়াতের সাজদা আদায় হয়ে যাবে।

* নামাযের মধ্যে অন্য কারও সাজদার আয়াত পড়তে শুনলে নামাযের মধ্যে সাজদা করবে না, নামাযের পরে সাজদা করবে। নামাযের মধ্যে করলেও তা আদায় হবে না, উপরন্তু পাপ হবে।

* এক জায়গায় বসে একটি সাজদার আয়াত বারবার পড়লে বা শুনলে একটি সাজদাই ওয়াজিব হয়, শর্ত হল মজলিস এক থাকতে হবে- মজলিস পরিবর্তন হলে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজ দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়েছে ধরা হবে। এক জায়গায় বসে একাধিক সাজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে যত আয়াত তত সাজদা ওয়াজেব হবে।

* রেডিও, টেপরেকর্ডার ও গ্রামোফোনে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত শুনলে সাজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয় না।

(امداد الفتاوی [illegible]/٢ وآلات جدیدہ کے شرعی احکام)

* সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং তিলাওয়াতের সাজদা থেকে বাঁচার জন্য শুধু সাজদার আয়াত বাদ দিয়ে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ।

**গ্রন্থ সমাপ্ত**

## তৃতীয় সংস্করণে যা যা পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা হয়েছে

আহকামে যিন্দেগীর ৩য় সংস্করণে মোট চার ধরনের পরিবর্তন/পরিবর্ধন আনয়ন করা হয়েছে। যথা:–

### ১. সংযোজন করা হয়েছে–

* আল্লাহ্‌র ৯৯ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

* অলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা শীর্ষক আলোচনায় সংযোজন।

* হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাজার বেশ কিছু নতুন মাসআলা সংযোজন।

* "হজ্জের সফরের আদবসমূহ" শীর্ষক আলোচনা সংযোজন।

* হজ্জের মাসায়েলে সর্বশেষ অবস্থার আলোকে কিছু নতুন বর্ণনা সংযোজন।

* মক্কা মুকাররমায় যিয়ারতের স্থানসমূহের আলোচনায় নতুন কিছু তথ্য সংযোজন।

* মদীনা মুনাওওরায় যিয়ারতের স্থানসমূহের আলোচনায় নতুন কিছু তথ্য সংযোজন।

* "জেহাদ প্রসঙ্গ" শীর্ষক আলোচনা সংযোজন।

* ("তিলাওয়াতের সাজদা" শীর্ষক আলোচনা) ১৪টি সাজদার আয়াতের বিবরণ সংযোজন করে দেয়া হয়েছে।

* "সাজদায়ে সহোর মাসায়েল" শীর্ষক আলোচনার ৫ম মাসআলায় কিছু কথা সংযোজন করা হয়েছে।

* আরও বহু স্থানে ছোটখাট অনেক মাসআলা সংযোজন।

* বেশ কিছু স্থানে আরও বরাত সংযোজন করা হয়েছে।

### ২. বাদ দেয়া হয়েছে–

অধিকতর তাহকীকের ভিত্তিতে এ সংস্করণে পূর্বের সংস্করণ থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ বাদ দেয়া হয়েছে।

* ("মসজিদে যাওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ" শীর্ষক আলোচনা) মসজিদ নজরে আসলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطَائِيْ وَعَمَدِيْ.



* ("নামায পড়ার তরীকা" [পূর্বের শিরোনাম "দুই রাকআত নামাযের আমলসমূহ] শীর্ষক আলোচনা) তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পূর্বে এই দুআ পড়ে নেয়া উত্তম-

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

* ("মেজবানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ" শীর্ষক আলোচনা) সম্ভব হলে বিদায়ের সময় মেহমানকে কিছু হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদান করবে।

### ৩. বিন্যাসগত পরিবর্তন–

নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় চতুর্থ অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "হায়েয নেফাস ও ইস্তেহাযা ইত্যাদি"–এর অধীনে আনা হয়েছে।

* গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল

* প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা

* প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা

### ৪. ভাষাগত পরিবর্তন–

* "হক্কে শোফআর মাসায়েল" শীর্ষক আলোচনার ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে সাবলীল করে দেয়া হয়েছে।

* বিভিন্ন স্থানে টুকিটাকি ভাষাগত ও বানানগত পরিবর্তন ও পরিমার্জন আনা হয়েছে।

## পঞ্চম সংস্করণে যা যা পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা হয়েছে

পঞ্চম সংস্করণে যা যা পরিবর্তন/পরিবর্ধন বা সংশোধন করা হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

* উযূতে "নিয়ত আরবীতে হওয়া" উত্তম কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে।

* উযূতে "নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা মোস্তাহাব।" এটি বাদ দেয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

* উযূতে কান মাসেহের তরীকার বর্ণনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

* উযূতে কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত– এটি পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

* উযূর শেষে কালেমায়ে শাহাদাতের পর পঠিত দুআর মধ্যে কিছু শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে।

* উযুর শেষে সূরা কদর পাঠের ফযীলত সম্বলিত রেওয়ায়েতটি তাহকীকান্তে প্রমাণযোগ্য সাব্যস্ত না হওয়ায় বাদ দেয়া হয়েছে।

* মোজায় মাসেহের বর্ণনা নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। সেখানে কিছু নতুন মাসআলা সংযোজন করা হয়েছে।

* সূরা ফাতেহা শেষে আমীন আস্তে বলা সুন্নাত।– পরিবর্তন করে আস্তে বলা উত্তম– এরূপ করে দেয়া হয়েছে।

* শবে বরাতে গোসল করা মুস্তাহাব।– এটি বাদ দেয়া হয়েছে।

* শবে কদরে গোসল করা মুস্তাহাব।– এটি বাদ দেয়া হয়েছে।

* আশুরায় ১টা রোযা রাখা "মাকরূহ তাহরীমী"– পরিবর্তন করে "মাকরূহ তানযীহী" করা হয়েছে।

* অসুস্থ্য অবস্থায় চারশত বার দুআয়ে ইউনুসের বর্ণনায় চল্লিশ বার লেখা হয়েছে। সরাসরি হাদীছ দেখেই এটা করা হয়েছে।

* খতমে ইউনুস/খতমে শিফা, খতমে জালালী, খতমে বুখারী, খতমে খাজেগান ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নোট সংযোজন করা হয়েছে।

* দুরূদে নারিয়া সম্বন্ধে কতিপয় লোকের ভুল ব্যাখ্যার অপনোদন করা হয়েছে।

* ভুল বুঝাবুঝির কারণে তদুপরি জরুরিও নয়– এ কারণে অবৈধ প্রেম থেকে ও যেনার চেতনা থেকে মুক্তির উপায় প্রসঙ্গ থেকে নিম্নোক্ত কথাগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। "যে বুযুর্গের প্রতি ভক্তি আছে তাঁর সম্পর্কে এই কল্পনা করবে যে, তিনি আমার অন্তরের মধ্যে বসে আমার অন্তর থেকে সব জঞ্জাল ধীরে ধীরে বাইরে নিক্ষেপ করছেন।"

* "মোবাইল সেট সংক্রান্ত কিছু মাসআলা", "পাত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকা উত্তম ও কাম্য", "পাত্রের মধ্যে যেসব গুণ থাকা উত্তম ও কাম্য" – এই তিনটি শিরোনামে নতুন করে বেশ কিছু মাসআলা সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু স্থানে ফাঁকে ফাঁকে নতুন মাসআলা সংযোজন করা হয়েছে।

* বেশ কিছু স্থানে আরও বরাত সংযোজন করা হয়েছে। দু'একটা বরাতের পরিবর্তনও করা হয়েছে।

* পুরো গ্রন্থের বাংলা ও আরবী শব্দাবলীর বানান-রীতি বহুলাংশে আধুনিকায়ণ করে দেয়া হয়েছে।



## গ্রন্থপঞ্জী

এ গ্রন্থে (আহকামে যিন্দেগী-তে) যেসব কিতাবের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা (লেখকের নামসহ) পেশ করা হল।


| লেখকের নাম | গ্রন্থের নাম |
|---|---|
| أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة | ابن ماجة |
| الإمام أبو داود السجستاني | السنن لأبي داود |
| مولنا محمد یوسف لدھیانوی | آپ کے مسائل اور انکا حل |
| حضرت مولنا مفتی رشید احمد | احسن الفتاوی |
| الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي | الأحكام السلطانية |
| عارف باللہ مولنا ڈاکٹر محمد عبد الحی | احکام میت |
| حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي | إحياء علوم الدين |
| الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي | أدب الدنيا والدين |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | ادب القرآن |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | آداب المعاشرت |
| حضرت مولنا حفظ الرحمٰن سیوھاروی | اسلام کا اقتصادی نظام |
| حضرت مولنا محمد منظور نعمانی | اسلام کیا ہے؟ |
| حضرت مولنا قاری محمد طیب صاحب | اسلامی تہذیب وتمدن |
| پروفیسر رفیع اللہ شھاب | اسلامی معاشرۃ |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | اصلاح انقلاب امت |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | اصلاح الرسوم |
| شیخ الحدیث حضرت مولنا محمد زکریا | الاعتدال في مراتب الرجال المعروف باسلامی سیاست |
| ترتیب دادہ از افادات حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | العلم والعلماء |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | اغلاط العوام |
| وهبة الذحيلي المصري | الفقه الإسلامي وأدلته |
| عبد الرحمن الجزيري | الفقه على المذاهب الأربعة |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | امداد الفتاوی |
| إلياس عبد الغني | المساجد الأثرية |

| গ্রন্থের নাম | লেখকের নাম |
| --- | --- |
| المشاكل الزوجية وحلولها | محمد عثمان الخشت (مكتبة القرآن . القاهره) |
| المقاصد الحسنة | الإمام الشيخ شمس الدين السخاوي |
| آلات جدیدہ کے شرعی احکام | حضرت مولنا مفتی محمد شفیع صاحب |
| আযাম ইকামতের ফাযায়েল, মাসায়েল ও তাজবীদ | মূলঃ মাওঃ কারী আবুল হাছান আজমী (দেওবন্দ) |
| ইসলামে শ্রমিকের অধিকার | হযরত মাওঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ |
| ইসলামী ফিকাহ | মূল মাওঃ মুজীবুলণ্ডাহ নদবী |
| ইংরেজী পড়িব না কেন? | মূল মাওঃ আশরাফ আলী থানবী |
| ইল্‌মের ফযীলত | হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী |
| الصحيح للبخاري | محمد بن إسماعيل البخاري |
| بدائع الصنائع | ملك العلماء علاء الدين الكاساني |
| بصائر حکیم الامت | مرتبہ عارف باللہ مولنا ڈاکٹر محمد عبدالحی |
| بہشتی زیور | حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی |
| بیان القرآن | حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی |
| بيوت الصحابة | إلياس عبد الغني |
| বেহেশতী জেওর | মূল মাওঃ আশরাফ আলী থানবী |
| ভোট সম্পর্কে শরীয়াতের নির্দেশ | হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী |
| تحفۂ زوجین | ترتیب دادہ از رسائل اشرف علی تھانوی |
| تربیت اولاد اور اسکے متعلقات | ترتیب دادہ از رسائل اشرف علی تھانوی |
| السنن للترمذي | أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي |
| تصوف کیا ہے؟ | مولنا محمد منظور نعمانی |
| تعلیم الدین | حضرت مولنا محمد اشرف علی تھانوی |
| تقویۃ الایمان | حضرت مولنا شاہ اسماعیل شہید |
| تكملة فتح الملهم | مولنا محمد تقي العثماني الباكستاني |
| تنبيه الغافلين | أبو الليث السمرقندي |
| তাসাওউফ তত্ত্ব | হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী |
| তুহফায়ে আবরার | মূলঃ হযরত মাওঃ শাহ আবরারুল হক সাহেব |





| গ্রন্থের নাম | লেখকের নাম |
| --- | --- |
| جدید فقہی مسائل | مولنا خالد سیف اللہ رحمانی (فاضل دیوبند) |
| جزاء الاعمال | حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی |
| جمال القرآن | حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی |
| جمع الفوائد | محمد بن محمد بن سليمان |
| جواہر الفتاوی | حضرت مولنا مفتی عبدالسلام چاٹگامی |
| جواہر الفقہ | حضرت مولنا مفتی محمد شفیع |
| جہیز ایک سماجی لعنت | مولنا خورشید حسن قاسمی |
| | হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী |
| حسن العزیز | حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی |
| حصن حصین | محمد بن محمد بن محمد الجزری الشافعی |
| حکیم الامت حضرت تھانوی کے سیاسی افکار | حضرت مولنا محمد تقی عثمانی |
| حقوق العباد | اوصاف علی |
| হজ্জ উমরা ও যিয়ারত | মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ |
| হায়াতুল মুসলিমীন | মূল- হযরত মাঃ আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) |
| خیر الفتاوی | الشیخ خیر محمد جالندھری ومفتیان خیر المدارس، ملتان |
| درس ترمذی | حضرت مولنا محمد تقی عثمانی |
| الدر المختار (شرح تنوير الأبصار) | الشيخ علاء الدين محمد الحصكفي |
| دینی دعوت کے قرآنی اصول | حضرت مولنا قاری محمد طیب |
| ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں | مفتی سعید احمد پالنپوری |
| راہ سنت | حضرت مولنا محمد سرفراز خان صاحب صفدر |
| رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں | حکیم محمد اختر شاہ |
| سیرت مصطفیٰ | مولنا ادریس کاندھلوی |
| ছাফাইয়ে মু'আমালাত | মূল- হযরত আশরাফ আলী থানবী |
| رد المحتار (شامی) | محمد أمين الشهير بابن عابدين الشامي |
| شرح المنية (غنية المتملي) | الشيخ إبراهيم الحلبي الحنفي |
| شرح الوقايه | الشيخ عبد الله بن مسعود |

| লেখকের নাম | গ্রন্থের নাম |
|---|---|
| امام زاده محمد بن أبي بكر الحنفي البخاري | شرعة الإسلام |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | شریعت وطریقت |
| حضرت مولنا ریاست علی صاحب بجنوری | شوری کی شرعی حیثیت |
| মূল: শায়খুল হাদীছ মাঃ যাকারিয়া | সর্বরোগের মূল |
| হযরত মাওঃ শামছুল হক ফরীদপুরী | সংক্ষেপে ইসলাম |
| سيد أحمد الطحطاوي | حاشية الطحطاوي (على مراقي الفلاح) |
| الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند | عالمگیریہ (الفتاوی الهنديه) |
| أبو جعفر أحمد الأزدي الطحاوي | عقيدة الطحاوي |
| عبد الحي اللكنوي | عمدة الرعاية |
| أكمل الدين محمد بن محمود | العناية |
| جسٹس سید امیر علی مترجم فتاوی عالمگيرية | عين الهداية (شرح اردو هدایہ) |
| مولنا قاری منت علی | غنية القاري |
| الشيخ إبراهيم الحلبي الحنفي | غنية المتملي (شرح منية المصلي) |
| مفتیان دار العلوم دیوبند | فتاوی دار العلوم |
| مفتی عبد الرحیم لاج پوری | فتاوی رحیمیۃ |
| امام ربانی حضرت مولنا رشید احمد گنگوھی | فتاوی رشیدیہ |
| فخر الدين قاضيخان | فتاوى قاضيخان |
| مفتی محمود حسن دیوبند | فتاوی محمودیۃ |
| مولنا شبير أحمد العثماني | فتح الملهم |
| شیخ السلام حضرت مولنا مشاہد سلهٹی | الفرقان |
| حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی | فروع الایمان |
| شیخ الحدیث مولنا محمد زکریا | فضائل اعمال |
| حضرت مولنا سید اصغر حسین | فقہ الحدیث |
| از افادات حضرت مولنا اشرف علی تھانوی | فقہ حنفی کے اصول وضوابط |
| حضرت مولنا قاری عبد الرحمن صاحب مکی | فوائد مکیہ |
| حضرت مولنا مفتى فيض الله | فيض الكلام وشرحه |



| লেখকের নাম | গ্রন্থের নাম |
|---|---|
| লেখক মণ্ডলী-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা | ফাতাওয়া ও মাসায়েল |
| حضرت مولنا سید اصغر حسین | قصد السبیل |
| محى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي | كتاب الأذكار |
| হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাছান | কাফন দাফনের মাসলা মাসায়েল |
| حضرت مولنا سید اصغر حسین | گلزار سنت |
| شیخ عبد الحق محدث دهلوی | ما ثبت بالسنۃ |
| الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن بكر الهيثمي | مجمع الزوائد |
| حسن بن عمار الشرنبلالي | مراقي الفلاح |
| ملا علي القاري | مرقاة المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح) |
| مولنا محمد رفعت قاسمی | مسائل وآداب ملاقات |
| أبو الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري | الصحيح لمسلم |
| ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله | مشكاة المصابيح |
| العلامة يوسف البنوري | معارف السنن |
| حضرت مولنا مفتی محمد شفیع | معارف القرآن |
| حضرت مولنا سعید احمد صاحت مفتی اعظم مظاهر العلوم | معلم الحجاج |
| يعقوب بن سيد علي | مفاتيح الجنان (شرح شرعة الإسلام) |
| হযরত মাওঃ শামছুল হক ফরিদপুরী | মা বাপ ও সন্তানের অধিকার |
| قاری محمد ابراهیم صاحب نواکھالی | نزهۃ القاری |
| أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي | السنن للنسائي |
| عبد الحی لکھنوی | نفع المفتی والسائل |
| صوفی عبد الحمید سواتی | نماز مسنون |
| حسن بن علي الشرنبلالي | نور الإيضاح |
| মূল: মাওঃ হিফজুর রহমান সিওহারভী | নীতি দর্শন |
| شيخ الإسلام الإمام الهمام برهان الدين | هداية |